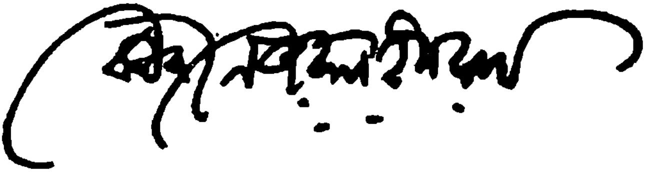
নজরুল-রচনাবলী



নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

প্রথম খণ্ড



বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৯৯২

প্রথম সংস্করণ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩/২৫শে মে ১৯৬৬। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : ৮ই ফাল্গুন ১৩৮১/২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫। পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৯০/জুন ১৯৮৩। নতুন সংস্করণ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/২৫শে মে ১৯৯৩। নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ [প্রথম খণ্ড] : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩/মে ২০০৬। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ সেল], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ৫৫০০ কপি। মূল্য : ২৪০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.). NAZRUL RACHANABALI [Works of Kazi Nazrul Islam], Vol. I. First edition : May 25, 1966. Second enlarged edition : February 21. 1975. Reprint : June 1983. New edition : May 25, 1993. Nazrul Birth Centenary edition [Vol-I] : May 2006. First Reprint (Birth Centenary edition) : June 2012. Published by Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price : Taka 240.00 only.

ISBN 984-07-5010-0

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

নূরুল ইসলাম
সদস্য-সচিব

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় নজরুল-রচনাবলী-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। প্রথমে তিন খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হওয়ার পর তাঁরই সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে অবশিষ্ট দুটি খণ্ড অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড (প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ) প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালে। সম্পাদকের জীবদ্দশায় নজরুল-রচনাবলী-র একটি সংস্করণ ও তার পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড সংশোধিত বা পুনর্মুদ্রিত হয়নি। আবদুল কাদিরের মৃত্যুর (১৯৮৪) পর নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় নজরুল-রচনাবলী-র সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। নতুন সংস্করণ স্বল্প সময়ে শেষ হয়ে যায় এবং তা পুনর্মুদ্রণ করা হয়। পুনর্মুদ্রিত সকল কপিও দ্রুত নিঃশেষিত হয়। এরপর দীর্ঘদিন যাবত রচনাবলী-র কোনো পুনর্মুদ্রণ হয়নি।

নজরুল-রচনাবলী-র অধিকতর নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র পাঠশুদ্ধি, অপ্রকাশিত রচনার অন্তর্ভুক্তি ও রচনার বর্জিত অংশ সংযোজন ইত্যাদি দ্বারা নজরুল-- রচনাবলী-র একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুত করাই বর্তমান সম্পাদনা পরিষদের প্রধান কাজ। পাঠ প্রস্তুত করার সময় প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান লক্ষ্য অর্জনের জন্য নজরুল-বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদদের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করা হয়। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী ছাড়াও বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র নতুন সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলাম—রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনা করে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

নজরুল-রচনাবলী-র প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত কাব্যগ্রন্থ, কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কবির বিদ্রোহ ও প্রেম-চেতনা, পুরাণ ও বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহারে নৈপুণ্য, আরবি-

ফারসি-হিন্দি শব্দ ব্যবহার ও নতুন শব্দ গঠনে অনন্য বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় যা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের এক অমর কবির আসন দিয়েছে।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ নজরুল-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, প্রাবন্ধিক প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে যেভাবে নজরুল-রচনাবলী-র প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সে জন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব নূরুল ইসলাম। রচনাবলী প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তা ফারহানা খানম, নাজমা আহমেদ, জয়নুল আবেদীন, সাইমন জাকারিয়া ও বাকিয়ার হোসেন। কম্পিউটারে কম্পোজ করেছেন আবু মোঃ ইমদাদুল হক, শুভ্রা বড়ুয়া ও মোঃ মোবারক হোসেন। প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁদের কাজের জন্য ধন্যবাদ।

নজরুল-রচনাবলী আগের মতোই গবেষক ও পাঠকদের সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ ।। ২৫শে মে ২০০৬

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে এবং এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

একুশ শতকের সূচনাপর্বে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে বিভিন্ন রচনার শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে যথাসাধ্য প্রয়াস চালানো হয়। মুদ্রিত রচনাবলীর বানান যুগোপযোগী করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণে পূর্ব সংস্করণের গ্রন্থ-পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রয়োজনে নতুন তথ্যাদিও সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের উৎসর্গপত্র পূর্বের মতোই সংযোজিত হলেও দুএকটি ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত, অথচ রচনাবলীতে বাদ পড়ে যাওয়া উৎসর্গপত্র যোগ করা হয়েছে। যেমন—'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের ডি.এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের কবিকৃত ভূমিকা। 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন'। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর

নয়

প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩ ॥ ২৫শে মে ২০০৬

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী-র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান-ইস্‌লামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই ; .... ও-সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার।' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নজরুল-রচনাবলী প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দোলন-চাঁপা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে ; সে-স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল ; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'-বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে-সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা-কাল ও উপলক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে-বিতর্কের নিরসনে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সব নেই ; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ-কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলো না। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ-বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

আবদুল কাদির

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড বহুদিন আগেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দরুন এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল ; এজন্য আমাদের দুঃখের অবধি নেই।

দ্বিতীয় সংস্করণে নজরুলের 'নির্ঝর' কাব্যখানির ১৮টি কবিতা স্বতন্ত্রভাবে একত্রে-সজ্জিত করা হলো। এ-সম্পর্কে 'গ্রন্থ-পরিচয়' দ্রষ্টব্য। 'সংযোজন' বিভাগে 'অদর্শনের কৈফিয়ত' ও 'আত্মকথা' শীর্ষক দু'টি নূতন কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ দু'টি কবিতার অনুলিপি সংগ্রহ করে যিনি বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড কার্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর নাম আমি বহু চেষ্টা করেও জানতে পারিনি।

'প্রবন্ধ'-ভাগের 'সংযোজন'-এ 'আমার ধর্ম', 'মুশকিল', 'লাঞ্ছিত', 'নিশানবরদার', 'তোমার পণ কি', 'ভিক্ষা দাও', 'কামাল' ও 'ভাববার কথা' শিরোনামে ৮টি নূতন নিবন্ধ পরিবেশিত হলো। এগুলি নজরুলের সম্পাদিত অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাগুলি ১৩৬৭ অগ্রহায়ণে ৬নং এন্টনিবাগান লেন, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'ধূমকেতু' নামক পুস্তিকায় নজরুলের অন্যান্য ১৩টি লেখার সঙ্গে সংকলিত হয়।

আমি বৃদ্ধ হয়েছি। কয়েক বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয় ; কিন্তু তা এখনও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি না। ইতোমধ্যে আমার বাম চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণের যতটুকু উন্নতিবিধান করতে পেরেছি, তা সুধীমহলে স্বীকৃত হবে বলেই আমি আশা পোষণ করছি।

ঢাকা

৮ই ফাল্গুন ১৩৮১

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্ম-বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *নজরুল-রচনাবলী* পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু *নজরুল-রচনাবলী* সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত *নজরুল-রচনাবলীর*ই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধে জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধে ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

নজরুল-রচনাবলী পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত *নজরুল-রচনাবলীর* বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে *নজরুল-রচনাবলীর* সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে *অগ্নি-বীণার* পরে *বিষের বাঁশী* এবং তারপরে *দোলন-চাঁপা* বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে *অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, বিষের বাঁশী*। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২. কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে *রচনাবলীতে* মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, *সন্ধ্যামণি*, *নবরাগমালিকা*। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণের গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যেসব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন সর্বহারা। যেসব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয়

খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ *সঞ্চিতা* এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে *সঞ্চিতার* প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. *মক্তব-সাহিত্য* বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় *রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে *মক্তব-সাহিত্যের* উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

নজরুল-রচনাবলীর সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

নজরুল-রচনাবলীর সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা *নজরুল-রচনাবলীর* আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

সূচিপত্র

কবিতা

গল্প

উপন্যাস

প্রবন্ধ

রাজবন্দীর জবানবন্দী [৪২৯ — ৪৩৫]



কিশোর বয়সে নজরুল ইসলাম

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম রচিত 'নানা প্রসঙ্গে নজরুল' (নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুলাই ২০০২) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত



হাবিলদার-বেশে নজরুল ইসলাম : ২১ বছর বয়সে

'নজরুল অ্যালবাম' (অক্টোবর ১৯৯৪), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত



যুদ্ধ- ফেরত নজরুল ইসলাম

'নজরুল অ্যালবাম' (অক্টোবর ১৯৯৪), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত



নজরুল ইসলাম : ২৪ বছর বয়সে

'নজরুল অ্যালবাম' (অক্টোবর ১৯৯৪), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত



বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দলমাদল কামানের পাশে দাঁড়ানো নজরুল ইসলাম : ২৫ বছর বয়সে

'নজরুল অ্যালবাম' (অক্টোবর ১৯৯৪), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত



কবি পত্নী প্রমীলা

'নজরুল অ্যালবাম' (অক্টোবর ১৯৯৪), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত



কৃষ্ণনগরের বাসস্থান 'গ্রেস কটেজ'-এ নজরুল-পরিবার : নজরুলের কোলে শিশুপুত্র বুলবুল, বামে শ্বাশুড়ি গিরিবালা দেবী, ডানে কবি-পত্নী প্রমীলা, বামে বুলবুলের সেবিকা

'নজরুল অ্যালবাম' (অক্টোবর ১৯৯৪), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত



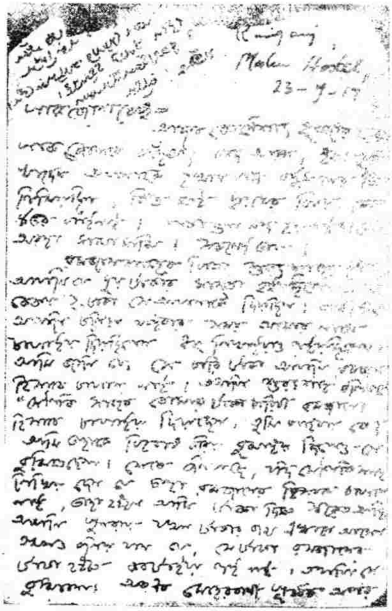
শিকারি দলে নজরুল ইসলাম (কোট পরিহিত বাম পাশে বসা)। ১৯২১ সালে নজরুল কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বিহারের চুনারে গিয়েছিলেন শিকারে। সেখানে কয়েকটি গ্রুপ ছবি তোলা হয়। এ সম্পর্কিত তথ্যে জানা যায়, শিকারের সঙ্গী ছিলেন ডা. হামিদ (কলকাতা করপোরেশনের গো-খাবার সুপার), জহিরুদ্দিন (ঢাকা ওয়ারি ক্লাবের কর্ণধার জহুর চাচা) ও অন্যান্য। হামিদ সাহেব মুর্শিদাবাদের লোক। জহুর চাচা কৃষ্ণনগরের। ছবিতে নজরুল ছাড়া আর যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সনাক্ত করা আজ আর সম্ভব নয়

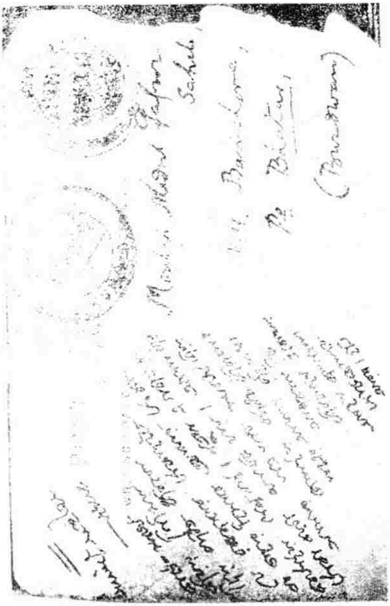
ছবি জনাব কে. এম. জামানের সৌজন্যে, অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সিনিয়র সাংবাদিক জনাব ফজলুল করিমের মাধ্যমে প্রাপ্ত, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, আষাঢ় ১৪০২/জুন ১৯৯৫



১৯১৬ সালে বর্ধমানের রানিগঞ্জে সিয়ারসোল রাজ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ আবদুল গফুর সাহেবের বিদায়োপলক্ষে ' মর্মোচ্ছ্বাস' শীর্ষক মানপত্রের ফটোকপি। 'মর্মোচ্ছ্বাস' শীর্ষক কবিতাটি যে ঐ স্কুলের ছাত্র কাজী নজরুল ইসলামের রচিত তা কবিতাটির প্রতিটি স্তবকের প্রথম পংক্তির প্রথম ও বড় অক্ষর মিলালেই তার প্রমাণ মেলে: 'কাজী নজরুল ইসলাম' নামটি বেরিয়ে আসে

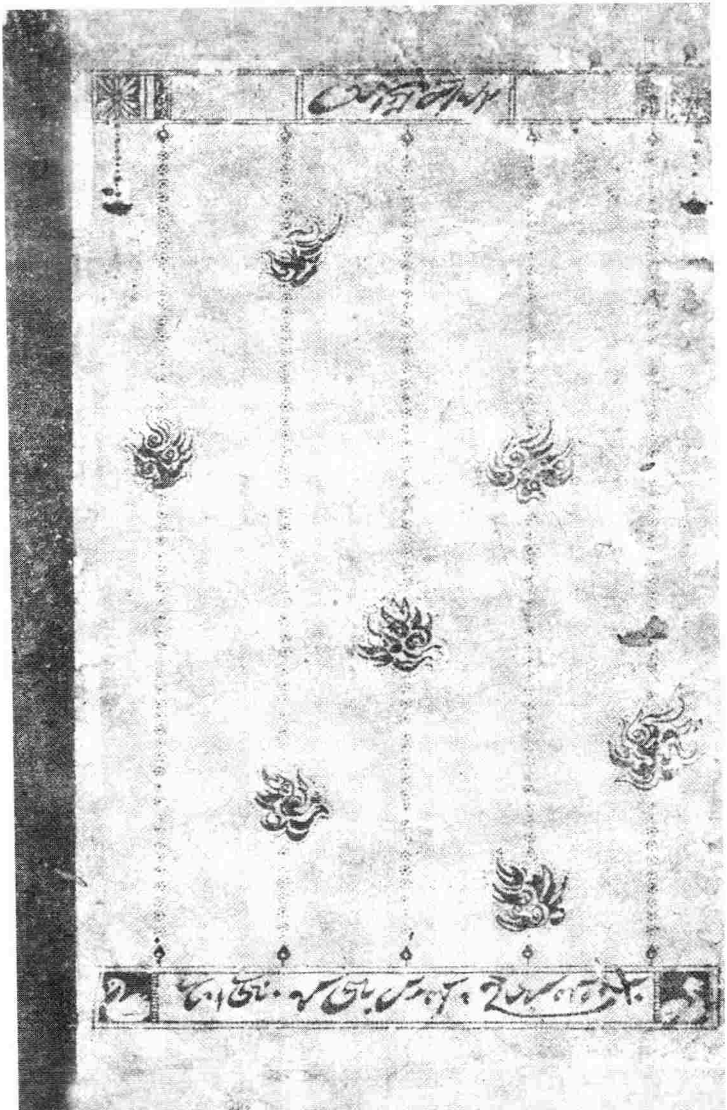
মানপত্রের ফটোকপি প্রয়াত কথাশিল্পী শওকত ওসমানের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'মর্মোচ্ছ্বাস' কবিতাটি কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'-তে সংকলিত





আজ পর্যন্ত নজরুল ইসলামে যত চিঠি পাওয়া গেছে তারমধ্যে এটি প্রথম চিঠি। ১৯৭১ সালে ছাত্রাবস্থায় নজরুল এই চিঠি তাঁর স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক জনাব আবদুল গফুরকে লেখেন

কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক আব্দুল মান্নান সৈয়দের কাছ থেকে সংগৃহীত



প্রচ্ছদ: অগ্নি-বীণা (২৫ শে অক্টোবর ১৯২২)

প্রাবন্ধিক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের সৌজন্যে প্রাপ্ত

যুগ-বাণী

প্রাপ্তিস্থান—
আর্য্যপাবলিশিং হাউস্
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট—(দোতালায়)
কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩২৯।

কাজী নজরুল ইসলাম

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রচ্ছদ : যুগবাণী (২৬শে অক্টোবর ১৯২২)

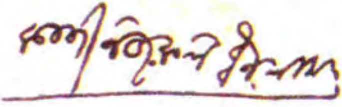
প্রাবন্ধিক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের সৌজন্যে প্রাপ্ত



প্রচ্ছদ : দোলন-চাঁপা (অক্টোবর ১৯২৩)

ড. রাজিয়া সুলতানা রচিত 'নজরুল-অন্বেষা' (গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০১) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত





প্রচ্ছদ : বিষের বাঁশী (১০ই আগষ্ট ১৯২৪)

ড. রাজিয়া সুলতানা রচিত 'নজরুল-অন্বেষা' (গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০১) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

ভাঙার-গান

কাজী নজরুল ইস্‌লাম



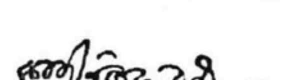
প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ডি, এম্ লাইব্রেরী,

৬১নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট.

কলিকাতা।

দাম দশ আনা।



প্রচ্ছদ : ভাঙার গান (আগস্ট ১৯২৪)

প্রাবন্ধিক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের সৌজন্যে প্রাপ্ত



প্রচ্ছদ : বাঁধনহারা (দ্বিতীয় সংস্করণ, তারিখবিহীন। প্রমীলা কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবেশক ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা)

ড. রাজিয়া সুলতানা রচিত 'নজরুল-অন্বেষা' (গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০১) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

অগ্নি-বীণা

উৎসর্গ

ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু

অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।
তাই তো তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে॥

দহন-বনের গহন-চারী—
হায় ঋষি—কোন্ বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আন্‌লে বারি
অগ্নি-মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন্ বাঁশি সে বুঝ্‌তে পারি না যে॥

দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হান্‌ছিলে বৈশাখে,
হঠাৎ সে কার শুন্‌লে বেণু কদম্বের ঐ শাখে।
বজ্রে তোমার বাজ্‌ল বাঁশি,
বহ্নি হলো কান্না হাসি,
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী—
মন সরে না কাজে।
তোমার নয়ন-ঝুরা অগ্নি-সুরেও রক্ত-শিখা বাজে॥

মুখবন্ধ

অগ্নি-বীণা-র প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি চিত্রকর-সম্রাট শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, এবং এঁকেছেন তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীবীরেশ্বর সেন। এজন্য প্রথমেই তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

'ধূমকেতু'র পুচ্ছে জড়িয়ে পড়ার দরুন যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি করে *অগ্নি-বীণা* বের করতে পারলাম না। অনেক ভুলত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। সর্বপ্রথম অসম্পূর্ণতা, যেসব গান ও কবিতা দেবো বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সেইগুলি দিতে পারলাম না। কেননা সে সমস্তগুলি দিতে গেলে বইটি খুব বড় হয়ে যায়, তার পর ছাপানো ইত্যাদি খরচ এত বেশি পড়ে যায় যে এক টাকায় বই দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। পূর্বে যখন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তখন ভাবিনি, যে, সমস্ত কবিতা গান ছাপতে গেলে তা এত বড় হয়ে যাবে, কেননা আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কোনো দিনই ছিল না, আজও নেই। এর জন্য যতটুকু গালি-গালাজ বদনাম সব আমাকে অকুতোভয়ে হজম করতে হবেই। তবু আমার পাঠক পাঠিকার নিকট আমার এই ত্রুটি বা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। বাকি কবিতা ও গানগুলি দিয়ে এবং পরে কতকগুলি কবিতার সমষ্টি নিয়ে এইরকম আকারেরই *অগ্নি-বীণা*-র দ্বিতীয় খণ্ড দিন পনরর মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। আর্য পাবলিশিং হাউজ-এর ম্যানেজার আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহের ঐকান্তিক চেষ্টারই সাহায্যে আমি *অগ্নি-বীণা* কোনোরকমে শেষ করতে পারলাম; আরো অনেকে অনেকরকম সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখির ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপ্‌টা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল্ দোলে !
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় !

বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে !
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—
হাঁকে ঐ 'জয় প্রলয়ঙ্কর !'
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে !
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে !
এবার মহা-নিশার শেষে
আস্‌বে ঊষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভর্‌বে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ! !

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত-চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে !
খুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে !
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ স্তূপে !
এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে কর্‌তে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে—
মধুর হেসে !

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ! !

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !—
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্ !
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির !

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর !
আমি দুর্বার,

আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !
আমি মানি নাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন !
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর !
আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর !
বল বীর—
চির উন্নত মম শির !

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ !
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল চঞ্চল, ঠমকি ছমকি
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্ !
আমি চপলা-চপল হিন্দোল !

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা !
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম্ ভরপুর মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি !

আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে-চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তূর্য!
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির!

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি খ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!
আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস,—আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্-দোল্!—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেমউদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশির!
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে-দেখা-অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন্-কন্।

আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভিতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর !
আমি উত্তরী-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।—
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত-করতলে,
তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে !
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল !
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চরি ভূমি-কম্প !
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি,
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি !
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল !

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরির তানে পাশরি !
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরি।

বোররাক—স্বর্গের পক্ষীরাজ।

আমি রুষে উঠে যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।
আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডি, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত!
আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!—

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!

হাবিয়া দোজখ—সপ্তম নরক, এই নরকই ভীষণতম।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !

রক্তাম্বরধারিণী মা

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন-ঝন্।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল্-চিতা।
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।
এলোকেশে তব দুলুক ঝন্‌ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত-বান।
নিশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মা গো এই ভুবন,
অ-সুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু
চক্র মা তোর হেম-কাঁকন।
টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,

নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।
হাসো খলখল, দাও করতালি,
বলো হর হর শঙ্কর !
আজ হতে মা গো অসহায় সম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর।
মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক করো মা,
সে চাবুক করো নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে-লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মারো আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডি রূপ ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

আগমনী

একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন—
ঝন রনরন রন ঝনঝন !
সেকি দমকি দমকি

ধমকি ধমকি
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি গমকি
ওঠে চোটে চোটে,
ছোটে লোটে ফোটে !
বহ্নি-ফিনিকি চমকি চমকি
ঢাল-তলোয়ারে খনখন !
একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
রণ ঝনঝন ঝন রণরণ !

হৈ হৈ রব
ঐ ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
ওই পালে পালে,
ধরা কাঁপে দাপে।
জাঁকে মহাকাল কাঁপে থরথর !
রণে কড়কড় কাড়া-খাঁড়া-ঘাত,
শির পিষে হাঁকে রথ-ঘর্ঘর-ধ্বনি ঘররর !
'গুরু গরগর' বোলে ভেরী তূরী,
'হর হর হর'
করি চীৎকার ছোটে সুরাসুর-সেনা হনহন !
ওঠে ঝন্‌ঝা ঝাপটি দাপটি সাপটি
হু-হু-হু-হু-হু-হু শনশন !
ছোটে সুরাসুর-সেনা হনহন !

তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ খল খল খল
নাচে রণ-রঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে,
ধকধক জ্বলে জ্বলজ্বল
বুকে মুখে চোখে রোষ-হুতাশন !
রোস্‌ কোথা শোন্‌ !

ঐ ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি বোলে,
ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে,

মম-বরুণ কী কল-কল্লোলে চলে উতরোলে
ধ্বংসে মাতিয়া তাথিয়া তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে ! চরণ-ভঙ্গে
সৃষ্টি সে টলে টলমল !

ওকি বিজয়-ধ্বনি সিন্ধু গরজে কলকল কল কলকল !
ওঠে কোলাহল,
কূট হলাহল
ছোটে মন্থনে পুন রক্ত-উদধি,
ফেনা-বিষ ক্ষরে গলগল !
টলে নির্বিকার সে বিধাত্রীরো গো
সিংহ-আসন টলমল !
কার আকাশ-জোড়া ও আনত-নয়ানে
করুণা-অশ্রু ছলছল !

বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁজর ঝম্‌ঝম্‌,
নাচে ধূর্জটি সাথে প্রমথ ববম্‌ বম্‌বম্‌ !
লাল লালে-লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের,
ওঠে ওঙ্কার রণ-ডঙ্কার,
নাদে ওম্‌ ওম্‌ মহাশঙ্খ বিষাণ রুদ্রের !
ছোটে রক্ত-ফোয়ারা বহ্নির বান রে !
কোটি বীর-প্রাণ
ক্ষণে নির্বাণ
তবু শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম্‌গম্‌ !
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত পিশাচেরও
শিরদাঁড়া করে চন্‌চন্‌ !
যত ডাকিনী যোগিনী বিস্ময়াহতা,
নিশীথিনী ভয়ে থম্‌থম্‌ !
বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্‌ঝম্‌ !

ঐ অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য-সেনা যত
হত আহত করে রে দেবতা সত্য !
স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, মাতাল রক্ত-সুরায় ;

ত্রস্ত বিধাতা,
মস্ত পাগল পিনাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায় !
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায় !

চিতার উপরে চিতা সারি সারি,
চারিপাশে তারি
ডাকে কুক্কুর গৃধিনী শৃগাল !
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল !
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল ! !

আজ রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ !
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর !

'নাই দানব
নাই অসুর,—
চাইনে সুর,
চাই মানব !'—
বরাভয়-বাণী ঐ রে কার
শুনি, নহে হৈ রৈ এবার !

ওঠ্ রে ওঠ্,
ছোট্ রে ছোট্ !
শান্ত মন,
ক্ষান্ত রণ !—

খোল্ তোরণ,
চল্ বরণ
করব মা'য় ;
ডরব কায় ?
ধরব পা'য় কার্ সে আর,
বিশ্ব-মা'ই পার্শ্বে যার ?

আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া,
ঐ শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন-হাওয়া!
এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ঐ,
সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা
এল বীণা-পাণি অমলা ঐ!

•

এসেছে গণেশ,
এসেছে মহেশ,
বাস্‌রে বাস্!
জোর উছ্বাস্!!
এল সুন্দর সুর-সেনাপতি,
সব মুখ এ যে চেনা-চেনা অতি!
বাস্ রে বাস্ জোর উছ্বাস্!!

হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,
তব সীমা লয় হোক।
ভুলে যাও শোক—চোখে জল ব'ক
শান্তির—আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক!
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা'র আবাহন-গীত্ চলুক!
দীপ জ্বলুক!
গীত চলুক!!
আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম্!
স্বা-গতম্!
স্বা-গতম্!!
মা-তরম্!
মা-তরম্!!
ঐ ঐ ঐ বিশ্ব কণ্ঠে
বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে—'বন্দে মাতরম্!!!'

ধূমকেতু

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !
সাত— সাতশো নরক-জ্বালা জলে মম ললাটে,
মম ধূম-কুণ্ডলি করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে !
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ,
আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ-হাহাকার—
আর মর্তে সাহারা-গোবি-ছাপ,
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ !

আমি সর্বনাশের ঝাণ্ডা উড়ায়ে বোঁও বোঁও ঘুরি শূন্যে,
আমি বিষ-ধূম-বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান-অভিমুন্যে।
শোঁও শন-নন-নন-শন-নন-নন শাঁই শাঁই,
ঘুর্ পাক্ খাই, ধাই পাঁই পাঁই
মম পুচ্ছে জড়ায়ে সৃষ্টি ;
করি উল্কা-অশনি-বৃষ্টি,—
আমি একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি, পারি গ্রাসিতে এখনো ত্রিশটি।
আমি অপঘাত দুর্দৈব রে আমি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি !

আমি আপনার বিষ-জ্বালা-মদ-পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া
জোর বুঁদ হয়ে আমি চলেছি ধাইয়া ভাইয়া !
শুনি মম বিষাক্ত 'রিরিরিরি'-নাদ
শোনায় দ্বিরেফ-গুঞ্জন সম বিশ্ব-ঘোরার প্রণব-নিনাদ !
ধূর্জটি-শিখ করাল পুচ্ছে
দশ অবতারে বেঁধে ঝ্যাটা করে ঘুরাই উচ্চে, ঘুরাই—
আমি অগ্নি-কেতন উড়াই !—

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !

ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়ায়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ !
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি।

আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও !
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও !
তোর নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই, মৃত্যুর মুখে থুথু দি !
আর যে যত রাগে রে তারে তত কাল্-আগুনের কাতুকুতু দি।
মম তূরীয় লোকের তির্যক্ গতি তূর্য গাজন বাজায়
মম বিষ নিশ্বাসে মারীভয় হানে অরাজক যত রাজায় !

কচি শিশু-রসনায় ধানি-লঙ্কার পোড়া ঝাল
আর বদ্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, এসিড, পটাশ, মোন্‌ছাল,
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি
আর স্রষ্টারে আমি চুষে খাই !
পেলে বাহান্ন-শও জাহান্নমেও আধা চুমুকে সে শুষে যাই !

আমি যুগে যুগে আসি আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু—
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !
আমি শি শি শি প্রলয়-শিশ্ দিয়ে ঘুরি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি,
আমি ত্রিভুবন তার পোড়ায়ে মারিয়া আমিই করিব মুখাগ্নি !
তাই আমি ঘোর তিক্ত সুখে রে, একপাক ঘুরে বোঁও করে ফের দু'পাক নি !
কৃতঘ্নী আমি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি !

পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর—
শোন্ রে মর, শোন্ অমর !—
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা !
এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জানো কি তা ?
কি বলো ? কি বলো ? ফের বলো ভাই আমি শয়তান-মিতা !
হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা !
ছোটে শন শন শন ঘর ঘর ঘর সাঁই সাঁই !
ছোটে পাঁই পাঁই !
তুই অভিশাপ তুই শয়তান তোর অনন্তকাল পরমাই !
ওরে ভয় নাই তোর মার নাই ! !
তুই প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু,
তুই উগ্র ক্ষিপ্ত তেজ-মরীচিকা ন'স্ অমরার ঘুম-সেতু
তুই ভৈরব ভয় ধূমকেতু !

আমি যুগে যুগে আসি আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু !

ঐ ঈশ্বর-শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিঁড়ি,
আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি !
খ্যাপা মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক, দেবরাজ-দম্ভোলি
লোকে বলে মোরে, শুনে হাসি আমি আর নাচি বব-বম্‌ বলি !
এই শিখায় আমার নিযুত ত্রিশূল বাশুলি বজ্র-ছড়ি
ওরে ছড়ানো রয়েছে, কত যায় গড়াগড়ি !
মহা সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব-সম্রাট নিরবধি,
তার ললাটে তপ্ত অভিশাপ-ছাপ এঁকে দিই আমি যদি !
তাই টিটকিরি দিয়ে হাহা হেসে উঠি,
সে হাসি গুমরি লুটায়ে পড়ে রে তুফান ঝন্‌ঝা সাইক্লোনে টুটি !

আমি বাজাই আকাশে তালি দিয়া 'তাতা-উর্‌-তাক্‌'
আর সোঁও সোঁও করে প্যাঁচ দিয়ে খাই চিলে-ঘুড়ি সম ঘুরপাক !
মম নিশাস আভাসে অগ্নি-গিরির বুক ফেটে ওঠে ঘুৎকার
আর পুচ্ছে আমার কোটি নাগ-শিশু উদ্গারে বিষ-ফুৎকার !

কাল বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার
তখনি রক্ত শোষে না রে তার,
দৃষ্টি-সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্রচণ্ড-সুখে
পুচ্ছ সাপটি খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুঁকে !
তেমনি করিয়া ভগবানে আমি
দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী
ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি পিশাচের হাসি
এই অগ্নি-বাঘিনী আমি যে সর্বনাশী !

আজ রক্ত-মাতাল উল্লাসে মাতি রে—
মম পুচ্ছে ঠিকরে দশগুণ ভাতি,
রক্ত রুদ্র উল্লাসে মাতি রে !
ভগবান ? সে তো হাতের শিকার !—মুখে ফেনা উঠে মরে !
ভয়ে কাঁপিছে, কখন পড়ি গিয়া তার আহত বুকের 'পরে !
অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে ঘিরিয়া

অজগর কাল-কেউটে সে কোনো ফিরিয়া ফিরিয়া
চায়, আর ঘোরে শন্ শন্ শন্,
ভয়-বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপে রে যেমন—
তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে
ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে চলেছি রে ;
আর সাপে-ঘেরা অসহায় শিশু সম
বিধাতা তাদের কাঁপিছে রুদ্র ঘূর্ণির মাঝে মম !

আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁদে ত্রাসে,
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হয়ে তারে গ্রাসে !

কামাল পাশা

[তখন শরৎ-সন্ধ্যা। আস্‌মানের আঙিনা তখন কার্‌বালা ময়দানের মতো খুনখারাবির রঙে রঙিন। সেদিনকার মহা-আহবে গ্রীক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই রণস্থলে হত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাকি সব প্রাণপণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল-পাশা মহাহর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল মহাকল্লোলে অম্বর-ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের বুকে পিঠে দুই জন করিয়া নিহত বা আহত সৈন্য বাঁধা। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোলাগুলির আঘাতে, বেয়নটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত রক্তরঞ্জিত। তাহাদের কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। উদ্দাম বিজয়োন্মাদনার নেশায় মৃত্যু-কাতর রণক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহারা যেন খেপিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা সঙ্গীনের আগায় রক্ত-ফেজ উড়াইয়া ভাঙা-খাটিয়া-আদি-দ্বারা-নির্মিত এক অভিনব চৌদলে কামালকে বসাইয়া বিষম হল্লা করিতে করিতে তাহারা মার্চ করিতেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর-কল্লোলের মতো তাহাদের বিপুল বিজয়ধ্বনি আকাশে-বাতাসে যেন কেমন একটা ভীতি-কম্পনের সৃজন করিতেছে। বহু দূর হইতে সে রণ-তাণ্ডব নৃত্যের ও প্রবল ভেরী-তূরীর ঘন রোল শোনা যাইতেছে। অত্যধিক আনন্দে অনেকেরই ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছিল। অনেকেরই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।]

[সৈন্য-বাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণ গাহিতেছিল,—]

ঐ খেপেছে পাগ্‌লি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই।

কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !

[হাবিলদার-মেজর মার্চের হুকুম করিল,—কুইক্ মার্চ !]

লেফ্ট ! রাইট ! লেফ্ট্ ! !
লেফ্ট ! রাইট্ ! লেফ্ট ! !

[সৈন্যগণ গাহিতে গাহিতে মার্চ করিতে লাগিল]

ঐ খেপেছে পাগ্‌লি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই !
কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !

[হাবিলদার-মেজর :—লেফ্ট্ ! রাইট !]

সাব্বাস্ ভাই ! সাব্বাস্ দিই, সাব্বাস্ তোর শম্‌শেরে।
পাঠিয়ে দিলি দুশ্‌মনে সব যম-ঘর একদম্-সে রে !
বল্ দেখি ভাই বল্ হাঁ রে,
দুনিয়ার কে ডর্ করে না তুর্কির তেজ তলোয়ারে ?

[লেফ্ট্ ! রাইট্ ! লেফ্ট্ !]

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া !
বুজ্‌দিল্ ঐ দুশ্‌মন্ সব বিল্‌কুল্ সাফ হো গিয়া !
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া !
হুর্‌রো হো !
হুর্‌রো হো !
দস্যুগুলোয় সাম্‌লাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই !

তু নে — তুমি। কামাল কিয়া — অভাবনীয় কাণ্ড করলে, অসম্ভব করলে ! [কামাল মানে কিন্তু 'পূর্ণ'] শমশেরে — তরবারিকে। বিল্‌কুল সাফ হো গিয়া — একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। খুব কিয়া — আচ্ছা করেছ। বুজদিল —ভীরু, কাপুরুষ।

কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো   কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !

[হাবিলদার-মেজর :—সাবাস সিপাই ! লেফ্‌ট্ ! রাইট্ ! লেফ্‌ট্ !]

শির হতে এই পাঁও-তক্ ভাই লাল-লালে-লাল খুন মেখে
রণ-ভিতুদের শান্তি-বাণী শুন্‌বে কে ?
পিণ্ডারিদের খুন-রঙিন
নোখ-ভাঙা এই নীল সঙিন
তৈয়ার হেয়্ হর্দম ভাই ফাড়্‌তে যিগর্ শত্রুদের !
হিংসুক-দল ! জোর তুলেছি শোধ্ তাদের !
সাবাস্ জোয়ান ! সাবাস্ !

ক্ষীণজীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্—
এম্‌নি করে রে—
এম্‌নি জোরে রে—
ক্ষীণজীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্ !—
ঐ চেয়ে দ্যাখ্ আসমানে আজ রক্ত-রবির আভাস !—
সাবাস্ জোয়ান ! সাবাস্ ! !

[লেফ্‌ট্ ! রাইট্ ! লেফ্‌ট্]

হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের !
পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত !
তাই   তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত !
কি বলো ভাই শ্যাঙাত ?
হুর্‌রো হো !
হুর্‌রো হো ! !
দনুজ দলে দল্‌তে দাদা এম্‌নি দামাল কামাল চাই !
কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো   কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই ! !

[হাবিলদার মেজর : রাইট্ হুইল্ ! লেফ্‌ট্ রাইট্ ! লেফ্‌ট্ !
সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল।]

পাঁও-তক — পা পর্যন্ত। নেস্ত-নাবুদ — ধ্বংস-বিধ্বংস।

আজাদ মানুষ বন্দী করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ,
কুল্ মুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,
মোদের হাতে তুর্কি-নাচন নাচ্‌লে তাধিন্ তাধিন্ শেষ!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
বদ্-নসিবের বরাত খারাব বরাদ্দ তাই কর্‌লে কি না আল্লায়,
পিশাচগুলো পড়্‌ল এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পাল্লায়!
এই পাগলাদেরই পাল্লায়!!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো—
ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা,
ওদের হল্লা শুধু হল্লা,
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধর্‌তে আসেন তুর্কি-তাজি
মর্দ গাজি মোল্লা!
হাঃ! হাঃ! হাঃ!
হেসে নাড়িই ছেড়ে বা!
হা হা হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[হাবিলদার-মেজর—সাবাস সিপাই! লেফ্‌ট্ রাইট্! লেফ্‌ট্!
সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই!
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর :—লেফ্‌ট্ হুইল্! য়্যাজ্ য়ু ওয়্যার্!—রাইট হুইল্!—
লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফট্!!]
[সৈন্যদের আঁখির সামনে অস্ত-রবির আশ্চর্য রঙের খেলা ভাসিয়া উঠিল।]

কুল মুলুক — সমস্ত দেশটা। আজাদ — মুক্ত। বদ্-নসিব—দুর্ভাগ্য। তাজি—যুদ্ধাশ্ব।

দেখ্‌চ কি দোস্ত অমন করে? হোঁ হোঁ হোঁ!
সত্যি তো ভাই!—সন্ধেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ!
শহীদ সেনার টুকটুকে বৌ লাল-পিরাহান-পরা,
স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া, তায় ডগডগে আন্‌কোরা!—
না না না,—কল্‌জে যেন টুকরো-করে-কাটা
হাজার তরুণ শহীদ বীরের,—শিউরে উঠে গা'টা!
আস্‌মানের ঐ সিং-দরজায় টাঙিয়েছে কোন্ কসাই!
দেখতে পেলে এক্ষুনি গে এই ছোরাটা কল্‌জেতে তার বসাই!
মুণ্ডুটা তার খসাই!
গোস্বাতে আর পাইনে ভেবে কি যে করি দশাই!

[হাবিলদার-মেজর — সাবাস সিপাই! লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!]
[ঢালু পার্বত্য পথ, সৈন্যগণ বুকের পিঠের নিহত ও আহত সৈন্যদের ধরিয়া সন্তর্পণে নামিল।]

আহা কচি ভাইরা আমার রে!
এমন কাঁচা জানগুলো খান্ খান্ করেছে কোন্ সে চামার রে?
আহা কচি ভাইরা আমার রে!!

[সাম্‌নে উপত্যকা। হাবিলদার মেজর :—লেফ্‌ট্ ফর্ম! সৈন্য-বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল! হাবিলদার মেজর :—ফর্‌ওয়ার্ড! লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!]

আস্‌মানের ঐ আঙরাখা
খুন-খারাবির রঙ মাখা
কি খুবসুরৎ বাঃ রে বা!
জোর বাজা ভাই কাহারবা!
হোক্ না ভাই এ কার্‌বালা ময়দান—
আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়-গান!
হোক্ না এ তোর কার্‌বালা ময়দান!!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো—

[সাম্‌নে পার্বত্য পথ—হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল। হুকুম দিয়া গেল,—'মার্ক টাইম্!' সৈন্যগণ এক স্থানেই দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল—]

পিরাহান—পিরান। গোস্বা—ক্রোধ। খুবসুরৎ—সুন্দর।

দ্রাম্ ! দ্রাম্ ! দ্রাম্ !
লেফ্‌ট্ ! রাইট্ ! লেফ্‌ট্ !
দ্রাম্ ! দ্রাম্ ! দ্রাম্ !
আস্‌মানে ঐ ভাস্‌মান যে মস্ত দুটো রঙের তাল,
একটা নিবিড় নীল-সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল,—
বুঝ্‌লে ভাই ! ঐ নীল সিয়াটা শত্রুদের !
দেখ্‌তে নারে কারুর ভালো,
তাইতে কালো রক্ত-ধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের।
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল !
গৃধ্নু ওরা, লুব্ধ ওদের লক্ষ্য অসুর বল—
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল !
জালিম ওরা অত্যাচারী !
সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই !
জালিম ওরা অত্যাচারী !
সৈনিকের এই গৈরিকে ভাই—
জোর অপমান করলে ওরাই,
তাই তো ওদের মুখ কালো আজ, খুন যেন নীল জল !—
ওরা হিংস্র পশুর দল !
ওরা হিংস্র পশুর দল ! !

[হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল—ফর্‌ওয়ার্ড ! লেফ্‌ট্ হুইল্—
সৈন্যগণ আবার চলিতে লাগিল—লেফ্‌ট্ রাইট্ ! লেফ্‌ট্ !]

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হলো মরে।
তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে,—
ওরা শহীদ হলো মরে !
পিট্‌নি খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট হয়েছে ! কেমন !
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা, বীর সে তোরা এমন !
মুর্দারা সব যুদ্ধে আসিস্ ! যা যা !
খুন দেখেছিস্ বীরের ? হা দেখ্ টক্‌টকে লাল কেমন গরম তাজা !
মুর্দারা সব যা যা ! !

[বলিয়াই কটিদেশ হইতে ছোরা খুলিয়া হাতের রক্ত লইয়া দেখাইল]

সিয়া—কৃষ্ণবর্ণ। জালিম —উৎপীড়ক। মুর্দা—মৃত।

এঁরাই বলেন হবেন রাজা!
আরে যা যা! উচিত সাজা
তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে কামাল ভাই!

[হাবিলদার মেজর :—সাবাস সিপাই!]

এই তো চাই! এই তো চাই!
থাক্‌লে স্বাধীন সবাই আছি, নেই তো নাই, নেই তো নাই!
এই তো চাই!!

[কতকগুলি লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া সৈন্যগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।]

মার্ দিয়া ভাই মার্ দিয়া!
দুশ্‌মন্ সব হার্ গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া।
পর্‌ওয়া নেহি, যা নে দো ভাই যোঁ গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!

[হাবিলদার-মেজর :—সাবাস জোয়ান! লেফ্‌ট্! রাইট্!]

জোর্‌সে চলো পা মিলিয়ে,
গা হিলিয়ে,
এম্‌নি করে হাত দুলিয়ে!
দাদ্‌রা তালে 'এক দুই তিন' পা মিলিয়ে
ঢেউএর মতন যাই!
আজ স্বাধীন এ দেশ! আজাদ মোরা বেহেশ্‌তও না চাই!
আর বেহেশ্‌তও না চাই!!

[হাবিলদার-মেজর :—সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল তাই!

কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
হো হো কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই ! !

[সৈন্যদল এক নগরের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। নগর-বাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া এই মহান দৃশ্য দেখিতেছিল ; তাহাদের চোখ-মুখ আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। আজ বধূর মুখের বোরকা খসিয়া পড়িয়াছে। ফুল ছড়াইয়া হাত দুলাইয়া তাহারা বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল।]

ঐ শুনেছিস্? ঝর্‌কাতে সব বল্‌ছে ডেকে বৌ-দলে,
'কে বীর তুমি? কে চলেছ চৌদলে?'
চিনিস্‌নে কি? এমন বোকা বোনগুলি সব !—কামাল এ যে কামাল !
পাগলি মায়ের দামাল ছেলে ! ভাই যে তোদের !
তা না হলে কার হবে আর রৌশন্ এমন জামাল?
কামাল এ যে কামাল ! !
উড়িয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো ঘর-বাড়ি সব সামাল !
ঘর-বাড়ি সব সামাল ! !
আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে,
ডগ্‌মগিয়ে জোশ উঠেছে !
সাম্‌নে থেকে পালাও !
শোহরত দাও নওরাতি আজ ! হর্ ঘরে দীপ জ্বালাও !
সাম্‌নে থেকে পালাও !
যাও ঘরে দীপ জ্বালাও ! !

[হাবিলদার-মেজর :—লেফ্‌ট্ ফর্ম ! লেফ্‌ট্ ! রাইট্ ! লেফ্‌ট্ !—ফরওয়ার্ড্ !]

[বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পার্শ্বেই পরিখার সারি। পরিখা-ভর্তি নিহত সৈন্যের দল পচিতেছে এবং কতকগুলি অ-সামরিক নগরবাসী তাহা ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া চলিতেছে।]

ইস্ ! দেখেছিস ! ঐ কারা ভাই সাম্‌লে চলেন পা,
ফস্‌কে মরা আধ-মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা !
ও তাই শিউরে ওঠে গা !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

জামাল—রূপ। জোশ—উত্তেজনা। শোহরত—ঘোষণা। নওরাতি—উৎসব-রাত্রি।

মরল যে সে মরেই গেছে,
বাঁচ্‌ল যারা রইল বেঁচে !
এই তো জানি সোজা হিসাব !   দুঃখ কি তার আঁ ?
মরায় দেখে ডরায় এরা ! ভয় কি মরায়্ ? বাঃ
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

[সম্মুখে সঙ্কীর্ণ ভগ্ন সেতু। হাবিলদার-মেজর অর্ডার দিল—'ফর্ম্ ইন্‌টু সিঙ্গল্ লাইন।' এক একজন করিয়া বুকের পিঠের নিহত ও আহত ভাইদের চাপিয়া ধরিয়া অতি সন্তর্পণে 'স্লো মার্চ' করিয়া পার হইতে লাগিল।]

সত্যি কিন্তু ভাই
যখন মোদের বক্ষে-বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই—
কেমন সে এক ব্যথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে !
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধরে কল্‌জেখানা পেষে !
নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুক্‌রে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে !
কে যেন ভাই কল্‌জেখানা পেষে ! !
ঘুমোও পিঠে, ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার, আহা !
বুক যে ভরে হাহাকারে যতই তোরে সাব্বাস দিই,
যতই বলি বাহা !
লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা ! !
ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার, আহা ! !
অস্ত-পারের দেশ পারায়ে বহুৎ সে দূর তোদের ঘরের রাহা !
ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটি ছোট আহা !
মরণ-বধূর লাল রাঙা বর ! ঘুমো !
আহা, এমন চাঁদমুখে তোর কেউ দিল না চুমো !

হতভাগা রে !
মরেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে
না জানি কোন্ ফুট্‌তে-চাওয়া মানুষ-কুঁড়ির হিয়ায় !
তরুণ জীবন এম্‌নি গেল, একটি রাতও পেলিনে রে বুকে কোনো প্রিয়ায় !
অরুণ খুনের তরুণ শহীদ ! হতভাগা রে !
মরেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে !
তাই যত আজ লিখ্‌নে-ওয়ালা তোদের মরণ ফুর্তি-সে জোর লেখে !
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা ! হাসি রকম দেখে !

মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে !
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে !'
আঁখির পাতা ভিজল কি না কোনো কালো চোখের,
জান্‌ল না হায় এ-জীবনে ঐ সে তরুণ দশটি হাজার লোকের !
পচে মরিস পরিখাতে, মা-বোনেরাও শুনে বলে 'বাহা' !
সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী কেউ কি রে নেই ? আহা !—
আয় ভাই তোর বৌ এল ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলি পরে,
আঁধার-শাড়ি পরবে এখন পশ্‌বে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে !—
ভাবতে নারি, গোরের মাটি করবে মাটি এ মুখ কেমন করে—
সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে !
বিদায়-বেলায় আরেকটিবার দিয়ে যা ভাই চুমো !
অনাদরের ভাইটি আমার ! মাটির মায়ের কোলে এবার ঘুমো ! !

[নিহত সৈন্যদের নামাইয়া রাখিয়া দিয়া সেতু পার হইয়া আবার জোরে মার্চ করিতে করিতে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।]

ঠিক বলেছ দোস্ত তুমি !
চোস্ত কথা ! আয় দেখি—তোর হস্ত চুমি !
মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের ?
আব্-জম্-জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্‌সি বিষের !
কে মরেছে ? কান্না কিসের ?
বেশ করেছে !
দেশ বাঁচাতে আপ্‌নারি জান শেষ করেছে !
বেশ করেছে ! !
শহীদ ওরাই শহীদ !
বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে খুন ওদেরি লোহিত !
শহীদ ওরাই শহীদ ! !

[এইবার তাহাদের তাম্বু দেখা গেল। মহাবীর আনোয়ার পাশা বহু সৈন্যসামন্ত ও সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া 'ডবল মার্চ' করিতে লাগিল]

গোর—কবর, সমাধি। আব্-জম্-জম্—মন্দাকিনী সুধা।

হুর্‌রো হো !
হুর্‌রো হো ! !
ভাই-বেরাদর পালাও এখন ! দূর্ রহো ! দূর্ রহো ! !
হুর্‌রো হো ! হুর্‌রো হো !

[কামাল পাশাকে কোলে করিয়া নাচিতে লাগিল]

হৌ হৌ হৌ ! কামাল জিতা রও !
কামাল জিতা রও !
ও কে আসে ? আনোয়ার ভাই ?—
আনোয়ার ভাই ! জানোয়ার সব সাফ ! !
জোর নাচো ভাই ! হর্দম্ দাও লাফ !
আজ জানোয়ার সব সাফ !
হুর্‌রো হো ! হুর্‌রো হো ! !

সব-কুছ আব্ দূর্ রহো !—হুর্‌রো হো ! হুর্‌রো হো ! !
রণ জিতে জোর মন মেতেছে !—সালাম সবায় সালাম !—
নাচ্‌না থামা রে !
জখ্‌মি ঘায়েল ভাইকে আগে আস্তে নামা রে !
নাচ্‌না থামা রে !—

[আহতদেরে নামাইতে নামাইতে]

কে ভাই ? হাঁ হাঁ, সালাম !
—ঐ শোন্ শোন্ সিপাহ্-সালার কামাল ভাই-এর কালাম।

[সেনাপতির অর্ডার আসিল]

'সাবাস ! থামো ! হো ! হো !
সাবাস ! হল্ট্ ! এক ! দো !'

ভাই-বেরাদর—আত্মীয়-স্বজন। জিতা রও—বেঁচে থাক। আব্—এখন। জখ্‌মি—ঘায়েল, আহত। সিপাহ্-সালার—প্রধান সেনাপতি। কালাম—হুকুম।

[এক নিমিষে সমস্ত কল-রোল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখনো কি তারায় তারায় যেন ঐ বিজয়-গীতির হারা-সুর বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলিয়া গেল—]

ঐ খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই!
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই।
হো হো, কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!!

আনোয়ার

[স্থান—প্রহরী-বেষ্টিত অন্ধকার কারাগৃহ, কনস্ট্যান্টিনোপল্।
কাল—অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি।]

[চারিদিকে নিস্তব্ধ নির্বাক। সেই মৌনা নিশীথিনীকে ব্যথা দিতেছিল শুধু কাফ্রি-সান্ত্রীর পায়চারির বিশ্রী খট্‌খট্ শব্দ। ঐ জিন্দানখানায় মহাবাহু আনোয়ারের জাতীয়-সৈন্যদলের সহকারী এক তরুণ সেনানী বন্দী। তাহার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, ডাগর চোখ, সুন্দর গঠন—সমস্ত-কিছুতে যেন একটা ব্যথিত-বিদ্রোহের তিক্ত-ক্রন্দন ছলছল করিতেছিল। তরুণ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখাপাতে তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেকটা বেশি বয়স্ক বোধ হইতেছিল।

সেইদিনই ধামা-ধরা সরকারের কোর্ট-মার্শালের বিচারে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে, পরদিন নিশিভোরে তরুণ সেনানীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

আজ হতভাগ্যের সেই মুক্তি-নিশীথ, জীবনের সেই শেষরাত্রি। তাহার হাতে, পায়ে, কটিদেশে, গর্দানে উৎপীড়নের লৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-ভারাতুর তরুণ সেনানী স্বপ্নে তাহার 'মা'-কে দেখিতেছিল। সহসা চীৎকার করিয়া সে জাগিয়া উঠিল। তাহার পর চারিদিকে কাতর নয়নে একবার চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। শুধু হিমানি-সিক্ত বায়ু হা হা স্বরে কাঁদিয়া গেল, 'হায় মাতৃহারা !'

স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তরুণ সেনানী ব্যর্থ-রোষে নিজের বাম বাহু নিজে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। কারাগৃহের লৌহ-শলাকায় তাহার শৃঙ্খলিত দেহভার বারেবারে নিপতিত হইয়া কারা-গৃহ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

এখন তাহার অস্ত্র-গুরু আনোয়ারকে মনে পড়িল। তরুণ বন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আনোয়ার !'—]

আনোয়ার ! আনোয়ার !
দিলাওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ করো, মারো যত জানোয়ার !
আনোয়ার ! আফসোস্ !
বখতেরই সাফ্ দোষ,
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙে গেছে শম্‌শের—পড়ে আছে খাপ কোষ !
আনোয়ার ! আফসোস্ !

দিলওয়ার —সাহসী। বখত—অদৃষ্ট। জোশ—উত্তেজনা।

আনোয়ার ! আনোয়ার !
সব যদি সুম্‌সাম, তুমি কেন কাঁদো আর ?
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার !
আনোয়ার ! আর না !—
দিল্ কাঁপে কার না ?
তল্‌ওয়ারে তেজ নাই !—তুচ্ছ স্মার্ণা,
ঐ কাঁপে থরথর মদিনার দ্বার না ?
আনোয়ার ! আর না !

আনোয়ার ! আনোয়ার !
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর
খুন করো—খুন করো ভীরু যত জানোয়ার !
আনোয়ার ! জিঞ্জির-
পরা মোরা খিঞ্জির !
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোণা রিণ-ঝিণ্ কির,—
নিবু নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিন্‌কির !
গর্দানে জিঞ্জির !

আনোয়ার ! আনোয়ার !
দুর্বল্ এ গিদ্‌ধড়ে কেন তড়্পানো আর ?
জোরওয়ার শের কই ?—জের্‌বার জানোয়ার !
আনোয়ার ! মুশ্‌কিল
জাগা কঞ্জুশ্-দিল,
ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল !
ভাই আজ শয়তান ভাই-এ মারে ঘুষ কিল !
আনোয়ার ! মুশ্‌কিল !

আনোয়ার ! আনোয়ার !
বেইমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর।
কোথা খোঁজো মুস্‌লিম ?—শুধু বুনো জানোয়ার !
আনোয়ার ! সব শেষ !—
দেহে খুন অবশেষ !—

সুম্‌সাম—নিঝঝুম। জিঞ্জির—শৃঙ্খল। খিঞ্জির—শূকর। রোণা—ক্রন্দন। জোরওয়ার—বলবান। শের—বাঘ। গিদ্‌ড়ে—শৃগাল। জেরবার—ক্ষত-বিক্ষত। কঞ্জুশ্-দিল—কৃপণ মন।

ঝুটা তেরি তলওয়ার ছিন্ লিয়া যব্ দেশ !
আওরত সম ছি ছি ক্রন্দন রব পেশ ! !
আনোয়ার ! সব শেষ !

আনোয়ার ! আনোয়ার !
জনহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর !
আজো যারা বেঁচে আছে তারা খ্যাপা জানোয়ার !
আনোয়ার !—কেউ নাই !
হাথিয়ার ?—সেও নাই !
দরিয়াও থম্থম্ নাই তাতে ঢেউ, ছাই !
জিঞ্জির গলে আজ বেদুঈন-দে'ও ভাই !
আনোয়ার ! কেউ নাই !

আনোয়ার ! আনোয়ার !
যে বলে সে মুস্‌লিম—জিভ্ ধরে টানো তার !
বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার !
আনোয়ার ! ধিক্কার !
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার—
তল্‌ওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার !
যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিক্‌দার !
আনোয়ার ! ধিক্কার !

আনোয়ার ! আনোয়ার !
দুনিয়াটা খুনিয়ার, তবে কেন মানো আর
রুধিরের লোহু আঁখি ?—শয়তানি জানো সার !
আনোয়ার ! পঞ্জায়
বৃথা লোকে সম্‌ঝায়,
ব্যথা-হত বিদ্রোহী দিল্ নাচে ঝন্‌ঝায়,
খুন-খেগো তল্‌ওয়ার আজ শুধু রণ্ চায়,
আনোয়ার ! পঞ্জায় !
আনোয়ার ! আনোয়ার !

বিয়াবান—মরুভূমি। হাথিয়ার—অস্ত্র। দিক্‌দার—তিক্ত-বিরক্ত।

পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম-জানোয়ার,
ঘরে যত দুশ্‌মন, পরে কেন হানো মার?—
আনোয়ার! এসো ভাই!
আজ সব শেষও যাই!—
ইস্‌লামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই!—
তেগ ত্যাজি বরিয়াছি ভিখারির বেশও তাই!
আনোয়ার! এসো ভাই!!

[সহসা কাফ্রি সান্ত্রির ভীম চ্যালেঞ্জ্‌ প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনির মতো হুঙ্কার দিয়া উঠিল—'এয়্‌ নৌজওয়ান, হুঁশিয়ার!' অধীর ক্ষোভে তিক্ত রোষে তরুণের দেহের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল! তাহার কটিদেশের, গর্দানের, পায়ের শৃঙ্খল খানখান হইয়া টুটিয়া গেল, শুধু হাতের শৃঙ্খল টুটিল না। সে সিংহ-শাবকের মতো গর্জন করিয়া উঠিল—]

এয়্‌ খোদা! এয়্‌ আলি! লাও মেরি তলোয়ার!

[সহসা তাহার ক্লান্ত আঁখির চাওয়ায় তুরস্কের বন্দিনী মাতৃ-মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। ঐ মাতৃমূর্তির পার্শ্বেই তাহার মায়েরও শৃঙ্খলিত ভিখারিনি বেশ। তাঁদের দুইজনেরই চোখের কোণে দুই বিন্দু করিয়া করুণ অশ্রু। অভিমানী পুত্র অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল—]

ও কে? ও কে ছল আর?
না—মা, মরা জানকে এ মিছে তর্‌সানো আর!
আনোয়ার! আনোয়ার!!

[কাপুরুষ প্রহরীর ভীম প্রহরণ বিনিদ্র বন্দী তরুণ সেনানীর পৃষ্ঠের উপর পড়িল। অন্ধ কারাগারের বন্ধ রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহারই আর্ত প্রতিধ্বনি গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল—'আঃ—আঃ—আঃ!'

আজ নিখিল বন্দী-গৃহে গৃহে ঐ মাতৃমুক্তিকামী তরুণেরই অতৃপ্ত কাঁদন ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে। যেদিন এ ক্রন্দন থামিবে, সেদিন সে-কোন্‌ অচিন্‌ দেশে থাকিয়া গভীর তৃপ্তির হাসি হাসিব জানি না! তখন হয়তো হারা-মা-আমার আমায় 'তারার পানে চেয়ে চেয়ে' ডাকিবেন। আমিও হয়তো আবার আসিব। মা কি আমায় তখন নূতন নামে ডাকিবেন? আমার প্রিয়জন কি আমায় নূতন বাহুর ডোরে বাঁধিবে? আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, আর কেন যেন মনে হইতেছে, 'আসিবে সেদিন আসিবে!']

তেগ—তলোয়ার। তর্‌সানো—দুঃখ দেওয়া।

রণ-ভেরী

[গ্রীসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক-গভর্ণমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যেব জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত]

ওরে আয় !
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
ওরে আয় !
ঐ ইস্‌লাম ডুবে যায় !
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন্ গায় !
আজ শখ করে জুতি-টক্করে
তোড়ে শহীদের খুলি দুশ্‌মন পায় পায়—
ওরে আয় !
তোর জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায় !
ধরে ঝন্‌ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুস্‌লিম-পঞ্জায় !
তোর মান যায় প্রাণ যায়—
তবে বাজাও বিষাণ, ওড়াও নিশান ! বৃথা ভীরু সম্‌ঝায় !
রণ- দুর্মদ রণ চায় !

ওরে আয় !
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায় !
ওরে আয় !
ঐ ঝনননন রণ-ঝনঝন ঝন্‌ঝনা শোনা যায় !
শুনি এই ঝন্‌ঝনা-ব্যঞ্জনা নেবে গঞ্জনা কে রে হায় ?
ওরে আয় !
তোর ভাই ম্লান চোখে চায়,
মরি লজ্জায়,
ওরে সব যায়,
তবু কব্‌জায় তোর শম্‌শের নাহি কাঁপে আফ্‌সোসে হায় ?
রণ- দুন্দুভি শুনি খুন-খুবি
নাহি নাচে কি রে তোর মরদের ওরে দিলিরের গোর্দায় ?

শম্‌শের—তরবারি। খুন-খুবি—রক্তোন্মত্ততা। দিলির—সাহসী, নির্ভীক।

ওরে আয়
মোরা দিলাবার খাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায় !
তারা খিঞ্জির যারা জিঞ্জির-গলে ভূমি চুমি মূরছায় !
আরে দূর দূর ! যত কুক্কুর
আসি শের-বব্বরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি চড়ে ! হাতি
ঘা'ল হবে ফেরু-ঘায় ?
ঐ ঝনননন রণঝনঝন ঝন্‌ঝনা শোনা যায় !
ওরে আয় !
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায় !
ঐ শের-নর হাঁকড়ায়—
ওরে আয় !
ছোড় মন-দুখ,
হোক বন্দুক
ঐ বন্দুক তোপ, সন্দুক তোর পড়ে থাক, স্পন্দুক বুক ঘা'য় !
নাচ্ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ—
থৈ তাণ্ডব, আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই !

ওরে আয় !
কর্ কোরবান আজ তোর জান দিল্ আল্লার নামে ভাই।
ঐ দীন্ দীন্-রব আহ্ব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায় !
শেল- গর্জ্জন
করি তর্জ্জন
হাঁকে, বর্জ্জন নয় অর্জ্জন আজ, শির তোর চায় মা'য় !
সব গৌরব যায় যায় ;
ওরে আয় !
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায় !
ওরে আয় !
ঐ কড়কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায় !
ওরে আয় !
মুখ ঢাকিবি কি লজ্জায় ?

দিলবার—প্রাণবন্তা। জিঞ্জির —শিকল। শের-বব্বরে—সিংহ। শের-নর—পুরুষসিংহ। হাঁকড়ায়—গর্জ্জন করিতেছে। কোরবান—উৎসর্গ।

হুর্ হুর্‌রে।
কত দূর রে
সেই পুর রে যথা খুন-খোশ্‌রোজ খেলে হর্‌রোজ দুশ্‌মন-খুনে ভাই!
সেই বীর-দেশে চল্ বীর-বেশে,
আজ মুক্ত দেশে রে মুক্তি দিতে রে বন্দীরা ঐ যায়!
ওরে আয়!
বল্ ‘জয় সত্যম্ পুরুষোত্তম’, ভীরু যারা মার খায়!
নারী আমাদেরি শুনি রণ-ভেরী হাসে খলখল হাত-তালি দিয়ে রণে ধায়!
মোরা রণ চাই রণ চাই,
তবে বাজহ্ দামামা, বাঁধহ্ আমামা, হাথিয়ার পাঞ্জায়!
মোরা সত্য ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গা'য়।

ওরে আয়!
ঐ কড়কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়!
ওরে আয়!
অব- রুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকিব ফুকারি যায়!
তোপ্ দ্রুম্ দ্রুম্ গান গায়!
ওরে আয়!
ঐ ঝননরণন খঞ্জর-ঘাত পঞ্জরে মূরছায়!
হাঁকো হাইদার,
নাই নাই ডর,
ঐ ভাই তোর ঘুর-চর্খীর সম খুন খেয়ে ঘুর্ খায়!
ঝুটা দৈত্যেরে
নাশি সত্যেরে
দিবি জয়-টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!

ওরে আয়!
মোরা খুন্-জোশি বীর, কঞ্জুশি লেখা আমাদের খুনে নাই!
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদ্‌শাহি, মোরা জালিমের খুন খাই!
মোরা দুর্মদ, ভর্‌পুর্ মদ
খাই ইশ্‌কের, ঘাত-শম্‌শের ফের নিই বুক নাঙ্গায়!
লাল পল্টন মোরা সাচ্চা,
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,

খুন-খোশ-রোজ—রক্ত-মহোৎসব। হররোজ—প্রতিদিন। আমামা—শিরস্ত্রাণ। নকিব—তূর্যবাদক। হাইদার—মহাবীর হজরত আলীর হাঁক। খুন-জোশি—রক্ত-পাগলামি। কঞ্জুশি—কৃপণতা। ইশকের—প্রেমের। শহীদান—Martyrs.

মরি জালিমের দাঙ্গায় !
মোরা অসি বুকে বরি হাসি মুখে মরি জয় স্বাধীনতা গাই !
ওরে আয়
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায় ! !

'শাত-ইল-আরব'

শাতিল্ আরব ! শাতিল্ আরব ! ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলিরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানি, মিস্‌রি, আর্‌বি, কেনানি —
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈন্‌দের চাঙ্গা শির !
নাঙ্গা-শির্—
শম্‌শের হাতে, আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর !
শাতিল্ আরব ! শাতিল্ আরব ! ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

'কূত-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া ;
উগারি সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব 'মস্তানি'র।
ত্রস্তা-নীর
গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,—'শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখির !'
দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক আজমে করেছ ধন্যা ;—
বীর-প্রসূ দেশ হলো বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দমির !

শাতিল আরব—আরব দেশের এক নদীর নাম। দিলির—অসম সাহসী। য়ুনানি—য়ুনান দেশের অধিবাসী। মিস্‌রি—মিশরের অধিবাসী। কেনানি—কেনানের অধিবাসী। চাঙ্গা—টাটকা। কূত-আমারা—কূতল-আমার নামক স্থান, যেখানে জেনারেল টাউনসেন্ড বন্দী হন।

মর্দ বীর
সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।

শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর !
দুশ্‌মন্-লোহু ঈর্ষায়-নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিলমিল্,
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছ পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারির !
জিন্দা বীর
'জুলফিকার' আর 'হায়দরি' হাঁক হেথা আজো হজরত্ আলীর—
শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব ! ! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা,—
এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাব-মঞ্জরীর !
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জুর সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির !
শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব ! ! পূত যুগে তোমার তীর।

ইরাক-বাহিনী ! এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে 'জননী আমার !' বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর !
রক্ত-ক্ষীর—
পরাধীনা ! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু-ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ ! বিদায় ! বিদায় ! ! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির !

খেয়া-পারের তরণী

যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার ?

প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে!
ঝন্‌ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।

তমসাবৃত্ত ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী!
দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী!

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে—
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন!

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ্!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও
কাণ্ডারী আহ্‌মদ তরী ভরা পাথেয়।

আবুবকর উস্‌মান উমর আলি হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি-গান—লা-শরিক আল্লাহ!

'শাফায়ত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত্' হতে ফেলে হুরি রাশ্ রাশ্ ফুল।

আহ্‌মদ—মোহাম্মদ (সা)। লা-শরিক আল্লাহ্—ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ উপাস্য নাই। শাফায়ত—পরিত্রাণ। জান্নাত—স্বর্গ।

শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ও-পারের যাত্রী।
বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হলো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

কোরবানি

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ', শক্তির উদ্‌বোধন।
দুর্বল ! ভীরু ! চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন !
ধ্বনি ওঠে রণি দূর বাণীর,—
আজিকার এ খুন কোর্‌বানির !
দুম্বা-শির রুম্-বাসীর
শহীদের শির-সেরা আজি।—রহমান কি রুদ্র নন?
বাস্ ! চুপ খামোশ রোদন !
আজ শোর ওঠে জোর 'খুন দে, জান দে, শির দে বৎস' শোন্ !
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ', শক্তির উদ্বোধন !
খঞ্জর মারো গর্দানেই,
পঞ্জরে আজি দরদ নেই,
মর্দানি'ই পর্দা নেই
ডর্‌তা নেই আজ খুন্-খারাবিতে রক্ত-লুব্ধ মন !
খুনে খেল্‌ব খুন্-মাতন !
দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আন্‌তে যুঝ্‌ব রণ।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !
চড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার
মুস্‌লিমে সারা দুনিয়াটার।

রহমান—করুণাময়। খামোশ—নীরব। গর্দানে—স্কন্ধে।

'জুল্‌ফেকার' খুল্‌বে তার
দু'ধারী ধার্ শেরে-খোদার রক্তে-পূত-বদন!
খুনে আজকে রুধ্‌ব মন!
ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,
'আজাদি' মেলে না পস্তানোয়!
দস্তা নয় সে সস্তা নয়!
হত্যা নয় কি মৃত্যুও? তবে রক্ত-লুব্ধ কোন্
কাঁদে—শক্তি-দুঃস্থ শোন্—
'এয়্ ইব্‌রাহিম্ আজ কোর্‌বানি কর শ্রেষ্ঠ পুত্রধন!'
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
এ তো নহে লোহ্ তরবারের
ঘাতক জালিম জোর্‌বারের!
কোরবানের জোর-জানের
খুন এ যে, এতে গোর্দা ঢের রে, এ ত্যাগে 'বুদ্ধ' মন!
এতে মা রাখে পুত্র পণ্!
তাই জননী হাজেরা বেটারে পরাল বলির পূত বসন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
এই দিনই 'মীনা'-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আব্বা ইব্‌রাহিম্ সে আপনা রুদ্র পণ!
ছি ছি! কেঁপো না ক্ষুদ্র মন!

জুল্‌ফেকার—মহাবীর হজরত আলীর বিশ্বত্রাস তরবারি। শেরে-খোদা—খোদার সিংহ; হজরত আলীকে এই গৌরবান্বিত নামে অভিহিত করা হয়। জোরবার—বলদৃপ্ত। জোর-জান—মহাপ্রাণ। আজাদি—মুক্তি। আব্বা—বাবা। ইবরাহিম—Abraham. হাজেরা—হজরত ইবরাহীমের স্ত্রী।

আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ সম মোল্লা খুন-বদন !
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !
দ্যাখ্ কেঁপেছে 'আরশ' আস্মানে,
মন-খুনী কি রে রাশ মানে ?
ত্রাস প্রাণে ?—তবে রাস্তা নে !
প্রলয়-বিষাণ কিয়ামতে তবে বাজাবে কোন্ বোধন ?
সেকি সৃষ্টি-সংশোধন ?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন্ !—
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।
মুস্লিম-রণ-ডঙ্কা সে,
খুন্ দেখে করে শঙ্কা কে ?
টঙ্কারে অসি ঝঙ্কারে
ওরে হুঙ্কারে, ভাঙি গড়া ভীম কারা লড়ব রণ-মরণ !
ঢালে বাজ্বে ঝন্-ঝনন্ !
ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন !
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !
জোর চাই আর যাচ্না নয়
কোরবানি-দিন আজ না ওই ?
বাজ্না কই ? সাজ্না কই ?
কাজ না আজিকে জান্ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ ?
বল্—'যুঝ্ব জান্ ভি পণ !'
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ !
আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !

মোহর্‌রম

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,—
'আম্মা ! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া'।
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে !
রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া দামেশ্‌কে—
'জয়নালে পরাল এ খুনিয়ারা বেশ কে ?'
'হায় হায় হোসেনা' ওঠে রোল ঝন্‌ঝায়,
তল্‌ওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পঞ্জায় !
উন্‌মাদ 'দুলদুল্' ছুটে ফেরে মদিনায়,
আলি-জাদা হোসেনের দেখা হেথা যদি পায় !
মা ফাতেমা আস্‌মানে কাঁদে খুলি কেশপাশ,
বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেতবাস !
রণে যায় কাসিম্ ঐ দু'ঘড়ির নওশা,
মেহেদির রঙটুকু মুছে গেল সহ্‌সা !
'হায় হায়' কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা—
'কঙ্কণ পঁইচি খুলে ফেলো সকিনা !'
কাঁদে কে রে কোলে করে কাসিমের কাটা-শির ?
খান্‌খান্ খুন হয়ে ক্ষরে বুক-ফাটা নীর !
কেঁদে গেছে থামি হেথা মৃত্যু ও রুদ্র,
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র !
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,
'আম্মা গো পানি দাও ফেটে গেল ছাতি মা !'
নিয়ে তৃষা সাহারার, দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার !
দুই হাত কাটা তবু শের-নর আব্বাস
পানি আনে মুখে, হাঁকে দুশ্‌মনও 'সাব্বাস' !
দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর 'শির দেগা, নেহি দেগা আমামা !'
মা'র স্তনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়্‌পায় !
জিভ চুষে কচি জান থাকে কিরে ধড়্‌টায় ?
দাউদাউ জ্বলে শিরে কারবালা-ভাস্কর,
কাঁদে বানু—'পানি দাও, মরে জাদু আস্‌গর !'

আরশ—খোদার সিংহাসন। আম্মা—মা। লা'ল—জাদু। মাতম—হাহা ক্রন্দন। দুনিয়া-দামেশকে—দামেশক-রূপ দুনিয়ায়। আমামা—শিরস্ত্রাণ।

কলিজা কাবাব সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,
খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জ্জুর,
পেল না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা,—পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন্ !
পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাঁধনে !
তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
'দাদা ! তেরি ঘর্ কিয়া বরবাদ্ পয়মাল !'
হাইদরি-হাঁক হাঁকি দুলদুল্-আস্ওয়ার
শম্শের চম্কায় দুশমনে ত্রাস্বার !
খসে পড়ে হাত হতে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।
নিঃশেষ দুশমন্ ; ওকে রণ-শ্রান্ত
ফোরাতের নীরে নেমে মুছে আঁখি-প্রান্ত ?
কোথা বাবা আস্গার্ ? শোকে বুক-ঝাঁঝরা
পানি দেখে হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা !
ধুঁকে ম'লো আহা তবু পানি এক কাৎরা
দেয়নি রে বাছাদের মুখে কম্জাত্রা !
অঞ্জলি হতে পানি পড়ে গেল ঝর্-ঝর্
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর !
হল্কুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে ?—
আফ্তাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে !
আস্মান ভরে গেল গোধূলিতে দুপরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে !
বেটাদের লোহু-রাঙা পিরাহান-হাতে, আহ্—
'আরশে'র পায়া ধরে কাঁদে মাতা ফাতেমা,
'এয়্ খোদা বদ্লাতে বেটাদের রক্তের
মার্জনা করো গোনা পাপী কম্বখ্তের !'

বানু—আসগরের মাতা। আসগর—ইমাম হোসেনের শিশুপুত্র। জয়নাল—ইমাম হোসেনের পুত্র। বরবাদ—নষ্ট। পয়মাল—ধ্বংস। দুলদুল-আসওয়ার—'দুলদুল' ঘোড়ার সওয়ার ইমাম হোসেন। এক কাৎরা—এক বিন্দু। কমজ্জাতরা—নীচমনাগণ। হলকুম—কণ্ঠ। তেগ—তরবারি। আফতাব—সূর্য। কমবখ্‌ত—হতভাগ্য।

কত মোহর্‌রম্‌ এল, গেল চলে বহু কাল—
ভুলিনি গো আজো সেই্‌ শহীদের লোহু লাল !
মুস্‌লিম ! তোরা আজ জয়নাল আবেদিন,
'ওয়া হোসেনা—ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন !
ফিরে এল আজ সেই্‌ মোহর্‌রম মাহিনা,—
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না !
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্‌ আরবির,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির ;—
তবে শোনো ঐ শোনো বাজে কোথা দামামা,
শম্‌শের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা !
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকিবের তূর্য,
হুঁশিয়ার ইস্‌লাম, ডুবে তব সূর্য !
জাগো ওঠো মুস্‌লিম, হাঁকো হাইদরি হাঁক।
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক !
নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তিন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস দিন।
হাসানের মতো পি'ব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মতো নিব বুকে ছুরি কহ্‌রের ;
আস্‌গর সম দিব বাচ্চারে কোর্‌বান,
জালিমের দাদ নেবো, দেবো আজ গোর জান !
সকিনার শ্বেতবাস দেব মাতা কন্যায়,
কাসিমের মতো দেবো জান রুধি অন্যায় !
মোহর্‌রম্‌ ! কারবালা ! কাঁদো 'হায় হোসেনা !'
দেখো মরু-সূর্যে এ খুন যেন শোষে না !

মর্সিয়া—শোক-গীতি। শম্‌শের—তরবারি। নকিব—তূর্যবাদক।জহর—বিষ। কহর—অভিশাপ। দাদ—প্রতিশোধ।

দোলন-চাঁপা

দুটি কথা

সে আজ বন্দী। তার সত্য-মুক্ত প্রাণ যে ভৈরব-রুদ্র-ছায়ানটের হিল্লোলে নৃত্য-পাগল ছন্দে এক অভিনব সৃষ্টি-রচনা করে গেল, —সে আজ মুক্ত! কোনো রাজ-শক্তির ভ্রূকুটি সে মানে না, কোনো লৌহ-নিগড় কোনোদিন তারে বাঁধতে পারে না—সে আপনার তালে নেচে চলে, আর পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায় কত রক্ত-নয়ন, কত শাসন-বচন, কত শাস্তি-রচন। সে যে প্রলয়ানন্দে ভরা রুদ্রনটের নৃত্য, ছন্দ যে তার কাল-বৈশাখীর নর্তনের মতো এলোমেলো, সুর যে তার সৃষ্টির ব্যথা-গৌরব ভরা। সুর আজ স্বেচ্ছাচারী, সুর—রাজবন্দী।

সে আজ বন্দী। তবু সে একদিন যুগযুগান্ত-সঞ্চিত রুদ্ধহিমানির বুকে অগ্নিকণা এনে দিয়েছিল, তার রুদ্র বীণে কোন সর্বভুক দেবতা তার চিরমন্দির গড়ে নিল, আর সেই অগ্নি-বীণে তার দিবস-নিশার দহন-আলোয় আপন অন্তরে তার চিরবাসরের চিতা রচনা করে নিল, —সবার আড়ালে, সবার গোপনে, সবার উপরে—মানবের হাসি-কান্না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বহু বহু দূরে; —সেখানে বসে সে তার অন্তর-অলকায় যে গাথা গেয়ে চলেছে তাতে বন্ধনের কৃষ্ণ রেখা নেই, দুর্বল কম্পিত হিয়ার ক্ষীণ রাগিণী নেই—সেখানে সে আর তার অন্তর-দেবতা, নিখিল নরনারী বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ দুয়ার দেখে ফিরে আসে শুধু।

সে আজ বন্দী। রাজার দেওয়া লৌহ-নিগড়ে তার অন্তরের বিদ্রোহী-বীর কোন দেবতার আশিস নির্মাল্য দেখতে পেল, তাই সাদরে বরণ করে নিল তাকে আপনার বলে। তারপর একদিন যখন বাংলার যুবক আবার জলদমন্দ্রে বাধা-বন্ধহারা হয়ে স্বাধীনচিত্ত ভরে বাংলার চিরশ্যামল চিরঅমলিন মাতৃমূর্তি উন্মাদ আনন্দে বক্ষে টেনে নেবে, সেই শুভ আরতিলগ্নে ইমনকল্যাণ সুরে যে নহবতের রাগিণী বেজে উঠবে, তাতে হে কবি, তোমার প্রেম-বৈভব-গাথা—তোমার অন্তর-বহ্নি-ব্যথা সন্ধ্যা-রাগ রক্তে আপনি বেজে উঠবে; জননীর শ্যামবক্ষে তোমার স্মৃতি ব্যথা-ভারাতুর হয়ে সকল পূজার মাঝে বারেবারে তোমাকেই স্মরণ করিয়ে দেবে, —হে কবি, সে আজ নয়।

ইতি—
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

[আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে]

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আসল হাসি, আসল কাঁদন,
মুক্তি এল, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ,
সৃষ্টিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুলল সাগর দুলল আকাশ ছুটল বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে,
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিগবালিকার পীতবাসে;
আজ রঙন এল রক্ত-প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আসল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে !
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !
আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট, আসল সুদূর,
আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে !
ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুব্‌ঘাসে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ জাগল সাগর, হাসল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে !
মন ছুটছে গো আজ বল্গাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে !
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

দোদুল দুল

[আরবি 'মোতাকারিব' ছন্দ]

দোদুল দুল্‌
দোদুল দুল্‌ !
বেণীর বাঁধ
আলগ্‌-ছাঁদ,

আলগ্-ছাঁদ
খোঁপার ফুল,
কানের দুল
খোঁপার ফুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

অলক-ছায়
কপোল-ছায়,
পরশ চায়
অলস চুল
বিনুন্-বিন্
কেশের উল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

অসম্বৃত্
কাঁখের ভিত
অসম্বৃত্
পিঠের চুল,
লোহিত পীত
নোলক দুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

সোহাগ্-ঘায়
দোলন্-গায়
কাঁপন খায়
আপন পায়,
পায়ের নখ
মাথার চুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

পরাগ-ফাগ
ছড়ায় আজ
শিরাজ-বাগ
ইরান-গুল,
দোলন্-দোল
দে বুলবুল,
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

কাঁকন চায়
নাচন্ ফিন্
রিমিক ঝিম
ঝিমিক ঝিম !
আঁচল-বীণ
চাবির রিং
বুলায় নিদ
ঢুলায় ঢুল্
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

নিশাস-রেশ
কাঁপায় বেশ
মোতির হার
হিয়ার দেশ,
কাঁপায় শেষ
প্রাণের কূল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

বুকের কোল
আদর ঘায়
দোলায় দোল্,
দোলায় দোল্
শরম-লোল

মরম-মূল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

কলস্-কাঁখ
পুকুর যায়,
আঁচল চায়
চুমায় ধুল,
দখিন্ হাত
ঝুলন্ ঝুল্
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

কাঁকাল ক্ষীণ
মরাল গ্রীব
ভুলায় জড়্—
ভুলায় জীব,
গমন-দোল্
অতুল তুল্
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

হাসির ভাস,
ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ,
আঁখির লাস,
নয়ন-নীর
অধর-ফুল
রাতুল তুল
রাতুল তুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ !

মৃণাল-হাত
নয়ন-পাত

গালের টোল,
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল,
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল ?
কোথায় তুল
কোথায় তুল ?
স্বরূপ তার
অতুল তুল,
রাতুল তুল,
কোথায় তুল
দোদুল দুল্
দোদুল দুল্ ! !

বেলাশেষে

ধরণী দিয়াছে তার
গাঢ় বেদনার
রাঙা মাটি-রাঙা ম্লান ধূসর আঁচলখানি
দিগন্তের কোলে কোলে টানি।
পাখি উড়ে যায় যেন কোন মেঘ-লোক হতে
সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে।
আকাশের অস্ত-বাতায়নে
অনন্ত দিনের কোন্ বিরহিণী কনে
জ্বালাইয়া কনক-প্রদীপখানি
উদয়-পথের পানে যায় তার অশ্রু-চোখ হানি ?
'আসি'-বলে চলে যাওয়া বুঝি তার প্রিয়তম আশে,
অস্ত-দেশ হয়ে ওঠে মেঘ-বাষ্প-ভারাতুর তারি দীর্ঘশ্বাসে।

আদিম কালের ঐ বিষাদিনী বালিকার পথ-চাওয়া চোখে—
পথ-পানে-চাওয়া-ছলে দ্বারে-আনা সন্ধ্যা-দীপালোকে
মাতা বসুধার মমতার ছায়া পড়ে।
করুণার কাঁদন ঘনায় নত-আঁখি স্তব্ধ দিগন্তরে।
কাঙালিনী ধরা-মা'র অনাদি কালের কত অনন্ত বেদনা
হেমন্তের এমনি সন্ধ্যায় যুগ যুগ ধরি বুঝি হারায় চেতনা।
উপুড় হইয়া সেই স্তূপীকৃত বেদনার ভার
মুখ গুঁজে পড়ে থাকে ; ব্যথা-গন্ধ তার
গুমরিয়া গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে যায়
এমনি নীরবে শান্ত এমনি সন্ধ্যায়। ...
ক্রমে নিশীথিনী আসে ছড়াইয়া ধূলায়-মলিন এলোচুল,
সন্ধ্যা-তারা নিবে যায়, হারা হয় দিবসের কূল। ...

তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হায়
আমার দুচোখ পুরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।
বুকে বাজে হাহাকার-করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায় 'খালি, সব খালি !
ঐ নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোক,
নিখিলের করুণা যা-কিছু, তোর তরে তাহাদের অশ্রুহীন চোখ !'
মনে পড়ে—তাই শুনে মনে পড়ে মম
কত না মন্দিরে গিয়া পথের সে লাথি-খাওয়া ভিখারির সম
প্রসাদ মাগিনু আমি—
'দ্বার খোলো, পূজারী দুয়ারে তব আগত যে স্বামী !'
খুলিল দুয়ার, দেউলের বুকে দেখিনু দেবতা,
পূজা দিনু রক্ত-অশ্রু, দেবতার মুখে নাই কথা।

হায় হায় এ যে সেই অশ্রুহীন-চোখ,
কেঁদে ফিরি, ওগো এ কি প্রেমহীন অনাদর-হানা দেবলোক !
ওরে মূঢ় ! দেবতা কোথায় ?
পাষাণ-প্রতিমা এরা, অশ্রু দেখে নিষ্পলক অকরুণ মায়াহীন
চোখে শুধু চায়।

এরাই দেবতা, যাচি প্রেম ইহাদেরই কাছে,
অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূর কাছে হায় জল-ধারা যাচে !

আমার সে চারি পাশে ঘরে ঘরে কত পূজা কত আয়োজন,
তাই দেখে কাঁদে আর ফিরে ফিরে চায় মোর ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন,
অপমানে পুন ফিরে আসে,
ভয় হয়, ব্যাকুলতা দেখি মোর কি জানি কখন কে হাসে।
দেবতার হাসি আছে, অশ্রু নাই;
ওরে মোর যুগ-যুগ-অনাদৃত হিয়া, আয় ফিরে যাই। ...
এই সাঁঝে মনে হয়, শূন্য চেয়ে আরো এক মহাশূন্য রাজে
দেবতার-পায়ে-ঠেলা এই শূন্য মম হিয়া-মাঝে।
আমার এ ক্লিষ্ট ভালোবাসা,
তাই বুঝি হেন সর্বনাশা।
প্রেয়সীর কণ্ঠে কভু এই ভুজ এই বাহু জড়াবে না আর,
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়, খর তরবার।

পউষ

পউষ এল গো!
পউষ এল অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এল গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥

সে এল আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ—হা) মলিন চোখে চায়।
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে॥

পউষ এল গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এল গো! পউষ এল—
শুকনো নিশাস, কাঁদন-ভারাতুর

বিদায়-ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার সুর—
'ওঠো পথিক ! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে'।।

পথহারা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।
'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে ;
পথের পথিক পথেই বসে থাকে,
জানে না সে কে তাহারে চাবে।
উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাথায় দিগ্‌বধূদের কেশে,
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন যে গায় গীতি,
একলা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধার আঁধার বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়
আর কি পুবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

ব্যথা-গরব

তোমার কাছে নাই অজানা কোথায় আমার ব্যথা বাজে।
ওগো প্রিয়! তবু এত ছল করা কি তোমার সাজে?

কেন তোমার অনাদরে বক্ষ আমার ডুকরে ওঠে,
চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে, কলজে ছিঁড়ে রক্ত ছোটে,
এ অভিমান এ ব্যথা মোর
জানি, জানো, হে মনোচোর,
তবু কেন এমন কঠোর
বুঝতে আমি পারি না যে!
অন্‌হেলা না পুলক-লাজে॥

যখন ভাবি আমার আদর কতই তোমায় হানে বেদন,
বুকের ভিতর আছড়ে পড়ে অসহায়ের হুতাশ রোদন।
যতই আমায় সইতে নারো
আঁকড়ে ততই ধরি আরো;
মারো প্রিয় আরো মারো
তোমার আঘাত-চিহ্ন রাজে
যেন আমার বুকের মাঝে॥

মনে পড়ে সেদিন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে অঘোর ঘুমে
এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে।
আমার অশ্রু-আঘাত লেগে
চমকে তুমি উঠলে জেগে
চরণ-আঘাত করলে রেগে
সেই পরশের সান্ত্বনা যে
আজো আমার মর্মে রাজে॥

এমনি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত-সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর পরান-প্রিয়!
সেই পদ-চিন বক্ষে রেখে
ভগবানে কইব ডেকে—

'ছাই ভৃগুপদ, যাও হে দেখে
কি কৌস্তুভ এ হিয়ায় রাজে !'
মরবে হরি হিংসা-লাজে ॥

বিষ্ণুজয়ী ভালোবাসার গর্বে এ বুক উঠবে দুলে,
সর্বহারার হাহাকার আর কাঁদবে নাকো চিত্ত-কূলে।
এই যে তোমার অবহেলা
তাই নিয়ে মোর কাটবে বেলা,
হেলাফেলার বসবে মেলা,
একলা আমার বুকের মাঝে,
সুখে দুখে সকল কাজে ॥

উপেক্ষিত

কান্না-হাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা,
কখন তুমি ডাক দেবে মা, কখন আমি ভাঙব খেলা ?
অজানাকে আনতে জিনে
জগৎটাকে ফেলনু চিনে,
চাই যারে মা তায় দেখিনে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা ॥

আজকে বড় শ্রান্ত আমি আশায় আশায় মিথ্যা ঘুরে,
ও মা এখন বুকে ধরো, মরণ আসে ঐ অদূরে !
সৃষ্টিটাকে পায়ের তলে
এসেছি মা হেলায় দলে,
হৃদয় শুধু জিনতে বলে
খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা
আর সহে না মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলাফেলা ॥

বিশ্বজয়ের গর্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়,
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ও মা এসে দাও বরাভয় !
চারদিকে মা প্রবঞ্চনা
ভালোবাসার গিল্টিসোনা,
আজ মণি কাল ধূলি-কণা,
জুয়ার হাট এই প্রেমের মেলা !
খুইয়েছি সব সাধের খেলায়, বুক ভেঙেছে হেলার ঢেলা !
এখন তুমি নাও মা কোলে, নয় অকূলে ভাসাই ভেলা ॥

সমর্পণ

প্রিয় !
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে ॥

তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগল ভালো
লাগল ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলাল
সেই নয়নের জলে।
আজকে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে ॥

আজ দিগ্‌বালিকার আঁখি-পাতা অনেক দূরের কানন-ছায়ে
কাঁপচে অভিমানে,
একলা-আমার পথ দেখাত ঐ বালিকাই চপল পায়ে
দিক হতে দিক-পানে !
মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে
এলেম তোমার কুটির ছায়ে
চরণ-ছায়ে,

ক্লান্তি আমার দাও মুছায়ে
দীপ-ঢাকা অঞ্চলে।
আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে !
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে॥

পুবের চাতক

সকাল-সাঁঝে চেয়ে থাকি পুব-গগনের পানে
কেন-যে তা তার আঁখি আর আমার আঁখিই জানে॥

নদীপারের দেশে থাকি এমনি তারও আঁখি-পাখি
দিগ্‌বালিকার পুব-কপোলে চাওয়ার পাখা হানে।
চাওয়ায় চাওয়ায় চুমোচুমি রোজ মোদের ঐখানে॥

মোদের চোখের চুমুর মিলন ভোরের তারার পুবে,
সেই মিলনের ভরাট পুলক অস্তঘাটে ডুবে।
হারা সে চোখ নতুন করে ভোরের আলোয় উঠে ভরে
নিশি-জাগা আঁখির লালী লাগে ঊষার প্রাণে।
দূরের দেখা দুইটি চাওয়ায় করুণ রেখা টানে॥

উদয়ঘাটে হাসে যখন পোড়ারমুখী শশী
শশীর মুখে চেয়ে ভাবি শশী তো নয় দোষী।
তার চোখের ঐ কাজল-রাগই রুচির চাঁদে করলে দাগী
কলঙ্কী চাঁদ কাজল-আঁখির সজল চাওয়ার বানে।
দোষী শশীর কলঙ্ক তার আঁখির স্মৃতি আনে॥

পুবের দেশের চাতক আমি চাই নাকো আন পানে,
তাই তো সেও তার চাহনি পুব গগনেই হানে।
সে থাকে মোর উদয়-দেশে তাই সে দেশে ভালোবেসে
তাকাই না গো পিছন পানের অস্তমরূদ্যানে,
পাছে তাহার বাজে ব্যথা কোমল অভিমানে॥

যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খেয়া বেয়ে
জানি না তার আঁখি সেদিন থাকবে কোথায় চেয়ে।
তাই তো এমন মিটিয়ে ক্ষুধা চোখ ভরে পিই চোখের সুধা
দূরের বেদন ভুলায় মোর ঐ চাউনি-তরঙ্গ গানে।
এবার এ চোখ হারিয়ে গেলাম পুবের পরিস্থানে।।

অবেলার ডাক

অনেক করে বাসতে ভালো পারিনি মা তখন যারে,
আজ অবেলায় তারেই মনে পড়ছে কেন বারেবারে।।

আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে,
চুমুর পরে চুম দিয়ে ফের হানত আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাবতুম তখন এ কোন বালাই!
করত এ প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হয়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ঝারে।
অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে।।

তরুণ তাহার ভরাট বুকের উপচে-পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দুপায় দলেছি মা, আজ কেন হায় তার অনুরাগ?
এই চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে, আর দুচোখ ছেপে
জল ঝরছে, তখনো মা কইনি কথা অহঙ্কারে,
এমনি দারুণ হতাদরে করেছি মা বিদায় তারে।।

দেখেওছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,
দ্বার হতে সে দ্বারে খেয়ে সবার লাথি ঝাঁটা।
ভেবেছিলাম আমার কাছে
তার দরদের শান্তি আছে।

আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিনতে নেরে দেবতারে।
ভিক্ষুবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে॥

পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ-ভিখারি,
মাগো আমি ভিখারিনী, আমি কি তাঁয় চিনতে পারি?
তাই মাগো তাঁর পূজার ডালা
নিইনি, নিইনি মণির মালা
দেব্‌তা-আমার নিজে আমায় পূজল ষোড়শ-উপচারে।
পূজারীকে চিনলাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে॥

আমার চাওয়াই শেষ চাওয়া তাঁর মাগো আমি তা কি জানি?
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায়-বাণী।
ওরে আমার ভালোবাসা,
কোথায় বেঁধেছিলি বাসা
যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে?
নিঃশ্বসিয়া উঠছে ধরা, নেই রে সে নেই খুঁজিস কারে!

সে যে পথের চিরপথিক, তার কি সহে-ঘরের মায়া?
দূর হতে মা দূরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া।
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে,
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে?

মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধরে রাখার?
তার তরে নয় ভালোবাসা সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ডাকার।
তাই মা আমার বুকের কপাট
খুলতে নারল তার করাঘাত,
এ মন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে॥

সোহাগে সে ধরতে যেত নিবিড় করে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম ভয়ে এ-বুক উঠত কেঁপে।
রাজ-ভিখারির আঁখির কালো
দূরে থেকেই লাগত ভালো,

আসলে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়ার অশ্রু-ভারে,
ব্যথায় কেমন মুষড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে॥

আজ কেন মা তারই মতন আমারো এই বুকের ক্ষুধা
চায় শুধু সেই হেলায় হারা আর আদর সোহাগ পরশ-সুধা।
আজ মনে হয় তাঁর সে বুকে
এ-মুখ চেপে নিবিড় সুখে
গভীর দুখের কাঁদন কেঁদে শেষ করে দিই এই আমারে !
যায় না কি মা আমার কাঁদন তাঁহার দেশের কানন-পারে ?

আজ বুঝেছি এ জনমের আমার নিখিল শান্তি-আরাম
চুরি করে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম।
হে বসন্তের রাজা আমার !
নাও এসে মোর হার-মানা-হার !
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্তনাদের হাহাকারে,
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন করে কাঁদতে পারে !

তোমার কথাই সত্য হলো পাষাণ ফেটেও রক্ত বহে,
দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজকে দহে।
জাগল বুকে ভীষণ জোয়ার,
ভাঙল আগল ভাঙল দুয়ার,
মূকের বুকে দেব্‌তা এলেন মুখর মুখে ভীম পাথারে।
বুক ফেটেছে মুখ ফুটেছে—মাগো মানা করছ কারে ?

স্বর্গ আমার গেছে পড়ে তাঁরই চলে যাওয়ার সাথে,
এখন আমার একার বাসর দোসরহীন এই দুঃখরাতে।
ঘুম ভাঙাতে আসবে না সে
ভোর না হতেই শিয়র পাশে
আসবে না আর গভীর রাতে চুমু চুরির অভিসারে,
কাঁদবে ফিরে তাহার সাথী ঝড়ের রাতি বনের পারে॥

আজ পেলে তাঁয় হুমড়ি খেয়ে পড়তুম মাগো যুগল পদে
বুকে ধরে পদ-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।
বসতে দিতাম আধেক আঁচল,
সজল চোখের চোখ-ভরা জল

ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে-মুখে অধর-ধারে,
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে॥

দেখতে মাগো তখন তোমার রাক্ষুসি এই সর্বনাশী
মুখ থুয়ে তার উদার বুকে বলত, 'আমি ভালোবাসি।'
বলতে গিয়ে সুখ-শরমে
লাল হয়ে গাল উঠত ঘেমে,
বুক হতে মুখ আসত নেমে লুটিয়ে কখন কোল-কিনারে,
দেখতুম মাগো তখন কেমন মান করে সে থাকতে পারে॥

এমনি এখন কতই আশা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে
তাঁর ওপর মা অভিমানে, ব্যথায়, রাগে, অনুরাগে।
চোখের জলের ঋণী করে
সে গেছে কোন দ্বীপান্তরে?
সে বুঝি মা সাত সমুদ্দুর তেরো-নদীর সুদূর পারে?
ঝড়ের হাওয়া সেও বুঝি মা সে দূর-দেশে যেতে নারে?

তারে আমি ভালবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,
চৌচির হয়ে পড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।
চিৎকারে তার উঠবে কেঁপে
ধরার সাগর-অশ্রু ছেপে,
উঠবে খেপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুহুঙ্কারে,
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণি নেচে ঘিরবে তারে॥

ছি মা! তুমি ডুকরে কেন উঠছ কেঁদে অমন করে?
তার চেয়ে মা তারই কোনো শোনা-কথা শুনাও মোরে।
শুনতে শুনতে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি।—ওকে খোলে
দুয়ার ওমা? ঝড় বুঝি মা তাঁরই মতো ধাক্কা মারে?
ঝোড়ো হাওয়া! ঝোড়ো হাওয়া! বন্ধু তোমার সাগর-পারে!

সে কি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নেই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে!
তবু কেন থাকি থাকি
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি!

যে কথা মোর রইল বাকি হায় সে কথা শুনাই কারে?
মাগো আমার প্রাণের কাঁদন আছড়ে মরে বুকের দ্বারে॥

যাই তবে মা দেখা হলে আমার কথা বলো তারে—
রাজার পূজা—সে কি কভু ভিখারিনী ঠেলতে পারে?
মাগো আমি জানি জানি,
আসবে আবার অভিমানী
খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে,
বলো তখন খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে!

চপল সাথী

প্রিয়! সামলে ফেলে চলো এবার চপল তোমার চরণ!
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ॥

কোথায় দূরে নূপুর বাজে তোমার পায়ে,
হেথায় রোদন আমার ওঠে উথলায়ে,
তোমার উদাসীন ঐ বিষম চলার ঘায়ে
আজ কাঁপে আমার সকল শরম-ভরম।
এখন ঐ দ্বিধাহীন চরণ করো মোর বুকে সম্বরণ।
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ॥

তুমি চলার ঝোঁকে দেখছো না হায় পড়ছে চরণ কোথায়,
ওগো চপল পরান-প্রিয়!
হেরো এবার তোমার পা পড়েছে আমার বুকের ব্যথায়
এখন ধীরে চরণ নিয়ো।
তোমার ঐ যে দোলন দোদুল-দোলা-চলায়,
আজ পথ-পাগলের পথের নেশা ভোলায়,
এবার থামাও সে দোল আমার বুকের তলায়,
আর সরিয়ো না মোর ব্যথায়-বাজা চরণ।
আমার ব্যথায় রেঙে হোক ও-চরণ নিখিল-মনোহরণ॥

ঐ অধীর চরণ চলার নেশায় হলে বিপথগামী
আমি বাঁচব কি আর প্রিয়?
তোমার বিপথ সে যে আমার তরে মৃত্যু-আঘাত, স্বামি!
এখন ধীরে চরণ নিয়ো।

ওগো জানি জানি শুধু চলার সুখে
তুমি পা ফেলেছ আমার ব্যথার বুকে,
ঐ চলাই তোমার আমার গভীর দুখে,
শেষে প্রেম হয়ে সে করল অবতরণ।
আজ একা তোমার নয় ও-চরণ আমার নিখিল শরণ!
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ!
প্রিয় সামলে ফেলো চলো এবার চপল তোমার চরণ॥

পূজারিণী

এত দিনে অ-বেলায়—
প্রিয়তম!
ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণি সম
দিবাযামী
যবে আমি
নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ-খেলায়—
এত দিনে অ-বেলায়
জানিলাম, আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি।
পূজারিণী!
ঐ কণ্ঠ, ও-কপোত-কাঁদানো রাগিণী,
ঐ আঁখি, ঐ মুখ,
ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ,
ঐ তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসী জিনি—
চিনি, সব চিনি।

তাই আমি এতদিনে
জীবনের আশাহত ক্লান্ত শুষ্ক বিদগ্ধ পুলিনে
মূর্ছাতুর সারা প্রাণ ভরে
ডাকি শুধু ডাকি তোমা,
প্রিয়তমা !
ইষ্ট মম জপ-মালা ঐ তব সবচেয়ে মিষ্ট নাম ধরে !
তারি সাথে কাঁদি আমি—
ছিন্ন-কণ্ঠে কাঁদি আমি, চিনি তোমা, চিনি চিনি চিনি,
বিজয়িনী নহ তুমি—নহ ভিখারিনী,
তুমি দেবী, চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী !
যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ্ করি মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারেবারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি !
চিনি তোমা বারেবারে জীবনের অস্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায়।
তারপর চেনা-শেষে
তুমি-হারা পরদেশে
ফেলে যাও একা শূন্য বিদায়-ভেলায় ! ...

* * *

আজ দিনান্তের প্রান্তে বসি আঁখি-নীরে তিতি
আপনার মনে আনি তারি দূর-দূরান্তের স্মৃতি—
মনে পড়ে—বসন্তের শেষে-আসা ম্লান মৌন মোর আগমনী সেই নিশি,
যেদিন আমার আঁখি ধন্য হলো তব আঁখি-চাওয়া সনে মিশি।
তখনো সরল সুখী আমি—ফোটেনি যৌবন মম,
উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি-আসি ঊষা-সম
আধ-ঘুমে আধ-জেগে তখনো কৈশোর,
জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি-ভোর।
বাধা-বন্ধ-হারা
অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণিবায়ু-পারা
দুরন্ত গানের বেগ অফুরন্ত হাসি
নিয়ে এনু পথ-ভোলা আমি অতিদূর পরবাসী।
সাথে তারি
এসেছিনু গৃহ-হারা বেদনার আঁখি-ভরা বারি।
এসে রাতে—ভোরে জেগে গেয়েছিনু জাগরণী সুর—

ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলে তুমি কাছে এসেছিলে,—
মুখ-পানে চেয়ে মোর সকরুণ হাসি হেসেছিলে,—
হাসি হেরে কেঁদেছিনু—'তুমি কার পোষাপাখি কান্তার-বিধুর ?'
চোখে তব সে কি চাওয়া ! মনে হলো যেন
তুমি মোর ঐ কণ্ঠ ঐ সুর—
বিরহের কান্না-ভারাতুর
বনানী-দুলানো,
দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো
আদি জন্মদিন হতে চেনো তুমি চেনো।
তারপর—অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা-ভাঙা
ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে ;
বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে
কারে পেতে চেয়েছিনু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে—
শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে-জাগা তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া
লেগেছিল মম আঁখি-পাতে।
আরো দেখেছিনু, ঐ আঁখির পলকে
বিস্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে
ঝলেছিল, গলেছিল গাঢ় ঘন বেদনার মায়া,—
করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিণী অন্ধকার নিশীথিনী-কায়া।

তৃষাতুর চোখে মোর বড় যেন লেগেছিল ভালো
পূজারিণী ! আঁখি-দীপে-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সকরুণ আলো।—
তারপর—গান গাওয়া শেষে
নাম ধরে কাছে বুঝি ডেকেছিনু হেসে।
অমনি কী গর্জে-ওঠা রুদ্ধ অভিমানে
(কেন কে সে জানে)
দুলি উঠেছিল তব ভুরু—বাঁধা স্থির আঁখি-তরী,
ফুলে উঠেছিল জল, ব্যথা-উষ্ণ-উৎস-মুখে তাহা ঝরঝর পড়েছিল ঝরি !
একটু আদরে এত অভিমানে ফুলে-ওঠা, এত আঁখি-জল,
কোথা পেলি ওরে কার অনাদৃতা ওরে মোর ভিখারিনী,
বল্ মোরে বল্।
এই ভাঙা বুকে
ঐ কান্না-রাঙা মুখ থুয়ে লাজ-সুখে
বল্ মোরে বল্—

মোরে হেরি কেন এত অভিমান?
মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল?
অ-চেনা অ-জানা আমি পথের পথিক
মোরে হেরে জলে পুরে ওঠে কেন তব ঐ বালিকার আঁখি অনিমিখ?
মোর পানে চেয়ে সবে হাসে,
বাঁধা-নীড় পুড়ে যায় অভিশপ্ত তপ্ত মোর শ্বাসে;
মণি ভেবে কত জনে তুলে পরে গলে,
মণি যাবে ফণি হয়ে বিষ-দগ্ধ মুখে
দংশে তার বুকে,
অমনি সে দলে পদতলে!
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিনী! তারে নিয়ে এ কি তব অকরুণ খেলা?
তারে নিয়ে একি গূঢ় অভিমান? কোন অধিকারে
নাম ধরে ডাকটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে?
কেউ ভালোবাসে নাই? কেউ তোমা করেনি আদর?
জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল, অভিমানী করুণা-কাতর!

নহে তাও নহে—
বুকে থেকে রিক্ত-কণ্ঠে কোন রিক্ত অভিমানী কহে—
'নহে তাও নহে!'
দেখিয়াছি শতজন আসে এই ঘরে,
কতজন না চাহিতে এসে বুকে করে,
তবু তব চোখে-মুখে এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা!
মোরে হেরে উছলায় কেন তব বুক-ছাপা এত প্রীতি-সুধা?
সে রহস্য, রানি!
কেহ নাহি জানে—
তুমি নাহি জানো—
আমি নাহি জানি।
চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ—
কোথা হতে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান! ...
নাহি বুঝিয়াও আমি সেদিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা!
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধরে মোর অনাদৃতা সীতা!
কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্তকুমারী সতী; তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা

খেলা-ছলে ; চির-মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা !
নীরবে সয়েছ সবি—
সহজিয়া ! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি।

* * *

তারপর—নিশি-শেষে পাশে বসে শুনেছিনু তব গীত-সুর
লাজে-আধ-বাধ-বাধ শঙ্কিত বিধুর ;
সুর শুনে হলো মনে—ক্ষণে ক্ষণে—
মনে-পড়ে-পড়ে না এ হারা-কণ্ঠ যেন
কেঁদে কেঁদে সাধে 'ওগো চেনো মোরে জন্মে জন্মে চেনো !'—
মথুরায় গিয়া শ্যাম, রাধিকায় ভুলেছিল যবে,
মনে লাগে—এই সুরে এই গীত-রবে কেঁদেছিল রাধা ;
অবহেলা-বেঁধা-বুক নিয়ে এ যেন রে অতি-অন্তরালে ললিতার কাঁদা !
বন-মাঝে একাকিনী দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে ঝুরে
ফেলে-যাওয়া নাথে তার ডেকেছিল ক্লান্ত কণ্ঠে এই গীত-সুরে।
কান্তে পড়ে মনে
বনলতা সনে
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে।
হে-গিরি-শিরে
হারা-সতী উমা হয়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা-কণ্ঠে হায়,
কেঁদেছিল চির-সতী পতি-প্রিয়া প্রিয়ে তার পেতে পুনরায় ! ...
চিনিলাম বুঝিলাম সবি—
যৌবন সে জাগিল না, লাগিল না মর্মে তাই গাঢ় হয়ে তব মুখ-ছবি।
তবু তব চেনা-কণ্ঠে মম কণ্ঠ-সুর
রেখে আমি চলে গেনু কবে কোন পল্লিপথে দূর। ...
দুদিন না যেতে এ কি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্ম-মূলে !

খুঁজে ফিরি, কোথা হতে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে—
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে।
কেঁদে ওঠে লতা-পাতা
ফুল পাখি নদী-জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,

কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাত্ৰা !
পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চিৎকারিয়া ফেরে তাই—'কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই ?'
হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস,
মনে হয়—এ নিখিল যৌবন-আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হুতাশ !
চোখ পুরে লাল নীল কত রাঙা, আবছায়া ভাসে,
আসে—আসে—
কার বক্ষ টুটে
মম প্রাণ-পুটে
কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে ?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে ; দিগন্তর দুলি ওঠে মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার-ত্রাসে !
কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম !
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা !
অনন্ত অগস্ত্য-তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু-সম, মাগে সিন্ধু আর !
ভগবান ! ভগবান ! এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার !
কোথা তৃপ্তি ? তৃপ্তি কোথা ? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিন্ধু
অনাদি পাথার !
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার !
কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি এত বড় বিশ্বে মোর নাই, শান্তি নাই।

ভাবি আর চলি শুধু, শুধু পথ চলি
পথে কত পথ-বালা যায়,
তারি পাছে হায়, অন্ধ বেগে ধায়
ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন
পিছু ফিরে কেহ যদি চায়—অভিমানে জলে ভেসে যায় দুনয়ন !
দেখে তারা হাসে,
না চাহিয়া কেহ চলে যায়, 'ভিক্ষা লহ' বলে কেহ আসে দ্বার-পাশে
প্রাণ আরো কেঁদে ওঠে তাতে
গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে !
প্রলয়-পয়োধি-নীরে গর্জে-ওঠা হুহুঙ্কার-সম

বেদনা ও অভিমানে ফুলে ফুলে দুলে দুলে ওঠে ধূ-ধূ
কোপ-ক্ষিপ্ত প্রাণ-শিখা মম !
পথ-বালা আসে ভিক্ষা-হাতে,
লাথি মেরে চূর্ণ করি গর্ব তার ভিক্ষা-পাত্র সাথে।
কেঁদে তারা ফিরে যায়, ভয়ে কেহ নাহি আসে কাছে;
'অনাথপিণ্ডদ'-সম
মহাভিক্ষু প্রাণ মম
প্রেম-বুদ্ধ লাগি হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে,
'ভিক্ষা দাও, পুরবাসি !
বুদ্ধ লাগি ভিক্ষা মাগি, দ্বার হতে প্রভু ফিরে যায় উপবাসী !'

কত এল কত গেল ফিরে,
কেহ ভয়ে কেহ বা বিস্ময়ে !
ভাঙা বুকে কেহ,
কেহ অশ্রু-নীরে—
কত এল কত গেল ফিরে !
আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,
বুঝিতে পারে না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ।
তারা আসে হেসে,
শেষে হাসি-শেষে
কেঁদে তারা ফিরে যায়
আপনার গৃহ-স্নেহচ্ছায়—
বলে তারা, 'হে পথিক ! বলো বলো তব প্রাণ কোন ধন মাগে ?
সুরে তব এত কান্না, বুকে তব কার লাগি এত ক্ষুধা জাগে ?'
কি যে চাই বুঝে নাকো কেহ,
কেহ আনে প্রাণ মন কেহ-বা যৌবন ধন
কেহ রূপ দেহ।
গর্বিতা ধনিকা আসে মদমত্তা আপনার ধনে,
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে। ...
সব ব্যর্থ, ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ
পথে পথে গেয়ে গেয়ে গান—
'কোথা মোর ভিখারিনী পূজারিণী কই ?
যে বলিবে—ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি
ওগো মোর স্বামি !
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী, বিজয়িনী নই।'

মরু মাঝে ছুটে ফিরি বৃথা
হু হু করে জ্বলে ওঠে তৃষ্ণা—
তারি মাঝে তৃষ্ণা-দগ্ধ প্রাণ
ক্ষণেকের তরে কবে হারাইল দিশা।
দূরে কার দেখা গেল হাতছানি যেন—
ডেকে ডেকে সে-ও কাঁদে—
'আমি নাথ তব ভিখারিনী,
আমি তোমা চিনি,
তুমি মোরে চেনো।'
বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল মরীচিকা-ছায়া !—
'ভিক্ষা দাও' বলে আমি এনু তার দ্বারে,
কোথা ভিখারিনী? ওগো এ যে মিথ্যা মায়াবিনী,
ঘরে ডেকে মারে।
এ যে ক্রূর নিষাদের ফাঁদ,
এ যে ছলে জিনে নিতে চাহে ভিখারির ঝুলির প্রসাদ।
হলো না সে জয়ী,
আপনার জালে পড়ে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী।

* * *

কাঁটা-বেঁধা রক্ত-মাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে,
জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়
তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে।
তবু কেন কতবার মনে যেন হতো
তব স্নিগ্ধ মদির পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা সব দগ্ধ ক্ষত।
মনে হতো প্রাণ তব প্রাণে যেন কাঁদে অহরহ—
'হে পথিক! ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে
কহ মোরে কহ!'
নীরব গোপন তুমি মৌনা তাপসিনী,
তাই তব চির-মৌন ভাষা
শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা-বুকে
কাঁদে কত ভালোবাসা আশা!

* * *

এরি মাঝে কোথা হতে ভেসে এল মুক্তধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে,
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে।
কোথা গেল পথ—
কোথা গেল রথ—
ডুবে গেল সব শোক-জ্বালা,
জননীর ভালোবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দোলাইল দেয়ালির আলা !
গত-কথা গত-জন্ম হেন
হারা-মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেনু যেন।
গৃহহারা গৃহ পেনু, অতি শান্ত-সুখে
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভরে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে।
শেষ হলো পথ-গান গাওয়া,
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হা-হা স্বরে পথ-সাথী তুফানের হাওয়া।

* * *

আবার আবার বুঝি ভুলিলাম পথ—
বুঝি কোন বিজয়িনী-দ্বার-প্রান্তে আসি বাধা পেল পার্থ-পথ-রথ।
ভুলে গেনু কারে মোর পথে পথে খোঁজা,
ভুলে গেনু প্রাণ মোর নিত্যকাল ধরে অভিসারী
মাগে কোন পূজা,
ভুলে গেনু যত ব্যথা শোক,—
নব সুখ-অশ্রুধারে গলে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রুহীন চোখ।
যেন কোন রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি,
সুরভিতে মেতে উঠে বুক,
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ।
বাঁচিয়া নতুন করে মরিল আবার
সীধু-লোভী বাণ-বেঁধা পাখি। ...
... ভেসে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী—
জাগিল না পাষাণ-প্রতিমা,
অপমানে দাবানল-সম তেজে
রুখিয়া উঠিল এইবার যত মোর ব্যথা-অরুণিমা।

হুঙ্কারিয়া ছুটিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি
বেদনার আদি হেতু স্রষ্টা পানে মেঘ অভ্রভেদী,
ধূমধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু-ধূমে
হিংসা-হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।

———একি মায়া ! তার মাঝে মাঝে
মনে হতো, কত দূর হতে, প্রিয়, মোর নাম ধরে যেন তব বীণা বাজে !
সে সুদূর গোপন পথের পানে চেয়ে
হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রু-রাঙা বেদনার রসে যেত ছেয়ে।
সেই সুর সেই ডাক স্মরি স্মরি
ভুলিলাম অতীতের জ্বালা,
বুঝিলাম তুমি সত্য—তুমি আছ,
অনাদৃতা তুমি মোর, তুমি মোরে মনে প্রাণে যাচ,
একা তুমি বন-বালা
মোর তরে গাঁথিতেছ মালা
আপনার মনে
লাজে সঙ্গোপনে।
জন্ম জন্ম ধরে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিনী। ...
অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে উঠে কহে—চিনি, চিনি।
বেঁচে ওঠ মরা প্রাণ ! ডাকে তোরে দূর হতে সেই—
যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ-শান্তি নেই !
তারি মাঝে
কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে ?
কে যেন রে পিছু ডেকে চিৎকারিয়া কয়—
বন্ধু, এ যে অবেলায় ! হতভাগ্য, এ যে অসময় !
শুনিনু না মানা, মানিনু না বাধা,
প্রাণে শুধু ভেসে আসে জন্মান্তর হতে যেন বিরহিণী ললিতার কাঁদা !
ছুটে এনু তব পাশে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ;
মৃত্যু-পথ অগ্নি-রথ কোথা পড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,
তোমার গোপন পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এল বুক জুড়ে।

*　　*　　*

তারপর যা বলিব হারায়েছি আজ তার ভাষা ;
আজ মোর প্রাণ নাই, অশ্রু নাই, নাই শক্তি আশা।
যা বলিব আজ ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্ত-ঝরা প্রাণ-রাঙা অশ্রু-ভাঙা ভাষা !
ভাবিতেছ, লজ্জাহীন ভিখারির প্রাণ—
সে-ও চাহে দেওয়ার সম্মান !
সত্য প্রিয়া, সত্য ইহা ; আমিও তা স্মরি
আজ শুধু হেসে হেসে মরি !
তবু শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রিয়তমা, দ্বার হতে দ্বারান্তরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে
এসেছিনু তব পাশে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছিনু তোমা।
প্রাণের সকল আশা সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া
তোমারে পূজিয়াছিনু, ওগো মোর বে-দরদি পূজারিণী প্রিয়া,
ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন
অবহেলে শুধু ভালোবেসে।
ভেবেছিনু, দুর্বিনীত দুর্জয়ীরে জয়ের গরবে
তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন
তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া
বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে।
ছিল আশা, ছিল শক্তি, বিশ্বটারে টেনে
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেবো এনে !
কিন্তু হায় ! কোথা সেই তুমি ? কোথা সেই প্রাণ ?
কোথা সেই নাড়ি-ছেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান ?

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ ;
আজ হেরি—তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী !
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখো কিছু বাকি,—
দুর্ভাগিনী ! দেখে হেসে মরি ! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি ?
মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান,
তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এ দৃষ্টি যাহারে দেখে,
তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তার প্রাণ।
লোভে আজ তব পূজা কলুষিত, প্রিয়া,
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,
যারে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ মন-প্রাণ সমর্পিয়া।

তাই আমি ভাবি, কার দোষে—
অকলঙ্ক তব হৃদি-পুরে
জ্বলিল এ মরণের আলো কবে পশে?
তবু ভাবি, একি সত্য? তুমিও ছলনাময়ী?
যদি তাই হয়, তবে মায়াবিনী অয়ি!
ওরে দুষ্ট, তাই সত্য হোক।
জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।
আমি তুমি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সব মিথ্যা হোক;
জ্বালো ওরে মিথ্যাময়ী, জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।

* * *

তব মুখপানে চেয়ে আজ
বাজ-সম বাজে মর্মে লাজ
তব অনাদর অবহেলা স্মরি স্মরি
তারি সাথে স্মরি মোর নির্লজ্জতা
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি।
মনে হয়—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা দ্বিধা হও!
ঘৃণাহত মাটি-মাখা ছেলেরে তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হতে অন্ধকারে টেনে লও!'
তবু বারেবারে আসি আশা-পথ বাহি,
কিন্তু হায়, যখনই ও-মুখ পানে চাহি—
মনে হয়,—হায়, হায়, কোথা সেই পূজারিণী,
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী?
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,
এ যে সেই ভাবহীন মুখ!
পূর্ণা নয়, এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি—
অপমানে ফেটে যায় বুক!
প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা, হায়!
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দলে অলক্তক পরে এরা পায়!
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।

নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন। ...
যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!

*   *   *

বুঝিয়াছি, শেষবার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁধি,
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া ওঠে তাই,
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি?
জ্বলে ওঠ এইবার মহাকাল-ভৈরবের নেত্রজ্বালাসম ধকধক,
হাহাকার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক!
আন্ তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তূরী!
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর্ এই মিথ্যাপুরী।
রক্ত-সুধা-বিষ আন্, ধর্ টিপে টুঁটি!
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক্ কুটি-কুটি!

*   *   *

কণ্ঠে আজ এত বিষ, এত জ্বালা,
তবু বালা!
থেকে থেকে মনে পড়ে—
যতদিন বাসিনী তোমারে আমি ভালো,
যতদিন দেখিনি তোমার বুক-ঢাকা রাগ-রাঙা আলো,
তুমি ততদিন-ই
যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিনী।
ততদিনই এতটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিক্ত অভিমানে
তব চোখে উছলাত জল, ব্যথা দিত তব কাঁচা প্রাণে;
একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি
কত নিশি-দিন তুমি, মনে করো, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি,

আমি চেয়ে দেখি নাই ; তারই প্রতিশোধ
নিলে বুঝি এতদিনে ! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে
অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাস-রোধ !
আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি—
অকরুণা ! প্রাণ নিয়ে এ কি মিথ্যা অকরুণ খেলা !
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পারো, নারী !
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।
ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান,
একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি দিয়া
মন-প্রাণ লভে অবসান।
ভুল, তাহা ভুল,
বায়ু শুধু ফোটায় কলিকা, অলি এসে হরে নেয় ফুল !
বায়ু বলী, তার তরে প্রেম নহে, প্রিয়া !
অলি শুধু জানে ভালো কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া !

*　　　*　　　*

পথিক দখিনা-বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে
মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে !
বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি !
আমি না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে ভালো,
কুমারী-বুকের তব সব স্নিগ্ধ রাগ-রাঙা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুকে-মুখে—
ভুখারির ভাঙা বুকে পুলকের রাঙা বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে !
সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হলো—আমি আজ তৃপ্ত হয়ে মরি।
না চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি—শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার করে তব প্রিয় নাম চুমি।

*　　　*　　　*

মোরে মনে পড়ে
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমায়ে কাহারো বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,
মনে করো, মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ ;
আর কভু আসিবে না
উগ্র সুখে কেহ্ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ !
মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,—
অমর হইয়া আছে—রবে চিরদিন
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি !

অভিশাপ

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে !
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি,
সাগর আকাশ বাতাস চিরি
যেদিন আমায় খুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে
কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় উঠবে ও-বুক ছমকে,—
জাগবে হঠাৎ চমকে !
ভাববে বুঝি আমিই এসে
বসনু বুকের কোলটি ঘেঁষে,

ধরতে গিয়ে দেখবে যখন—
শূন্য শয্যা ! মিথ্যা স্বপন !
বেদ্‌নাতে চোখ বুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

গাইতে বসে কণ্ঠ ছিঁড়ে আসবে যখন কান্না,
বলবে সবাই—'সেই যে পথিক তার শেখানো গান না ?—'
আসবে ভেঙে কান্না !
পড়বে মনে আমার সোহাগ,
কণ্ঠে তোমার কাঁদবে বেহাগ !
পড়বে মনে অনেক ফাঁকি,
অশ্রু-হারা কঠিন আঁখি
ঘন ঘন মুছবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে-ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কণ—
কাঁদবে কুটির-অঙ্গন !
শিউলি-ঢাকা মোর সমাধি
পড়বে মনে, উঠবে কাঁদি !
বুকের মালা করবে জ্বালা,
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা রাত্রি,
থাকবে সবাই—থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রীই !
আসবে শিশির-রাত্রি !
থাকবে পাশে বন্ধু-স্বজন,
থাকবে রাতে বাহুর বাঁধন,
বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আনবে মনে—
বিষিয়ে ও-বুক উঠবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

আসবে আবার শীতের রাতি, আসবে নাকো আর সে—
তোমার সুখে পড়ত বাধা থাকলে যে-জন পার্শ্বে,
আসবে নাকো আর সে !
পড়বে মনে, মোর বাহুতে
মাথা থুয়ে যে-দিন শুতে,
মুখ ফিরিয়ে থাকতে ঘৃণায় !—
সেই স্মৃতি নিত ঐ বিছানায়
কাঁটা হয়ে ফুটবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

আবার গাঙে আসবে জোয়ার, দুলবে তরী রঙ্গে,
সেই তরীতে হয়তো কেহ থাকবে তোমার সঙ্গে—
দুলবে তরী রঙ্গে।
পড়বে মনে, সে কোন রাতে
এক তরীতে ছিলে সাথে,
এমনি গাঙে ছিল জোয়ার,
নদীর দু'ধার এমনি আঁধার,
তেমনি তরী ছুটবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

তোমার সখার আসবে যেদিন এমনি কারা-বন্ধ,
আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয়তো হবে অন্ধ—
সখার কারা-বন্ধ !
বন্ধু তোমার হানবে হেলা,
ভাঙবে তোমার সুখের মেলা ;
দীর্ঘ বেলা কাটবে না আর,
বইতে প্রাণের শ্রান্ত এ-ভার
মরণ-সনে যুঝবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

ফুটবে আবার দোলন-চাঁপা চৈতী-রাতের চাঁদনি,
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজবে আমার কাঁদনি—
চৈতী-রাতের চাঁদনি।
ঋতুর পরে ফিরবে ঋতু,
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু !

চাইবে কেঁদে নীল নভো-গা'য়,
আমার মতন চোখ ভরে চায়
যে-তারা, তায় খুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

আসবে ঝড়ি, নাচবে তুফান, টুটবে সকল বন্ধন,
কাঁপবে কুটির সেদিন ত্রাসে, জাগবে বুকে ক্রন্দন—
টুটবে যবে বন্ধন !
পড়বে মনে, নেই সে সাথে
বাঁধতে বুকে দুঃখ-রাতে ;—
আপনি গালে যাচবে চুমা,
চাইবে আদর, মাগবে ছোঁওয়া,
আপনি যেচে চুমবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হানত,
সেই আঘাতই যাচবে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত—
আসব তখন পান্থ।
হয়তো তখন আমার কোলে,
সোহাগ-লোভে পড়বে ঢলে,
আপনি সেদিন সেধে-কেঁদে
চাপবে বুকে বাহুয় বেঁধে,
চরণ চুমে পূজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

আশান্বিতা

আবার কখন আসবে ফিরে সেই আশাতে জাগব রাত,
হয়তো সে কোন নিশুত রাতে ডাকবে এসে অকস্মাৎ !
সেই আশাতে জাগব রাত।

যতই কেন বেড়াও ঘুরে
মরণ-বনের গহন জুড়ে
দূর সুদূরে,
কাঁদলে আমি আসবে ছুটে, রইতে দূরে নারবে নাথ,
সেই আশাতে জাগব রাত।

কপট ! তোমার শপথ-পাহাড় বিন্ধ্যসম হোক না সে,
ঝড়ের মুখে খড়ের মতন উড়বে তা মোর নিশ্বাসে !
একটি ছোট্ট নিশ্বাসে !
রাত্রি জেগে কাঁদছি আমি
শুনবে যখন, হে মোর স্বামি,
সুদূরগামী !
আগল ভেঙে আসবে পাগল, চুমবে সজল নয়ন-পাত,
সেই আশাতে জাগব রাত।

জানি সখা, আমার চোখের একটি বিন্দু অশ্রুজল,
নিববে তাতেই তোমার বুকের অগ্নি-সিন্ধু নীল গরল,
আমার চোখের অশ্রুজল !
তোমার আদর-সোহাগিনী
তাই তো কাঁদায় নিশিদিনই
এ অধীনী,
ভুলবে জানি তোমার রানি গরবিনীর সব আঘাত !
সেই আশাতে জাগব রাত।

আসবে আবার পদ্মানদী, দুলবে তরী ঢেউ-দোলায়,
তেমনি করে দুলব আমি তোমার বুকের পরকোলায়।
দুলবে তরী ঢেউ-দোলায়।
পাগলি নদী উঠবে খেপে,
তোমায় তখন ধরব চেপে
বক্ষ ব্যেপে,
মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন, জড়িয়ে কণ্ঠ থাকবে হাত !
সেই আশাতে জাগব রাত।

পোড়া চোখের জল ফুরায় না, কেমন করে আসবে ঘুম ?
মনে পড়ে শুধু তোমার পাতাল-গভীর মাতাল চুপ,
কেমন করে আসবে ঘুম ?

আজ যে আমার নিশীথ জুড়ে
একলা থাকার কান্না ঝুরে
হতাশ সুরে,
পুবের হাওয়ায় কাঁদবে সে সুর, আসবে পছিম হাওয়ার সাথ !
সেই আশাতে জাগব রাত।

বিজলি-শিখার প্রদীপ জ্বেলে ভাদর রাতের বাদল মেঘ,
দিগ্বিদিকে খুঁজছে তোমায় ডাকছে কেঁদে বজ্র-বেগ—
দিগ্বিদিকে খুঁজছে মেঘ !
তোমার আশায় ঐ আশা-দীপ
জ্বালিয়েছে আজ দিক ভরে নীপ,
হে রাজ-পথিক,
আজ না আসো, এসো যেদিন দীপ নিবাবে ঝন্‌ঝাবাত !
সেই আশাতে জাগব রাত।

পিছু-ডাক

সখি ! নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়বে কি আর মনে ?
সেথায় তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে।
প্রথম দেখা তোমায় আমায়
যে গৃহ-ছায় যে আঙিনায়,
যেথায় প্রতি ধূলি-কণায়
লতাপাতার সনে—
নিত্য চেনার বিত্ত রাজে চিত্ত-আরাধনে,
পুণ্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদছে নিরজনে॥

সেথা তুমি যখন ভুলতে আমায়, আসত অনেক কেহ,
তখন আমার হয়ে অভিমানে কাঁদত যে ঐ গেহ।
যেদিক পানে চাইতে সেথা
বাজত আমার স্মৃতির ব্যথা,

সে গ্লানি আজ ভুলবে হেথা
নতুন আলাপনে।
আমিই শুধু হারিয়ে গেলেম হারিয়ে-যাওয়ার বনে॥

আমার এতদিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দূর,
ওগো আমার সুদূর করত নিকট ঐ পুরাতন পুর।
এখন তোমার নতুন বাঁধন,
নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,
নতুন সাধন, গানের মাতন
নতুন আবাহনে।
আমারই সুর হারিয়ে গেল সুদূর পুরাতনে॥

সখি ! আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর,
আজ মোর সমাধির বুকে তোমার উঠবে বাসর-ঘর।
শূন্য ভরে শুনতে পেনু
ধেনু-চরা বনের বেণু—
হারিয়ে গেনু হারিয়ে গেনু
অস্ত-দিগঙ্গনে।
বিদায় সখি, খেলা-শেষ এই বেলা-শেষের খনে !
এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহকোণে॥

মুখরা

আমার কাঁচা মনে রঙ ধরেচে আজ,
ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ ?
আমার কাঁচা মনে রঙ ধরেচে আজ॥

আমার ভুবন উঠচে রেঙে
তার পরশের সোহাগ লেগে,

ঘুমিয়ে ছিনু দেখনু জেগে মা,
আমায় জড়িয়ে বুকে দাঁড়িয়ে আছেন নিখিল হৃদয়-রাজ !
ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ ?

আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী !
মা গো, আমি আর কি মিথ্যা লজ্জা করে পারি ?
আমায় দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী !

জগৎ যারে পায় না সেধে
সেই সে যখন সাধছে কেঁদে
আমার চরণ বক্ষে বেঁধে মা,
আমি বাঁধব না চুল, এই ভালো মোর ভিখারিনীর সাজ।
ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ ?

আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরানপণ ?
মা গো বক্ষে আমার বিশ্বলোকের চির-চাওয়া ধন,
আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরানপণ ?

বিশ্ব-ভুবন যার পদছায়
সেই এসে হায় মোর পদ চায়,
আমার সুখ-আবেগে বুক ফেটে যায় মা,
আজ লাজ ভুলেছি, সাজ ভুলেছি, ভুলেছি সব কাজ।
ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ ?

সাধের ভিখারিনী

তুমি মলিন বাসে থাকো যখন, সবার চেয়ে মানায় !
তুমি আমার তরে ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায় !
জানি, প্রিয়ে, জানি জানি,
তুমি হতে রাজার রানি,

খাটত দাসী; বাজত বাঁশি
তোমার বালাখানায়।
তুমি সাধ করে আজ ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥

দেবি! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারিকে ভালোবেসে সাজলে ভিখারিনী।
সব ত্যাজি মোর হলে সাথী,
আমার আশায় জাগচ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার
হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি সাধ করে মোর ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥

কবি-রানি

তুমি আমায় ভালোবাস তাই-তো আমি কবি।
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥

আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা
পুবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালোবাসো বলে ভালোবাসে সবি॥

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এল তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমি আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি,
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মাল্য, রানি! তোমার সবি॥

তুমি আমায় ভালোবাস তাই-তো আমি কবি।
আমার এ রূপ,—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥

আশা

আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে,
আমার লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধরবে কি ঐ কোলে?
বাড়িয়ে বাহু আসবে ছুটে?
ধরবে চেপে পরান-পুটে?
বুকে রেখে চুমবে কি মুখ
নয়ন-জলে গলে?
আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে!

তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা,
তা ভুলবে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা?
বলো বলো জীবন-স্বামি,
সেদিনও কি ফিরব আমি?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না
ঐ চরণের তলে?
আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে!

শেষ প্রার্থনা

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে
যেন এমনি কাটে আস্‌ছে-জনম তোমায় ভালোবেসে।
এমনি আদর, এমনি হেলা
মান-অভিমান এমনি খেলা,

এমনি ব্যথার বিদায়-বেলা
এমনি চুমু হেসে,
যেন খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে !
এবার ব্যর্থ আমার আশা যেন সকল প্রেমে মেশে !
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে।।

যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামি !
এবার এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি !
আপন সুখকে বড় করে
যে-দুখ পেলেম জীবন ভরে,
এবার তোমার চরণ ধরে
নয়ন-জলে ভেসে
যেন পূর্ণ করে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে।
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে।।

[সে যে চাতকই জানে]

সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী !
চাঁদে চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়-তম চুমু দি !

বিষের বাঁশী

উৎসর্গ

বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব
আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা
মিসেস এম. রহমান সাহেবার
পবিত্র চরণারবিন্দে—

এমনি প্লাবন-দুন্দুভি-বাজা ব্যাকুল শ্রাবণ মাস—
সর্বনাশের ঝান্ডা দুলায়ে বিদ্রোহ-রাঙা-বাস
ছুটিতে আছিনু মাভৈ-মন্ত্রী ঘোষি অভয়ঙ্কর,
রণ-বিপ্লব-রক্ত-অশ্ব কশাঘাত-জর্জর!
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল-পথ-বাঁকে,
ওগো নাগ-মাতা, বিষ-জর্জর তব গরজন-ডাকে!
কোথা সে অন্ধ অতল পাতাল-বন্ধ গুহার তলে,
নির্জিত তব ফণা-নিঙড়ানো গরলের ধারা গলে;
পাতাল-প্রাচীর চিরিয়া তোমার জ্বালা-ক্রন্দন-চুর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিষ-মদ-চিক্কুর!
আঁধার-পীড়িত রোষ-দোদুল্ সে তব ফণা-ছায়া-দোল
হানিছে গৃহীরে অশুভ শঙ্কা, কাঁপে ভয়ে সুখ-কোল।
ধূমকেতু-ধ্বজ বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়াইল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল!
ধূমকেতু-ধূম-গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশু-ফণী
উল্লাসে 'জয় জয় নাগমাতা' হাঁকিল জয়-ধ্বনি!
বন্দিল, উর নাগ-নন্দিনী ভেদিয়া পাতাল-তল!
দুলিল গানের অশুভ-অগ্নি-পতাকা জ্বালা-উজল!
তারপর মাগো কোথা গেলে তুমি, আমি কোথা হনু হারা,
জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস-কারা!
শৃঙ্খলিতা সে জননীর ব্যথা বাজিয়া এ ক্ষীণ বুকে
অগ্নি হয়ে মা জ্বলেছিল খুন, বিষ উঠেছিল মুখে,
শৃঙ্খল-হানা অত্যাচারীর বুকে বাজপাখি সম
পড়িয়া তাহারে ছিঁড়িতে চেয়েছি হিংসা-নখরে মম,—
সে আক্রমণ ব্যর্থ কখন করেছে কারার ফাঁদ,
বন্দিনী দেশ-জননীর সাথে বেঁধেছে আমারে বাঁধ।

হাতে পায়ে কটি-গর্দানে মোর বাজে শত শৃঙ্খল,
অনাহারে তনু ক্ষুধা-বিশীর্ণ, তৃষায় মেলে না জল,
কত যুগ যেন এক অঞ্জলি পায়নিকো আলো বায়ু,
তারি মাঝে আসি রক্ষী-দানব বিদ্যুতে বেঁধে স্নায়ু—
এত যন্ত্রণা তবু সব যেন বুকে ক্ষীর হয়ে ওঠে,
শত্রুর হানা কন্টক-ক্ষত প্রাণে ফুল হয়ে ফোটে !—
এরই মাঝে তুমি এলে নাগ-মাতা পাতাল-বন্ধ টুটি
অচেতন মম ক্ষত তনু পড়ে তব ফণা-তলে লুটি !
তোমার মমতা-মানিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্ব-জননী ! তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে ; বিষ শুধু তোমা দহে,
ফণা তব মাগো পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে !—
আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছ অভয়-ক্রোড়ে,
সপ্ত রাজার রাজৈশ্বর্য মানিক দিয়াছ মোরে,
নহে তার তরে,—সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মানিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো,
শুধু মাতা নহ, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,—
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি !

হুগলি
১৬ই শ্রাবণ ১৩৩১

তোমার নাগ-শিশু—
নজরুল ইসলাম

কৈফিয়ৎ

অগ্নি–বীণা দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যেসব কবিতা ও গান দেবো বলে এতকাল ধরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেইসব কবিতা ও গান দিয়ে এই *বিষের বাঁশী* প্রকাশ করলাম। নানা কারণে *অগ্নি–বীণা* দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদলে *বিষের বাঁশী* নামকরণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ 'আইন'–রূপ 'আয়ান ঘোষ' যতক্ষণ তার বাঁশ উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশিতে তথাকথিত 'বিদ্রোহ'–রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো–র বাঁশ বাঁশির চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশিতে বাঁশাবাঁশি লাগলে বাঁশিরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কেননা, বাঁশি হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের !

এই বাঁশি তৈরির জন্য আমার অনেক বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁরা সাহায্য না করলে এ বাঁশির গান আমার মনের বেণু–বনেই গুমরে মরত। এঁরা সকলেই নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ প্রাণ–সুন্দর আনন্দ–পুরুষ। আমার নি–খরচা কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ পাবার লোভে এঁরা সাহায্য করেননি। এঁরা সকলেই জানেন, ওসব বিষয়ে আমি একেবারে অমানুষ বা পাষাণ। এঁরা যা করেছেন তা স্রেফ আনন্দের প্রেরণায় ও আমায় ভালোবেসে। সুতরাং আমি ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকের মতো তাঁদের কাছে চির–চলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের আনন্দকে খর্ব ও ভালোবাসাকে অস্বীকার করব না। এঁরা যদি সাহায্য হিসাবে আমায় সাহায্য করতে আসতেন, তাহলে আমি এঁদের কারুর সাহায্য নিতাম না। যাঁরা সাহায্য করে মনে মনে প্রতিদানের দাবি পোষণ করে আমায় দায়ী করে রাখেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে আমি নিজেকে অবমানিত করতে নারাজ। এতটুকু শ্রদ্ধা আমার নিজের উপর আছে। স্রেফ তাঁদের নাম ও কে কোন মালমশলা জুগিয়েছেন তাই জানাচ্ছি—নিজেকে হালকা করার আত্মপ্রসাদের লোভে।

এ *বিষের বাঁশী*র বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশ–মাতা, আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।

বাঁশ জুগিয়েছেন সুলেখক ঔপন্যাসিক–বন্ধু সনৎকুমার সেন। এ বাঁশকে বাঁশি করে তুলেছেন—'বাণী' যন্ত্র দিয়ে ঐ যন্ত্রাধিকারী বিখ্যাত স্বদেশ–সেবক আমার অগ্রজ–প্রতিম পরম শ্রদ্ধাস্পদ ললিত–দা ও পাঁচু–দা। তাঁদের যন্ত্রের সাহায্য না পেলে এ বাঁশি শুধু বাঁশই রয়ে যেত। এই বাঁশির গায়ের অদ্ভুত বিচিত্র নকশাটি কেটে দিয়েছেন প্রোথিত–যশা কবি–শিল্পী—আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু—'কল্লোল'–সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। এই সবের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন দেশের–কাজে–উৎসর্গ–প্রাণ আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবি মঈনউদ্দিন হুসয়ন সাহেব বি. এ. (নূর লাইব্রেরি)। বলতে ভুলে

গিয়েছিলাম, ডি. এম. লাইব্রেরির গোপাল-দা এই গান শোনাবার জন্য ঢোল-শোহরৎ দেবার ভার নিয়েছেন।

এত বন্ধুর এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেল আমার অবকাশ-হীনতা ও অভিমন্যুর মতো সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত ক্ষতবিক্ষত অবস্থার জন্য। যাঁরা আমায় জানেন, তাঁরা জানেন, আমার বিনা কাজের হট্টমন্দিরে অবকাশের কিরকম অভাব এবং জীবনের কতখানি শক্তি ব্যয় করতে হয় দশ দিকের দশ আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য। যদি অবকাশ ও শান্তি পাই, তাহলে দ্বিতীয় সংস্করণে এর দোষ-ত্রুটি নিরাকরণের চেষ্টা করব। ইতি—

হুগলি
১৬ই শ্রাবণ ১৩৩১

নজরুল ইসলাম

[আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ]

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ !
গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

আয় রে আমার বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল্-কেউটে গোখরো নাগের
পীত চাবুক !
হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

বুঝিসনি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী !
তোর অভিমান হলো শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসি !
(তোর) হাসির বাঁশি আনলে বুকে যক্ষ্মা-রুগীর রক্ত-বান,
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে, হায় অবোধ !
ছুটে এলি ছায়ার আশায়, মাথায়
তেমনি জ্বলছে রোদ।
ফাঁকির ফানুস ছাই হলো তোর,
খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

তুই যে আগুন, জল-ধারা চাস কার কাছে ?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে !
ফুলের মালার হুলের জ্বালায় জ্বলবি কত অগ্নি-ম্লান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

অগ্নি-ফণি ! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস্ চুমা,
পাহাড়-ভাঙা জাপটানি তোর—ভাবিস সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া !

মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু-টান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

সুখের লালস শেষ করে দে, স্বার্থপর !
কাল্-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া ! তুই কোথা বল
বাঁধবি ঘর ?
ঘর-পোড়ানো ত্রাস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

তোর তরে নয় শীতল ছায়া,
পান্থ-তরুর প্রেম-আসার,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু,
রুদ্র শিবের চণ্ড মার।
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে
কশাই-কঠিন তুই পাষাণ !
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

সাপ ধরে তুই চাপবি বুকে
সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ
চুমুর সোহাগ সইবে না !
ডাক-নামে ডাক তোর তরে নয়,
আহ্বান তোর ভীম কামান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ !

ফণি-মন্‌সার কাঁটার পুরে
আয় ফিরে তুই কাল্-ফণি,
বিষের বাঁশি বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা—
'আয় নীলমণি।'
ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামি ছাড়্,
ধর্ খ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ !
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ !

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

[আবির্ভাব]

নাই তা—জ
তাই লা—জ ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ !
করে তসলিম হর্ কুর্নিশে শোর্ আ-ওয়াজ
শোন্ কোন মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ !
উরজ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেজাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান্ তিহারান-স্মরি কাহার বিরাট নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।'
চলে আন্‌জাম
দোলে তান্‌জাম
খোলে হুর-পরি মরি ফিরদৌসের হাম্মাম !
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর্, হাতে 'আব্-জম-জম্-জাম্'।
শোন্ দামাম কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম !'

২

মস্ তান !
ব্যস্ থাম্ !
দেখ্ মশ্‌গুল্ আজি শিস্তান্ বোস্তান্,
তেগ্ গর্দানে ধরি দারোয়ান রোস্তাম।

কুঞ্জিকা : তাজ—মুকুট। তসলিম—সালাম, প্রণাম। শোর্-আওয়াজ—বিরাট বিপুল ধ্বনি। মুজ্‌দা—খোশ্ খবর, সুসংবাদ। হেরা—আরবের হেরা নামক পর্বত। এই গিরি-গুহায় হজরত মোহাম্মদ (সা) সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। উরজ, য়্যামেন, নজ্‌দ, হেজাজ, তাহামা—আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম। ইরাক—মেসোপটেমিয়া প্রদেশ। শাম—সিরিয়া প্রদেশ। মেসের—মিশর দেশ। ওমান—আরবের এক ছোট রাজ্য। সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম—আরবি ভাষায় উচ্চারিত 'দরুদ' বা শান্তিবাণী। মুসলমান মাত্রেরই হজরতের নামের শেষে এই 'দরুদ' পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ—'তাঁহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হউক।'

আন্‌জাম—আয়োজন। তান্‌জাম—সওয়ারি। ফিরদৌস—স্বর্গ। হাম্মাম—স্নানাগার। কওসর—অমৃত। ভর—ভরা, পূর্ণ। হুর-পরি—অপ্সরী-কিন্নরী। আব্-জম্‌জম্—মক্কার 'জমজম' নামক কূপের পবিত্র পানি। জাম—পেয়ালা। দামাম—দামামা। তামাম—সমস্ত। সামান—সাজ-সরঞ্জাম।

বাজে কাহার্‌বা বাজা, গুল্‌জার গুলশান
গুল্‌ফাম !
দক্ষিণে দোলে আরবি দরিয়া খুশিতে সে বাগে–বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন–জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবিতে সব্‌জার জাগে দাগ !
নূরে কুর্শির
পুরে 'তূর'–শির,
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরি ফুর্তির,
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দূরানি তুর্কির !
আজ বেদুইন তার ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুড়ে ফেলে বল্লম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম'।

৩

'সাবে ঈন্'
তাবে ঈন্
হয়ে চিল্লায় জোর 'ওই ওই নাবে দীন !'
ভয়ে ভূমি চমে 'লাত্ মানাত'–এর ওয়ারেশিন।
রোয়ে 'ওয়্যা–হোবল্' ইবলিস্ খারেজিন,—
কাঁপে জিন্ !
জেদ্দার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর ওক্ত,
ঘন উথলে অদূরে 'জম্–জম্' শরবৎ !

মস্‌তান—মস্তানা, পাগলা। ব্যস্ থাম—ব্যস্, থামো ! শিস্তান-বোস্তান—শিস্তানের ফুল-বাগিচা। তেগ—তলোয়ার। গর্দানে—স্কন্ধে। রোস্তাম—পারস্যের জগদ্‌বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। কাহার্‌বা—তালের নাম। গুল্‌জার—মাত্। গুল্‌শান—পুষ্প-বাটিকা। গুল্‌ফাম—গোলাবি রঙিন। আরবি দরিয়া—আরব সাগর। খুশিতে বাগে বাগ্—আহ্লাদে আটখানা। নীলা—নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতের—লোহিত সমুদ্রের। খুন-জোশিতে—রক্ত-উত্তেজনায়। আগ—আগুন। সাহারা, গোবি—দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সব্‌জার—হরিতের। নূরে—জ্যোতিতে। কুর্শি—খোদার সিংহাসনের আসন। তূর—আরবের তূর নামক পর্বত। সুর্খীর—লালিমার। লালী—অরুণিমা। ইরানি—পারস্যের অধিবাসী। দূরানি—কাবুলি। তুর্কি—তুরস্কের অধিবাসী।

'সাবেঈন'—আরবের মূর্তিপূজকগণ। 'তাবেঈন'—আজ্ঞাবহ। চিল্লায়—চিৎকার করে। 'দীন'—সত্যধর্ম। 'লাত্ মানাত'—আরবের মূর্তিপূজকগণের ঠাকুরদের নাম। ওয়ারেশিন—উত্তরাধিকারিগণ, (এখানে) ঐ মূর্তিসমূহের দলবল।

পানি কওসর,
মণি জওহর্
আনি 'জিবরাইল' আজ হরদম দানে গওহর্,
টানি 'মালিক-উল্-মৌত্' জিঞ্জির—বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর্।
হানি বরষা সহসা 'মিকাইল' করে
উষর আরবে ভিঙ্গা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইসরাফিল'-এর শিঙ্গা !

৪

জঞ্ জাল্
কঙ্ কাল
ভেদি,— ঘন জাল মেকি গণ্ডির পঞ্জার
ছেদি,— মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার !
বেদি— পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
ওঙ্কার !
শঙ্কারে করি লঙ্কার পার কার ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার ?
ভূমা- নন্দে রে সব টুটেছে অহঙ্কার !

মর- মর্মরে
নর- ধর্ম রে
বড় কর্মরে দিল ঈমানের জোর বর্ম রে,
ভর্ দিল্ জান্—পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্য রে !
রণে তাই তো বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ—
'ওয়ে মার্হাবা ওয়ে মার্হাবা এয়্ সর্ওয়ারে কায়েনাত !'

'ওয্যা হোবল'—আরব মূর্তি-পূজারীদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইব্লিস—শয়তান। খারেজিন—এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জিন—দৈত্য ; genii. জেদ্দা—জেদ্দা বন্দর। মদিনা—শহর ('মদিনা' নামক শহর নয়)। 'কাবা'—মক্কার বিশ্ববিখ্যাত মস্জিদ। হর্ ওক্ত—সর্বদা। হরদম্—সদাসর্বদা। গওহর—মতি। মালিক-উল-মৌত—ফেরেশতার (স্বর্গীয় দূত) নাম ; জীবের জীবন-সংহার এই যমরাজের হাতে। জিঞ্জির—শৃঙ্খল। 'মিকাইল'—ফেরেশতা। ভিঙ্গা—সরসা। ইস্রাফিল—প্রলয়-বিষাণ-মুখে এক ফেরেশ্তা। জঞ্জাল—জঞ্জাল। কঙ্কাল—কঙ্কাল। সরোদ—এক তারের যন্ত্রের নাম।

৫

শর্‌- ওয়ান
দর্‌- ওয়ান
আজি বান্দা যে ফের্‌উন শাদ্দাদ্ নম্‌রুদ মারোয়ান ;
তাজি বোর্‌রাক্ হাঁকে আস্‌মানে পর্‌ওয়ান,—
ও যে বিশ্বের চির সাচ্‌চারই বোর্‌হান—
'কোর্‌-আন্' !
'কোন্ জাদুমণি এলি ওরে—বলি রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হাবিবে বুকে চাপি, আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই !
দূরে আব্‌দুল্লার রুহ্ কাঁদে, 'ওরে আমিনারে 'গমি' নাই—
দেখো সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ, সব ভর্‌-পুর 'কমি' নাই।'

'এয়্ ফর্ জন্দ'—
হায় হর্‌দম্
ধায় দাদা মোত্‌লেব কাঁদি,'—গায়ে ধুলা কর্দম !
'ভাই ! কোথা তুই ?' বলি বাচচারে কোলে কাঁদিছে
হাম্‌জা দুর্দম !
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হতে জোর-শোর আসে,
ভাসে 'কালাম'—
'এয় শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জমাঁ সালাম !'

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

[তিরোভাব]

এ কি বিস্ময় ! আজরাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ !
বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর-শোক।
জান্-মরা তার পাষাণ-পাঞ্জা বিল্‌কুল ঢিলা আজ,
কব্‌জা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।
জিব্‌রাইলের আতশি পাখা সে ভেঙে যেন খানখান,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আনচান !

মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল
ঢালে কুল মুল্লুকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল।
একি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই? সেই রবিউল আউওল?

২

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইস্রাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু !গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজ !
রসুলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান?
তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান !
জমিন-আসমান জোড়া শির পাঁও তুলি তাজি বোর্‌রাক,
চিখ্‌ মেরে কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক !
হুর-পরি শোকে হায়
জল- ছলছল চোখে চায়।
আজ জাহান্নামের বহ্নি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি জল,
যত ফিরদৌসের নার্গিস্‌-লালা পেলে আঁসু-পরিমল।

৩

মৃত্তিকা-মাতা কেঁদে মাটি হলো বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটার জানাজা কাঁধে যেন—তাই বহে ঘন নাভি-শ্বাস।
পাতাল-গহ্বরে কাঁদে জিন, পুন মলো কি রে সোলেমান?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান !
ফুল পাতা যত খসে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা-স্নায়ু !

ঈমান—বিশ্বাস। বিশ্ব-বয়তুল্লাহ্—বিশ্বরূপ 'কাবা' বা আল্লার ঘর। ওয়ে—ওগো, বাছা। মারহাবা—সাবাস। 'সরওয়ারে কায়েনাত'—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। 'শর্‌ওয়ান'—নওশেরওয়ান নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ্। বান্দা—হুজুরে-হাজির গোলাম, বন্দনাকারী। ফেরাউন, শাদ্দাদ, নমরুদ, মার্‌ওয়ান—বিখ্যাত ঈশ্বরদ্রোহী সব। তাজি—দ্রুতগামী অশ্ব। বোর্‌রাক—উচ্চৈঃশ্রবার মতো স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান—আকাশ। পরওয়ান—পরোয়ানা। সাচ্চারই—সত্যেরই। বোরহান—প্রমাণ। রোয়ে—কাঁদে। আমিনা—হজরত মোহাম্মদ (সা) জননীর নাম। খোদার হাবিব—আল্লার বন্ধু (হজরতের খেতাব)। আবদুল্লাহ্—হজরতের স্বর্গগত পিতা। রুহ্—আত্মা। 'গমি'—দুঃখ। 'গমি' নাই—দুঃখ করো না। ভরপুর—পূর্ণ। 'কমি'—অপূর্ণ। 'কমি' নাই—আজ কিছু অপূর্ণ নাই।

মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই।
যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে।
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে।

৪

নকিবের তূরী ফুৎকারি আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খানখান করে চোট মারে দূরে চাঁদে?
আবু বকরের দরদর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতা আয়েশার কাঁদনে মূরছে আসমানে তারা ডরে!
শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে 'আল্লার আজ ছাল তুলে নেবো মেরে তেগ্, দেগে কোঁড়া।'
হাঁকে ঘন ঘন বীর—
'হবে জুদা তার তন শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত—যে নেবে রে তাঁরে গোরে।
আর দারাজ দস্তে তেজ হাতিয়ার বোঁও বোঁও করে ঘোরে!'

৫

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মস্জিদে?
মুয়াজ্জিনের হোঁশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে!

বেলালেরও আজ কন্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ি-ছেঁড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে!
উস্মানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে!

আজরাইল—যমদূত। বে-দরদ—নির্মম। সুরাখ—ঝাঁঝরা। খাক্—মাটি। নীলা তাজ—আজরাইলের মাথার তাজ নীলবর্ণ। জিবরাইল—প্রধান ফেরেশ্তা ও স্বর্গীয় বার্তাবহ। আতশি—অগ্নিময়। মিকাইল—একজন ফেরেশ্তার নাম। কুল মুল্লুকে—সর্বদেশে। ইসরাফিল—প্রলয়-বিষাণধারী ফেরেশ্তা। রসুল—প্রেরিত পুরুষ। আজাজিল—শয়তানের নাম। তাজি বোর্‌রাক—বোররাক নামক স্বর্গীয় ঘোড়া। আরশ—খোদার সিংহাসন। ফিরেদৌস—বেহেশ্ত, স্বর্গবিশেষের নাম। নার্গিস্ লালা—ফুলের নাম।

আজ ভোঁতা সে দু'ধারী ধার
ঐ আলীর জুলফিকার !
আহা রসুল–দুলালি আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
'কোথা বাবাজান !' বলি মাথা কুটে কুটে এলোকেশ নাহি বাঁধে !

৬

হাসান–হুসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর,
'নানাজান কই !' বলি খুঁজে ফেরে কভু বার কভু ঘর।
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালি, খসেছে চন্দ্র–তারা,
আঁধিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন–ঝারা !
সাগর–সলিল ফোঁপায়ে উঠে সে আকাশ ডুবাতে চায়,
শুধু লোনা জলে তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায় !
খোদ খোদা সে নির্বিকার,
আজ 'টুটেছে আসনও তাঁর !
আজ সখা মহ্বুবে বুকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
তারে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে !

৭

বেহেশ্ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম–ধাম,
গাহে হুর–পরি যত, 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।'
কাতারে কাতারে করজোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,—
ধরিতে না পেরে ধরা–মা'র চোখে দরদর ধারা বয়।
এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী ?
আজ জননীর মুখে হারামণি–পাওয়া–হাসা হাসে জগপতি !
'খোদা, একি তব অবিচার !'
বলে কাঁদে সুত ধরা–মার।
আজ অমরার আলো আরো ঝলমল, সেথা ফোটে আরো হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এল অমা–রাশি !

তন্—দেহ। দরাজ দস্তে—বিশাল হাতে। জুল্ফিকার—হজরত আলীর দুধারী তলোয়ার। মাহ্বুব—প্রিয়।

*

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কী ঘন রোল—'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।'

সেবক

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?—
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?
নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা?—

ফন্দি-কারায় কাঁদছিল হায় বন্দি যত ছেলে,
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,
পাবক-শিখা হস্তে ধরি কে তুমি ভাই এলে?
'সেবক আমি'—হাঁকল তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।

দিন-দুনিয়ায় আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,
করছে অসুর হক্-কে না-হক, হক-তায়ালায় হেলা!
রক্ষ-সেনার লক্ষ আঘাত বক্ষে বড়ই বেঁধে,
রক্ষা করো, রক্ষা করো, উঠতেছে দেশ কেঁদে।
নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহীদ হবে মরে,
চরণ-তলে দলবে মরণ ভয়কে হরণ করে—
ওরে জয়কে বরণ করে—
নেই কি এমন সত্য-পুরুষ মাতৃ-সেবক ওরে?
কাঁপল সে স্বর মৃত্যু-কাতর আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে,
বাজ পড়েছে বাজ পড়েছে ভারত-মাতার নীড়ে।

দানব দলে শান্তি আনে নাই কি এমন ছেলে?—
এ কি দেখি গান গেয়ে ঐ অরুণ আঁখি মেলে
পাবক-শিখা হস্তে ধরে কে বাছা মোর এলে?—
'মাগো আমি সেবক তোমার! জয় হোক মা'র।'
হাঁকল তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে!
বিশ্ব-গ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও।
—কে আছ বীর এস!
'বন্দি থাকা হীন অপমান!' হাঁকবে যে বীর তরুণ,—
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।
হঠাৎ দেখি আসছে বিশাল মশাল হাতে ও কে?
'জয় সত্যম্' মন্ত্র-শিখা জ্বলছে উজল চোখে।
রাত্রিশেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে?—
'সেবক তোদের, ভাইরা আমার! —জয় হোক মা'র।'
হাঁকল তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে!

জাগৃহি

[তোটক ছন্দ]

'হর হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম'—
একি ঘন রণ-রোল ছায় চরাচর ব্যোম্!
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব হাঁক
ধু ধু দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ,
হানে কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ!

আজ ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ঐ ভাঙল আগল ওরে ভাঙল আগল !
বোলে অম্বুদ-ডম্বরু কম্বু বিষাণ,
নাচে থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগলা ঈশান !
দোলে হিন্দোল ভীম-তালে সৃষ্টি ধাতার,
বুকে বিশ্বপাতার বহে রক্ত-পাথার !
ঘোর নির্ঘোষে 'মার মার' দৈত্য, অসুর,
প্রেত, রক্ত-পিশাচ, রণ-দুর্মদ সুর।
করে ক্রন্দসী-ক্রন্দন অম্বর রোধ—
ত্রাহি ত্রাহি মহেশ হে সম্বর ক্রোধ !
সুত মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।
কাল- বৈশাখী ঝন্‌ঝারে সঙ্গে করি—
রণ- উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি !
উর- হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে খড়্গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা !
নিয়া রক্তপানের কি অগস্ত্য-তৃষা
নাচে ছিন্ন সে মস্তা মা, নাইকো দিশা !
'দে রে রক্ত দে রক্ত দে' রণে ক্রন্দন,
বুঝি থেমে যায় সৃষ্টির হৃৎ-স্পন্দন !
জ্বলে বৈশ্বানরের ধু ধু লক্ষ শিখা,
আজ বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টীকা !
শুধু অগ্নি-শিখা ধূ ধূ অগ্নি-শিখা,
শোভে করুণার ভালে লাল রক্ত-টিকা !
রণ- শ্রান্ত অসুর-সুর-যোদ্ধৃ-সেনা,
শুধু রক্ত-পাথার, শুধু রক্ত-ফেনা !
একি বিশ্ব-বিধ্বংসী নৃশংস খেলা,
কিছু নাই কিছু নাই প্রেত-পিশাচে মেলা।
আজ ঘরে ঘরে জ্বলে ধূ ধূ শ্মশান মশান—
হোক রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান !
আজি বন্ধ সবার পূতি-গন্ধে নিশাস,
বিষে বিশ্ব-নিসাড়, বহে জোর নাভি-শ্বাস !
দেহ ক্ষান্ত রণে, ফেল রঙ্গিণী বেশ,
খোলো রক্তাম্বর মাতা সম্বর কেশ !

এ তো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা !
আজ জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা !
তব চরণাবলুণ্ঠিত মহিষ-অসুর,
হলো ধ্বংস অসুর, লীন শক্তি পশুর।
তবে সম্বর রণ, হোক ক্ষান্ত রোদন—
হোক সত্য-বোধন আজ মুক্তি-বোধন :
এস শুদ্ধা মাতা এই কাল-শ্মশানে
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে !
জাগে জাগো মানব-মাতা দেবী নারী !
আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি-বারি !
এস কৈলাস হতে মাগো মানস-সরে,
নীল উৎপল দলে রাঙা আঁচল ভরে।
এসো কন্যা উমা, এসো গৌরী রূপে,—
বাজো শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে !
আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে,
ঐ শেফালি-তলে হের শেফালি-তলে।
ওড়ে এলোমেলো অঞ্চল আশ্বিন-বায়,
হানে চঞ্চল নীল চাওয়া আকাশের গায় !
ঘোষে হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী,—
এল হৈমবতী, এল গৌরী রানি।
বাজো মঙ্গল-শাঁখ, হোক শুভ-আরতি,
এল লক্ষ্মী-কমল, এল বাণী-ভারতী।
এল সুন্দর সৈনিক সুর কার্তিক,
এল সিদ্ধি-দাতা, হেরো হাসে চারিদিক !
ভরা ফুল-খুকি ফুল-হাসি শিউলির তল,
আজ চোখে আসে জল, শুধু চোখে আসে জল !
নিয়া মাতৃ-হিয়া নিয়া কল্যাণী-রূপ
এল শক্তি স্বাহা, বাজো শাঁখ, জ্বালো ধূপ !
ভাঁজো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী সুর,
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।
ওঠে কণ্ঠ ছাপি বাণী সত্য পরম—
বন্- দে মাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ !

তূর্য নিনাদ

[গান]

কোরাস {
(আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার,
আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকিব, — কে করে মুশকিল আসান তার?

মন্দির আজি বন্দির ঘানি,
নির্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,
সন্ধি-মহলে ফন্দির ফাঁদ, গভীর আন্ধি-অন্ধকার!
হাঁকিছে নকিব, —হে মহারুদ্র, চূর্ণ করো এ ভণ্ডাগার॥

রক্ত-মদের বিষ পান করি
আর্ত মানব; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্বাণ স্মরি!
ক্রন্দন-ঘন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার,—
হাঁকিছে নকিব, —অভয়-দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার॥

কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল-রাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি?
উরিবে কখন ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড়?
হাঁকিছে নকিব,—আনো ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত-ধার॥

কণ্ঠ ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে,
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘন মনোবেদনাতে।
দশভুজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশপ্রহরণ-ধারিণী মার—
হাঁকিছে নকিব, —'আবিরাবির্মএধি' হে নব যুগাবতার!

মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তাঁরে চেতন-মন্ত্র? কে গাহিবে জয় জীবনের জয়?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বলো বল-দর্পীর অহঙ্কার?—
হাঁকিছে নকিব, —সেদিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ-দ্বার॥

বোধন*

[গান]

১

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
কেঁদো না, দমো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারো সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখতে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ তো সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে॥

২

হয়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু, —বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ-শস্য !
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই ! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত !
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

৩

দুদিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ !
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে ;
কন্টক-ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

---

* হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্ গশতা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্‌আন গম্ মখোর' শীর্ষক গজলের ভাব-ছায়া।

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারী ভাই, তুফানে আমরা পরোয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধো বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দি, নিঃস্ব যদিও, আমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

উদ্বোধন

[গান]

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও!

অগ্নি-তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!
নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তড়িত-বহ্নি আগে
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব।

দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !
দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি,
বিনাশো জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ, দাও মুক্তি-গরব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে ;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদের দাঁড়াবার পুন দাও গৌরব—
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রেরো হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আনো আঘাত প্রচণ্ড আহব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

নির্বীর্য এ তেজঃ-সূর্যে
দীপ্ত করো হে বহ্নি-বীর্যে,
শৌর্য, ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব !
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও !

অভয়-মন্ত্র

[গান]

কোরাস —
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয় !
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয় !
বল, হউক গান্ধি বন্দি, মোদের সত্য বন্দি নয়।
বল, মাভৈ মাভৈ, পুরুষোত্তম জয়।
তুই নির্ভর কর আপনার 'পর,
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর !

ওরে যে যায় যাক সে, তুই শুধু বল 'আমার হয়নি লয় !'
বল 'আমি আছি', আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়।
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয়। ...

তুই চেয়ে দেখ ভাই আপনার মাঝে,
সেথা জাগ্রত ভগবান বাজে,
নিজ বিধাতারে মান, আকাশ গলিয়া ক্ষরিবে রে বরাভয় !
তোর বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারা-রুদ্ধ কি হয় ?
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ জয় সত্যের জয় ! ...

আজ বক্ষের তোর ক্ষীরোদ-সাগরে
অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে
শুধু লক্ষ্মীর ভোগ লক্ষ্য তাঁহার নয় কিছুতেই নয় !
তোর অচেতন চিতে জাগা রে চেতনা নারায়ণ চিন্ময়।
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয় ! ...

ঐ নির্যাতকের বন্দি-কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায় ?
ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয় !
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয় ! ...

ওরে সত্য যে চির-স্বয়ম্ প্রকাশ,
রোধিবে কি তারে কারাগার ফাঁস ?
ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন ? আছে তার আছে ক্ষয় !
সেই সত্য মোদের ভাগ্য-বিধাতা, যাঁর হাতে শুধু রয়।
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয় ! ...

যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি
তোদের পাত্র দিয়া গেল ভরি !
ঐ বদ্ধ মৃত্যু পারেনিকো তাঁরে পারেনি করিতে লয় !

তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজ শান্তিময় !
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয় ! ...

ওরে রুদ্র তখনি ক্ষুদ্রেরে গ্রাসে
আগেই যবে সে মরে থাকে ত্রাসে,
ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভর
ঐ শূদ্র-কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বাঁধা রয় ?
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয় ! ...

ঐ টুটে-ফেটে-পড়া লোহার শিকল,
ভগবানে বেঁধে করিবে বিকল ?
ঐ কারা ঐ বেড়ি কভু কি বিপুল বিধাতার ভার সয় ?
ওরে যে হয় বন্দি হতে দে, শক্তি-আত্মার আছে জয়।
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয় ! ...

ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী, ভয়-ভীত !
কেন হেন ঘন অবসাদ চিত ?
বল পর-বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয় ?
তুই আত্মাকে চিন, বল 'আমি আছি', 'সত্য আমার জয় !'
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল, মাভৈ মাভৈ, জয় সত্যের জয়।
বল, হউক গান্ধি বন্দি, মোদের সত্য বন্দি নয় !

আত্মশক্তি

[গান]

এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর !
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির।

তূরীয়ানন্দে ঘোষো সে আজ
'আমি আছি'—বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ-রাজ !
সেই স্বরাজ !
জাগ্রত করো নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর ;
আত্ম-ভিতু এ অচেতন-চিতে জাগো 'আমি'-স্বামী নাঙ্গা-শির ॥

এসো প্রবুদ্ধ, এসো মহান
শিশু-ভগবান জ্যোতিষ্মান।
আত্মজ্ঞান—
দৃপ্ত-প্রাণ !
জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে রাজিছে রুদ্র তেজ রবির !
উদয়-তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন 'আমি-আছি'-র !

করহ শক্তি-সুপ্ত-মন
রুদ্র বেদনে উদ্বোধন,
হীন রোদন—
খিন্ন-জন
দেখুক আত্ম-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর !
বলো নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি শুদ্ধ ধীর !

কে করে কাহারে নির্যাতন
আত্ম-চেতন স্থির যখন ?
ঈর্ষা-রণ
ভীম-মাতন
পদাঘাত হানে পঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির।

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান্ ?—
আত্ম-জ্ঞান !

গাহ উদগাতা ঋত্বিক গান অগ্নি–মন্ত্র শক্তি–শ্রীর।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারো বাণীর !

এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি–বুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য–কৃপাণ বিজলি–ঝলক ন্যায়–অসির ৷৷

মরণ–বরণ

[গান]

এস এস এস ওগো মরণ !
এই মরণ–ভীতু মানুষ–মেষের ভয় করো গো হরণ ৷৷

না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ–করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে;
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন–ভরা চরণ ৷৷

দীপক রাগে বাজাও জীবন–বাঁশি,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি।
কাঁধে পিঠে কাঁদে যেথা শিকল–জুতোর ছাপ,
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ !
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নাম–করণ ৷৷

হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে,—
মেষগুলোকে শেষ করে দেশ—চিতার বুকে নাচো !
শব করে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছো।
মরায় ভরা ধরায়, মরণ ! তুমিই শুধু বাঁচো—
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ ৷৷

জ্ঞান-বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া,
নাশ করো ঐ ভীরুর কায়া ছায়া !
মুক্তি-দাতা মরণ ! এসো কাল-বোশেখির বেশে ;
মরার আগেই মরল যারা, নাও তাদের এসে !
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা-মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ ॥

বন্দিবন্দনা

[গান]

আজি রক্ত নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দি-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে ॥

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য-জ্যোতি-শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্টে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিংশ কোটি ঐ
মানব-কল্লোলে ॥

ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কারে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দি গেয়ে চলে,
বন্দিশালা মাঝে ঝন্‌ঝা পশেছে রে
উতল কলরোলে ॥

আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যথা বন্দি-কারা, সেথা
কেন রে কারা-ত্রাসে মরিবে বীর-দলে।
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে॥

আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কারা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ধু ধু ধু হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার-গলে
চলে রে বীর চলে;
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব—
রুদ্র-শিখা জ্বলে॥

কোরাস্:
জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তি-কামী জয়!
স্বাধীন-চিত জয়! জয় হে!!
জয় হে! জয় হে! জয় হে!

বন্দনা-গান

[গান]

কোরাস {
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি॥

তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে।
সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,
তাহাদেরি পথে চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ঐ বন্দি-বাস॥

শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব তাই।
জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ,
আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ ॥

শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সঙ্ঘ হে,
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে!
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান ॥

শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদের ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

মুক্তি-সেবকের গান

[গান]

ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!
তোদের কোন ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ান ছল-ছল?
ঐ কারা-ঘর তো নয় হারা-ঘর,
হোথাই মেলে মার-দেওয়া বর রে!
ওরে হোথাই মেলে বন্দিনী মার বুক-জুড়ানো কোল!
তবে কিসের রোদন-রোল?
তোরা মোছ রে আঁখির জল!
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!

আজ কারায় যারা, তাদের তরে
গৌরবে বুক উঠুক ভরে রে !
মোরা ওদের মতোই বেদ্‌না ব্যথা মৃত্যু আঘাত হেসে
বরণ যেন কর্‌তে পারি মাকে ভালবেসে।
ওরে স্বাধীনকে কে বাঁধতে পারে বল ?
ও ভাই মুক্তি–সেবক দল !

ও ভাই প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর
মরবে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর।
মোরা কাঁদব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কলজে–তল !
মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুর পশুর দল ?
মোরা কাঁদব যেদিন আসবে তারা আবার ফিরে রে,
কাঙালিনী মায়ের আমার এই আঙিনা–তল।
ও ভাই মুক্তি–সেবক দল॥

শিকল–পরার গান

এই শিকল–পরা ছল মোদের এ শিকল–পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দি হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন–ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন–ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল–বাঁধা পা নয় এ শিকল–ভাঙা কল॥

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস !
সেই ভয়–দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আনব মাভৈ–বিজয়–মন্ত্র বল–হীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ্ শাসন, জয় দেখিয়ে নয় ;
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয় !
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝন্ঝনা,
এ যে মুক্ত-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

মুক্ত-বন্দি

[গান]

বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডি-মুক্ত বন্দি-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দি-বীর !
জয় জয়ত বন্দি-বীর ॥

অগ্রে তোমার নিনাদে শঙ্খ, পশ্চাতে কাঁদে ছয়-বছর,
অম্বরে শোনো ডম্বরু বাজে—'অগ্রসর হও, অগ্রসর !'
কারাগার ভেদি নিশ্বাসে ওঠে বন্দিনী কোন ক্রন্দসীর,
ডান-আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম-আঁখে ঝরে অশ্রু-নীর !
বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডি-মুক্ত বন্দি-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর !
বন্দি তোমায় বন্দি-বীর !
জয় জয়ত বন্দি-বীর ॥

পথ-তরু-ছায় ডাকে 'আয় আয়' তব জননীর আর্ত স্বর,
এ আগুন-ঘরে কাঁপিল সহসা 'সপ্তদশ সে বৈশ্বনর'।
আগমনী তব রণ-দুন্দুভি বাজিছে বিজয়-ভৈরবীর,
জয় অবিনাশী উল্কা-পথিক চির-সৈনিক উচ্চ-শির !

বন্দি তোমায় ফন্দি–কারার গণ্ডি–মুক্ত বন্দি–বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়–দানবের ছয় বছরের জয়–প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দি–বীর !
জয় জয়ত বন্দি–বীর॥

রুদ্ধ–প্রতাপ হে যুদ্ধ–বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব তলে।
ভুলো না বন্ধু, দলেছ দানব যুগে যুগে তব পদ–তলে !
এ নহে বিদায়, পুন হবে দেখা অমর–সমর–সিন্ধু–তীর,
এস বীর এস, ললাটে এঁকে দি অশ্রু–তপ্ত লাল রুধির !
বন্দি তোমায় ফন্দি–কারার গণ্ডি–মুক্ত বন্দি–বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়–দানবের ছয় বছরের জয়–প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দি–বীর !
জয় জয়ত বন্দি–বীর॥*

যুগান্তরের গান

[গান]

১

বলো ভাই মাভৈ মাভৈ,
নবযুগ ঐ এল ঐ
এল ঐ রক্ত–যুগান্তর রে।
বলো জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব–বরাভয়
শোন অভয় ঐ রথ–ঘর্ঘর রে॥
রে বধির ! শোন্ পেতে কান
ওঠে ঐ কোন মহা–গান
হাঁকছে বিষাণ ডাকছে ভগবান রে।

* জনৈক অগ্নি–সৈনিকের ছয় বছর কারা–ভোগের পর মুক্তি–উপলক্ষে অভিনন্দন–গীতি।

জগতে লাগল সাড়া
জেগে ওঠ্ উঠে দাঁড়া
ভাঙ্ পাহারা মায়ার কারা-ঘর রে।
যা আছে যাক না চুলায়
নেমে পড় পথের ধুলায়
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে॥
সে ঝড়ের ঝাপটা লেগে
ভীম আবেগে উঠনু জেগে
পাষাণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে।
ভুলেছি পর ও আপন
ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।
যারা ভাই বদ্ধ কূয়ায়
খেয়ে মার জীবন গোঁয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে॥

২

ঝড়ের ঝাঁটার ঝাণ্ডা নেড়ে
মাভৈঃ-বাণীর ডঙ্কা মেরে
শঙ্কা ছেড়ে হাঁক প্রলয়ঙ্কর রে।
তোদের ঐ চরণ-চাপে
যেন ভাই মরণ কাঁপে,
মিথ্যা পাপের কণ্ঠ চেপে ধর রে।
শোনা তোর বুক-ভরা গান,
জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ,
দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে॥

৩

মোরা ভাই বাউল চারণ,
মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,

অ-বিনাশী নাইকো মোদের ডর রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা-প্রাণ উট্‌কে দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে॥

৪

খুঁড়ব কবর তুড়ব শ্মশান
মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ
আনব বিধান নিদান কালের বর রে।
শুধু এই ভরসা রাখিস
মরিসনি ভির্মি গেছিস
ঐ শুনেছিস ভারত-বিধির স্বর রে।
ধর হাত ওঠ রে আবার
দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মার মূর্তি মনোহর রে॥

চরকার গান

ঘোর—
ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর॥

১

তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে আসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর॥

২

ঘর ঘর তুই ঘোর রে জোর
ঘর্ঘরঘর ঘূর্ণি তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
তোর ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর॥

৩

তুই ভারত-বিধির দান,
এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার ঘরের লক্ষ্মী আসবে ঘরে শুনে তোর ঐ গান।
আর লুটতে নারবে সিন্ধু-ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোড়॥

৪

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,
তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে
রচলি চক্রে তোর,
তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
আবার তোর মহিমায় বুঝল দুভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়॥

৫

ভারত বস্ত্র-হীন যখন
কেঁদে ডাকল—নারায়ণ!
তুমি লজ্জা-হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হরতে পারল না দুঃশাসন-চোর॥

৬

এই সুদর্শন-চক্রে তোর
অত্যাচারীর টুটল জোর রে ছুটল সব গুমোর
তুই ঘোব ঘোর ঘোর।
তুই জোর জুলুমের দশম গ্রহ, বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর॥

৭

হয়ে অন্ন বস্ত্র হীন
আর ধর্মে কর্মে ক্ষীণ
দেশ ডুবছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন আনলে অন্ন পণ্য–সুধা, খুললে স্বর্গ মুক্তি–দোর।।

৮

শাসতে জুলুম নাশতে জোর
খদ্দর–বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য–ডোর,
তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
মোরা ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে দেখি চলছে চরকা, রাত্রি ভোর।।

৯

তুই সাত রাজারই ধন,
দেশ– মা'র পরশ–রতন,
তোর স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম্য মোক্ষ মন।
তুই মায়ের আশিস, মাথার মানিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রু–লোর।।

জাতের বজ্জাতি

[গান]

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত–জালিয়াৎ খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।।

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাই তো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশো–খান !
এখন দেখিস ভারত–জোড়া

পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ৷৷

জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্মসম সহন-শীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁওয়াছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।
যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া ৷৷

দিন-কানা সব দেখতে পাসনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,
কেমন করে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জাঁতা-কলে।
(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য ত্যাজি নিলি বাতি,
(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া ৷৷

মনু ঋষি অণুসমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝলি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস শির।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিনলিনে তা চিনির বলদ, সার হলো তাই শাস্ত্র বওয়া ৷৷

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম-পর।
(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা করে
স্রষ্টায় পূজিস জীবন ভরে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভি দোওয়া ৷৷

বলতে পারিস বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া ৷৷

ভগবানের ফৌজদারি-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার,
(তোর) পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেথা ভাই একাক্কার।

জাত সে শিকেয় তোলা রবে,
কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
(তা'পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিংবা স্বর্গে খোওয়া॥

(এই) আচার বিচার বড় করে প্রাণ-দেবতায় ক্ষুদ্র ভাবা,
(বাবা) এই পাপেই আজ উঠতে বসতে সিঙ্গি-মামার খাচ্ছ থাবা !
(তাই) নাইকো অন্ন, নাইকো বস্ত্র,
নাইকো সম্মান, নাইকো অস্ত্র,
(এই) জাত-জুয়াড়ির ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া॥

সত্য-মন্ত্র

[গান]

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !
(এই) খোদার উপর খোদকারি তোর
মানবে না আর সর্বলোক
মানবে না আর সর্বলোক ! !

(তোর) ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,
নিবুক না রে, কিসের ভয় ?
আঁধারকে তোর কিসের ভয় ?
(ঐ) ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো,
ভবনটাই সে সত্য নয়।
ঘরটাই তোর সত্য নয়।
(ঐ) বাইরে জ্বলছে চন্দ্র সূর্য
নিত্য-কালের তাঁর আলোক।
বিধির বিধান সত্য হোক !

লোক-সমাজের শাসক রাজা,
(আর) রাজার শাসক মালিক যেই,
বিরাট যাঁহার সৃষ্টি এই,
তাঁর শাসনকে অগ্রে মান
তার বড় আর শাস্ত্র নেই,
তার বড় আর সত্য নেই!
সেই খোদা খোদ সহায় তোর,
ভয় কি? নিখিল মন্দ ক'ক্।
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

বিধির বিধান মানতে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল
বিশ্ব যদি কয় পাগল,
আছেন সত্য মাথার 'পর,—
বে-পরোয়া তুই সত্য বল্।
বুক ঠুকে তুই সত্য বল্!
(তখন) তোর পথেরই মশাল হয়ে
জ্বলবে বিধির রুদ্র-চোখ!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র
আজ আছে কাল নাইকো আশ,
কা'ল তারে কাল করবে গ্রাস।
হাতের খেলা সৃষ্টি যাঁর
তাঁর শুধু ভাই নাই বিনাশ,
স্রষ্টার সেই নাই বিনাশ!
সেই বিধাতার মাথায় করে
বিপুল গর্বে বক্ষ ঠোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!

সত্যতে নাই ধানাইপানাই,
সত্য যাহা সহজ তাই,
সত্য যাহা সহজ তাই ;
আপ্‌নি তাতে বিশ্বাস আসে,
আপনি তাতে শক্তি পাই,
সত্যতে জোর-জুলুম নাই।
সেই সে মহান্ সত্যকে মান্—
রইবে না আর দুঃখ-শোক।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক ! !

নানান মুনির নানান মত যে,
মানবি বল সে কার শাসন ?
কয় জনার বা রাখবি মন ?
এক সমাজকে মানলে করবে
আরেক সমাজ নির্বাসন,
চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন !
সকল পথের লক্ষ্য যিনি
চোখ পুরে নে তাঁর আলোক।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক ! !

সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর,
কর্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম-দুগ্ধে না রয় জল,
সত্যের জয় হবেই হবে,
আজ নয় কাল মিলবে ফল,
আজ নয় কাল মিলবে ফল।
(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়
চুষবে রক্ত মিথ্যা-জোঁক !
বিধি বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক ! !

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।
বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাই তো প্রাণ।
জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই,
জগন্নাথের সাম্য-লোক !
জগন্নাথের তীর্থ-লোক !
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক ! !

চিনেছিলেন খ্রিস্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহাম্মদ ও রাম—
মানুষ কী আর কী তার দাম।
(তাই) মানুষ যাদের করত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলেন স্থান
গান্ধি আবার গান সে গান।
(তোরা) মানব-শত্রু, তোদেরই হায়
ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ।
বিধির বিধান সত্য হোক !
বিধির বিধান সত্য হোক ! !

বিজয়-গান

[গান]

ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা
উড়লো আকাশ-পথে।
মাগো, তোমার রথ-আনা ঐ
রক্ত-সেনার রথে।।

ললাট-ভরা জয়ের টিকা,
অঙ্গে নাচে অগ্নি-শিখা,
রক্তে জ্বলে বহ্নি-লিখা—মা !
ঐ বাজে তোর বিজয়-ভেরি,
নাই দেরি আর নাই মা দেরি,
মুক্ত তোমার হতে ॥

আনো তোমার বরণ-ডালা, আনো তোমার শঙ্খ, নারী !
ঐ দ্বারে মার মুক্তি-সেনা, বিজয়-বাজা উঠছে তারি।

ওরে ভীরু ! ওরে মরা !
মরার ভয়ে যাসনি তোরা ;
তোদেরও আজ ডাকছি মোরা ভাই !
ঐ খোলে রে মুক্তি-তোরণ,
আজ একাকার জীবন-মরণ
মুক্ত এ ভারতে ॥

পাগল পথিক

[গান]

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আঙ্গিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায় ॥

অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এল রে করতে ছেদন ?
শিকল-দেবীর বেদির বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায় ॥

মরা মায়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী ভা'য়ে ভা'য়ে
বুক-ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আনল মরণ-পারের মায়ে।

পণ করেছে এবার সবাই,
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই!
মুক্তি সে তো নিজের প্রাণে, নাই ভিখারির প্রার্থনায়॥

শাশ্বত যে সত্য তারি ভুবন ভরে বাজল ভেরি,
অসত্য আজ নিজের বিষেই মরল ও তার নাইকো দেরি।

হিংসুকে নয়, মানুষ হয়ে
আয় রে, সময় যায় যে বয়ে।
মরার মতন মরতে, ওরে মরণ-ভিতু! কজন পায়॥

ইসরাফিলের শিঙা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,
প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।

পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দলে আয় পায় দলে আয়!
রোদন কিসের? —আজ যে বোধন!
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয়॥

ভূত-ভাগানোর গান

[বাউলের গান]

১

ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতারে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ নাচ্ বুঢ়টি নাচায় বাবা উঠতে বসতে শুতে!

ও ভূত যেই দেখেছে মন্দির তোর
নাই দেবতা নাচছে ইতর,
আর মন্ত্র শুধু দন্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জু'তো॥

২

ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা
আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে অমনি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে,
আজ ভূত-ভাগানোর মজা দেখায় বোম্‌-ভোলা বম্ভুতে !

৩

ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো
দেখে শুনে হলো ঝুনো,
তাই তুলো-ধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁথে,
ও ভূত নাচছে রে তোর নাকের ডগায় পারিসনে তুই ছুঁতে !

৪

আগে বোঝেনিকো তোদের ওঝা
তোরা গোঁজামিলের মন্ত্র-ভজা।
(শিখলি শুধু চক্ষু-বোঁজা)
শিখলি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে থুতে,
তাই আপনাকে তুই হেলা করে ডাকিস স্বর্গ-দূতে॥

৫

ওরে জীবন-হারা, ভূতে খাওয়া !
ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া
সে কি সোজা ? —ভূত কি ভাগে ফুস-মন্তর ফুঁতে ?
তোরা ফাঁকির কিন্তু এড়িয়ে—পড়বি কূল-হারা 'কিন্তু'তে !

৬

ওরে ভূত তো ভূত—ঐ মারের চোটে
ভূতের বাবা উধাও ছোটে !
ভূতের বাপ ঐ ভয়টাকে মার, ভূত যাবে তোর ছুটে।
তখন ভূতে-পাওয়া এই দেশই ফের ভরবে দেবতা দূতে॥

বিদ্রোহী বাণী

১

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল!
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক গুড় গুড়, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল॥

পেটে এক আর মুখে আরেক—এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম-দামি।
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হলি আপন ফাঁকির আফসোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোষে।
তাই হলি সব সেরেফ আজ
কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ,
সত্য কথা বলতে ডরাস, তোরা আবার করবি কাজ!
ফোঁপ্‌রা ঢেঁকির নেইকো লাজ!

ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রাম-ছাগল!
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল!
এবার তোরা সত্য বল॥

২

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!
'ভারত হবে ভারতবাসীর'—এই কথাটাও বলতে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়।

বল রে তোরা বল নবীন—
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ!
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,
চায় না এরা—হই স্বাধীন!
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ-ফরাজ ছল কেবল!
ফাঁকা প্রেমের ফুস-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল!
এবার তোরা সত্য বল!

৩

মহান-চেতা নেতার দলে তোল রে তরুণ তোদের না'য়,
ওঁরা মোদের দেব্‌তা, সবাই করব প্রণাম ওঁদের পায়।
জানিস তো ভাই শেষ বয়সে স্বতই সবার মরতে ভয়,
ঝড়-তুফানে তাঁদের দিয়ে নয় তরী পার করতে নয়।

জোয়ানরা হাল ধরবে তার
করবে তরী তুফান পার !
আল্লা বলে মাল্লা তরুণ ঐ তুফানে লাখ হাজার
প্রাণ দিয়ে ত্রাণ করবে মার !
সেদিন করিস এই নেতাদের ধ্বংস-শেষের সৃষ্টি কল।
ভয়-ভীরুতা থাকতে দেশের প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল !
এবার তোরা সত্য বল।।

৪

ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব
'ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়ো, পড়বে এস বেদান্ত !'
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত !
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সবক !
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দূলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল।
সেও ভি আচ্ছা, মরব পিয়ে মৃত্যু-শোণিত-এলকোহল !
এবার তোরা সত্য বল।।

৫

প্রেমিক ঠাকুর মন্দিরে যান, গাড়ুন সেথায় আস্তানা !
শবে শিবায় শিব কেশবের—তৌবা—তাঁদের রাস্তা না।
মৃতের সামিল এখন ওঁরা, পূজা ওঁদের জোরসে হোক,
ধর্মগুরুর গোর-সমাধি পূজে যেমন নিত্য লোক !

তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম !
মুক্তি-সেনা চায় হুকুম !
চাই না 'নেতা', চাই 'জেনারেল', প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধূম।
মানব-মেধের যজ্ঞধূম।
প্রাণ-আঙুরের নিঙড়ানো রস—সেই আমাদের শান্তি-জল।
সোনা-মানিক ভাইরা আমার ! আয় যাবি কে তরতে চল।
এবার তোরা সত্য বল॥

৬

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব ভিতু সেথাই বিদ্রোহ !
ধামা-ধরা ! জামা-ধরা ! মরণ-ভিতু ! চুপ রহো !
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ !
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি—মরব শেষ।
নরম গরম পচে গেছে, আমরা নবীন চরম দল !
ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিংবা পাতাল-তল !

অভিশাপ

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান !
মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান।

আদি ও অন্তহীন
আজ মনে পড়ে সেই দিন—
প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
আর চিৎকার করি কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ-স্বামী।
ভয়ে কালো হয়ে গেল আলো-মুখ তার।
ফরিয়াদ করি গুমরি উঠিল মহা-হাহাকার—
ছিন্ন-কণ্ঠে আর্ত কণ্ঠে তোমাদের ঐ ভীরু বিধাতার—
আর্তনাদের মহা-হাহাকার—

যে, 'বাঁচাও আমারে বাঁচাও হে মোর মহান বিপুল আমি !
হে মোর সৃষ্টি ! অভিশাপ মোর !
আজি হতে প্রভু তুমি হও মম স্বামী !'—
শুনি খল খল খল অট্ট হাসিনু, আজি সে হাসি বাজে
ঐ অগ্ন্যুদ্গার-উল্লাসে আর নিদাঘ-দগ্ধ
বিনা-মেঘের ঐ শুষ্ক বজ্র-মাঝে !

স্রষ্টার বুকে আমি সেই দিন প্রথম জাগানু ভীতি,—
সেই দিন হতে বাজিছে নিখিলে ব্যথা-ক্রন্দন গীতি !
জাপটি ধরিয়া বিধাতারে আজো পিষে মারি পলে পলে,
এই কালসাপ আমি, লোকে ভুল করে মোরে অভিশাপ বলে।

মুক্ত-পিঞ্জর

ভেদি দৈত্য-কারা
উদিলাম পুন আমি কারা-ত্রাস চির-মুক্ত বাধাবন্ধ-হারা।
উদ্দামের জ্যোতি-মুখরিত মহা-গগন-অঙ্গনে,—
হেরিনু, অনন্তলোক দাঁড়াল প্রণতি করি মুক্ত-বন্ধ আমার চরণে।
থেমে গেল ক্ষণেকের তরে বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার,
শুনিল কোথায় বাজে ছিন্ন শৃঙ্খলে কার আহত ঝঙ্কার।
কালের করাতে কার ক্ষয় হলো অক্ষয় শিকল,
শুনি আজি তারি আর্ত জয়ধ্বনি বিঘোষিল গগন পবন জল স্থল।
কোথা কার আঁখি হতে সরিল পাষাণ-যবনিকা
তারি আঁখি-দীপ্তি-শিখা রক্ত-রবি-রূপে হেরি ভরিল উদয়-ললাটিকা।
পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি,
জ্যোতির্লোক হতে ঝরা করুণা-ধারায়—ডুবে গেল ধরা-মা'র স্নেহ-শুষ্ক মাটি,
পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল—
বাহিরিল কোন বার্তা নিয়া পুন মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল !
দৈত্যাগার দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ রোষে হাঁকিল প্রহরী !
কাঁদিল পাষাণে পড়ি
সদ্য-ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল !

মুক্তি মার খেয়ে কাঁদে পাষাণ-প্রাসাদ-দ্বারে আহত অর্গল !
শুনিলাম—মম পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে
নিখিল বন্দির ব্যথা-শ্বাস—
মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।

ছুটে এসে লুটায়ে লুটায়ে যেন পড়ে মম পায়ে ;
বলে—'ওগো ঘরে-ফিরে মুক্তি-দূত !
একটুকু ঠাঁই কিগো হবে না ও ঘরে-নেওয়া নায়ে ?'
নয়ন নিঙাড়ি এল জল,
মুখে বলিলাম তবু—'বন্ধু ! আর দেরি নাই, যাবে রসাতল
পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা ঐ দৈত্যাগার,
আসে কাল, রক্ত-অশ্বে চড়ি হের দুরন্ত দুর্বার !'—
বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখি
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্ত ধ্বনি হাঁকি—
উড়িবার চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,
অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে।
মা আমার ! মা আমার ! এ কি হলো হায় !
কে আমারে টানে মা গো উচ্চ হতে ধরার ধুলায় ?
মরেছে মা বন্ধ-হারা বহ্নি-গর্ভ তোমার চঞ্চল,
চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।
মা ! তোমার হরিণ-শিশুরে
বিষাক্ত সাপিনী কোন টানিছে নয়ন-টানে কোথা কোন দূরে !
আজ তব নীল-কণ্ঠ পাখি গীত-হারা
হাসি তার ব্যথা-ম্লান, গতি তার ছন্দ-হীন, বদ্ধ তার ঝর্না-প্রাণ-ধারা !
বুঝি নাই রক্ষী-ঘেরা রাক্ষস-দেউলে
এল কবে মরু-মায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম-মূলে !
চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল—
কোন চপলার কেশ-জাল
কখন জড়াতেছিল গতি-মত্ত আমার চরণে,
লৌহ-বেড়ি যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণ-বন্ধনে !
আজ যবে পলে পলে দিন-গণা পথ-চাওয়া পথ
বলে—'বন্ধু, এই মোর বুক পাতা, আনো তব রক্ত-পথ-রথ—'
শুনে শুধু চোখে আসে জল,
কেমনে বলিব, বন্ধু ! আজও মোর ছিঁড়েনি শিকল !

হারায়ে এসেছি সখা শক্রর শিবিরে
প্রাণ–স্পর্শমণি মোর,
রিক্ত–কর আসিয়াছি ফিরে !'...
যখন আছিনু বদ্ধ রুদ্ধ দুয়ার কারাবাসে
কত না আহ্বান–বাণী শুনিতাম লতা–পুষ্প–ঘাসে !
জ্যোতির্লোক মহাসভা গগন–অঙ্গন
জানাত কিরণ–সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ !
নাম–নাহি–জানা কত পাখি
বাহিরের আনন্দ–সভায়—সুরে সুরে যেত মোরে ডাকি।
শুনি তাহা চোখ ফেটে উছলাত জল—
ভাবিতাম, কবে মোর টুটিবে শৃঙ্খল,
কবে আমি ঐ পাখি–সনে
গাব গান, শুনিব ফুলের ভাষা
অলি হয়ে চাঁপা–ফুল বনে।
পথে যেত অচেনা পথিক,
নিরুদ্ধ গবাক্ষ হতে রহিতাম মেলি আমি তৃষ্ণাতুর আঁখি নির্নিমিখ !
তাহাদের ঐ পথ–চলা
আমার পরানে যেন ঢালিত কি অভিনব সুর–সুধা–গলা !
পথ–চলা পথিকের পায়ে পায়ে লুটাত এ মন,
মনে হতো, চিৎকারিয়া কেঁদে কই—
'হে পথিক, মোরে দাও ঐ তব বাধা–মুক্ত অলস চরণ !
দাও তব পথ–চলা পা'র মুক্তি–ছোঁওয়া,
গলে যাক এ পাষাণ, টুটে যাক ও–পরশে এ কঠিন–লোহা !'
সন্ধ্যাবেলা দূরে বাতায়নে
জ্বলিত অচেনা দীপখানি,
ছায়া তার পড়িত এ বন্ধন–কাতর দুনয়নে !
ডাকিতাম, 'কে তুমি অচেনা বধূ কার গৃহ–আলো ?
কারে ডাকো দীপ–ইশারায় ?
কার আশে নিতি নিতি এত দীপ জ্বালো ?
ওগো, তব ঐ দীপ সনে
ভেসে আসে দুটি আঁখি–দীপ কার এ রুদ্ধ প্রাঙ্গণে !'—
এমনি সে কত মধু–কথা
ভরিত আমার বদ্ধ নিজন ঘরের নীরবতা।
ওগো, বাহিরিয়া আমি হায় একি হেরি—
ভাঙা–কারা–বাহু মেলি আছে মোর সারা বিশ্ব ঘেরি।

পরাধীনা অনাথিনী জননী আমার—
খুলিল না দ্বার তাঁর,
বুকে তাঁর তেমনি পাষাণ,
পথ-তরু-ছায় কেহ 'আয় আয় জাদু' বলি জুড়াল না প্রাণ!

ভেবেছিনু ভাঙিলাম রাক্ষস-দেউল
আজ দেখি সে দেউল জুড়ে আছে সারা মর্ম-মূল!
ওগো, আমি চির-বন্দি আজ,
মুক্তি নাই, মুক্তি নাই,
মম মুক্তি নত-শির আজ নত-লাজ!
আজ আমি অশ্রু-হারা পাষাণ-প্রাণের কূলে কাঁদি—
কখন জাগাবে এসে সাথী মোর ঘূর্ণি-হাওয়া রক্ত-অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল-আঁধি!
বন্ধু! আজ সকলের কাছে ক্ষমা চাই—
শত্রুপুরী-মুক্ত আমি আপন পাষাণ-পুরে আজি বন্দি ভাই!

ঝড়

[পশ্চিম-তরঙ্গ]

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—ক্কড়ক্কড় ক্কড়—
কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে
প্রাচীর অলক্ষ্য পথ-পানে।
মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ-সন্ধানে!
জন্মিয়াই হেরিনু, মোরে ঘিরি—ক্ষিতির অক্ষৌহিনী সেনা
প্রণমি বন্দিল—'প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,
মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস—
প্রলয়-তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারি সর্বনাশ!'

বাজিল আকাশ-ঘণ্টা, বসুধা-কাঁসর ;
মার্তণ্ডের ধূপদানি—মেঘ-বাষ্প-ধূমে-ধূমে ভরাল অম্বর !
উল্কার হাউই ছোটে, গ্রহ উপগ্রহ হতে ঘোষিল মঙ্গল ;
মহাসিন্ধু-শঙ্খে বাজে অভিশাপ-আগমনী কলকল কল্ কলকল কল্ কলকল কল্ !
'জয় হে ভয়ঙ্কর, জয় প্রলয়ঙ্কর' নির্ঘোষি ভয়াল
বন্দিল ত্রিকাল-ঋষি।
ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি আশিস দানিল মহাকাল।
উল্লম্ফিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি বাহু,
আমি নব রাহু !

হেরিলাম সেবা-রতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন-ভয়ে মোর
প্রস্তর-শিখার সম নিশ্চল নিশ্চুপ।
অনুমানি যেন কোন্ সর্বনাশা অমঙ্গল ভয়
জাগি আছ শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানমগ্না মাতা, শ্বাস নাহি বয়।
মনে হলো ঐ বুঝি হারা-মাতা মোর ! মৌনা ঐ জননীর
শুভ্র শান্ত কোলে
—প্রহ্লাদকুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম 'মা আমার' বলে।
নাহি জানি কোন ফণি-মনসার হলাহল-লোকে—
কোন বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে—
নাগ-মাতা, কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্র-ফণা নাগ,
ভীষণ তক্ষক-শিশু ! কোথা হয় নাগ-নাশী জন্মেজয় যাগ—
উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন গুণী—
জন্মান্তর-পার হতে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি।
মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ,
আমার তূরীয় গতি—সে যে ঐ অনাদি উদয় হতে
হিংসা-সর্প-যজ্ঞ-মন্ত্র-টান !
ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—
সহসা কে তুমি এলে হে মর্ত-ইন্দ্রাণী মাতা,
তব ঐ ধূলি-আস্তরণ
বিছায়ে আমার তরে জাতকের জন্মান্তর হতে ?
লুকানু ও-অঞ্চল-আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোর মৃত্যু-পথে !

ব্যর্থ হলো অঞ্চল-আড়াল ; বহ্নি-আকর্ষণ
মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ
রক্তে রক্তে বাজে মোর—শনশন শন্
শন্—শন্—ঐ শুন দূর
দূরান্তর হতে মাগো ডাকে মোরে অগ্নি-ঋষি বিষ-হরী সুর !

জননী গো চলিলাম অনন্ত চঞ্চল,
বিষে তব নীল হলো দেহ, বৃথা মাগো দাব-দাহে পুড়ালে অঞ্চল !
ছুটে চলি মহা-নাগ, রক্তে মোর শুনি আকর্ষণী,
মমতা-জননী
দাহে মোর পড়িল মুরছি ;
আমি চলি প্রলয়-পথিক—দিকে দিকে মারী-মরু রচি।

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—ক্কড়ক্কড় ক্কড়—
কোলাহল-কল্লোলের হিল্লোল—হিন্দোল—
দুরন্ত দোলায় চড়ি—'দে দোল্ দে দোল্'
উল্লাসে হাঁকিয়া বলি, তালি দিয়া মেঘে
উন্মাদ উন্মাদ ঘোর তুফানিয়া বেগে !
ছুটে চলি ঝড়—গৃহ-হারা শান্তি-হারা বন্ধ-হারা ঝড়—
স্বেচ্ছাচার-ছন্দে নাচি। ক্কড়ক্কড় ক্কড়
কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে ঘোর বজ্র-গিটকিরি !
মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা-পিচকিরি !
উড়ে সুখ-নীড়, পড়ে ছায়া-তরু, নড়ে ভিত্তি রাজ-প্রাসাদের,
তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।
আমি ছুটি অশান্ত-লোকের
প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি।
লোকে লোকে পড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কানাকানি !

ঝড়—ঝড়—উড়ে চলি ঝড় মহাবায়-পক্ষীরাজে চড়ি,
পড়ো-পড়ো আকাশের ঝোলা শামিয়ানা
মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি !
প্রমত্ত সাগর-বারি—অশ্ব মম তুফানির খর ক্ষুর-বেগে
আন্দোলি আন্দোলি ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার !

আমি যেন সাপুড়িয়া, মারি মন্ত্র–মোর—
ঢেউ এর মোচড়ে তাই মহাসিন্ধু–মুখে
জল–নাগ–নাগিনীরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুঁকে !
প্রিয়া মোর ঘূর্ণিবায়ু বেদুইন–বালা
চূর্ণি চলে ঝন্‌ঝা–চুর মম আগে আগে।
ঝর্না–ঝোরা তটিনীর নটিনী–নাচন–সুখ লাগে
শুষ্ক খড়কুটো ধূলি শীত–শীর্ষ বিদায়–পাতায়
ফাল্গুনী–পরশে তার।—আমার ধমকে নুয়ে যায়
বনস্পতি মহা মহীরুহ, শাল্মলী, পুন্নাগ দেওদার,
ধরি যবে তার
ঝাপটি পল্লব–ঝুঁটি, শাখা–শির ধরে দিই নাড়া ;
গুমরি কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,
চড়্‌চড়্‌ করে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির–দাঁড়া !

প্রিয়া মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে আগে চলে ;
পাগলিনী কেশে ধূলি চোখে তার মায়া–মণি ঝলে।
ঘাগরির ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি–ধাঁধা লাগায় নয়নালোকে মোর।
ঘূর্ণিবালা হাসির হর্‌রা হানি বলে—'মনোচোর !
ধরো তো আমারে দেখি'—
ত্রস্ত–বাস হাওয়া–পরি, বেণী তার দুলে ওঠে সুকঠিন মম ভালে ঠেকি।
পাগলিনী মুঠি মুঠি ছুঁড়ে মারে রাঙা পথ–ধূলি,
হানে গায় ঝর্না–কুলুকুচু, পদ্ম–বনে আলুথালু খোঁপা পড়ে খুলি !
আমি ধাই পিছে তার দুরন্ত উল্লাসে ;
লুকায় আলোর বিশ্ব চন্দ্র সূর্য তারা পদভর–ত্রাসে !
দীর্ঘ রাজপথ–অজগর সঙ্কুচিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে !
ধরণী–কূর্মপৃষ্ঠ দীর্ণ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে !
পশ্চাতে ছুটিয়া আসে মেঘ–ঐরাবত–সেনাদল
গজগতি–দোলা–ছন্দে ; স্বর্গে বাজে বাদল–মাদল !
সপ্ত সাগর শোষি শুণ্ডে শুণ্ডে তারা—
উপুড় ধরণী–পৃষ্ঠে উগারে নিযুত লক্ষ বারি–তীর–ধারা !
বয়ে যায় ধরা–ক্ষত–রসে
সহস্র পঙ্কিল স্রোত–ধার !
চণ্ডবৃষ্টি–প্রপাত–ধারা–ফুলে
বরষার বুকে ঝলে জল–মালা–হার।

আমি ঝড়, হুল্লোড়ের সেনাপতি ; খেলি মৃত্যু-খেলা
ঘূর্ণনিয়া প্রিয়া-সাথে। দুর্যোগের হুলাহুলি মেলা
ধায় মম অশ্রান্ত পশ্চাতে !
মম প্রাণ-রঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু-মুহু মাতে !
শ্যাম স্বর্ণ পত্রে পুষ্পে কাঁপে তার অনন্ত কলাপ।—
দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-জ্বলন্ত-প্রলাপ
ভূমিকম্প-জরজর থরথর ধরিত্রীর মুখে !
বাসুকি-মন্দার সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধু-তট ভরে ফেনা-থুকে।
জেগে ওঠে মম সেই সৃষ্টি-সিন্ধু-মন্থন-ব্যথায়
রবি শশী তারকার অনন্ত বুদ্‌বুদ্ ; —উঠে ভেঙে যায়
কত সৃষ্টি কত বিশ্ব আমার আনন্দ-গতি পথে।
শিবের সুন্দর ধ্রুব-আঁখি
যমের আরক্ত ঘোর মশাল-নয়ন—দীপ মম রথে।

জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত 'মিকাইলের' আতশি-পাখায়।
অনন্ত-বন্ধন-নাগ-শিরস্ত্রাণ শোভে শিরে ! শিখী-চূড়া তায়
শনির অশনি ঐ ধূমকেতু-শিখা,
পশ্চাতে দুলিছে মোর অনন্ত আঁধার চিররাত্রি-যবনিকা !
জটা মোর নীহারিকাপুঞ্জ-ধূম পাটল পিঙ্গাশ,
বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিষ্কাশ !

ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
ক্কড়ক্কড় ক্কড়—
বজ্র-বায়ু দন্তে-দন্তে ঘর্ষি চলি ক্রোধে !
ধূলি-রক্ত বাহু মম বিন্ধ্যাচল সম রবি-রশ্মি-পথ রোধে।
ঝন্‌ঝনা-ঝাপটে মম
ভীত কূর্ম সম
সহসা সৃষ্টির খোলে নিয়তি লুকায়।
আমি ঝড়, জুলুমের জিঞ্জির-মঞ্জীর বাজে ত্রস্ত মম পায় !
ধাক্কার ধমকে মম খানখান নিষিদ্ধের নিরুদ্ধ দুয়ার,
সাগরে বাড়ব লাগে, মড়ক দুয়ার্কি ধরে আমার ধুয়ার !
কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডম্বরু ডিণ্ডিম্
ড্রিম্ ড্রিম্ ড্রিম্ !
অম্বর-ডঙ্কার ডামাডোল
সৃজনের বুকে আনে অশ্রু-বন্যা ব্যথা-উতরোল।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত মম দুর্বাসার হিংসা ক্রোধ শাপ।
ভীমা উগ্রচণ্ডা ফেলে উল্কারূপী অগ্নি-অশ্রু, সহিতে না পারি মম তাপ !
আমি ঝড়, পদতলে 'আতঙ্ক'-কুঞ্জর, হস্তে মোর 'মাভৈ'-অঙ্কুশ।
আমি বলি, ছুটে চল প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে,—
হে নবীন পরুষ পুরুষ !
স্কন্ধে তোল উদ্ধত বিদ্রোহ-ধ্বজা, কণ্টক-অশঙ্ক রে নির্ভীক !
পুরুষ ক্রন্দন-জয়ী, —দুঃখ দেখে দুঃখ পায়—ধিক্ তারে ধিক্ !
আমি বলি, বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেল লুফোলুফি খেলা !
বীর নিক্ বিপ্লবের লাল-ঘোড়া,
ভীরু নিক পারে-ধাওয়া পলায়ন-ভেলা !
আমি বলি, প্রাণানন্দে পিয়ে নে রে বীর,
জীবন-রসনা দিয়া প্রাণ ভরে মৃত্যু-ঘন ক্ষীর !
আমি বলি, নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুণ্ড সূর্যের হাম্মামে।
রৌদ্রের-চন্দন-শুচি, উঠে বস গগনের বিপুল তাঞ্জামে !
আমি ঝড় মহাশক্র স্বস্তি-শান্তি-শ্রীর,
আমি বলি, শ্মশান-সুষুপ্তি শান্তি—
জয়নাদ আমি অশান্তির।

পশ্চিম হইতে পূবে ঝন্‌ঝনা-ঝাঁঝর
ঝন্‌ঝা-জগঝম্প ঘোর—বাজায়ে চলেছি ঝড়—
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন্
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ ঝনন্ ঝনন্ শন্
শনশনশন্
হুহু হুহু হুহু—
সহসা কম্পিত-কণ্ঠ-ক্রন্দন শুনি কার—'উহু ! উহু উহু উহু !'
সজল কাজল-পক্ষ্ম কে সিক্ত-বসনা একা ভিজে—
বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিজে।
নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে চোখের কাজল,
মলিন করেছে তার কালো আঁখি-তারা
বায়ে-ওড়া কেতকীর পীত পরিমল !
এ কোন্ শ্যামলী পরি পুবের পরিস্থানে কেঁদে কেঁদে যায়—
নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায় !

জেগেছে বালার বুকে এক বুক ব্যথা আর কথা,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে,

ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা !
কদম্ব তমাল তাল পিয়াল-তলায়
দূর্বাদল-মখমলে শ্যামলী-আল্‌তা তার মুছে মুছে যায় !
বাঁধে বেণী কেয়া-কাঁটা-বনে।
বিদেশিনী দেয়াশিনী একমনে দেয়া-ডাক শোনে।
দাদুরির আদুরি কাজরি
শোনে আর আঁখি-মেঘ-কাজল গড়ায়ে
দুখ-বারি পড়ে ঝরঝরি।
ঝিম্‌ ঝিম্‌ রিম্‌ ঝিম্‌—রিমিরিমি রিম ঝিম্‌
বাজে পাঁইজোর—
কে তুমি পূরবী বালা ? আর যেন নাহি পাই জোর
চলা-পায়ে মোর, ও-বাজা আমারো বুকে বাজে।
ঝিল্লির ঝিমানি-ঝিনিঝিনি
শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে !

আমি ঝড় ? ঝড় আমি ? —না, না, আমি বাদলের বায় !
বন্ধু ! ঝড় নাই
কোথায় ?
ঝড় কোথা ? কই ?—

বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ—
ঐ শোনো, শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে !—
না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে,
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর ! তুমি থেকো জেগে !
তুমি রক্ষী এ রক্ত-অশ্বের,
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা !—শুন শুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের—
পুবের হাওয়ায়—।
যায়—যায়—সব ভেসে যায়—
পুবের হাওয়ায়—
হায় !—

মিকাইল—স্বর্গীয় দূত, ইনি ঝড়-বৃষ্টির নিয়ন্তা। 'নার'—অগ্নি।

ভাঙার গান

মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে

ভাঙার গান

[গান]

১

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী !
ওরে ও তরুণ ঈশান !
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ !
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।

২

গাজনের বাজনা বাজা !
কে মালিক ? কে সে রাজা ?
কে দেয় সাজা
মুক্ত-স্বাধীন সত্যকে রে ?
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসি ?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে ?

৩

ওরে ও পাগলা ভোলা !
দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদগুলা
জোরসে ধরে হেঁচকা টানে !

মার হাঁক হায়দরি হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক
মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে !

৪

নাচে ঐ কাল-বোশেখি,
কাটাবি কাল বসে কি ?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি !
লাথি মার, ভাঙ রে তালা !
যত সব বন্দি-শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।

জাগরণী

কোরাস্ :—
ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও !
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও !
জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো,
জাগো রে ! জাগো রে !

১

মুক্ত করিতে বন্দিনী মা'য়
কোটি বীরসুত ঐ হেরো ধায়
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার-পানে—
কার টানে ?

দ্বার খোলো দ্বার খোলো !
একবার ভুলে ফিরিয়া চাও !

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

২

জননী আমার ফিরিয়া চাও !
ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও !
চাই মানবতা, তাই দ্বারে
কর হানি মা গো বারেবারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও !
পুরুষ-সিংহ জাগো রে !
সত্যমানব জাগো রে।
বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা হও
সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও !

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

৩

লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার,
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত
জেনেছে সত্য-হত্যা সার।
অত্যাচার ! অত্যাচার ! !
ত্রিশ কোটি নর-আত্মার যারা অপমান হেলা
করেছে রে
শৃঙ্খল গলে দিয়েছে মা'র—
সেই আজ ভগবান তোমার !
অত্যাচার ! অত্যাচার ! !
ছি-ছি-ছি ছি-ছি-ছি নাই কি লাজ—
নাই কি আত্মসম্মান ওরে নাই জাগ্রত
ভগবান কি রে
আমাদেরো এই বক্ষোমাঝ ?

অপমান বড় অপমান ভাই
মিথ্যার যদি মহিমা গাও !

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

৪

আল্লায় ওরে হকতা'লায়
পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়,
আজাদ-মুক্ত আত্মারে যারা শিখায়ে ভীরুতা
করেছে দাস—
সেই আজ ভগবান তোমার !
সেই আজ ভগবান তোমার !
সর্বনাশ ! সর্বনাশ !
ছি-ছি নির্জীব পুরবাসী আর খুলো না দ্বার !
জননী গো ! জননী গো !
কার তরে জ্বালো উৎসব-দীপ ?
দীপ নেবাও ! দীপ নেবাও ! !
মঙ্গল-ঘট ভেঙে ফেলো,
সব গেল মা গো সব গেল !
অন্ধকার ! অন্ধকার !
ঢাকুক এ মুখ অন্ধকার !
দীপ নেবাও ! দীপ নেবাও।

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

৫

ছি ছি ছি ছি
এ কি দেখি
গাহিস তাদেরি বন্দনা-গান,
দাস সম নিস হাত পেতে দান !
ছি-ছি-ছি ছি-ছি-ছি
ওরে তরুণ ওরে অরুণ !

নরসুত তুমি দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন
মুছিয়া দাও !
ভাঙিয়া দাও,
এ-কারা এ-বেড়ি ভাঙিয়া দাও !

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

৬

পরাধীন বলে নাই তোমাদের
সত্য-তেজের নিষ্ঠা কি !
অপমান সয়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ছি ?
মরি লাজে, লাজে মরি !
এক হাতে তোরে 'পয়জার' মারে
আর হাতে ক্ষীর সর ধরি !
অপমান সে যে অপমান !
জাগো জাগো ওরে হতমান !
কেটে ফেলো লোভী লুব্ধ রসনা,
আঁধারে এ হীন মুখ লুকাও !

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

৭

ঘরের বাহির হয়ো না আর,
ঝেড়ে ফেলো হীন বোঝার ভার,
কাপুরুষ হীন মানবের মুখ
ঢাকুক লজ্জা অন্ধকার।
পরিহাস ভাই পরিহাস সে যে,
পরাজিতে দিতে মনোব্যথা—যদি
জয়ী আসে রাজ-রাজ সেজে।
পরিহাস এ যে নির্দয় পরিহাস !
ওরে কোথা যাস
বল কোথা যাস ছি ছি
পরিয়া ভীরুর দীন বাস ?

অপমান এত সহিবার আগে
হে ক্লীব, হে জড়, মরিয়া যাও!

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

৮

পুরুষসিংহ জাগো রে!
নির্ভীক বীর জাগো রে!
দীপ জ্বালি কেন আপনারি হীন কালো অন্তর
কালামুখ হেন হেসে দেখাও!
নির্লজ্জ রে ফিরিয়া চাও!
আপনার পানে ফিরিয়া চাও!
অন্ধকার! অন্ধকার!
নিশ্বাস আজি বন্ধ মা'র
অপমানে নির্মম লাজে,
তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে—
দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!
আপনার পানে ফিরিয়া চাও!

কোরাস্ :— ভিক্ষা দাও ...

মিলন-গান

[গান]

ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান।
(সেদিন) দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান॥

(তোরা) স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।
(তাই) কলজে চুঁয়ে গলছে রক্ত দলছে পায়ে ডলছে কান॥

(যত) মাদি তোরা বাঁদি–বাচ্চা দাস–মহলের খাস গোলাম।
(হায়) মাকে খুঁজিস? চাকরানি সে, জেলখানাতে ভানছে ধান॥

(মা'র) বন্ধ ঘরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলো দুই নয়ান।
(তোরা) শুনতে পেয়েও শুনলিনে তা মাতৃহন্তা কুসন্তান॥

(ওরে) তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু–ডাকাত লুঠছে ধান।
(তাই) গোবর–গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান॥

(ছিলি) সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসা–যুদ্ধে আজকে এমনি ক্ষিণ্নপ্রাণ।
(তোদের) মুখের গ্রাস ঐ গিলছে শিয়াল তোমরা শুয়ে নিচ্ছ ঘ্রাণ॥

(তোরা) কলুর বলদ টানিস ঘানি গলদ কোথায় নাইকো জ্ঞান।
(শুধু) পড়ছ কেতাব, নিচ্ছ খেতাব, নিমক–হারাম বে–ঈমান॥

(তোরা) বাঁদর ডেকে মানলি সালিশ, ভাইকে দিতে ফাটল প্রাণ।
(এখন) সালিশ নিজেই 'খা ডালা সব' বোকা তোদের এই দেখান॥

(তোরা) পথের কুকুর দু'কান–কাটা মান–অপমান নাইকো জ্ঞান।
(তাই) যে জুতোতে মারছে গুঁতো করছ তাতেই তৈল দান॥

(তোরা) নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান।
(তোদের) কে যে ভাল কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান॥

(শুনি) আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার চেয়েও হীন তোদের প্রাণ।
(তাই) তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান॥

(তোদের) হাড় খেয়েছে, মাস খেয়েছে, (এখন) চামড়াতে দেয় হেঁচকা টান
(আজ) বিশ্ব–ভুবন ডুকরে ওঠে দেখে তোদের অসম্মান॥

(আজ) সাধে ভারত–বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান।
(তোরা) বিশ্বে যে তাঁর রাখিস নে ঠাঁই কানা গরুর ভিন্ বাথান॥

(তোরা) করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
(আজো) বুঝলি না হায় নাড়ি–ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান॥

(ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।
(তোরা) মেঘ–বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড়–তুফানের লাল নিশান॥

পূর্ণ-অভিনন্দন

[গান]*

এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র ! এস পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ !
ভেদ করি পুন বন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ !
এস অনাগত নব-প্রলয়ের মহা সেনাপতি মহামহিম !
এস অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

ছয়বার জয় করি কারা-ব্যূহ, রাজ-রাহু-গ্রাস-মুক্ত চাঁদ !
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের মুক্ত-বাঁধ।
নবগ্রহ ছিঁড়ি ফণি-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী !
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলি !
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার ! স্বাগত হে দেব-সেনাপতি !
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমরা ধ্বংস-মার
এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার !
এস অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারি !
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিপ, এস প্রতাপের হারা-তরবারি !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

---

* মাদারিপুর শান্তি-সেনা-বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি-উপলক্ষে রচিত।

ওগো অতীতের আজো–ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ !
না–আসা–দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ।
জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি–অন্তরীণ !
জয় যুগে–যুগে–আসা–সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি–অন্তহীন !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা–মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা–ভাগীরথীর !

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি মাটিতে কোল,
শ্যামল শস্যে হরিৎ ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম আঁচল।
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত–স্বরে কাঁদিছেন মাতা, 'কই রে আমার দুলাল কই?'
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা–মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা–ভাগীরথীর !

মোছো আঁখি–জল, এস বীর ! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি–ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া, হায় !
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম–শেষ,
ইহাদেরি মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা–মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা–ভাগীরথীর !

এস বীর ! এস যুগ–সেনাপতি ! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণী, উদ্‌গারে গিরি অগ্নি–ধূম।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দির আঁখি–জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা–মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা–ভাগীরথীর !

গল–শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা'য়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু–খড়্গ–ছিন্ন–মুণ্ড দানিবে ও–পায়ে প্রণাম–চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা–মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা–ভাগীরথীর !

ঝোড়ো গান

[কীর্তন]

(আমি) চাইনে হতে ভ্যাবাগঙ্গারাম
ও দাদা শ্যাম !
তাই গান গাই আর যাই নেচে যাই
ঝম্‌ঝম্‌াঝম্‌ অবিশ্রাম ।।

আমি সাইক্লোন আর তুফান
আমি দামোদরের বান
খোশখেয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্ধমান।
আর শিবঠাকুরকে কাঠি করে বাজাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ড্রাম ।।

মোহান্তের মোহ-অন্তের গান

[গান]

জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ডুবাল পাপ-চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী ।।

তোরা হত্যা দিতিস যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপ্‌নি আসি।
জাগো বঙ্গবাসী ।।

মোহের যার নাইকো অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত,
মা-বোনে সর্বস্বান্ত করছে বেদী-মূলে।
তোদেরে পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে।
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস পাপ-ব্যভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী ।।

পুণ্যের ব্যবসাদারি
চালায় সব এই ব্যাপারি,
জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায় ছাই মেখে যে ভিখারী শিব বেড়ান ভিক্ষা করে—
ওরে তাঁর পূজারী দিনে-দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

এইসব ধর্ম-ঘাগী
দেব্‌তায় করছে দাগী,
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে বসে।
সে যে পাপের ঘন্টা বাজায় পাপী দেব-দেউলে পশে।
আর ভক্ত তোরা পূজিস তারেই যোগাস খোরাক সেবা-দাসী!
জাগো বঙ্গবাসী॥

দিয়ে নিজ রক্তবিন্দু
ভরালি পাপের সিন্ধু—
ডুবলি তায় ডুবলি হিন্দু ডুবালি দেব্‌তারে।
দেখো ভোগের বিষ্ঠা পুড়ছে তোদের বেদীর ধূপাধারে।
পূজারীর কমণ্ডলুর গঙ্গা-জলে মদের ফেনা উঠছে ভাসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

দিতে যায় পূজা-আরতি
সতীত্ব হারায় সতী,
পুণ্য-খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে,
তার ভোগ-মহলের জ্বলছে প্রদীপ তোদের পুণ্য-ঘিয়ে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামিতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।
জাগো বঙ্গবাসী॥

তোরা সব শক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি!
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যে রে।
তোরা পূজারীকে করিস পূজা পূজার ঠাকুর ছেড়ে!
মার অসুর শোধরা সে ভুল, আদেশ দেন মা সর্বনাশী।
'জয় তারকেশ্বর' বলে পরবি রে নয় গলায় ফাঁসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

আশু-প্রয়াণ গীতি

কোরাস্ : বাংলার 'শের', বাংলার শির,
বাংলার বাণী, বাংলার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ।।

বাংলার ঋষি বাংলার জ্ঞান বঙ্গবাণীর শ্বেতকমল,
শ্যাম বাংলার বিদ্যা-গঙ্গা অবিদ্যা-নাশী তীর্থ-জল !
মহামহিমার বিরাট পুরুষ শক্তি-ইন্দ্র তেজ-তপন—
রক্ত-উদয় হেরিতে সহসা হেরিনু সে-রবি মেঘ-মগন।

কোরাস্ : বাংলার 'শের', বাংলার শির,
বাংলার বাণী, বাংলার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ।।

মদ-গর্বীর গর্ব-খর্ব বল-দর্পীর দর্প-নাশ
শ্বেত-ভিতুদের শ্যাম বরাভয় রক্তাসুরের কৃষ্ণ ত্রাস।
নব ভারতের নব আশা-রবি প্রাচী'র উদার অভ্যুদয়
হেরিতে হেরিতে হেরিনু সহসা বিদায়-গোধূলি গগনময়।

কোরাস্ : বাংলার 'শের', বাংলার শির,
বাংলার বাণী, বাংলার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ।।

পড়িল ধসিয়া গৌরীশঙ্কর হিমালয়-শির স্বর্গচূড়,
গিরি কাঞ্চন-জঙ্ঘা গিরিল—বাংলার যবে দিন-দুপুর।
শিশুক-হাঙর শোষিছে রক্ত, মৃত্যু শোষিছে সাগর-প্রাণ,—
পরাধীনা মা'র স্বাধীন সুতের মেদ-ধূমে কালো দেশ-শ্মশান।

কোরাস্ : বাংলার 'শের', বাংলার শির,
বাংলার বাণী, বাংলার বীর
সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ।।

অরাজক মারি মড়া–কান্নায় দেশ–জননীর বদ্ধ শ্বাস,
হে দেব–আত্মা ! স্বর্গ হইতে দাও কল্যাণ, দাও আভাস,
কেমন করিয়া মৃত্যু মথিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয় মানব ;
শব হয়ে গেছ, শিব হয়ে এস দেবকী–কারার নীল কেশব।

কোরাস্ : বাংলার 'শের', বাংলার শির,
বাংলার বাণী, বাংলার বীর
সহসা ও–পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহা–ভারতের মহাপ্রয়াণ॥

ল্যাবেন্ডিশ* বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত

কোরাস্ : কে বলে মোদেরে ল্যাডাগ্যাপচার ? আমরা সিভিল গাড়,
অরাজক এই ভারত–মাঠে হে আমরা উদ্‌মো ষাঁড়॥

মোরা লাঙল জোয়াল দড়াদড়ি–ছাড়া,
বড় সুখে তাই দিই শিং–নাড়া,
অসহ–যোগীও করিবে না তাড়া রে—
ওরে ভয় নাই, ওরা বৈষ্ণব বাঘ, খাবে না মোদের হাড় !
চলো ব্যাং–বীর, বলো ঠ্যাং নেড়ে জোর, ছেড়েছে ডেড়েং হার্ র্ !
কোরাস্ : কে বলে ইত্যাদি—

মোরা গলদঘর্ম যদিও গলিয়া,
বড় বেজুত করেছে লেজুড় ডলিয়া,
তবু গলদ করো না বলদ বলিয়া হে,
মোরা বড় দরকারি সরকারি গরু, তরকারি নহি তার !
তবে গতিক দেখিয়া অধিক না গিয়া সটান পগার পার !
কোরাস্ : কে বলে ইত্যাদি—

* কলকাতার এক জাতীয় সিপাই

আজ গোবরগণেশ গোবরমস্ত
ল্যাজে ও গোবরে খিচেন দন্ত,
তবু করুণার নাহিকো অন্ত হে,
যত মামাদের কড়ি ধামা-ধরে দিয়া আমাদেরি ভাঙে ঘাড় !
আর বাবাদেরে বেঁধে ঠ্যাঙাতে মোরাই কেটে দি বাঁশের ঝাড়।
কোরাস্ : কে বলে ইত্যাদি—

হয়ে ইভিলের গুরু ডেভিল পশুর—
সিভিল-বাহিনী, কি এত কসুর
করেছি মাইরি ? বলো তো শ্বশুর হে !
ঐ রাঙামুখে বাবা অন্ন দি তুলি নিজে খাই জোলো মাড়,
তবু সেলাম ঠুকিতে মলাম বাবা গো বক্র মাজা ও ঘাড় !
কোরাস্ : কে বলে ইত্যাদি—

বহে কালাতে ধলাতে গঙ্গা-যমুনা,
আমরা তাহারি দিব্যি নমুনা,
এ-রীতি পিরীতি বুঝিবে কভু না হে,
তাই কালামুখ প্রেমে আলা করি হাঁকি—'তাড়্‌রে নেটিভ্ তাড়্' !
তবে কোপন-স্বভাব দেখিলে অমনি গোপন খাম্বা-আড় !
কোরাস্ : কে বলে ইত্যাদি—

এবে কাঁপিবে মেদিনী শত উৎপাতে
চিৎপটাং সে কত 'ফুট্‌পাথে'
হবে আমাদেরি ভীম কোঁৎকাতে হে !
অবে পরোয়া কি দাদা ? ক্যাঁকড়ার সম নিসপিস নাড়ো দাঁড়,
যদি নিশ্চল হাতে পিস্তল কাঁপে তবু গোঁফে দাও চাড়।
কোরাস্ : কে বলে ইত্যাদি—

বাবা ! যদিও এ-দেহ ঝুনো ঠনঠন
তবু লোকে ভাবে ঠুঁটো পল্টন।
আরে ঘোড়া নাই ? বাস্, পায়ে হন্টন হে !
বাজে করতাল—আজ হরতাল। ডাকে আত্মা যে খাঁচা ছাড় !
ওরে 'ওয়ান্ পেস্ স্টেপ্ ফরওয়ার্ড মার্চ, থুড়ি থুড়ি ব্যাক্‌ওয়ার্ড।'

সুপার (জেলের) বন্দনা*

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারি ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥

রেখেছে সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার-কক্ষে জামাই-আদরে
বেঁধেছ শিকল-প্রণয়-ডোরে।
তুমি ধন্য ধন্য হে॥

আ-কাঁড়া চালের অন্ন-লবণ
করেছে আমার রসনা-লোভন,
বুড়ো ডাটা-ঘাঁটা লাপসি শোভন,
তুমি ধন্য ধন্য হে॥

ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি,
খেয়ে গয়া পাবে সোজা স-গুষ্টি,
ওল-ছোলা দেহ ধবল-কুষ্টি
তুমি ধন্য ধন্য হে॥

দুঃশাসনের রক্ত-পান

বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!

* হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান 'জুলুম' বড়-কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে আমরা অভিনন্দন জানাতাম।

অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন,
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর,
কর আ-কণ্ঠ পান রুধির।
ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।
মা-বোনেদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।
বুক ফেটে চোখে জল আসে,
তারে ক্ষমা করা? ভীরুতা সে!
হিংসাশী মোরা মাংসাশী,
ভণ্ডামি ভালবাসাবাসি!
শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই!
মারি লাথি তার মড়া মুখে,
তাতা-থৈ নাচি ভীম সুখে।

নহি মোরা ভীরু সংসারী,
বাঁধি না আমরা ঘরবাড়ি।
দিয়াছি তোদের ঘরের সুখ,
আঘাতের তরে মোদের বুক।
যাহাদের তরে মোরা চাঁড়াল
তাহারাই আজি পাড়িছে গা'ল!
তাহাদের তরে সন্ধ্যা-দীপ,
আমাদের আন্দামান দ্বীপ!
তাহাদের তরে প্রিয়ার বুক
আমাদের তরে ভীম চাবুক।
তাহাদের ভালবাসাবাসি,
আমাদের তরে নীল ফাঁসি।
বরিছে তাদের বাজিয়া শাঁখ,
মোদের মরণে নিনাদে ঢাক।

জীবনের ভোগ শুধু ওদের,
তরুণ বয়সে মরা মোদের।
কার তরে ওরে কার তরে
সৈনিক মোরা পচি মরে?
কার তরে পশু সেজেছি আজ,
অকাতরে বুক পেতে নি বাজ।
ধর্মাধর্ম কেন যে নাই
আমাদের, তাহা কে বোঝে ভাই?
কেন বিদ্রোহী সব-কিছুর?
সব মায়া কেন করেছি দূর?
কারে ক'স মন সে-ব্যথা তোর?
যার তরে চুরি সে বলে চোর।
যার তরে মাখি গায়ে কাদা,
সেই হয় এসে পথে বাধা।

ভয় নাই গৃহী! কোরো না ভয়,
সুখ আমাদের লক্ষ্য নয়।
বিরূপাক্ষ যে মোরা ধাতার,
আমাদের তরে ক্লেশ-পাথার।
কাড়ি না তোদের অন্ন-গ্রাস,
তোমাদের ঘরে হানি না ত্রাস;
জালিমের মোরা ফেলাই লাশ,
রাজ-রাজড়ার সর্বনাশ!
ধর্ম-চিন্তা মোদের নয়,
আমাদের নাই মৃত্যু-ভয়!
মৃত্যুকে ভয় করে যারা,
ধর্মধ্বজ হোক তারা।
শুধু মানবের শুভ লাগি
সৈনিক যত দুখভাগী।
ধার্মিক! দোষ নিয়ো না তার,
কোরবানির[১] সে, নয় রোজার[২]!
তোমাদের তরে মুক্ত দেশ,
মোদের প্রাপ্য তোদের শ্লেষ।

১ কোরবানি—বলি। ২ রোজা—উপবাস।

জানি জানি ঐ রণাঙ্গন
হবে যবে মোর মৃৎ-কাফন[৩]
ফেলিবে কি ছোট একটি শ্বাস?
তিক্ত হবে কি মুখের গ্রাস?
কিছুকাল পরে হাড়ডি মোর
পিষে যাবি ভাই জুতিতে তোর!
এই যারা আজ ধর্ম্মহীন
চিনে শুধু খুন আর সঙিন;
তাহাদেরে মনে পড়িবে কার
ঘরে পড়ে যারা খেয়েছে মার?
ঘরে বসে নিস স্বর্গ-লোক,
মেরে মরে তারে দিস দোজখ[৪]!
ভয়ে-ভীরু ওরে ধর্ম্মবীর!
আমরা হিংস্র চাই রুধির!
শয়তান মোরা? আচ্ছা, তাই।
আমাদের পথে এসো না ভাই।

মোদের রক্ত-রুধির-রথ,
মোদের জাহান্নামের পথ,
ছেড়ে দেও ভাই জ্ঞান-প্রবীণ,
আমরা কাফের ধর্ম্মহীন!
এর চেয়ে বেশি কি দেবে গা'ল?
আমরা পিশাচ খুন-মাতাল।
চালাও তোমার ধর্ম্ম-রথ,
মোদের কাঁটার রক্ত-পথ।
আমরা বলিব সর্বদাই—
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!

চাই না ধর্ম্ম, চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম
আমাদের কাছে: শুধু হালাল[৫]
দুশমন-খুন লাল-সে-লাল॥

---

৩ মৃৎ-কাফন—লাশ যেখানে থাকে। ৪ দোজখ—নরক। ৫ হালাল—পবিত্র।

শহীদী-ঈদ

১

শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন-লোহিত তাজ,
আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ :
জিয়ারার চেয়ে পিয়ারা যে
আল্লার রাহে তাহারে দে,
চাহি না ফাঁকির মণিমানিক।

২

চাহি নাকো গাভি দুম্বা উট,
কতটুকু দান? ও দান ঝুট।
চাই কোরবানি, চাই না দান।
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের,
দেবে কি? কে আছ মুসলমান?

৩

ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ,
আপনারে আর দিসনে লাজ,—
গরু ঘুষ দিয়ে চাস সওয়াব?
যদিই রে তুই গরুর সাথ
পার হয়ে যাস পুলসেরাত,
কি দিবি মোহাম্মদে জওয়াব!

৪

শুধাবেন যবে—ওরে কাফের,
কি করেছ তুমি ইসলামের?

ইসলামে দিয়ে জাহান্নম
আপনি এসেছ বেহেশত 'পর—
পুণ্য-পিশাচ ! স্বার্থপর !
দেখাসনে মুখ, লাগে শরম !

৫

গরুরে করিলে সেরাত পার,
সন্তানে দিলে নরক-নার !
মায়া-দোষে ছেলে গেল দোজখ।
কোরবানি দিলি গরু-ছাগল,
তাদেরই জীবন হলো সফল
পেয়েছে তাহারা বেহেশ্‌ত্‌-লোক !

৬

শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে, ভণ্ড সে !
ইসলাম বলে—বাঁচো সবাই !
দাও কোরবানি জান্‌ ও মাল,
বেহেশত্‌ তোমার করো হালাল।
স্বার্থপরের বেহেশ্‌ত্‌ নাই।

৭

ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে করো ফখর !
মোনাফেক তুমি সেরা বে-দীন !
ইসলামে যারা করে জবেহ্‌,
তুমি তাহাদেরি হও তাঁবে।
তুমি জুতো-বওয়া তারি অধীন।

৮

নামাজ–রোজার শুধু ভড়ং,
ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম !
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করো জড়ো
ত্যাগের বেলাতে জড়সড় !
তোর নামাজের কি আছে দাম ?

৯

খেয়ে খেয়ে গোশ্‌ত্‌ রুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসি বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানি।
বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবে দ্বীন,
দাস ইসলাম হবে স্বাধীন,
গাহিছে কামাল এই গানই !

১০

বাঁচায়ে আপনা ছেলে–মেয়ে
জান্নাত পানে আছ চেয়ে
ভাবিছ সেরাত হবেই পার।
কেননা, দিয়েছ সাতজনের
তরে এক গরু ! আর কি, ঢের !
সাতটি টাকায় গোনাহ্‌ কাবার !

১১

জানো না কি তুমি, রে বেঈমান !
আল্লা সর্বশক্তিমান
দেখিছেন তোর সব কিছু ?
জাব্বা–জোব্বা দিয়ে ধোঁকা
দিবি আল্লারে, ওরে বোকা !
কেয়ামতে হবে মাথা নিচু !

১২

ডুবে ইসলাম, আসে আঁধার !
ইব্‌রাহিমের মতো আবার
কোরবানি দাও প্রেয় বিভব !
'জবিহুল্লাহ্' ছেলেরা হোক,
যাক সব কিছু—সত্য রোক !
মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।

১৩

খা'বে দেখেছিলেন ইবরাহিম—
'দাও কোরবানি মহামহিম !'
তোরা যে দেখিস দিবালোকে
কি যে দুর্গতি ইসলামের !
পরীক্ষা নেন খোদা তোদের
হবিবের সাথে বাজি রেখে !

১৪

যত দিন তোরা নিজেরা মেষ,
ভীরু দুর্বল, অধীন দেশ,—
আল্লার রাহে ততটা দিন
দিও নাকো পশু কোরবানি,
বিফল হবে রে সবখানি !
(তুই) পশু চেয়ে যে রে অধম হীন !

১৫

মনের পশুরে করো জবাই,
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।
কশাই-এর আবার কোরবানি !—
আমাদের নয়, তাদের ঈদ,
বীর-সুত যারা হলো শহীদ,
অমর যাদের বীরবাণী।

১৬

পশু কোরবানি দিস তখন
আজাদ-মুক্ত হবি যখন
জুলম-মুক্ত হবে রে দ্বীন।—
কোরবানির আজ এই যে খুন
শিখা হয়ে যেন জ্বালে আগুন,
জালিমের যেন রাখে না চিন্।।
আমিন্ রাব্বিল্ আলমিন !
আমিন রাব্বিল্ আলমিন ! !

ব্যথার দান

মানসী আমার !
মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
ক্ষমা করোনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করলুম।

ব্যথার দান

দারার কথা

গোলেস্তান

গোলেস্তান ! অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আঃ মাটির মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল ! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা, ... সেই ঘুম-পাড়ানোর সরল ছড়া,—

'ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো !'

আরো মনে পড়ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আবদার। ... সে মা আজ কোথায় ?

দু-একদিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড়-মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশত থেকে আব্‌দেরে ছেলের কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কি-না জানিনে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি বলেই— মাতৃ-স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হতে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে,—মাকে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা'র চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি। মাকে আমি ছোট করছিনে। ধরতে গেলে মা-ই বড়। ভালোবাসতে শিখিয়েছেন তো মা। আমার প্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইয়েছেন তো মা। আমাকে কাজে-অকাজে এমন করে সাড়া দিতে শিখিয়েছেন যে মা ! মা পথ দেখিয়েছেন, আর আমি চলেছি সেই পথ ধরে। লোকে ভাবছে, কি খামখেয়ালি পাগল আমি ! কি কাঁটা-ভরা ধ্বংসের পথে চলেছি আমি ! কিন্তু আমার চলার খবর মা জানতেন, আর সে-কথা শুধু আমি জানি।

আমায় লোকে ঘৃণা করছে ? আহা, আমি ঐ তো চাই। তবে একটা দিন আসবেই যে-দিন লোকে আমার সঠিক খবর জানতে পেরে দু'-ফোটা সমবেদনার অশ্রু ফেলবেই ফেলবে। কিন্তু আমি হয়তো তা আর দেখতে পাব না। আর তা দেখে অভিমানী স্নেহ-বঞ্চিতের মতো আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। সে-দিন হয়তো আমি থাকব দুঃখ-কান্নার সুদূর পারে।

চমন

আচ্ছা মা ! তুমি তো মরে শান্তি পেয়েছ, কিন্তু এ কি অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে ? আমি চিরদিনই বলেছি, না—না—না, আমি এ-পাপের বোঝা বইতে পারব না ; কিন্তু তা তুমি শুনলে কই ? সে-কথা শুধু হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন আমার মনের কথা সব জানো আর কি ! ... এই যে বেদৌরাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলে, এর জন্যে দায়ী কে ? এখন যে আমার সকল কাজেই বাধা ! কোথাও পালিয়েও টিকতে পারছিনে ! ... আমি আজ বুঝতে পারছি মা, যে, আমার এই ঘর-ছাড়া উদাস মনটার স্থিতির জন্যেই তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই পুষ্প-শিকলটা নিজের হাতে আমার পরিয়ে গিয়েছ। ঐ মালাই তো হয়েছে আমার জ্বালা ! লোহার শিকল ছিন্ন করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দলে যাবার মতো নির্মম শক্তি তো নেই আমার। ... যা কঠোর, তার ওপর কঠোরতা সহজেই আসে ; কিন্তু যা কোমল পেলব নমনীয়, তাকে আঘাত করবে কে ? তারই আঘাত যে আর সইতে পারছিনে !

হতভাগিনী বেদৌরা ! সে কথা কি মনে পড়ে—সেই মায়ের শেষ দিন ? —সেই নিদারুণ দিনটা ? মায়ের শিয়রে মরণের দূত ম্লান মুখে অপেক্ষা করছে—বেদনাপ্লুত তাঁর মুখে একটা নির্বিকার তৃপ্তির আবছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, —জীবনের শেষ রুধিরটুকু অশ্রু হয়ে তোমার আর আমার মঙ্গলেচ্ছায় আমাদেরই আনত শিরে চুঁইয়ে পড়ছে। মা'র পূত সে শেষের অশ্রু বেদনায় যেমন উত্তপ্ত, শান্ত স্নেহ-ভরা আশিসে তেমনই স্নিগ্ধ-শীতল ! তোমার অযতনে-থোওয়া কালো কোঁকড়ানো কেশের রাশ আমাকে শুদ্ধ ঝেঁপে দিয়েছে, আর তার অনেকগুলো আমাদেরই অশ্রু-জলে সিক্ত হয়ে আমার হাতে-গলায় জড়িয়ে গিয়েছে, —আমার হাতের ওপর কচি পাতার মত তোমার কোমল হাত দুটি থুয়ে মা অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে আদেশ করছেন, —'দারা, প্রতিজ্ঞা কর, —বেদৌরাকে কখনো ছাড়বিনে।'

তারপর তাঁর শেষের কথাগুলো আরও জড়িয়ে ভারি হয়ে এল, —'এর আর কেউ নেই যে বাপ, এই অনাথা মেয়েটাকে যে আমি এত আদুরে আর অভিমানী করে ফেলেছি।'

সে কি ব্যথিত-ব্যাকুল আদেশ, গভীর স্নেহের সে কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা !

তার পরে মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্মতলে একটু একটু করে ভালবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা। ... মুখোমুখি বসে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না, মনে পড়ে কি সে-সব বেদৌরা ? তখন আপনি মনে হতো, এই পাওয়ার ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে অরুন্তুদ ! তা না হলে সাঁঝের মৌন আকাশ-তলে দু'জনে যখন গোলেস্তানের আঙুর-বাগিচায় গিয়ে হাসতে হাসতে বসতাম তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমিষে শুকিয়ে গিয়ে দুইটি প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভরে উঠত ? তখনও কেন অবুঝ বেদনায় আমাদের বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠত ? আঁখির পাতায় পাতায় অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে আসত ? ...

আজ সেটা খুব বেশি করেই বুঝতে পেরেছি বেদৌরা। কেননা, এই যে জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরও বড় করে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম বলেই। বিরহের ব্যথায় জান্টা যখন 'পিয়া পিয়া' বলে 'ফরিয়াদ' করে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে. তা প্রকাশ করতে আর কেউ কখ্খনো পারবে না। দুনিয়ায় যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দময়।

আর সেই দিনের কথাটা? সে-দিন বাস্তবিকই সেটা বড় আঘাতের মতোই প্রাণে বেজেছিল! আমার আজও মনে পড়ছে, সে-দিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে ফলে ফুলে পাতায়। ... আর সবচেয়ে বেশি করে তরুণ-তরুণীদের বুকে!

আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢল্-ঢল্ করছে পরিস্তানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদিদের মতো! নাশপাতিগুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মতো। রস-প্রাচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের অভিমানে-স্ফুরিত টুকটুকে অরুণ অধরের মতো। পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেতে বুল্‌বুল্‌দের নওরোজের মেলা বসেছে। আড়ালে আগ্‌ডালে বসে কোয়েল আর দোয়েল-বধূর গলা-সাধার ধূম পড়ে গিয়েছে, কি করে তারা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশ্‌গুল করে রাখবে। ... উদ্দাম দখিন হাওয়ার সাথে ভেসে-আসা একরাশ খোশবুর মাদকতায় আর নেশায় আমার বুকে তুমি ঢলে পড়েছিলে। শিরাজ-বুল্‌বুল্-এর 'দিওয়ান' পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য দুষ্টু এলো চুলগুলি সংযত করে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দু'জনারই চোখ ছেপে অশ্রু বয়েই চলেছিল।

মিলনের মধুর অতৃপ্তি এই রকমে বড় সুন্দর হয়েই আমাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ের পাতাগুলো উল্টে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সব ওলট-পালট হয়ে গেল ঠিক যেমন বিরাট্ বিপুল এক ঝন্‌ঝার অত্যাচারে একটা খোলা বই-এর পাতা বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। ... সে এলোমেলো পাতাগুলো আবার গুছিয়ে নিতে কি বেগই না পেতে হয়েছে আমায়, বেদৌরা! ... তা হোক, তবু তো এই 'চমনে' এসে তোমায় ফের পেয়েছি। তুমি যে আমারই। বাঙালি কবির গানের একটা চরণ মনে প'ড়ছে—

'তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী!'

তারপর সেই ছাড়াছাড়ির ক্ষণটা বেদৌরা, তা কি মনে পড়ছে? আমি শিরাজের বুল্‌বুলের সেই গানটা আবৃত্তি করছিলাম,—

'দেখনু সে-দিন ফুল-বাগিচায় ফাগুন মাসের ঊষায়,
সদ্য-ফোটা পদ্ম ফুলের লুটিয়ে পরাগ-ভূষায়,

কাঁদ্‌চে ভ্রমর আপন মনে অঝোর নয়নে সে,
হঠাৎ আমার পড়ল বাধা কুসুম চয়নে যে !
কইনু,—'হাঁ ভাই ভ্রমর ! তুমি কাঁদচ সে কোন্ দুখে
পেয়েও আজি তোমার প্রিয়া কমল-কলির বুকে ?'
রাঙিয়ে তুলে কমল-বালায় অশ্রু-ভরা চুমোয়
বললে ভ্রমর,—'ওগো কবি, এই তো কাঁদার সময়।
বাঞ্ছিতারে পেয়েই তো আজ এত দিনের পরে,
ব্যথা-ভরা মিলন-সুখে অঝোর ঝরা ঝরে !'

এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ; আমার একটা কথাও বিশ্বাস করলে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, সে থাকতে আমার মতো একটা ঘর-বাড়ি-ছাড়া বয়াটে ছোকরার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হতেই পারে না। ...

আমার কান্না দেখে সে বললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের 'দিওয়ান' পড়ে পড়ে আমিও পাগল হয়ে গিয়েছি। তোমার মিনতি দেখে সে বললে যে, আমি তোমাকে জাদু করেছি।

তার পর অনেক দিন ঘুরে ঘুরে কেটে গেল ঐ ব্যাকুল-গতি ঝর্‌নাটার ধারে। যখন চেতন হলো, তখনও বসন্ত-উৎসব তেমনি চলেছে, শুধু তুমিই নেই ! দেখলুম, ক্রমেই তোমার আল্‌তা-ছোবানো পায়ের পাতার পাতলা দাগগুলা নির্ঝরের কূলে কূলে মিশিয়ে আসছে, আর রেশমি চুড়ির ভাঙা টুক্‌রোগুলো বালি-ঢাকা পড়ছে।

আমি কখনো মনের ভুলে এ-পারে দাঁড়িয়ে ডাকতুম, —বেদৌরা ! ... অনেকক্ষণ পরে পাথরের পাহাড়টা ডিঙিয়ে ও-পার হতে কার একটা কান্না আসতে আসতে মাঝপথে মিশিয়ে যেত—'রা—আঃ—আঃ !'

সারা বেলুচিস্তান আর আফগানিস্তানের পাহাড় জঙ্গলগুলোকে খুঁজে পেলুম, কিন্তু তোমার ঝরনা-পারের কুটিরটির খোঁজ পেলুম না।

একদিন সকালে দেখলুম, খুব উন্মুক্ত একটা ময়দানে একা একজন পাগলা আস্‌মান-মুখো হয়ে শুধু লাফ মারছে, আর সেই সঙ্গে হাত দুটো মুঠো করে কিছু ধরবার চেষ্টা করছে। আমার বড্ডো হাসি পেল। শেষে বললুম—'হাঁ ভাই উৎরিঙ্গে ! তুমি কি তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে আকাশ-ফড়িং ধরছ ?'

সে আরও লাফাতে লাফাতে সুর করে বলতে লাগল—

'এ-পার থেকে মারলাম ছুরি লাগল কলা গাছে,
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা !'

এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়। অত দুঃখেও আমি হো-হো করে হেসে বললুম—'ভাই, তুমি কি কবি ?'

সে খুব খুশি হয়ে চুল দুলিয়ে বললে—'হাঁ হাঁ, তাই !'

আমি বললুম,—'তা তোমার কবিতার মিল হলো কই?'

সে বললে,—'তা নাই বা হলো, হাঁটু দিয়ে তোর রক্ত প'ড়ল তো।' এই বলেই সে আমার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুমণ্ডিত গালে চুম্বনের চোটে আমায় বিব্রত করে তুলে বললে, —'অনিলের নীল রঙটাকে সুনীল আকাশ ভেবে ধরতে গেলে সে দূরে সরে গিয়ে বলে, —'ওগো, আমি আকাশ নই, আমি বাতাস—আমি শূন্য, আমায় ধরা যায় না। আমায় তোমরা পেয়েছ। তবুও যে পাইনি বলে ধরতে আস, সেটা তোমার জবর ভুল।'

এক নিমেষে আমার মুখের মুখর হাসি মূক হয়ে মিলিয়ে গেল। ভাবলাম, হাঁ ঠিকই তো। যাকে ভিতরে, অন্তরের অন্তরে পেয়েছি, তাকে খাম্‌খা বাইরের-পাওয়া পেতে এত বাড়াবাড়ি কেন? তাই সে-দিন আমার পোড়ো-বাড়িতে শেষ কান্না কেঁদে বললুম, —'বেদৌরা! তোমায় আমি পেয়েছি আমার হৃদয়ে—আমার বুকের প্রতি রক্ত-কণিকায়।' ...

তারপর এই যে হিন্দুস্থানের অলিতে-গলিতে 'কম্‌লিওয়ালে' সেজে ফিরে এলুম, সে তো শুধু ঐ এক ব্যথার সান্ত্বনাটা বুকে চেপেই। ভাবতুম, এমনি করে ঘুরে ঘুরেই আমার জনম কাটবে; কিন্তু তা আর হলো কই? আবার সেই গোলেস্তানে ফিরে এলুম! সেখানে আমার মাটির কুঁড়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে, কিন্তু তারই আর্দ্র বুকে যে তোমার ঐ পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে, ... তাই আমায় জানিয়ে দিল, যে, তুমি এখানে আমায় খুঁজতে এসে না পেয়ে শুধু কেঁদে ফিরেছ!

সেই পাগলটা আবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তুমি চমনে ফুটে শুকিয়ে যাচ্ছ। ...

আমি এসেই তোমায় দূর হ'তে দেখে চিনেছি। তবে তুমি আমায় দেখে অমন করে ছুটে পালালে কেন? সে কি মাতালের মতো টলতে টলতে দৌড়ে লুকিয়ে পড়লে ঐ খোর্মা গাছগুলোর আড়ালে! সে কি অসম্বৃত অশ্রু ঝরে পড়ছিল তোমার! আর কতই সে ব্যথিত অনুযোগ ভরে উঠেছিল সে করুণ দৃষ্টিতে!

কিন্তু কোথা গেলে তুমি? বেদৌরা, তুমি কোথায়? ...

বেদৌরার কথা

বোস্তান

মা গো, কি ব্যথিত পাণ্ডুর আকাশ! এই যে এত বৃষ্টি হয়ে গেল, ও অসীম আকাশের কান্না নয় তো? —না, না, এত উদার যে, সে কাঁদবে কেন? আর কাঁদলেও তার অশ্রু আমাদের সঙ্কীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মতো বিস্বাদ আর উষ্ণ নয় তো! দেখছ, সে কত ঠাণ্ডা! ...

কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছি? একেবারে এক দৌড়ে চমন থেকে এই বোস্তানে এসেছি! তা হোক, এতক্ষণে যেন জানটা ধড়ে এল। ... আ ম'লো! এত হুক্‌রে হুক্‌রে বুক ফেটে কান্না আসছে কিসের? মানুষের মনের মতো আর বালাই নেই। ঐ জ্বালাতেই তো আমায় জ্বালিয়ে খেলে গো!—কি? তার দেখা পেয়েছি বলে এ-কান্না? —তাতে আর হয়েছে কি?

সে যে ফিরে আসবেই, সে তো জানা কথা। কিন্তু এত দিনে কেন? এ অসময়ে কেন? এখন যে আমার মালতীর লতা রিক্তকুসুম! ওগো, এ মরণের তটে এ দুর্দিনে কি দিয়ে বাসর সাজাব? যদি এলেই, তবে কেন দু'দিন আগেই এলে না? তাহলে তো তোমায় এমন করে এড়িয়ে চলতে হতো না! সেই দিনই—যেদিন আবার ঐ চমনের শুক্‌নো বাগানের ধারে তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম—সেই দিনই তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ব'লতাম, —'এস প্রিয়, ফিরে এস!'

আমরা নারী, একটুতেই যত কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি, পুরুষরা তা তো পারে না। তাদের বুকে যেন সব সময়েই কিসের পাথর চাপা। তাই যখন অনেক বেদনায় এই সংযমী পুরুষদের দুটি ফোঁটা অসম্বরণীয় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তখন তা দেখে না কেঁদে থাকতে পারে, এমন নারী তো আমি দেখি না!

সেদিন যখন কত বছর পরে আমাদের চোখাচোখি হলো, তখন কত মিনতি-অনুযোগ আর অভিমান মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের চারটি চোখেরই সজল চাউনিতে! —হ্যাঁ, আর কেমন 'বেদৌরা' বলে মাথা ঘুরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ঐ খেজুরের কাঁটা-ঝোপটায় পড়ে গেল! তা দেখে পাষাণী আমি কি ক'রেই সে চোখ দুটো জোর করে দু-হাত দিয়ে চেপে এত দূর যেন কোন্ অন্ধ অমানুষিক শক্তির বলে ছুটে এলাম?

পুরানো কত স্মৃতিই আজ আমার বুক ছেপে উঠছে! সেই গোলেস্তানে এক জোড়া বুলবুলেরই মত মিলনেই অভিমান, মিলনেই বিচ্ছেদ-ব্যথা আর তারই প্রগাঢ় আনন্দে অজস্র অশ্রুপাত! তার চিন্তাটাও কত ব্যথিত-বিধুর! তার পর সেই জুয়াচোরের জোর ক'রে আমায় ছিনিয়ে-নেওয়া দয়িতের বুক থেকে, —অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে প্রিয়ের অন্বেষণ! —ওঃ কি-ই না করেছে তাকে আবার পেতে! কই তখনো তো সে এল না!

তারপর ভিতরে-বাইরে সে কি দ্বন্দ্ব লেগে গেল! ভিতরে ঐ এক তূষের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলতে লাগল, আর বাইরে? বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে! ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সয়ফুল্-মুলক্ এসে আমায় কান-ভাঙানি দিলে—ভালবাসায় কি বিরাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিনীর কড়ি-মধ্যমের মতো! আর এই বিশ্রী কামনাটা কত তীব্র—তীক্ষ্ণ—নির্মম! এই বাসনার ভোগে যে সুখ, সে হচ্ছে পৈশাচিক সুখ! এতে

শুধু দীপক রাগিণীর মতো পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের ! অথচ এই দীপকের আগুন একবার জ্বলে উঠবেই আমাদের জীবনের নব-ফাল্গুনে। সেই সময় স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের মত সান্ত্বনার একটা-কিছু পাশে না থাকলে সে যে জ্ব'লবেই—দীপক যে তাকে জ্বালাবেই !

তাই তো যে-দিন পুষ্পিত যৌবনের ভারে আমি ঢলে ঢলে পড়ছিলাম, আর একজন এসে আমায় যাচ্ঞা করলে, তখন আমার এই বাহিরের প্রবৃত্তিটা দমন করবার ক্ষমতাই যে রইল না। তখন যে আমি অন্ধ ! ওগো দেবতা, সে-দিন তুমি কোথায় ছিলে ! কেউ যে এল না শাসন করতে তখন ! হায়, সেই দিনই আমার মৃত্যু হল ! সেই দিনই আমি ভিখারিনী হয়ে পথে বসলাম। ওগো, আমার সেই অধঃপতনের দিনে চোখে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের নিবিড় কালিমা একেবারে ঘন-জমাট হয়ে বসেছিল, তখন এখনকার মত এতটুকুও আলোক যে সে-অন্ধকারটাকে তাড়াতে চেষ্টা করেনি। হয়তো একটি রশ্মিরেখার ঈষৎপাতে সব অন্ধকার সেদিন ছুটে পালাত। তা হলে দেখতে গো, কে আমার সমস্ত হৃদয়-আসন জুড়ে রাজাধিরাজ একচ্ছত্র সম্রাটের মত ব'সে আছে।

তবু যে আমার এ অধঃপতন হল, তা সে-দিনও বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পারছি নে, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ! কি আমি যদি বলি, আমার প্রেম—বক্ষের গভীর গোপন-তলে-নিহিত মহান প্রেম, যা সর্বদাই পবিত্র, তা তেমনি পূত অনবদ্য আছে আর চিরকালই থাকবে, তার গায়ে আঁচড় কাটে বাইরের কোনো অত্যাচার-অনাচারের এমন ক্ষমতা নেই, —তা হলে কে বুঝবে ? কেই বা আমায় ক্ষমা করবে ? তবু আমি বলব, প্রেম চিরকালই পবিত্র, দুর্জয়, অমর ; পাপ চিরকালই কলুষ, দুর্বল আর ক্ষণস্থায়ী।

ওঃ—মা ! কী অসহ্য বেদনা এই সারা বুকের পাঁজরে পাঁজরে ! ... কি সব ভুল বকছিলাম এতক্ষণ ? ঠিক যেন খোওয়াব দেখছিলাম, না ? ... পাপ ক্ষণস্থায়ী, কি নদীর বানভাসির পর যেমন বান রেখে যায় একটা পলির আবরণ সারা নদীটার বুকে, তেমনি পাপ রেখে যায় সঙ্কোচের পুরু একটা পর্দা ; সেটা কি ক্ষণস্থায়ী নয়, সেটা হয়তো অনেকেরই সারা জীবন ধরে থাকে। পাপী নিজেকে সামলে নিয়ে হাজার ভালো করে চললেও ভাবে, আমার এ দুর্নাম তো সারাজীবন কাদা-লেপ্টা হয়ে লেগেই থাকবে ! চাঁদের কলঙ্ক পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও যে ঢাকতে পারে না ! এই পাপের অনুশোচনাটাও কত বিষাক্ত—তীক্ষ্ণ ! ঠিক যেন এক সঙ্গে হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধছে বুকের প্রতি কোমল জায়গায়। ...

আবার আমার মনে পড়ছে সেই আমার বিপথে-টেনে-নেওয়া শয়তান সয়ফুল-মুল্‌কের কথা। সে-ই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা'। এখন তাকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম !

আমরা নারী, —মনে করি, এতটুকুতেই আমাদের হৃদয় অপবিত্র হ'য়ে গেল, আর অনুশোচনায় মনে মনে পুড়ে মরি। আমরা আরও ভাবি যে, হয়তো পুরুষদের

অত সামান্যতে পাপ স্পর্শে না। আর তাদের মনে এত তীব্র অনুশোচনাও জাগে না। কি সেই যে সে-দিন, যে-দিন আমার বাসনার পিয়াস শুকিয়ে গিয়েছে, আর মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল পানের তীব্র জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছি, আর ঠিক সেই সময় সহসা বিরাট বিপুল হয়ে আমার ভিতরের প্রেমের পবিত্রতা অপ্রতি-হত তেজে জেগে উঠেছে—সে তেজ চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে,—সে দিন—ঠিক সেই দিন—সয়ফুল্-মুল্‌ক্ সহসা কি রকম ছোট হ'য়ে গেল! একটা দুর্বার ঘৃণামিশ্রিত লজ্জার কালিমা তার মুখটাকে কেমন বিকৃত করে দিলে! সে দূর থেকে কেমন আমার দিকে একটা ভীতচকিত দৃষ্টি ফেলে উপর দিকে দুহাত তুলে আর্তনাদ করে উঠল,—"খোদা! আমি জীবন দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তবে যেন সে-জীবন মঙ্গলার্থেই দিতে পারি, শুধু এইটুকু করো খোদা!"

তার পর কেমন সে উন্মাদের মত ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে বললে, —"দেবি, ক্ষমা করো এ শয়তানকে! দেবীর দেবীত্ব চিরকালই অটুট থাকে, বাইরের কলঙ্কে তা কলঙ্কিত হয় না, বরং সংঘর্ষের ফলে তা আরও মহান উজ্জ্বল হয়ে যায়! কি আমি? —আমি? ওঃ, ওঃ, ওঃ!" সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তার সে-ছোটা থেমেছে কিনা জানিনে।

কি এ কি? আবার আমার মনটা কেন আমাকে যেন ভাঙানি দিচ্ছে শুধু একবার দেখে আসতে যে, তিনি তেমনি করে সেই খেজুর-কাঁটার ঝোপে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন কি না। ... না, না, —এ প্রাণ-পোড়ানি আর সইতে পারি নে গো—আর সইতে পারি নে! হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা করবই করব, একবার শেষ দেখা; তার পর বলব তাঁকে, —ওগো, তোমার সে বেদৌরা আর নেই, —সে মরেছে, মরেছে। তার প্রাণ তোমারই সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছে! তুমি তাকে বৃথা এমন করে খুঁজে বেড়াচ্ছ! বেদৌরা নেই—নেই—নেই!

তার পর—তার পর? তার পরেও যদি তিনি আমায় চান, তা হ'লে কি বলব তাঁকে, কি করব তখন? —না, তখনও এমনি শক্ত কাঠ হ'য়ে বলব, —ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না গো দেবতা, ছুঁয়ো না! আমার এ অপবিত্র দেহ ছুঁয়ে তোমার পবিত্রতার অবমাননা করো না!

আঃ! মা গো! কি ব্যথা! বুকের ভিতরটা কে যেন ছুরি হেনে খান্ খান্ করে কেটে দিচ্ছে। ...

দারার কথা

গোলেস্তান

তুমি কি সেই গোলেস্তান? তবে আজ তুমি এত বিশ্রী কেন? তোমার ফুলে সে সৌন্দর্য নেই, শুধু তাতে নরকের নাড়ি-উঠে-আসা পূতিগন্ধ! তোমার আকাশ আর তেমন উদার নয়, কে যেন তাকে পঙ্কিল ঘোলাটে করে দিয়েছে! তোমার মলয় বাতাসে যেন লক্ষ হাজার কাচের টুকরো লুকিয়ে রয়েছে! তোমার সারা গায়ে যেন বেদনা!...

কি করলে বেদৌরা তুমি? বেদৌরা! —নাঃ, এই যে ব্যথা দিলে তুমি, —এই যে প্রাণ-প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া নিদারুণ আঘাত, এতেও নিশ্চয়ই খোদার মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে! আমি কখনই ভুলব না খোদা, যে, তুমি নিশ্চয় মহান আর তোমার-দেওয়া সুখ-দুঃখ সব সমান ও মঙ্গলময়! তোমার কাজে অমঙ্গল থাকতে পারে না, আর তুমি ছাড়া ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না! ব্যথিতের বুকে এই সান্ত্বনা কি শান্তিময়!

আচ্ছা, তবু মন মানছে কই? কেন ভাবছি, এ নিশ্চয়ই আঘাত? তৃষাতুর চাতক যখন 'ফটিক জল—ফটিক জল' করে কেঁদে কেঁদে মেঘের কাছে এসে পৌঁছে, আর নিদারুণ মেঘ তার বুকে বজ্র হেনে দিয়ে বিদ্যুৎ-হাসি হাসে, তখন কেন মনে করি, এ মেঘের বড়ই নিষ্ঠুরতা!—কেন?

কিন্তু এত দিনেও নিজের স্বরূপ জানতে পারলুম না। আগে মনে করতুম আমি কত বড়—কত উচ্চ! আজ দেখছি, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি এক রত্তিও বড় নই! আমারো মন তাদের মত অমনি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা। নৈলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা করতে পারলুম না কেন? হোক না কেন যতই বড় সে দোষ! বাহিরটা তার নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু ভিতরটা যে তেমনি পবিত্র আর শুভ রয়েছে! জেনেও তাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা করতে পারলুম না, সে দোষ তো আমারই; কেননা আমি এখনও অনেক ছোট। জোর করে বড় হবার জন্যে একবার ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা তো হতে পারে না। সে যে হৃদয় হতে নয়! —নাঃ, আমাকে পুড়ে খাঁটি হতে হবে। খুব দূরে থেকে যদি মনটাকে ঠিক করতে পারি, তবেই আবার ফিরব, নইলে নয়। ওঃ, কি নীচ আমি! প্রথমে বেদৌরার মুখ থেকে তার এই পতনের কথা শুনে আমিও তো একেবারে নরক-কুণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিলুম। মনে করেছিলুম, আমিও এমনি করে আমার সুপ্ত কামনায় ঘৃতাহুতি দিয়ে বেদৌরার ওপর শোধ নেব। তার পর নরকের দ্বার থেকে কেমন করে হাত ধরে অশ্রু মুছিয়ে আমায় কে যেন ফিরিয়ে আনলে! সে বেশ শান্ত স্বরেই ব'ললে, —"এ প্রতিশোধ তো বেদৌরার ওপর নয় ভাই, এ প্রতিশোধ তোমার নিজের ওপর!" ভাবলুম, তাই তো, অভিমানের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে এ কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলুম! আমি আবার ফিরলুম।

তার পর বেদৌরাকে বলে এলুম, —"বেদৌরা ! যদি কোন দিন হৃদয় হতে ক্ষমা করবার ক্ষমতা হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চির-বিদায় ! মুখে জোর করে ক্ষমা করলুম বলে তোমায় গ্রহণ করে আমি তো একটা মিথ্যাকে বরণ করে নিতে পারি নে। আমি চাই, প্রেমের অঞ্জন আমার এই মনের কালিমা মুছিয়ে দিক।'

বেদৌরা অশ্রু-ভরা হাসি হেসে বললে, —'ফিরতেই হবে প্রিয়তম, ফিরতেই যে হবে তোমার ! এ সংশয় দু দিনেই কেটে যাবে। তখন দেখবে, আমাদের সেই ভালোবাসা কেমন ধৌত শুভ্র বেশে আরও গাঢ় পূত হয়ে দেখা দিয়েছে ! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় গোলেস্তানের এই ক্ষীণ ঝরণাটার ধারে বসে গান আর মালা গাঁথব। আর তা যে তোমায় পরতেই হবে। ব্যথার পূজা ব্যর্থ হবার নয় প্রিয় ! ..."

কোথায় যাই এখন, আর সে কোন্ পথে ? ওগো আমার পথের চিরসাথি, কোথায় তুমি ?

সয়ফুল্-মুল্কের কথা

* * *

আমি সেই শয়তান, আমি সেই পাপী, যে এক দেবীকে বিপথে চালিয়েছিল। ভাবলুম, এই ভুবনব্যাপী যুদ্ধে যে-কোনো দিকে যোগ দিয়ে যত শীগ্‌গীর পারি এই পাপ-জীবনের অবসান করে দিই। তার পর ? তার পর আর কি ? যা সব পাপীদের হয়, আমারও হবে।

পাপী যদি সাজা পায়, তা হলে সে এই বলে শান্তি পায় যে, তার ওপর অবিচার করা হচ্ছে না, এই শাস্তিই যে তার প্রাপ্য। কি শাস্তি না পেলে ভিতরের বিবেকের যে দংশন, তা নরক-যন্ত্রণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক।

যা ভাবলুম, তা আর হল কই ! ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এর মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তিসঙ্ঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলুম !

খোদা, আজ আমি বুঝতে পারলুম, পাপীকেও তুমি ঘৃণা কর না, দয়া কর। তার জন্যেও সব পথই খোলা রেখে দিয়ে দিয়েছ। পাপীর জীবনেও দরকার আছে। তা দিয়েও মঙ্গলের সলতে জ্বালানো যায়। সে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নয়!

কি সহসা এ কি দেখলুম? দারা কোথা থেকে এখানে এল? সে-দিন তাকে অনেক করে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, "এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ-দলে এসেছি।"

আঘাত খেয়ে খেয়ে কত বিরাট গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সে। আমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে যে এই বেদনাতুর যুবকের কাছে; নইলে আমার কোথাও ক্ষমা নেই। এর প্রাণে এই ব্যথার আগুন জ্বালিয়েছি তো আমিই, একে গৃহহীন করেছি তো আমিই।

কি অচিন্ত্য অপূর্ব অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা। সবাই ভাবছে, এত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে হাসতে হাসতে যে এমন করে বুকের রক্ত দিচ্ছে, সে বাস্তবিকই বীর, আর তাদের জাতিও বীরের জাতি! এমন দিন নেই, যে-দিন একটা-না-একটা আঘাত আর চোট না খেয়েছে সে। সে-দিকে কি দৃষ্টিই নেই তার। সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ-পিপাসা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে মৃত্যুর মত কঠোর হয়ে অন্যায়কে আক্রমণ করছে। যতক্ষণ এতটুকুও জ্ঞান থাকে তার, ততক্ষণ কার সাধ্য তাকে যুদ্ধস্থল থেকে ফেরায়! কি একরোখা জেদ! আমি কি বুঝতে পারছি, এ সংগ্রাম তার বাইরের জন্য নয়, এ যে ভিতরের ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। আমি জানি, হয় এর ফল অতি বিষময়, নতুবা খুবই শান্ত-সুন্দর।

কদিন থেকে বোমা আর উড়োজাহাজ হয়েছে এর সঙ্গী। বাইরে ভিতরে এত আঘাত এত বেদনা অম্লান বদনে সহ্য করে কি করে একাদিক্রমে যুদ্ধ জয় করছে এই উন্মাদ যুবক? ভয়টাকে যেন আরব সাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছে!

আজ সে একজন সেনাপতি। কি এ কি অতৃপ্তি এখনও তার মুখে বুকে জাগছে! রোজই জখম হচ্ছে, কি তাকে হাসপাতালে পাঠায় কার সাধ্য! গোলন্দাজ সৈনিককে ঘুমাবার ছুটি দিয়ে ভাঙা-হাতেই সে কামান দাগছে। সেনাপতি হলেও সাধারণ সৈনিকের মত তার হাতে গ্রিনেডের আর বোমার থলি, পিঠে তরল আগুনের বাল্‌তি, আর হাতে রিভলভার তো আছেই। রক্ত বইয়ে, লোককে হত্যা করে তার যে কি আনন্দ, সে আর কি বলব! সে বলছে, —পরাধীন লোক যত কমে ততই মঙ্গল।

আমি অবাক হচ্ছি, এ সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে যায়নি তো!

* * *

এ কি করলে খোদা! এ কি করলে? এত আঘাতের পরেও হতভাগা দারাকে অন্ধ আর বধির করে দিলে? এই পৈশাচিক যুদ্ধ-তৃষ্ণার ফলে যে এই রকমই একটা কিছু

হবে, তা আমি অনেক আগে থেকেই ভয় করছিলাম ! আচ্ছা করুণাময়, তোমার লীলা আমরা বুঝতে পারি নে বটে, কি এই যে নিরপরাধ যুবকের চোখ দুটো বোমার আগুনে অন্ধ আর কান দুটো বধির করে দিলে, আর আমার মত পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না, এতেও কি বলব যে, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা লুকানো রয়েছে? কি সে মঙ্গল, এ অন্ধকে দেখাও প্রভু, দেখাও ! এ অন্ধের দাঁড়াবার যষ্টিও যে ভেঙে দিয়েছি আমি ! তবে কি আমার বাহিরটা অক্ষত রেখে ভিতরটাকে এমনি ছিন্ন-ভিন্ন আর ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে? ওগো ন্যায়ের কর্তা ! এই কি আমার দণ্ড, —এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি? ...

* * *

আজ আমাদের ঈপ্সিত এই প্রধান জয়োল্লাসের দিনেও আমাদের জয়-পতাকাটা রাজ-অট্টালিকার শিরে থর্ থর্ করে কাঁপছে ! বিজয়-ভেরীতে জয়নাদের পরিবর্তে যেন জান-মোচ্‌ড়ানো শ্রান্ত 'ওয়ালট্‌জ্'-রাগিণীর আর্ত সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে ! তুর্য-বাদকের স্বর ঘন ঘন ভেঙে যাচ্ছে ! আজ অন্ধ সেনানী দারার বিদায়ের দিন ! অন্ধ-বধির-আহত দারা যখন আমার কাঁধে ভর করে সৈনিকদের সামনে দাঁড়াল, তখন সমস্ত মুক্তিসেবক সেনার নয়ন দিয়ে হু-হু করে অশ্রুর বন্যা ছুটেছে ! আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা বোঝাবার ভাষা নেই। মুক্তিসেবক-সৈন্যাধ্যক্ষ বললেন, —তাঁর স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হয়ে যাচ্ছিল, —"ভাই দারাবী ! আমাদের মধ্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্', 'মিলিটারি ক্রস' প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেন না আমরা নিজে নিজেই তো আমাদের কাজকে পুরস্কৃত করতে পারি নে। আমাদের বীরত্বের, ত্যাগের পুরস্কার বিশ্ববাসীর কল্যাণ ; কি যারা তোমার মতো এই রকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায়, আমরা শুধু তাদেরই বীর বলি !"

সৈন্যাধ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে আর কোটের আস্তিনে তাঁর অবাধ্য অশ্রু-ফোঁটা কটি মুছে নিয়ে বললেন—"তুমি অন্ধ হয়েছ, তুমি বধির হয়েছ, তোমার সারা অঙ্গে জখমের কঠোর চিহ্ন, —আমরা বলব, এই তোমার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ! অনাহূত-তুমি বিশ্বের মঙ্গল-কামনায় প্রাণ দিতে এসেছিলে, তার বিনিময়ে খোদা নিজ হাতে যা দিয়েছেন, —হোক না কেন তা বাইরের চোখে নির্মম—তার বড় পুরস্কার, মানুষ আমরা কি দেব ভাই? "খোদা নিশ্চয়ই মহান এবং তিনি ভালো কাজের জন্যে লোকদের পুরস্কৃত করেন !" —এ যে তোমাদেরই পবিত্র কোরআনের বাণী ! অতএব হে বীর সেনানী, হয়তো তোমার এই অন্ধত্ব ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি সব সুখ সুপ্ত র'য়েছে ! খোদা তোমায় শান্তি দিন !"

দারা তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটি দিয়ে যতদূর সাধ্য সৈনিকগণকে দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অশ্রুচাপা কণ্ঠে শুধু বলতে পেরেছিল, —"বিদায়, পবিত্র বীর ভাইরা আমার !"

আমিও অন্ধ দারার সঙ্গে আবার এই গোলেস্তানেই এলাম ! আর এই তো আমার ব্যর্থ জীবনের সান্ত্বনা, এই নির্বিকার বীরের সেবা ! দারা আমায় ক্ষমা করেছে, আমায় সখা বলে কোল দিয়েছে ! এতদিনে না এই হতভাগ্য যুবকের রিক্ত জীবন সার্থকতার পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে উঠল ! এতদিনে না সত্যিকার ভালোবাসায় তাকে ঐ অসীম আকাশের মতোই অনন্ত উদার করে দিলে ! রাস্তায় আসতে আসতে তাকে জিজ্ঞেস কর্লাম, —"আচ্ছা ভাই, তুমি বেদৌরাকে ক্ষমা করেছ ?"

সে কান্না-ভরা হাসি হেসে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমীর এই গজলটা গাইলে,—

'ওগো প্রিয়তম ! তুমি যত বেদনার শিলা দিয়ে
আমার বুকে আঘাত করেছ, আমি তাই দিয়ে যে
প্রেমের মহান মসজিদ তৈরী করেছি !'

আমার বিশ্বাস, শিশুদের চেয়ে সরল আর কিছু নেই দুনিয়ায়। দারাও প্রেমের মহিমায় যেন অমনি সরল শিশু হয়ে পড়েছে। তার মুখে কেমন সহজ হাসি, আবার কেমন অসঙ্কোচ কান্না ! তা কি অতি বড় পাষাণকেও কাঁদায় ! আমি সে-দিন হাসতে হাসতে বললাম, —"হাঁ ভাই, এই যে তুমি অন্ধ আর বধির হয়ে গেলে, এতে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস পাচ্ছ কি ?"

সে বললে, —"ওরে বোকা, এই যে তোদের আজ ক্ষমা করতে পেরেছি—এই যে আমার মনের সব গ্লানি সব ক্লেদ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে, সে এই অন্ধ হয়েছি বলেই তো, —এই বাইরের চোখ দুটোকে কানা করে আর শ্রবণ দুটোকে বধির করেই তো ! অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি যা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি। এখন আমি দেখছি দুনিয়া-ভরা শুধু প্রিয়ার রূপ আর তারই হাসির অনন্ত আলো ! আর এই কালা কান দুটো দিয়ে কি শুন্ছি, জানিস ? শুধু তার কানে-কানে-বলা গোপন-প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণ-ভরা মঞ্জীরের রুণু-ঝুনু বোল ! —আমি যে এই নিয়েই মশগুল !" বলেই অভিভূত হয়ে সে গান ধ'রলে,—

'যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর নাহি ফিরে আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো !
আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর কেহ নাই কিছু নাই গো !'

কানাড়া রাগিণীর কোমল গান্ধারে আর নিখাদে যেন তার সমস্ত আবিষ্ট বেদনা মূর্তি ধরে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁদে যাচ্ছিল ! কি কত শান্ত-স্নিগ্ধ বিরাট নির্ভরতা আর ত্যাগ এই গানে !

সবচেয়ে আমার বেশি আশ্চর্য বোধ হচ্ছে যে, বেদৌরাও আমাকে ক্ষমা করেছে, অথচ তার এ-বলায় এতটুকু কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। এ যেন প্রাণ হতে ক্ষমা করে বলা !

খোদা, তুমি মহান! "যার কেউ নেই তুমি তার আছ।" এই প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি-যে-আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই!

আজ এই বিনা কাজের আনন্দ, —ওঃ, তা কত মধুর আর সুন্দর!

বেদৌরার কথা

গোলেস্তান
(নির্ঝরের অপর পার)

তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন একেবারে প্রাণ খুলে, হৃদয়, হতে! এবার এ-ক্ষমায় এতটুকু দীনতা নেই। এ যে হবেই, তা তো আমি জানতামই, আর তাই যে এমন করে আমার প্রতীক্ষার সকাল-সাঁঝগুলো আনন্দেই কেটে গিয়েছে! আমার এই আশায় বসে-থাকা দিনগুলো, বিরলে-গাঁথা ফুলহারগুলো আর বেদনাবারিসিক্ত বিরহ-গানগুলো তাঁরই পায়ে ঢেলে দিয়েছি। তিনি তা গলায় তুলে আর বিনিময়ে যা দিয়েছেন, সেই তো গো তাঁর আমায়-দেওয়া ব্যথার দান!

তিনি বললেন, —'বেদৌরা! কামনা আর প্রেম, এ দুটো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। কামনার প্রবৃত্তি বা তার নিবৃত্তিতে হৃদয়ের দাগ-কাটা ভালবাসাকে যে ঢাকতেই পারে না, এ হচ্ছে ধ্রুব সত্য। এই রকম বিড়ম্বিত যে বেচারারা এই কথাটা একটু তলিয়ে দেখে ধীরভাবে বিশ্বাস করে না, তারা মস্ত ভুল করে, আর তাদের মতো হতভাগ্য অশান্ত জীবনও আর কারুর নেই। বাদলার দিনে কালো মেঘগুলো সূর্যকে গ্রাস করতে যতই চেষ্টা করুক, তা কিন্তু পারে না। তবে তাকে খানিকক্ষণের জন্যে আড়াল করে থাকে মাত্র। কেননা সূর্য থাকে মেঘের নাগাল পাওয়ার অনেক দূরে! কোন্ ফাঁকে আর সে কেমন করে যে অত মেঘের পুরু স্তর ছিঁড়ে রবির কিরণ দুনিয়ার বুকে প্রতিফলিত হয়, তা মেঘেও ভেবে পায় না, আর আমরাও জানতে চেষ্টা করিনে। তারপর মেঘ কেটে গেলেই সূর্য হাসতে থাকে আরও উজ্জ্বল হয়ে। কারণ, তাতে তো সূর্যের কোনো অনিষ্ট হয় না, —সে জানে, সে কেমন আছে তেমনি অটুট থাকবেই; ক্ষতি যা তোমার আমার—এই দুনিয়ার। তাই বলে কি বাদলের মেঘ আসবে না? সে এসে আকাশ ছাইবে না? সে আসবেই, ও যে স্বভাব; তাকে কেউ রুখতে পারবে না। তবে অত বাদলেও সূর্য-কিরণ পেতে হলে মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে হয়। সেটা তেমন সোজা নয়, আর তা দরকারও করে না। কামনাটা হ'চ্ছে ঠিক এই বাদলের মতো; আর প্রেম জ্বলছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মতো একইভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে!

'কামনায় হয়তো তোমার বাহিরটা নষ্ট করেছে, কিন্তু ভিতরটা তো নষ্ট ক'রতে পারে নি। তা ছাড়া, ও না হ'লে যে তুমি আমাকে এত বেশি ক'রে চিনতে না, এত বড় ক'রে

পেতে না। বাইরের বাতাস প্রেমের শিখা নিবাতে পারে না, আরও উজ্জ্বল করে দেয়। আর আমার অন্ধত্ব ও বধিরতা? ওর জন্যে কেঁদো না বেদৌরা, এ-গুলো থাকলে তো আমি তোমায় আর পেতাম না!'

পুষ্পিত সেব গাছ থেকে অশ্রুচাপা কণ্ঠে 'পিয়া পিয়া' করে বুলবুলগুলো উড়ে গেল!

তিনি আবার ব'ললেন, —"দেখ বেদৌরা, আজ আমাদের শেষ বাসর-শয্যা হবে। তার পর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যাবে নির্ঝরটার ও-পারে, আর আমি থাকব এ-পারে। এই দুপারে থেকে আমাদের দুজনেরই বিরহ-গীতি দুইজনকে ব্যথিয়ে তুলবে। আর ঐ ব্যথার আনন্দেই আমরা দুজনে দুজনকে আরো বড়—আরো বড় করে পাব!"

সেই দিন থেকে আমি নির্ঝরটার এ-পারে।

আমারও অশ্রু-ভরা দীর্ঘশ্বাস হু-হু ক'রে ওঠে, যখন মৌন-বিষাদে-নীরব সন্ধ্যায় তাঁর ভারি চাপা কণ্ঠ ছেপে একটা ক্লান্ত রাগিণী ও-পার হ'তে কাঁদতে কাঁদতে এ-পারে এসে বলে,—

'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন!'

হেনা

ভার্দুন ট্রেঞ্চ, ফ্রান্স

ওঃ ! কি আগুন-বৃষ্টি ! আর কি তার ভয়ানক শব্দ ! —গুড়ুম্—দ্রুম—দুম ! আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে ! গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝরত আসমানের নীলচক্ষু বেয়ে, তাহ'লে এক দিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হয়ে যেত ! আর এমনি অনবরত যদি এই বাজের চেয়েও কড়া 'দ্রুম্—দ্রুম্' শব্দ হতো, তাহলে লোকের কানগুলো একেবারে অকেজো হয়ে যেত। আজ শুধু আমাদের সিপাইদের সেই হোলি খেলার গানটা মনে পড়ছে,—

> 'আজু তল্‌ওয়ার সে খেলেঙ্গে হোরি,
> জমা হো গেয়ে দুনিয়া কা সিপাঈ।
> ঢালোঁও কি ডঙ্কা বাদন লাগি, তোপোঁও কে পিচকারি,
> গোলা বারুদকা রঙ্ বনি হ্যেয়, লাগি হেয় ভারি লড়াঈ !'

বাস্তবিক এ গোলা-বারুদের রঙে আসমান-জমিন লালে-লাল হয়ে গেছে ! সবচেয়ে বেশি লাল ঐ বুকে 'বেয়নেট'-পোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত ! লালে লাল ! শুধু লাল আর লাল ! এক একটা সিপাই 'শহীদ' হয়েছে, আর যেন বিয়ের নওশার মতো লাল হয়ে শুয়ে আছে !

ওঃ ! সবচেয়ে বিশ্রী ঐ ধোঁয়ার গন্ধটা। বাপ্ রে বাপ্ ! ওর গন্ধে যেন বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে ওঠে। মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাদের মারবার জন্যে এ-সব কি কুৎসিত নিষ্ঠুর উপায়। রাইফলের গুলির প্রাণহীন সীসাগুলো যখন হাড়ে এসে ঠেকে, তখন সেটা কি বিশ্রীরকম ফেটে চৌচির হয়ে দেহের ভিতরের মাংসগুলোকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।

এত বুদ্ধি মানুষ অন্য কাজে লাগালে তারা ফেরেশ্‌তার কাছাকাছি একটা খুব বড় জাত হয়ে দাঁড়াত !

ওঃ ! কি বুক-ফাটা পিয়াস ! এই যে পাশের বন্ধু রাইফেল্‌টা কাৎ করে ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে, একে আর হাজার কামান এক সঙ্গে গর্জে উঠলেও জাগাতে পারবে না—কোনো সেনাপতি আর তার হুকুম মানাতে পারবে না। এই সাত দিন ধরে একরোখা ট্রেঞ্চে কাদায় শুয়ে শুয়ে অনবরত গুলি ছোঁড়ার ক্লান্তির পর সে কি নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে এর প্রাণে ! তৃপ্তির কি স্নিগ্ধ স্পর্শ এখনো লেগে রয়েছে এর শুষ্ক শীতল ওষ্ঠপুটে !

যাক—যে ভয়ানক পিয়াস লেগেছে এখন আমার! এখন ওর কোমর থেকে জলের বোতলটা খুলে একটু জল খেয়ে জানটা ঠাণ্ডা করি তো! কাল থেকে আমার জল ফুরিয়ে গিয়েছে, কেউ এক ফোঁটা জল দেয়নি। —আঃ! আঃ! এই গভীর তৃষ্ণার পর এই এক চুমুক জল, সে কত মিষ্টি! অনবরত চালিয়ে চালিয়ে আমার লুইস্ গানটাও আর চলছে না। এখন আমার মৃত বন্ধুর লুইস্ গানটা দিয়ে দিব্যি কাজ চলবে! —এর যদি মা কিংবা বোন কিংবা স্ত্রী থাকত আজ এখানে, তা হলে এর এই গোলার আঘাতে ভাঙা মাথার খুলিটা কোলে করে খুব এক চোট কেঁদে নিত! যাক, খানিক পরে একটা বিশ-পঁচিশ মণের মস্ত ভারি গোলা হয়তো ট্রেঞ্চের সামনেটায় পড়ে আমাদের দুজনাকেই গোর দিয়ে দেবে! সে মন্দ হবে না!

হ্যাঁ, আমার এত হাসি পাচ্ছে ঐ কান্নার কথা মনে হয়ে! আরে ধ্যেৎ, সবাই মরব; আমি মরব, তুইও মরবি! এত বড় একটা নিছক সত্যি একটা স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে কান্না কিসের?

এই যে এত কষ্ট, এত মেহনত করছি, এত জখম হচ্ছি, তবুও সে কি একটা পৈশাচিক আনন্দ আমার বুক ছেয়ে ফেলছে! সে আনন্দটা এই কাঠ-পেন্সিলটার সীসা দিয়ে এঁকে দেখাতে পারছিনে! মস্ত ঘন ব্যথার বুকেও একটা বেশ আনন্দ ঘুম-পাড়ানো থাকে, যেটা আমরা ভাল করে অনুভব করতে পারিনে। এই লেখা অভ্যেসটা কি খারাব! এত আগুনের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছি,—পায়ের নিচে দশ-বিশটা মড়া, মাথার ওপর উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফাটছে—দুম্—দুম্—দুম্, সামনে বিশ হাত দূরে বড় বড় গোলা ফাটছে গুড়ুম গুড়ুম, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে 'রাইফেল্' আর 'মেশিনগানে'র গুলি—শোঁ শোঁ শোঁ, —তবুও এই সাতটা দিন মনের কথাগুলো খাতার কাগজগুলোকে না জানাতে পেরে জানটাকে কি ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল! আজ এই ক'টা কথা লিখে বুকটা বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে!

আঃ পাশের মরা বন্ধুর গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্যি একটু আরাম করে নেওয়া যাক! ওঃ কি আরাম! ...

এই সিন্ধুপারের একটা অজানা বিদেশিনী ছোট্ট মেম আমায় খানিকটা আচার আর দুটো মাখন-মাখা রুটি দিয়েছিল। সেটা আর খাওয়াই হয়নি। এদেশের মেয়েরা আমাদের এত স্নেহের আর করুণার চক্ষে দেখে! —হা-হা-হা-হাঃ, রুটি দুটো দেখ্ছি শুকিয়ে দিব্যি 'রোস্ট' হয়ে আছে! দেখা যাক, রুটি শক্ত না আমার দাঁত শক্ত! ওই খেতে হবে কিন্তু, পেটে যে আগুন জ্বলছে! —আচারটা কিন্তু বেড়ে তাজা আছে, দেখছি!

ঐ তেরো চৌদ্দ বছরের কচি মেয়েটা (আমাদের দেশে ও-রকম মেয়ে নিশ্চয়ই সন্তানের জননী নতুবা যুবতী গিন্নী!) যখন আমার গলা ধরে চুমু খেয়ে বললে,—'দাদা, এ-লড়াইতে কিন্তু শত্তুরকে খুব জোর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে,' তখন আমার মুখে সে কি একটা পবিত্র বেদনা-মাখা হাসি ফুটে উঠেছিল!

আঃ ! এতক্ষণে আকাশটা বেরোবার একটু ফাঁক পেয়েছে। রাশি রাশি জল-ভরা মেঘের ফাঁকে একটু একটু নীল আসমান দেখা যাচ্ছে। সে কত সুন্দর ! ঠিক যেন অশ্রুভরা চোখের ঈষৎ একটুকু সুনীল রেখা !

থাক গে এখন, অন্য সময় বাকি কথাগুলো লেখা যাবে। মরা বন্ধুর আত্মা হয়তো আমার ওপর চটে উঠেছে এতক্ষণ। কি বন্ধু, একটু জল দেব নাকি মুখে? —ইস্ হাঁ করে তাকাচ্ছেন দেখ ! না বন্ধু—না, তোমার পরপারের প্রিয়তমা হয়তো তোমার জন্যে শরবতের গেলাস-হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ! আহা, সে-বেচারিকে বঞ্চিত করব না তার সেবার আনন্দ থেকে !

আজ কত কথাই মনে হচ্ছে,—না—না, কিচ্ছু মনে হচ্ছে না, সব ঝুটা ! ফের লুইস্ গানটায় গুলি চালানো যাক ! —আমার সাহায্যকারী কয়জন বেশ তোয়াজ করে ঘুমিয়ে নিলে তো দেখছি !

ঐ—ঐ, পাশে কাদের তালে তালে পা মিলিয়ে চলার শব্দ পাচ্ছি ! ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্—লেফট্ রাইট্ লেফট্ ! ঐ মিলিয়ে চলার শব্দটা কি মধুর ! ও বুঝি আমাদের 'রিলিভ' করতে আসছে অন্য পল্টন।

উঃ ! এতটুকু অসাবধানতার জন্যে হাতের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল দেখছি একটা গুলিতে ! ... ব্যান্ডেজটা বেঁধে নিই নিজেই। নার্সগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারিনে। নারী যদি ভালো না বেসে সেবা করে আমার, তবে সে-সেবা আমি নেব কেন ?

আঃ, যুদ্ধের এই খুনোখুনির কি মাদকতা-শক্তি ! মানুষ মারার কেমন একটা গাঢ় নেশা।

পাশে আমার চেয়ে অত বড় জোয়ানটা এলিয়ে পড়েছে, দেখছি ! আমি দেখছি, শরীরের বলের চেয়ে মনের বলের শক্তি অনেক বেশি।

লুইস্ গানে এক মিনিটে প্রায় ছয়-সাত শো করে গুলি ছাড়ছি। যদি জানতে পারতুম, ওতে কত মানুষ মরছে ! —তা হোক এক দু কোণের দুটো লুইস্ গান্ই শত্রুদের জোর আটকিয়ে রেখেছে কিন্তু। কি চিৎকার করে মরছে শত্রুগুলো দলে দলে ! কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী !

সিঁন নদীর ধারের তাম্বু, ফ্রান্স

এই দুটো দিনের আটচল্লিশ ঘণ্টা খালি লম্বা ঘুম দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। এখন আবার ধড়া-চুড়ো পরে বেরোতে হবে খোদার সৃষ্টি নাশ করতে। এই মানুষ-মারা

বিদ্যে লড়াইটা ঠিক আমার মতো পাথর-বুকো কাঠখোট্টা লোকেরই মনের মতো জিনিস।

আজ সেই বিদেশিনী কিশোরী আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কি পরিষ্কার সুন্দর ফিট্‌ফাট্ বাড়িগুলো এদের! মেয়েটা আমাকে খুব ভালোবেসেছে। আমিও বেসেছি। আমাদের দেশে হলে বলত মেয়েটা খারাব হয়ে যাচ্ছে! কুড়ি-একুশ বছরের একজন যুবকের সঙ্গে একটা কুমারী কিশোরীর মেলা-মেশা আদৌ পছন্দ করত না!

ভালোবাসাটাকে কি কুৎসিত চক্ষে দেখছে আজ-কাল লোকেরা! মানুষ তো নয়, যেন শকুনি! দুনিয়ায় এত পাপ! মানুষ এত ছোট হলো কি করে? তাদের মাথার ওপর অমন উদার অসীম নীল আকাশ, আর তারই নিচে মানুষ কি সঙ্কীর্ণ, কি ছোট!

আগুন, তুমি ঝরো—ঝম্ ঝম্ ঝম্! খোদার অভিশাপ তুমি নেমে এসো ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মতো হয়ে—ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্! ইসরাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিসাড় করে দিয়ে—ওম্ ওম্ ওম্! প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর বোমার মধ্যে দিয়ে ফাটো—ঠিক মানুষের মগজের ওপর—দ্রুম্-দ্রুম্-দ্রুম্! আর সমস্ত দুনিয়াটা—সমস্ত আকাশ উল্টে ভেঙে পড়ো তাদের মাথায়, যারা ভালবাসায় কলঙ্ক আনে, ফুলকে অপবিত্র করে।

এখন যে সাজে সেজেছি, ঠিক এইরকম সাজে যদি আমাদের দেশের একটা লোককে সাজিয়ে উল্‌টে ফেলে দিই, তাহ'লে হাজার ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও সে আর উঠতে পারবে না। আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে আমার এখনকার এই গদাই-লশকরি চেহারা দেখে!

আমার এক 'ফাজিল' বন্ধু বলছেন,—'কি নিমকিন চেহারা!'—আহা, কি উপমার ছিরি! কে নাকি বলেছিল, —'ষাঁড়টা দেখতে যেন ঠিক কাতলা মাছ!'

ফ্রান্স
প্যারিসের পাশের ঘন বন

কাল হঠাৎ এই মস্ত জঙ্গলটায় আসতে হলো। কেন এ রকম পিছিয়ে আসতে হলো তার এতটুকুও জানতে পারলুম না! এ-মিলিটারি লাইনের ঐ-টুকুই সৌন্দর্য! তোমার ওপর হুকুম হলো 'ঐ কাজটা করো!' 'কেন ও-রকম করব?' তার কৈফিয়ত চাইবার কোনো অধিকার নেই তোমার। বাস্—হুকুম!

যদি বলি, 'মৃত্যু যে ঘনিয়ে আসছে!' অমনি বজ্রগম্ভীর স্বরে তার কড়া জবাব আসবে,—'যতক্ষণ তোমার নিশ্বাস আছে, ততক্ষণ কাজ করে যাও, যদি চলতে চলতে তোমার ডান পায়ের ওপর মৃত্যু হয়, তবে বাপ মা পর্যন্ত চলো!'

আঃ এই হুকুম মানায়, এই জীবন-পণ আনুগত্যে কত যে নিবিড় মাধুরী! বাজের মাঝে এ কি কোমলতা! যদি সমস্ত দুনিয়াটা এমনি একটা (এবং কেবল একটা) সামরিক শক্তির অধীন হয়ে যেত, তাহলে এই মাটির জমিনই এমন একটা সুন্দর স্থান হয়ে দাঁড়াত, যাকে 'জিন্নাতুল বাকিয়া' (শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ) বললেও লোক তৃপ্ত হতো না!

কি শৃঙ্খলা এই ব্রিটিশ জাতিটার কাজে-কর্মে কায়দা-কানুনে, তাই তারা আজ এত বড়। ওপর দিকে চাইতে গিয়ে আমাদের মাথার পাগড়ি পড়ে গেলেও তাদের মাথাটা দেখতে পাব না। মোটামুটি বলতে গেলে তাদের এই দুনিয়া-জোড়া রাজত্বিটা একটা মস্ত বড় ঘড়ি, আর সেটা খুবই ঠিক চলছে, কেননা তার সেকেন্ডের কাঁটা থেকে ঘন্টার কাঁটা পর্যন্ত সব তাতে বড্ডো কড়া বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম। সেই আবার রোজই 'অয়েল্ড' হচ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।

আমরাই নিয়ে গেলুম জার্মানদের 'হিন্ডেনবার্গ লাইন' পর্যন্ত খেদিয়ে, আবার আমাদেরই এতটা পিছিয়ে যেতে হলো! —ঘড়িটা যে তৈরি করেছে, সে জানে কোন্ কাঁটার কোন্‌খানে কি কাজ, কিন্তু কাঁটা কিচ্ছু বুঝতে পারে না। তবু তাকে কাজ করে যেতে হবে, কেননা, একটা স্প্রিং অনবরত তার পেছন থেকে তাকে গুঁতো মারছে!

এমনি একটা বিরাট কঠিন শৃঙ্খল, মস্ত বাঁধাবাঁধি আমাদের খুবই দরকার। আমাদের এই 'বেঁড়ে' জাতটাকে এমনি খুব পিঠ-মোড়া করে বেঁধে দোরস্ত না করলে এর ভবিষ্যতে আর উঠে দাঁড়াবার কোনো ভরসাই নেই! দেশের সবাই মোড়ল হলে কি আর কাজ চলে!

ওঃ, এত দূরেও আমাদের উপর গোলাবৃষ্টি! এ যেন একটা ভুতুড়ে কাণ্ড। কোথায় কোন্ সুদূরে লড়াই হচ্ছে, আর এখানে কি করে এই জঙ্গলে গোলা আসছে?

হাতি যখন ভাবে, তার চেয়ে বড় জানোয়ার আর নেই, তখন ছোট্ট একটি মশা তা মগজে কাম্‌ড়ে কিরকম 'ঘায়েল' করে দেয় তাকে।

এখানে এই গাছ-পালার আড়ালে একটা স্নিগ্ধ ছায়ার অন্ধকারে বেশ থাকা যাচ্ছে, কিন্তু এমনি একটু অন্ধকারের জন্যে আমার জান্‌টা বড্ডো বেশি আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল!

হায়! এই অন্ধকারে এলে কত কথাই মনে পড়ে আমার আবার! —নাঃ! যাই একবার গাছে চড়ে দেখি আশেপাশে কোথাও দুশমন লুকিয়ে আছে কি না।

আহ, গাছ থেকে ঐ দূরে বরফে-ঢাকা নদীটা কি সুন্দর! আবার ঐ গালার ঘায়ে ভাঙা মস্ত বাড়িগুলো কি বিশ্রী হাঁ করে আছে! এই সব ভাঙাগড়া দেখে আমার সেই ছোট্টবেলাকার কথা মনে পড়ে। তখন আমরা খুব ঘটা করে ধুলোবালির ঘর বানাতুম।

তার পর খেলা শেষ হলে সেগুলোকে পা দিয়ে ভেঙে দিতুম, আর সমস্বরে ভাঙার গান গাইতুম,—

'হাতের সুখে বানালুম
পায়ের সুখে ভাঙলুম !'

অনেক দূরে ঐ কামানের গোলাগুলো পড়ছে আর এখান থেকে দেখাচ্ছে যেন আসমানের বুক থেকে তারাগুলো খসে খসে পড়ছে !

ওঃ, কি বোঁ—বোঁ শব্দ ! ঐ যে মস্ত উড়োজাহাজ কি ভয়ানক জোরে ঘুরছে, উঠছে আর নামছে ! ঠিক যেন একটা চিলেঘুড়িকে খেলোয়াড় গোঁতা মারছে ! ওটা আমাদেরই। জার্মানদের জেপেলিনগুলো দূর থেকে দেখায় যেন একটা বড় শুঁয়োপোকা উড়ে যাচ্ছে।

যাক, আমার 'হ্যাভার স্যাক' থেকে একটু আচার বের করে খাওয়া যাক। সেই বিদেশিনী মেয়েটি আজ কত দূরে, কিন্তু তার ছোঁয়া যেন এখনো লেগে রয়েছে এই ফলের আচারে ! —দূর ছাই ! যত সব বাজে কথা মনে হয় কেন ? খামখা সাত ভূতের বেদনা এসে জানটা কচ্‌লে কচ্‌লে দিয়ে যায় !

হা–হা–হা–হাঃ, বন্ধু আমার পাশের গাছটায় বসে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন দেখছি। ঐ যে দিব্যি কোমর–বন্ধটা দিয়ে নিজেকে একটা ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত করে বেঁধেছেন। একবার পড়েন যদি ঝুপ্ করে ঐ নিচের জলটায়, তাহলে বেড়ে একটা রগড় হয় কিন্তু ! পড়িস আল্লা করে—এই সরাৎ দু—ম্ ! ...

দেবো নাকি তার কানের গোড়া দিয়ে শোঁ করে একটা পিস্তলের গুলি ছেড়ে ? আহা–হা, না না, ঘুমুক বেচারা ! আমার মতন এমন পোড়া–চোখ তো আর কারুর নেই যে, ঘুম আসবে না, আর এমন পোড়া মনও কারুর নেই যে, সারা দুনিয়ার কথা ভেবে মাথা ধরাবে !

রাত্রি হয়েছে, —অনেকটা হবে ! ভোর পর্যন্ত এমনি করেই কুঁকড়ো অবতার হয়ে থাকতে হবে। ... বুড়ো কালে (অবশ্য, যদি ততদিন বেঁচে থাকি !) এইসব কথা আর খাটুনির স্মৃতি কি মধুর হয়ে দেখা দেবে !

মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের জ্যোছনা কেমন ছিটে–ফোঁটা হয়ে পড়ছে সারা বনটার বুকে ! এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতাবাঘের মতো দেখাচ্ছে !

কালো ভারি জমাট মেঘগুলো আমার মাথার দু হাত ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় ভেসে উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর তারই দু এক ফোঁটা শীতল জল আমার মাথায় পড়ছে টপ্–টপ্–টপ্ ! কি করুণ শীতল সে জমাট মেঘের দুফোঁটা জল ! আঃ !

চাঁদটা একবার ঢাকা পড়ছে, আবার শাঁ করে বেরিয়ে আর একটা মেঘে সেঁধিয়ে পড়ছে ! এ যেন বাদশাহজাদার শিশ্–মহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। কি

ছুট্ছে? চাঁদ, না মেঘ? আমি বলব 'মেঘ', একটি সরল ছোট্ট শিশু বলবে 'চাঁদ'। কার কথা সত্যি?

আহা, কি সুন্দর আলো-ছায়া!

দূরে ওটা কি একটা পাখি অমন করে ডাকছে! এ-দেশের পাখিগুলোর সুর কেমন একটা মধুর অলসতায় ভরা! শুনলে যেন নেশা ধরে।

এই আলো-ছায়ায় আমার কত কথাই না মনে পড়ছে। ওঃ, তার চিন্তাটা কি ব্যথায় ভরা!

আমার মনে পড়ছে আমি বললুম, —'হেনা, তোমায় বড্ডো ভালোবাসি।'

সে, —হেনা তার কস্তুরীর মতো কালো পশমিনা অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, —'সোহ্‌রাব, আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসতে পারিনি।'

সেদিন জাফরানের ফুলে যেন 'খুন্‌-খোশ্‌রোজ' খেলা হচ্ছিল বেলুচিস্তানের ময়দানে! আমি আনমনে আখরোটের ছোট্ট একটা ডাল ভেঙে কাছের দেবদারু গাছ থেকে কতকগুলো ঝুমকো ফুল পেড়ে হেনার পায়ের কাছে ফেলে দিলুম!

তাম্বুলি-সুর্‌মা-মাখা তার কালো আঁখির পাতা ঝরে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার মেহেদি-ছোপানো হাতের চেয়েও লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখটা!

একটা কাঁচা মনক্কার থোকা ছিঁড়ে নিয়ে অদূরের কেয়া ঝোপের বুলবুলিটার দিকে ছুঁড়ে দিলুম। সে গান বন্ধ করে উড়ে গেল।

মানুষ যেটা ভাবে সবচেয়ে কাছে, সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে দূরে! এ একটা মস্ত বড় প্রহেলিকা!

হেনা! হেনা!! আফসোস্‌!!!

হিন্ডেনবার্গ লাইন

ওঃ! আবার কোথায় এসেছি! এটা যে একটা পাতালপুরী, দেও আর পরিদের রাজ্যি, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনে! যুদ্ধের ট্রেঞ্চ যে একটা বড় শহরের মতো এ-রকম ঘর-বাড়ি-ওয়ালা হবে, তা কি কেউ অনুমান করতে পেরেছিল? জমিনের এত নিচে কি বিরাট্‌ কাণ্ড! এও একটা পৃথিবীর মস্ত বড় আশ্চর্য। দিব্যি বাংলার নওয়াবদের মতো থাকা যাচ্ছে কিন্তু এখানে! ...

এ শান্তির জন্যে তো আসিনি এখানে! আমি তো সুখ চাইনি। আমি চেয়েছি শুধু ক্লেশ, শুধু ব্যথা, শুধু আঘাত! এ আরামের জীবনে আমার পোষাবে না বাপু! তাহলে আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে। এ যেন ঠিক 'টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল-তলায় বাসা।'

উঁহু, —আমি কাজ চাই! নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চাই। এ কি অস্বস্তির আরাম!

আচ্ছা, আগুনে পুড়ে নাকি লোহাও ইস্পাত হয়ে যায়। মানুষ কি হয়? শুধু 'ব্যাপ্‌টাইজড্'?

আবার মনটা ছাড়া পেয়ে আমার সেই আঙুর আর বেদানা গাছে-ভরা ঘরটায় দৌড় মেরেছে! আবার মনে পড়ছে সেই কথা! ...

'হেনা, আমি যাচ্ছি মুক্ত দেশের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যার ভিতরে আগুন, আমি চাই তার বাইরেও আগুন জ্বলুক! আর হয়তো আসব না। তবে আমার সম্বল কি? পাথেয় কই? আমি কি নিয়ে সেই অচিন দেশে থাকব?'

আমার হাতের মুঠোয় হেনার হেনারঞ্জিত হাত দু'টি কিশলয়ের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল। সে স্পষ্টই বললে, —'এ তো তোমার জীবনের সার্থকতা নয় সোহ্‌রাব! এ তোমার রক্তের উষ্ণতা! এ কি মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছ! এখনও বোঝো! ... আমি আজও তোমায় ভালবাসতে পারিনি।

সব খালি! সব শূন্য! খাঁ—খাঁ—খাঁ! একটা জোর দম্‌কা বাতাস ঘন ঝাউ গাছে বাধা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, —আঃ—আঃ—আঃ!

যখন কোয়েটা থেকে আমাদের ১২৭ নম্বর বেলুচি রেজিমেন্টের প্রথম 'ব্যাটালিয়ন' যাত্রা করলে এই দেশে আসবার জন্যে, তখন আমার বন্ধু একজন বাঙালি যুবক ডাক্তার সেব গাছের তলায় বসে গাচ্ছিল,—

'এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে,
বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে।
আজি মধু সমীরণে
নিশীথে কুসুম-বনে,
তারে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে?
এখন ফিরাবে হায় কিসের ছলে!
মধুনিশি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে!
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!'

কি দুর্বল আমি! সাধে কি আসতে চাইনি এখানে! ওগো, এ-রকম নওয়াবী-জীবন আমার চলবে না!

আমার রেজিমেন্টের লোকগুলো মনে করে আমার মতো এত মুক্ত, এত সুখী আর কেউ নেই। কারণ আমি বড্ডো বেশি হাসি। হায়, মেহেদি পাতার সবুজ বুকে যে কত 'খুন' লুকানো থাকে, কে তার খবর নেয়!

আমি পিয়ানোতে 'হোম হোম সুইট্ সুইট্ হোম' গৎটা বাজিয়ে সুন্দর রূপে গাইলুম দেখে ফরাসিরা অবাক হয়ে গেছে, যেন আমরা মানুষই নই, ওদের মতো উকোনো কাজ করা যেন আমাদের পক্ষে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! এ ভুল কিন্তু ভাঙাতেই হবে।

হিন্ডেনবার্গ লাইন

কি করি, কাজ না থাকলেও আমায় কাজ খুঁজে নিতে হয়। কাল রাত্তিরে প্রায় দু'মাইল শুধু হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ওদের অনেক তার কেটে দিয়ে এসেছি। কেউ এতটুকু টের পায়নি।

আমার কমান্ডিং অফিসার সাহেব বলেছেন, 'তুম্‌কো বাহাদুরি মিল যায়েগা।'

আজ আমি 'হাবিলদার' হলুম।

এ মন্দ খেলা নয় তো!

আবার সেই বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল! এই দু বছরে কত বেশি সুন্দর হয়ে গেছে সে! সেদিন সে সোজাসুজি বললে, যে, (যদি আমার আপত্তি না থাকে) সে আমায় তার সঙ্গী-রূপে পেতে চায়! আমি বললুম, —'না, তা হতেই পারে না!'

মনে মনে বললুম, —'অন্ধের লাঠি একবার হারায়। আবার? আর না। যা যা খেয়েছি, তাই সাম্‌লানো দায়।'

বিদেশিনীর নীল চোখ দুটো যে কিরকম জলে ভরে উঠেছিল, আর বুকটা তার কি রকম ফুলে ফুলে উঠেছিল, তা আমার মতো পাষাণকেও কাঁদিয়েছিল!

তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, —'তবে আমাকে ভালবাসতে দেবে তো? অন্তত ভাই-এর মতো ...'

আমি বেওয়ারিশ মাল। অতএব খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললুম, —'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' তারপর তার ভাষায় 'অডিএ' (বিদায়) বলে সে যে সেই গিয়েছে, আর আসেনি! আমার শুধু মনে হচ্ছে, —সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে! ... ওঃ—

যা হোক, আজ গুর্খাদের পেয়ে বেশ থাকা গেছে কিন্তু। গুর্খাগুলো এখনও যেন এক-একটা শিশু। দুনিয়ার মানুষ যে এত সরল হতে পারে, তা আমার বিশ্বাসই ছিল না। এই গুর্খা আর তাদের ভায়রা-ভাই 'গাড়োয়াল', এই দুটো জাতই আবার যুদ্ধের সময় কি-রকম ভীষণ হয়ে ওঠে! তখন এদের প্রত্যেকে যেন এক-একটা 'শেরে বব্বর'-এদের 'খুক্‌রি' দেখলে এখনও জার্মানরা রাইফেল্ ছেড়ে পালায়। এই দুটো জাত যদি না থাকত, তাহলে আজ এতদূর এগুতে পারতুম না আমরা। তাদের মাত্র কয় জন

আর বেঁচে আছে। রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট একেবারে সাবাড় ! অথচ যে দুচার জন বেঁচে আছে, তারাই কিরকম হাসছে খেলছে ! যেন কিছুই হয়নি।

ওরা যে মস্ত একটা কাজ করেছে, এইটেই কেউ এখনও ওদের বুঝিয়ে উঠতে পারেনি। আর ঐ এত লম্বা-চওড়া শিখগুলো, তারা কি বিশ্বাসঘাতকতাই না করেছে ! নিজের হাতে নিজে গুলি মেরে হাসপাতালে গিয়েছে।

বাহ্বা ! ট্রেঞ্চের ভিতর একটা ব্যাটালিয়ন 'মার্চ' হচ্ছে। ফ্রান্সের মধুর ব্যান্ডের তালে তালে কি সুন্দর পা-গুলো পড়ছে আমাদের ! লেফ্‌ট্—রাইট্—লেফ্‌ট্ ! ঝপ্—ঝপ্—ঝপ্। এই হাজার লোকের পা এক সঙ্গেই উঠছে, এক সঙ্গেই পড়ছে ! কি সুন্দর !

বেলুচিস্তান

কোয়েটার দ্রাক্ষাকুঞ্জস্থিত

আমার ছোট্ট কুটির

এ কি হলো ? আজ এই আখরোট আর নাশপাতির বাগানে বসে বসে তাই ভাবছি।

আমাদের সব ভারতীয় সৈন্য দেশে ফিরে এল, আমিও এলুম। কিন্তু সে দুটো বছর কি সুখেই কেটেছে !

আজ এই একটু আগে বৃষ্টির জলে-ধোওয়া স্বচ্ছ নীল আস্‌মানটি দেখছি, আর মনে পড়ছে সেই ফরাসি তরুণীটার ফাঁক-ফাঁক নীল চোখ দু'টি। পাহাড়ে ঐ চমরী মৃগ দেখে তার সেই থোকা থোকা কোঁকড়ানো রেশমি চুলগুলো মনে পড়ছে। আর ঐ যে পাকা আঙুর ঢল্-ঢল্ করছে, অমনি স্বচ্ছ তার চোখের জল।

আমি 'অফিসার' হয়ে 'সর্দার বাহাদুর' খেতাব পেলুম। সাহেব আমায় কিছুতেই ছাড়বে না। হায়, কে বুঝবে আর কাকেই বা বোঝাব, ওগো আমি বাঁধন কিনতে আসিনি। সিন্ধুপারে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যাইনি। ও শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি করে নিতে, —নিজেকে চাপা দিতে।

আবার এইখানটাতেই, যেখানে কখনো আসব না মনে করেছিলুম, আসতে হলো।

সিন্ধুপারে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যাইনি। ও শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি করে নিতে, —নিজেকে চাপা দিতে।

আবার এইখানটাতেই, যেখানে কখনো আসব না মনে করেছিলুম, আসতে হলো। এ কি নাড়ির টান ! ...

আমার কেউ নেই, কিছুই নেই, তবু কেন রয়ে রয়ে মনে হচ্ছে, —না, এইখানেই সব আছে। এ কার মূঢ় অন্ধ সান্ত্বনা ?

কারুর কিচ্ছু করিনি, আমারও কেউ কিচ্ছু করেনি, তবে কেন এখানে আসছিলুম না? সে একটা অব্যক্ত বেদনার অভিমান, —সেটা প্রকাশ করতে পারছিনে।

হেন! —হেনা! সাবাস! কেউ কোথাও নেই, তবুও ও-ধার থেকে বাতাসে ভেসে আসছে ও কি শব্দ, —'না—না—না।'

পাহাড় কেটে নির্ঝরটা তেমনি বইছে, কেবল যার মেহেদি-রাঙানো পদ-রেখা এখনও ওর পাথরের বুকে লেখা রয়েছে, সেই হেনা আর নেই। এখানে ছোট-খাটো কত জিনিস পড়ে রয়েছে, যাতে তার কোমল হাতের ছোঁয়ার গন্ধ এখনও পাচ্ছি।

হেনা! হেনা! হেনা! ... আবার প্রতিধ্বনি, নাঃ—নাঃ—নাঃ!

* * *

পেশোয়ার

পেয়েছি—পেয়েছি! আজ তার দেখা পেয়েছি। হেনা! হেনা! তোমাকে আজ দেখেছি এইখানে, এই পেশোয়ারে। তবে কেন মিথ্যা দিয়ে এত বড় একটা সত্যকে এখনও ঢেকে রেখেছ?

সে আমায় লুকিয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে। কিছু বলেনি, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে। ...

এ-রকম দেখায় যে অশ্রু প্রাণের শ্রেষ্ঠ ভাষা। সে আজো বললে, —সে আমায় ভালবাসতে পারেনি। ...

ঐ 'না' কথাটা বলবার সময় সে কি করুণ একটা কান্না তার গলা থেকে বেরিয়ে ভোরের বাতাসটাকে ব্যথিয়ে তুলেছিল!

দুনিয়রার সবচেয়ে মস্ত হেঁয়ালি হচ্ছে মেয়েদের মন!

কাবুল
ডাক্কা ক্যাম্প

যখন মানুষের মতো মানুষ আমির হাবিবুল্লাহ্ খাঁ শহীদ হয়েছেন শুনলুম, তখন আমার মনে হলো এত দিনে হিন্দুকুশের চূড়াটা ভেঙে পড়ল! সুলেমান পর্বত জড়শুদ্ধ উখড়িয়ে গেল!

ভাবতে লাগলুম, আমার এখন কি করা উচিত? দশ দিন ধরে ভাবলুম। বড্ডো শক্ত কথা!

নাঃ, আমিরের হয়ে যুদ্ধ করাই ঠিক মনে করলুম। কেন? এ 'কেন'র উত্তর নেই। তবু আমি সরল মনে বলছি, ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি, আমার এবার এ-যুদ্ধে আসার কারণ একটা দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ আহুতি দেওয়া, তাহলেও ঠিক উত্তর হয় না।

আমার অনেক খামখেয়ালির অর্থ আমি নিজেই বুঝি না!

সেদিন ভোরে ডালিম ফুলের গায়ে কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ওঃ, সে যেন আমারই মতো আরো অনেকের বুকের খুন-খারাবি! ...

উদার আকাশটা কেঁদে কেঁদে একটুর জন্যে থেমেছে। তার চোখটা এখনো খুব ঘোলা, আবার সে কাঁদবে। কার সে বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর কোয়েলিটাও কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করঞ্জ করে ফেলেছিল, আর তার উঁহুঁ—উঁহু শব্দ প্রভাতের ভিজে বাতাসে দোল খাইয়ে দিচ্ছিল! শুকনো নদীটার ও-পারে বসে কে শানাইতে আশোয়ারি রাগিণী ভাঁজছিল। তার মীড়ে মীড়ে কত যে চাপা হৃদয়ের কান্না কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তা সবচেয়ে বেশি বুঝছিলুম আমি। মেহেদি ফুলের তীব্র গন্ধে আমাকে মাতাল করে তুলেছিল!

আমি বললুম, —'হেনা, আমিরের হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আর ফিরে আসব না। বাঁচলেও আসব না।'

সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, —'সোহ্‌রাব, প্রিয়তম! তাই যাও! আজ যে আমার বলবার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালবাসি! —আজ আর আমার অন্তরের সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে 'আশেক'কে কষ্ট দেব না।' ...

আমি বুঝলুম, সে বীরাঙ্গনা—আফগানের মেয়ে। যদিও আফগান হয়েও আমি শুধু পরদেশির জীবন যাপন করেই বেড়িয়েছি, তবু এখন নিজের দেশের পায়ে আমার জীবনটা উৎসর্গ করি, এই সে চাচ্ছিল।

ওঃ, রমণী তুমি! কি করে তবে নিজেকে এমন করে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা?

কিঅটল ধৈর্যশক্তি তোমার! কোমলপ্রাণা রমণী সময়ে কত কঠিন হতে পারে? ...

হেনা! হেনা!!

কাবুল

পাঁচ পাঁচটা গুলি এখনও আমার দেহে ঢুকে রয়েছে! যতক্ষণ না সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়েছিলুম, ততক্ষণ সৈন্যদের কি শক্ত করেই রেখেছিলুম!

খোদা ! আমার বুকের রক্তে আমার দেশকে রক্ষা করেছি, একে যদি শহীদ হওয়া বলে, তবে আমি শহীদ হয়েছি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি !

আমি চলে এলুম। হেনা ছায়ার মতো আমার পিছু পিছু ছুটল ! এত ভালবাসা, পাহাড়-ফাটা উদ্দাম জলস্রোতের মতো এত প্রেম কি করে বুকের পাঁজর দিয়ে আটকে রেখেছিল হেনা। ...

* * *

আমির তাঁর ঘরে আমার আসন দিয়েছেন। আজ আমি তাঁর সেনাদলের একজন সর্দার।

আর হেনা ! হেনা ? —ঐ যে সে আমায় আঁক্‌ড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ... এখনও তার বুক কিসের ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে ! এখনও বাতাস ছাপিয়ে তার নিশ্বাসে উঠছে একটা মস্ত অতৃপ্তির বেদনা !

আহা, আমার মতো অভাগাও বড্ডো বেশি জখম হয়েছে। —ঘুমিয়েছে, ঘুমুক ! —না, না, দুইজনেই ঘুমোব ! এত বড় তৃপ্তির ঘুম থেকে জাগিয়ে আর বেদনা দিও না খোদা !

হেনা ! হেনা ! ! —না—না—আঃ ! ! ! ...

বাদল-বরিষণে

এক নিমেষের চেনা

বৃষ্টির ঝম্-ঝমানি শুনতে শুনতে সহসা আমার মনে হলো, আমার বেদনা এই বর্ষার সুরে বাঁধা ! ...

সামনে আমার গভীর বন। সেই বনে ময়ূরে পেখম ধরেছে, মাথার ওপর বলাকা উড়ে যাচ্ছে, ফোটা কদম ফুলে কার শিহরণ কাঁটা দিয়ে উঠছে, আর কিসের ঘন-মাতাল-করা সুরভিতে নেশা হয়ে সারা বনের গা টলছে ! ...

এটা শ্রাবণ মাস, না? —আহা, তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে !—

সে হলো আজ তিন বছরের কথা। আমার এই খাপ-ছাড়া জীবনে তার স্মৃতিগুলো ঝড়ের মুখে পদ্মবনের মতো ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেছে ! কখনও তার একটি কথা মনে পড়ে, কখনও আধখানি ছোঁওয়া আমার দাগা-পাওয়া বুকে জাগে ! মানস-বনের জুঁই-কুঁড়ি আমার ফুটতে গিয়ে ফুটতে পায় না, শিউলির বোঁটা শিথিল হয়ে যায় ! ওরই সাথে এই শাঙন-ঘন দেয়া-গরজনে আর এক দিনের অমনি মেঘের ডাক মনে পড়ে, আর আঁখি আমার আপনি জলে ভরে ওঠে !

সে-দিন ছিল আজকার মতোই শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী। পথ-হারা আমি ঘুরতে ঘুরতে যে-দিন প্রথম এই কালিঞ্জরে এসে পড়ি, সে-দিন এখানে কাজরি উৎসবের মহা ধূম পড়ে গেছে? আকাশ-ভরা হাল্কা জোলো মেঘ আমারই মতো খাপ-ছাড়া হয়ে যেন অকূল আকাশে কূল হারিয়ে ফিরছিল। তারই ঈষৎ ফাঁকে সুনীল গগনের এক ফালি নীলিমা যেন কোন্ অনন্ত-কান্নারত প্রেয়সীর কাজল-মাখা কালো চোখের রেখার মতো করুণ হয়ে জাগছিল ! পথ-চলার নিবিড় শ্রান্তি নিয়ে কালিঞ্জরের উপকণ্ঠের বাঁকে উপবনের পাশে তার সাথে আমার প্রথম দেখা। এই হঠাৎ-দেখাতেই কেন আমার মনে হলো, এ-মুখ যে আমার কত কালের চেনা—কোথায় যেন একে হারিয়েছিলাম ! সেও আমার পানে চেয়ে আমার চাওয়ায় কি দেখতে পেলে সেই জানে, —তাই পথ চলতে চলতে তার হাতের কচি ধানের ছোট্ট গোছাটি মুখের ওপর আধ-আড়াল করে আমায় জিজ্ঞেস করলে, —'পরদেশীয়া রে, তুহার দেশ কাহাঁ?'

সে স্বর আমার বাইরে ভিতরে এক ব্যাকুল রোমাঞ্চ দিয়ে গেল, বুকের সমস্ত রক্ত আকুল আবেগে কেঁপে কেঁপে নৃত্য করে উঠল !

এ কোন্ চির-পরিচিত স্বর? এ কে ছলনা করে আমায়? পুবের হাওয়া আমার পাশ দিয়ে কেঁদে গেল—'হায় গৃহহীন, হায় পথহারা!' ঝড়ে-ওড়া এক দল পল্‌কা মেঘের মতো মল্লারের সুরে পথের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে কাজ্‌রি গায়িকা রূপসীরা গেয়ে যাচ্ছিল,—ঘুঙ্‌ঘট-পট খোলো আরে সাঁবলিয়া!—ওগো শ্যামল, এখন তোমার ঘোমটা খুলে ফেলো।

আমার কাছে তাকে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তরুণীরা আঁখির পলকে থমকে দাঁড়াল, তারপর চুল ছড়িয়ে বাহু দুলিয়ে আঁচল উড়িয়ে বলে উঠল,—'কাজ্‌রিয়া গে! ক্যা তোরি সাঁবলিয়া আ গয়ি?'

সে তাদের এক পাশে স'রে গিয়ে কাঁপা-গলায় বললে,—'নহি্ রে সজ্‌নিয়া, নহি! য়্যে পর্‌দেশী জোয়ান!—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন বলে উঠল,—'ক্যা তেরি দিল্ ছিন্ লিয়া?'

সে লজ্জায় আর দাঁড়াতে পারল না, খাম্‌কা আমার দিকে অনুযোগ-তিরস্কার-ভরা বাঁকা চাউনি হেনে চলে গেল!

পথের ঐ বাঁক থেকেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তাদের ধানি রঙের শাড়ির ঢেউ আর আস্‌মানি রঙের ওড়নার আকুল প্রান্ত। রয়ে রয়ে তাদের এলানো কেশপাশ বেয়ে কেমন মধুর এক সোঁদা-গন্ধ ভেসে আসছিল। অতগুলি সুন্দর মুখের মাঝ থেকে আমার মনে জগ্-জগ্ করছিল শুধু ঐ কাজ্‌রিয়ার ছোট্ট কালো মুখ, —যা শিল্পীর হাতে কালো পাথর-কোঁদা দেবীমুখের মতো নিটোল! বিজলি-চমকের মতো তার ঐ যে একটি দুরন্ত চপল গতি, তারই মধুরতাটুকু আমার মনের মেঘে বারে-বারে তড়িৎ হেনে যাচ্ছিল।

পথের পাশের দোলনা-বাঁধা দেবদারু-তলায় দাঁড়িয়ে আমার শুধু এই কথাটিই মনে হতে লাগল, এই এক পলকের আধখানি চাওয়ায় কেমন করে মানুষ এত চির-পরিচিত হয়ে যেতে পারে!

*   *   *

অভিমানের দেখা-শোনা

তার পরের দিন আমলকি বনে দাঁড়িয়ে সেই আগেকার দিনের কথাটাই ভাবছিলাম, —আচ্ছা, এই যে আমার মানসী বঁধু, —একে কবে কোন্ পূরবীর কান্না-ভরা খেয়ার-পারে হারিয়ে এসেছিলাম? সকল স্মৃতি ওলট-পালট করেও তার দিনক্ষণ মনে

আসি–আসি করেও যেন আসে না, অথচ মনের–মানুষ–আমার একে দেখেই কেমন করে চিনে ফেললে। তাই সে আমার আঁখির দীপ্তিতে ফুটে উঠে বলে উঠল, —এই তো আমার চির–জনমের চাওয়া তুমি ! ওগো, এই তো আমার চির–সাধনার ধন তুমি ! ...

আর একবার আমার স্মৃতির অতল তলে ডুব দিলাম, এমন সময় ঝড়ের সুরে কাজ্‌রি গান গাইতে গাইতে রূপসী নাগরীরা আমার পাশ দিয়ে উধাও হয়ে গেল,—

'চঢ়ে ঘটা ঘন ঘোর গরজ রহে বদরা রে হোরি !
রিম্–ঝিম্ রিম্–ঝিম্ পানি বরষৈ রহি রহি জিয়া ঘাবরাবৈ রামা,
বহৈ নয়নাসে নীর ময়েল্ ভয়ি কজ্‌রা রে হোরি !'

[ঘোর ঘটা করে গগনে মেঘ করেছে, বাদল গরজন করছে, রিম্–ঝিম্–রিম্–ঝিম্ বৃষ্টি ঝরছে, থেকে থেকে জান আমার ঘাবড়িয়ে উঠছে, নয়ন বেয়ে আঁসু ঝরছে, —ওগো, চোখের কাজল আমার মলিন হয়ে গেল !]

বর্ষার মেঘ চলে গেল। মর্মে আমার তারই গাঢ় গমক গুম্‌রে ফিরতে লাগল, —'ময়েল ভয়ি কজ্‌রা রে হোরি !' —ওগো প্রিয়, চোখের কাজল আমার মলিন হয়ে গেল ! সে কোন্ অচেনার উদ্দেশ্যে এ অবুঝ–কান্না তোমার, ওগো বিদেশিনী ? সে–কথা সেও জানে না, তার মনও জানে না ! ...

আবার সেই সন্তাপহারী আমার চিরবাঞ্ছিত মেঘ গুরু–গরজনে ডেকে উঠল। বনের সিক্ত আকাশকে ব্যথিয়ে ময়ূরের কেকা–ধ্বনির সাথে চাতকের অতৃপ্তির কাঁদন রণিয়ে রণিয়ে উঠছিল, —'দে জল, দে জল !' হায় রে চিরদিনের শাশ্বত পিয়াসী ! তোর এ অনন্ত পিয়াসা কি সারা সাগরের জলেও মিটল না ?

আমার কেমন আবছা এক কণা স্মৃতি মনের কানে বলছিল, —তুমি আগে এমনই চাতক ছিলে, তোমার পিপাসা মিটবার নয় !

ভেজা মাটির আর খস্–খস্–এর গুমোট–ভরা ভারি গন্ধে যেন দম আট্‌কে যাচ্ছিল ; ও–ধারে ফোটা কেয়া ফুলের, আধফোটা যূথির, বেলির কুঁড়ির, ঝরা শেফালি–বকুলের দিল্–মাতানো খোশ্‌বুর মাঝে মাঝে পদ্ম আর কদম্বের স্নিগ্ধ সুরভি মধুর আমেজ দিচ্ছিল। বর্ষার ব্যথা আমার দিকে গভীর মৌন চাওয়া চেয়ে শুধাচ্ছিল,—

'এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায় !'

হায়, কি বলা যায় ? কাকে বলা যায় ? এ উতল–পাগল তার কিছুই জানে না, অথচ সে কি যেন বলতে চায়—কাকে যেন বুকের কাছে পেতে চায় ! এই

মেঘদূত তার কাছে তার পালিয়ে-যাওয়া প্রিয়তমার সন্ধান করে গেছে, তাই সেই চাওয়া-পাওয়া-টুকুর বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে, তাই সে মেঘদূতকে অভিনন্দন জানাচ্ছে,—

'এস হে সজল ঘন বাদল-বরিষণে !'

আজ আর একবার মনে হল সে তার বিদায়ের দিনে বলেছিল, —'আবার দেখা হবে, তখন হয়তো তুমি চিনতে পারবে না !'

আজ সেই বিদায়-বাণী মনে পড়ে আমার বক্ষ কান্নায় ভরে উঠছে। আমার পাশ দিয়ে কালো কাজ্‌রিয়া যখন তার চাউনি হেনে চলে গেল, তখন ঐ কথাটিই বারেবারে মনে পড়ছিল, —হয়তো তুমি চিনতে পারবে না !

তাই কাজ্‌রিয়াকে ডেকে বললাম, —এই তো তোমায় চিনতে পেরেছি তোমার এই চোখের চাওয়ায় !

কাজ্‌রিয়া চুল দিয়ে মুখ ঝেঁপে চলে গেল। তার ঐ না-চাওয়াই বলে গেল, সেও আমায় চিনতে পেরেছে।...

আবার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। ... ঝন্‌ঝার উতরোলের মতো দোল খেয়ে খেয়ে পাশের উপবন হতে তরুণী কণ্ঠের মল্লার হিন্দোলা ভেসে আসছিল, —'মেঘবা ঘুম্ ঘুম্ বরষাবৈ ছাবৈ বদরিয়া শাঙন মে !'

পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আকাশ বেয়ে হাজার পাগলা-ঝোরা ঝরছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্ ! যেন আকাশের আঙিনায় হাজার হাজার দুষ্টু মেয়ে কাঁকর-ভরা মল বাজিয়ে ছুটোছুটি করছে ! তপোবনে গিয়ে দেখলাম, সেই বৃষ্টিধারায় ভিজে ভিজে মহা উৎসাহে বিদেশিনী তরুণীরা দেবদারু ও বকুল শাখায় ঝুলানো দোলনায় দোল খেয়ে কাজ্‌রি গাইছে। ঝড়-বৃষ্টির সাথে সে কি মাতামাতি তাদের ! আজ তাদের কোথাও বন্ধন নেই, ওদের প্রত্যেকেই যেন এক একটা পাগলিনী প্রকৃতি ! কি সুন্দর সেই প্রকৃতির উদ্দাম চঞ্চলতার সনে মানব-মনের আদিম চির-যৌবনের বন্ধ-হারা গতি-রাগের মিলন ! — শাঙন মেঘের জমাট সুরে আমার মনের বীণায় মূর্ছনা লাগল। আমার যৌবন-জোয়ারও অমনি ঢেউ খেলে উঠল। মনের পাগল অমনি করে দোদুল দোলায় দুলে সুন্দরীদের এলো চুলের মতোই হাওয়ার বেগে মেঘের দিকে ছুটল, —হায় কোথায়, কোন্ সুদূরে তার সীমারেখা !

হিন্দোলার কিশোরীরা গাচ্ছিল কাজল-মেঘের আর নীল আকাশের গান। নিচে শ্যামল দূর্বায় দাঁড়িয়ে বিনুনি-বেণী-দোলানো সুন্দরীরা মৃদঙ্গে তাল দিয়ে গাচ্ছিল কচি ঘাসের আর সবুজ ধানের গান। তাদের প্রাণে মেঘের কথার ছোঁওয়া লেগেছিল। ... মেঘের এই মহোৎসব দেখে আপনি আমার চোখে জল ঘনিয়ে এল। দেখলাম সেই কালো কাজ্‌রিয়া—দোলনা ছেড়ে আমার পানে সজল চোখের চেনা চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে এক নিমেষে দোলনায় উঠে

কয়ে উঠল, —'সজ্‌নিয়া গে, ওগি সুন্দর পরদেশিয়া !' তার সই মতিয়া দুলতে দুলতে বাদল-ধারায় এক রাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, —'হা রে কাজ্‌রিয়া, তুহার সাঁবলিয়া !'

কাজ্‌রিয়া মতিয়ার চুল ধরে টেনে ফেলে দিয়ে পাশের বকুল গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি ভাবছিলাম, এমনি করেই বুঝি মেঘে আর মানুষে কথা কওয়া যায় ! এমনি করেই বুঝি ও-পারের বিরহী যক্ষ মেঘকে দূতী করে তার বিচ্ছেদ-বিধুরা প্রিয়তমাকে বুকের ব্যথা জানাত ! আমার ভেজা-মন তাই কালো মেঘকে বন্ধু বলে নিবিড় আলিঙ্গন করলে !

চমকে চেয়ে দেখলাম, সে কখন এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। তার গভীর অপলক দৃষ্টি মেঘ পারিয়ে কোন্ অনন্তের দিগ্বলয়ে পৌঁছেছিল, সেই জানে। তার পাশে থেকে আমারও মনে হল ঐ দূর মেঘের কোলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি শুধু সে আর আমি। কেউ কোথাও নেই, উপরে নিচে আশে-পাশে শুধু মেঘ আর মেঘ, —সেই অনন্ত মেঘের মাঝে সে মেঘের বরণ-বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে তার মেঘলা-দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর তুলে ধরেছে। ঐখানেই—ঐ চেনা-শোনা জায়গাটিতেই যেন আমাদের প্রথম দেখা-শুনা, ঐখানেই আবার আমাদের অভিমানের ছাড়াছাড়ি, এই কথাটা আমাদের দুই জনেরই মনের অচিন কোণে ফুটে উঠতেই আমরা একান্ত আপনার হয়ে গেলাম। যে কথাটি হয়তো সারা জীবন চোখের জলে ভেসেও বলা হতো না, এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক নিমেষে চারটি চোখের অনিমিখ চাউনিতে তা কওয়া হয়ে গেল। ...

আমি বললাম, —'কাজ্‌রি, আমি অনেক জীবনের খোঁজার পর তোমায় পেয়েছি !' এই মেঘের ঝরায় যে প্রাণের কথা প্রাণ দিয়ে সে শুনছিল, সহসা তাতে বাধা পেয়ে সে সচেতন হয়ে উঠল। চখা হরিণীর মতো ভীত-ত্রস্ত চাউনি দিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে আচম্‌কা আর্ত আকুল স্বরে কেঁদে উঠল ! আর দাঁড়াল না, হুঁক্‌রে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলে। যেতে যেতে বলে গেল—নাই রে সুন্দর পরদেশী, ম্যয় কারি কাজরিয়া হুঁ ; —ওগো সুন্দর বিদেশি, আমি কালো। আরও কি বলতে বলতে অভিমানে ক্ষোভে তার মুখে আর কথা ফুটল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল !

একটি পুরো বছর আর তার দেখা পাইনি। ...

আজ শাঙন রাতের মাতামাতিতে হৃদয় আমার কথায় আর ব্যথায় ভরে উঠেছে, আর তার সেই বিদায়-দিনের আরও অনেক কিছু মনে পড়ছে। আজ আমার শিয়রের ক্ষীণ দীপশিখাটিতে বাদল-বায়ের রেশ লেগে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে, আমার বিজন কক্ষটিতে সেই কাঁপুনি আমায় মনে পড়িয়ে দিচ্ছে—হায়, আজ তেমন করে আঘাত দেবারও আমার কেউ নেই ! প্রিয়তমের কাছ থেকে আঘাত পাওয়াতে যে কত নিবিড় মাধুরী, তা বেদনাতুর ছাড়া কে বুঝবে ? যার নিজের বুকে বেদনা বাজেনি, সে পরের বেদন বুঝবে না, বুঝবে না।

সে বলেছিল, —দেখ বিদেশি পথিক ! আমি নিবিড় কালো, লোকে তাই আমাকে কাজ্‌রিয়া বলে উপহাস করে। তাদের সে আঘাত আমি সইতে—উপেক্ষা করতে পারি, আমার সে সহ্যশক্তি আছে ; কিন্তু ওগো নিঠুর ! তুমিই কেন আমায় ভালবাসি বলে উপহাস করছ ? ওগো সুন্দর শ্যামল ! তুমি কেন এ হতভাগিনীকে আঘাত করছ ? এ অপমানের দুর্বার লজ্জা রাখি কোথায় ? জানি, আমি কালো কুৎসিত, তাই বলে ওগো পরদেশী, তোমার কি অধিকার আছে আমাকে এমন করে মিথ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ করবার ? ছি, ছি, আমায় ভালবাসতে নেই—ভালবাসা যায় না, ভালবাসতে পারবে না ! এমন করে আর আমার দুর্বলতায় বেদনা-ঘা দিও না শ্যামল, দিও না। ও তো আমার অপমান নয়, ও যে আমার ভালবাসার অপমান ; তা কেউ সইতে পারে না। বিদায় শ্যামল, বিদায় !

আমি মনে মনে বললাম, —ওগো অভিমানিনি ! অভিমানের গাঢ় বিক্ষোভ তোমায় অন্ধ করেছে, তাই তুমি সকল কথা বুঝেও বুঝছ না। আমিও যে তোমারই মতো কালো। তুমি তো নিজ মুখেই আমায় শ্যামল বলেছ, অথচ সুন্দর বলছ কেন ? তোমার চোখে তুমি আমায় যেমন সুন্দর দেখেছ, আমার চোখে আমিও তেমনি তোমার সৌন্দর্য দেখেছি। তোমার ঐ কালো রূপেই আমার চির-আকাঙ্ক্ষিতাকে খুঁজে পেয়েছি, যেন সে কোন্ অনাদি যুগের অনন্ত অন্বেষণের পর। আর যদি অধিকারই না থাকে, তবে তুমি আর কারুর আঘাতে বেদনা পেলে না, অথচ আমার স্নেহ সইতে পারলে না কেন ? আমারই উপরে বা তোমার কি দাবি পেয়েছ, যার জোরে সবারই আঘাত-বেদনাকে উপেক্ষা করতে পারো, শুধু আমাকেই পারো না ? আমার বক্ষ দলিত করে কি করে আমায় এমন ছেড়ে যেতে পারছ ? যার ভালবাসায় বিশ্বাস নেই, তার ওপর তো অভিমান করা চলে না। যাকে বুঝি, আর আমার দাবি আছে যে, আমার অভিমান এ সহ্য করবে, তারই উপর অভিমান আসে, তারই ওপর রাগ করা যায়। আমার যে তখন মস্ত বিশ্বাস থাকে যে, আমার এ অহেতুক অভিমানের আব্দার এ সহ্য করবেই, কেননা, সে যে আমায় ভালবাসে। ...

সে কোনো কথা বুঝল না, চলে গেল। এ তীব্র অভিমান যে তার কার ওপর, নিজেই বলতে পারত না, তবে কতকটা যেন তার এই কালো রূপের স্রষ্টার ওপর। তার বুক-ভরা অভিমান আহত পক্ষী-শাবকের মতো যেন সেই দুর্বোধ রূপস্রষ্টার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলছিল, —ওগো, আমাকেই কি সারা দুনিয়ার মাঝে এমন করে কালো কুৎসিত করে সৃষ্টি করতে হয় ? তোমার কুম্ভ-ভরা রূপের একটি রেণু এ-অভাগীকে দিলে কি তোমার ভরা-কুম্ভ খালি হয়ে যেত ? যদি কালো করেই সৃষ্টি করলে তবে ঐ অন্ধকারের মাঝে আলোর মতো ভালবাসা দিলে কেন ? আবার অন্যেরে দিয়ে ভালবাসিয়ে লজ্জিত করো কেন ? ... হায়, সে যে কখনও বোঝেনি যে, সত্য-সৌন্দর্য বাইরে নয়, ভিতরে—দেহে নয়, অন্তরে।

আমি সেদিন এই একটা নতুন জিনিস দেখেছিলাম যে, যত দিন সে কারুর ভালবাসা পায়নি, তত দিন তার সারা জনমের চাপা অভিমান এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে

ওঠেনি ; কিন্তু যেই সে বুঝলে, কেউ তাকে ভালবেসেছে, অমনি তার কান্না-ভরা অভিমান ঐ স্নেহের আহ্বান দুর্জয় বেগে হাহাকার করে গর্জন করে উঠল। এই ফেনিয়ে-ওঠা অভিমানের জন্যেই সে যাকে ভালবাসে, তাকে এড়িয়ে গেল। এমন ভালবাসায় যে প্রিয়তমাকে এড়িয়ে চলাতেই আনন্দ ! এ বেদনা-আনন্দের মাধুরী আমার মতো আর কেউ বোঝেনি।

হায়, আমার মনের এত কথা বুঝি মনেই মরে গেল ! এ জীবনে আর তা বলা হবে না।

*　　*　　*

চির-জনমের ছাড়াছাড়ি

তার পর-বছরের কথা।

কাজরিয়ার সঙ্গে আবার আমার দেখা হলো মির্জাপুরের পাহাড়ের বুকে বিরহী নামক উপত্যকায়। সে-দিন ছিল ভাদ্রের কৃষ্ণ-তৃতীয়া। সে-দিনও মেঘে আঁধারে কোলাকুলি করছিল। সে-দিন ছিল কাজরি উৎসবের শেষ দিন। সে দিন বাদল-মেঘ ধানের ক্ষেতে তার শেষ বিদায়-বাণী শোনাচ্ছিল, আর নবীন ধানও তার মঞ্জরী দুলিয়ে কেঁপে কেঁপে বাদলকে তার শেষ অভিনন্দন জানাচ্ছিল। হায়, এদের কেউ জানে না, আবার কোন্ মাঠে কোন্ তালি-বনের রেখা-পারে তাদের নতুন করে দেখা-শোনা হবে। আজ সুন্দরীদের চোখের কাজল মলিন, তাদের সুরে কেমন একটা ব্যথিত ক্লান্তি, সুন্দর ছোট্ট মুখগুলি রোদের তাপে শালের কচি পাতার মতো ম্লান—এলানো। কাল যে এই সারা-বছরের চাওয়া বাদল-উৎসবের বিসর্জন, এইটাই তাদের এত আনন্দকে বারে-বারে ব্যথা দিয়ে যাচ্ছিল। কে জানে, তাদের এই সখিদের এমনি করে পর-বছর আবার দেখা হবে কি না ! হয়তো এরই মাঝের কত চেনা মুখ কোথায় মিশিয়ে যাবে, সারা দুনিয়া খুঁজেও সে মুখ আর দেখতে পাবে না।

দোলনার সোনালি রঙের ডোরকে উজ্জ্বলতর ক'রে বারে-বারে ছুরি-হানার মতন বিজুরি চমকে যাচ্ছিল। কাজরি ছুটে এসে আমার ডান হাতটি তাঁর দু'হাতের কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে বুকের উপর রাখলে, তারপর বললে, —ওগো পরদেশি শ্যামল, তোমায় আমি চিনেছি ! তুমি সত্য ! তুমি আমায় ভালবাস ! নিশ্চয়ই ভালবাস ! সত্যিই ভালবাস !

দেখলাম, তার শীর্ণ চোখের উজ্জ্বল চাউনিতে গভীর ভালবাসার ছল-ছল জ্যোতি শরৎ-প্রভাতের জল-মাখা রোদ্দুরের মতো করুণ হাসি হেসেছে ! আহ্, এত দিনের

বিরহের কঠোর তপস্যায় সে তার সত্যকে চিনতে পেরেছে ! তার খিন্ন মলিন তনুলতার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখের জল সামলানো দায় হয়ে উঠল ! এক বিন্দু অসম্বরণীয় অবাধ্য অশ্রু তার পাণ্ডুর কপোলে ঝরে পড়তেই সে আমার পানে আর্ত দৃষ্টি হেনে ঐখানেই বসে পড়ল ! বকুল-শাখা আর শিউলি পাতা তার মাথায় ফুল-পাতা ফেলে সান্ত্বনা দিতে লাগল !

মতিয়া বললে, এবারও সে অনেক আশা করে আগের বছরের মতোই শ্রাবণ-পঞ্চমীর ভোরে কাজরি গেয়ে যমুনা-সিনানে গিয়ে সেখানকার মাটি দিয়ে ধানের অঙ্কুর উদ্‌গম করেছিল। সেই অঙ্কুরগুলি সে নিবিড় যতনে তার ছিন্ন ভেজা ওড়না দিয়ে আজও ঢেকে রেখেছে। সে রোজই বলত, —'মতিয়া রে, এবার আমার পরদেশি বঁধু আসবে ! ঐ যে শুনতে পাচ্ছি তার পথিক-গান !'

আজ ভাদ্র-তৃতীয়াতে 'নবীন ধানের মঞ্জরী' নিয়ে কতকগুলি সে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে, আর কয়েকটি শীষ এনেছে আমাকে উপহার দিতে।

আমি তার হাতে নাড়া দিয়ে বললাম, —'কাজরি, আর আমায় ছেড়ে যেও না।'

শুষ্ক অধর-কোণে তার আধ টুক্‌রো ম্লান হাসি ফুটতে ফুটতে মিলিয়ে গেল ! সে অতি কষ্টে তার আঁচল থেকে বহু যত্নে রক্ষিত ধানের সবুজ শীষ ক'টি বের করে একবার তার দু'টি জল-ভরা চোখের পূর্ণ চাওয়া দিয়ে আমার পানে চেয়ে দেখলে, তার পর আমার স্কন্ধদেশে ক্লান্ত বাহু দু'টি থুয়ে আমার কর্ণে শীষগুলি পরিয়ে দিলে। একটা গভীর তৃপ্তির দীঘল শ্বাসের সঙ্গে পবিত্র একরাশ হাসি তার চোখে-মুখে হেসে উঠল। দেখে বোধ হলো, এমন প্রাণ--ভরা সার্থক হাসি সে যেন আর জন্মে হাসে নি।

আবার একটু পরেই কি মনে হ'য়ে তার সারা মুখ ব্যথায় পাণ্ডুর হয়ে উঠল। সহসা চিৎকার করে সে কয়ে উঠল, —না শ্যামল, না—আমাকে যেতেই হবে ! তোমার এই বুক-ভরা ভালোবাসার পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে আমায় বিদায় নিতে দাও !

কোলের ওপর তার শ্রান্ত মাথা লুটিয়ে পড়ল। চির-জনমের কামনার ধনকে আমার বুকের ওপর টেনে নিলাম। আকুল ঝন্‌ঝা উন্মাদ বৃষ্টিকে ডেকে এনে আমায় ঘিরে আর্তনাদ করে উঠল, ওহ্ !—ওহ্ !—ওহ্ !

আমার মনে হয়, চাওয়ার অনেক বেশি পাওয়ার গর্বই তাকে বাঁচতে দিলে না। সে মরণ-বরণ করে তার কালো রূপস্রষ্টার কাছে চলে গেল ! এবার বুঝি সে অনন্ত রূপের ডালি নিয়ে আর এক পথে আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে ! ... কালো মানুষ বড্ডো বেশি চাপা অভিমানী। তাদের কালো রূপের জন্যে তারা মনে করে, তাদের কেউ ভালবাসতে পারে না। কেউ ভালবাসছে দেখলেও তাই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। বেচারাদের জীবনের এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

* * *

বাদল-ভেজা তারই স্মৃতি

এ-বছরও তেমনি শাঙন এসেছে। আজও আমার সেই প্রথম-দিনে-শোনা কাজরি গানটি মনে প'ড়ছে,—ওগো শ্যামল, তোমার ঘোমটা খোলো !

হায় রে পরদেশি সাঁবলিয়া ! তোমার এ অবগুণ্ঠন আর জীবনে খুলল না, খুলবে না। ...

আজ যখন আমার ক্লান্ত আঁখির সামনে আকাশ-ভাঙা ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে, পূরবী-বায় হু-হু করে সারা বিশ্বের বিরহ-কান্না কেঁদে যাচ্ছে, নিরেট জমাট আঁধার ছিঁড়ে ঝড়ের মুখে উগ্র মল্লারের তীব্র গোঙানি ব্যথিয়ে উঠছে, —ওগো, সামনে আমার পথ নেই—পথ নেই ! অনন্ত বৃষ্টির আকুল ধারা বইছে। —এমন সময় কোথায় ছিলে ওগো প্রিয়তম আমার ! এ বছরের মেঘ-বাদলে এমন করে আমায় যে দেখা দিয়ে গেলে, আমার প্রাণে যে কথা কয়ে গেলে ! হারানো প্রেয়সী আমার ! তোমার কানে-কানে-বলা গোপন গুঞ্জন আমি এই বাদলে শুনেছি, শুনেছি !

এই তোমার টাট্‌কা-ভাঙা রসাঞ্জনের মতো উজ্জ্বল-নীল গাঢ় কান্তি ! ওগো, এই তো তোমার কাজল-কালো স্নিগ্ধ-সজল রূপ আমার চোখে অঞ্জন বুলিয়ে গেল ! ওগো আমার বারে-বারে-হারানো মেঘের দেশের চপল প্রিয় ! এবার তোমায় অশ্রুর ডোরে বেঁধেছি ! এবার তুমি যাবে কোথা ? লোহার শিকল বারে-বারে কেটেছে তুমি মুক্ত-বনের-দুষ্ট পাখি, তাই এবার তোমায় অশ্রুর বাঁধনে বেঁধেছি, তাকে ছেদন করা যায় না ! ঐ ঘন নীল মেঘের বুকে, এই সবুজ-কচি দূর্বায়, ভেজা ধানের গানের রঙে তোমায় পেয়েছি। ওগো শ্যামলি ! তোমরা এ শ্যাম শোভা লুকাবে কোথায় ? ঐ সুনীল আকাশ এই সবুজ মাঠ, পথহারা দিগন্ত, —এতেই যে তোমার বিলিয়ে-দেওয়া চিরন্তন শ্যামরূপ লুটিয়ে পড়েছে। তাই আজ এই শ্রাবণ-প্রাতে ধানের মাঝে বসে গাইছি,—

'আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে,
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে !'

যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখনও বৃষ্টির ধারা বাঁধ-ছাড়া অযুত পাগলাঝোরার মতো ঝরে ঝরে পড়ছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্। এত জলও ছিল আজিকার মেঘে ! আকাশ-সাগর যেন উল্‌টে পড়েছে, এ বাদল-বরিষণের আর বিরাম নেই, বিরাম নেই ! ...

বৃষ্টিতে কাঁপতে কাঁপতে দেখলাম, আঁখির আগে আমার নীলোৎপল-প্রভ মানস-সরোবরে ফুটে রয়েছে সরোবর-ভরা নীল-পদ্ম !

ঘুমের ঘোরে

আজহারের কথা

আফ্রিকা
সাহারার মরূদ্যান-সন্নিহিত ক্যাম্প

ঘুম ভাঙল। ঘুমের ঘোর তবু ভাঙল না।… নিশি আমার ভোর হলো, সে স্বপ্নও ভাঙল, আর তার সঙ্গে ভাঙল আমার বুক !

কিন্তু এই যে তার শাশ্বত চিরন্তন স্মৃতি, তার আর ইতি নেই। না—না, মরুর বুকে ক্ষীণ একটু ঝর্না-ধারার মতো এই অম্লান স্মৃতিটুকুই তো রেখেছে আমার শূন্য বক্ষ স্নিগ্ধ-সান্ত্বনায় ভরে। বয়ে যাও ওগো আমার ঊষার মরুর ঝর্না-ধারা, বয়ে যাও এমনি করে বিশাল সে এক তপ্ত শূন্যতায় তোমার দীঘল রেখায় শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়া রেখে। দুর্বল তোমার এই পূত ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছে বিরাট কোন্ এক মরুভূ-প্রান্তরকে, তা তুমি নিজেও জানো না, তবু বয়ে যাও ওগো ক্ষীণতোয়া নির্ঝরিণীর নির্মল ধারা, বয়ে যাও !

নিশি-ভোরটা নাকি বিশ্ববাসী সবার কাছেই মধুর, তাই এ-সময়কার টোড়ি রাগিণীর কল-উচ্ছ্বাসে জাগ্রত নিখিল অখিলের পবিত্র আনন্দ-সরসী-সলিলে ক্রীড়ারত মরাল-যূথের মতো যেন সঞ্চরণ করে বেড়ায়, কিন্তু আমার নিশি ভোর না হলেই ছিল ভাল। এ আলো আমি আর সইতে পারছিনে, —এ যে আমার চোখ ঝলসিয়ে দিলে ! এ কি অকল্যাণময় প্রভাত আমার !

ভোর হলো। বনে বনে বিহগের ব্যাকুল কূজন বনান্তরে গিয়ে তার প্রতিধ্বনির রেশ রেখে এল ! সবুজ শাখীর শাখায় শাখায় পাতার কোলে ফুল ফুটল ! মলয় এল বুলবুলির সাথে শিস্ দিতে দিতে। ভ্রমর এল পরিমল আর পরাগ মেখে শ্যামার গজল-গানের সাথে হাওয়ার দাদ্রা তালের তালে তালে নাচতে নাচতে। কোয়েল, দোয়েল, পাপিয়া সব মিলে সমস্বরে গান ধরলে,—

> 'ওহে সুন্দর মরি মরি !
> তোমায় কি দিয়ে বরণ করি !'

অচিন্ কার কণ্ঠ-ভরা ভৈরবীর মীর মোচড় খেয়ে উঠল—'জাগো পুরবাসী !' সুষুপ্ত বিশ্ব গা-মোড়া দিয়ে তারই জাগরণের সাড়া দিলে ! …

'তুমি সুন্দর, তাই নিখিল বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।'

—পড়ে রইলুম কেবল আমি উদাস আনমনে, আমার এই অবসাদ-ভরা বিষণ্ণ দেহ ধরার বুকে নিতান্ত সঙ্কুচিত গোপন করে, হাস্যমুখরা তরল ঊষার গালের একটেরে এক কণা অশুষ্ক অশ্রুর মতো ! অথচ এই যে এক বিন্দু অশ্রুর খবর, তা ঊষা-বালা নিজেই জানে না, গত নিশি খোওয়াবের খাম্‌খেয়ালিতে কখন্ সে কার বিচ্ছেদ-ব্যথা কল্পনা করে কেঁদেছে, আর তারই এক রতি স্মৃতি তার পাণ্ডুর কপোলে পূত ম্লানিমার ঈষৎ আঁচড় কেটে রেখেছে !

ঘুমের ঘোর টুটলেই শোর ওঠে, —ঐ গো ভোর হলো ! জোর বাতাসে সেই কথাটি নিভৃত-সব-কিছুর কানে কানে গুঞ্জরিত হয়। সবাই জাগে—ওঠে—কাজে লাগে। আমার কিন্তু ঘুমের ঘোর টুটেও উঠতে ইচ্ছে করছে না। এখনও আফসোসের আঁসু আমার বইছে আর বইছে।

সব দোরই খুল্‌ল, কিন্তু এ উপুড়-করা গোরের দোর খুলবে কি করে? —না, তা খোলাও অন্যায়, কারণ এ গোরের বুকে আছে শুধু গোর-ভরা কঙ্কাল আর বুক-ভরা বেদনা, যা শুধু গোরের বুকেই থেকেছে আর থাকবে ! দাও ভাই, তাকে পড়ে থাকতে দাও এমনি নীরবে মাটি কাম্‌ড়ে, আর ঐ পথ বেয়ে যেতে যেতে যদি ব্যথা পাও, তবে শুধু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলো, আর কিচ্ছু না !

*　　　*　　　*

আচ্ছা, আমি এই যে আমার কথাগুলো লিখে রাখছি সবাইকে লুকিয়ে, এ কি আমার ভাল হচ্ছে? নাঃ, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে, এ ভাল, না মন্দ? হাঁ, আর এই যে আমার লেখার ওপর কুয়াশার মতো তরল একটা আবরণ রেখে যাচ্ছি, এটাও ইচ্ছায়, না অনিচ্ছায়?

তাই বলছি, এখন যেমন আমি অনেকেরই কাছে আশ্চর্য একটা প্রহেলিকা, আমি চাই চিরটা দিনই এমনি করে নিজেকে লুকিয়ে থাকতে—আমার সত্যিকার ব্যথার উৎসে পাথর চাপা দিয়ে আর তারই চারি পাশে আবছায়ার জাল বুনে ছাপিয়ে থাকতে, বুকের বেদনা আমার গানের মুখর কলতানে ডুবিয়ে দিতে ! কেননা, যখন লোকে ভাববে আর হাসবে, যে, ছি ! সৈনিকেরও এমন একটা দুর্বলতা থাকতে পারে !

না না—এখন থেকে আমার বুক সে চিন্তাটার লজ্জায় ভরে উঠছে ! —আমার এই ছোট কথা ক'টি যদি এমনি এক করুণ আবছায়ার অন্তরালেই রেখে যাই, তাহলে হয়তো কারুর তা বুঝবার মাথা-ব্যথা হবে না। আর কোনো অকেজো লোক তা বুঝবার চেষ্টা করলেও আমায় তেমন দুষতে পারবে না।

দূর ছাই, যতসব সৃষ্টিছাড়া চিন্তা ! কারই বা গরজ প'ড়েছে আমার এ লেখা দেখবার? তবু যে লিখছি? মানুষ মাত্রেই চায় তার বেদনার সহানুভূতি, তা নইলে

তার জীবনভরা ব্যথার ভার নেহাৎ অসহ্য হয়ে পড়ে যে! দরদি বন্ধুর কাছে তার দুঃখের কথা কয়ে আর তার একটু সজল সহানুভূতি আকর্ষণ করে যেন তার ভারাক্রান্ত হৃদয় লঘু হয়। তাছাড়া, যতই চেষ্টা করুক, আগ্নেয়গিরি তার বুকভরা আগুনের তরঙ্গ যখন নিতান্ত সামলাতে না পেরে ফুঁপিয়ে ওঠে, তখন কি অত বড় শক্ত পাথরের পাহাড়ও তা চাপা দিয়ে আটকে রাখতে পারে? কখনোই না। বরং সেটা আটকাতে যাবার প্রাণপণ আয়াসের দরুন পাহাড়ের বুকের পাষাণ-শিলাকে চুরমার করে উড়িয়ে দিয়ে আগুনের যে হলকা ছোটে, সে দুর্নিবার স্রোতকে থামায় কে? ...

হাঁ, তবু ভাববার বিষয় যে, সে দুর্মদ দুর্বার বাষ্পোচ্ছ্বাসটা আগ্নেয়গিরির বুক থেকে নির্গম হয়ে যাবার পরই সে কেমন নিস্পন্দ শান্ত হয়ে পড়ে! তখন তাকে দেখলে বোধ হয়, মৌন এই পাষাণ-স্তূপের যেন বিশ্বের কারুর কাছে কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলবার কইবার নেই! শুধু এক পাহাড় ধীর-প্রশান্ত-নির্বিকার শান্তি। ... আঃ সেই বেশ!

আচ্ছা, বাইরে আমি এতটা নিষ্করুণ নির্মম হলেও আমার যে এই মরু-ময়দানের শুকনো বালির নিচে ফল্গুধারার মতো অন্তরের বেদনা, তার জন্যে করুণায় একটি আঁখিও কি সিক্ত হয় না? এতই অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আমার! হয়তো থাকতেও পারে! তবু চাইনে যে? —না ভাই, না, প্রত্যাখ্যান আর বিদ্রূপের ভয় ও বেদনা যে বড় নিদারুণ! তাই আমার অন্তরের ব্যথাকে আর লজ্জাতুর ক'রতে চাইনে—চাইনে। হয়তো তাতে সে কোন্ এক পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করা হবে। সে তো আমি সইতে পারব না। অথচ একটু সান্ত্বনাও যেন এ নিরাশ নীরস জীবনে খুবই কামনার জিনিস হয়ে পড়েছে। এখন আমার সান্ত্বনা হচ্ছে এই লিখেই—এমনি করে আমার এই গোপন খাতাটির শাদা বুকে তারই সেই বেদনাতুর মূর্তিটিরই প্রতিচ্ছবি আবছায়ায় এঁকে। আমার শাদা খাতার এই কালো কথাগুলি আর গানের স্নিগ্ধ-কল্লোল এই দু'টি জিনিসই আগুন-ভরা জীবনে সান্ত্বনা-ক্ষীর ঢেলে দিচ্ছে আর দেবে! ...

আমার আজ দুনিয়ার কারুর ওপর অভিমান নেই! আমার সমস্ত মান-অভিমান এখন তোমারই ওপর খোদা! তুমিই তো আমায় এমন করে রিক্ত করেছ, তুমিই যে আমার সমস্ত স্নেহের আশ্রয়কে ঝোড়ো-হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে আমার ঘর ক'রে তুলেছ, —এখন পর হলে চলবে না—এড়িয়ে যেতেও পারবে না। এখন তুমি না সইলে এ দুরন্তের আব্দার অত্যাচার কে সইবে বলো? ওগো আমার দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলময় প্রভু, এখন তুমিই আমার সব!

* * *

হাঁ, এখনই লিখে থুই, নইলে কে জানে কোন্ দিন দুশমনের শেলের একটা তীব্র আঘাত ক্ষণিকের জন্যে বুকে অনুভব করে চিরদিনের মতো নিথর-নিঝুম হয়ে পড়ব! এই

মহাসমর–সাগরে ছোট্ট এক বুদ্বুদের মতোই মাথা তুলে উঠেছি, আবার হয়তো এক পলকেই আমার ক্ষুদ্র বুকের সমস্ত আশা–উৎসাহ ব্যথা–বেদনা থেমে গিয়ে ঐ বুদ্বুদটির মতোই কোথায় মিলিয়ে যাব! কেউ আহা বলবে না—কেউ উহুঁ করবে না! আমার কাছে সেই মৃত্যুর চিন্তাটা কেমন–এক–রকম প্রশান্ত মধুর।

আর একটা কথা, —আমাকে কিন্তু বাইরে এখনকার মতোই এমনি রণদুর্মদ, কর্তব্যের সময় এমনিই মায়া–মমতাহীন ক্রূর সেনানী, যুদ্ধে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের চেয়েও দুর্বিনীত দুর্বার নর–রক্তপিপাসু দুর্বৃত্ত দানবের মতোই থাকতে হবে। কলের মানুষের মতো আমার অধীন সৈনিকগণ যেন আমার হুকুম মানতে শেখে। আমার দায়িত্বজ্ঞানে আমার কাজে কলঙ্ক বা শৈথিল্যের যেন এতটুকু আঁচড় না পড়ে। সৈনিকের যে এর বড় বদনাম নেই। তারপর কর্তব্য–অবসানেই আমি তাদের সেই চিরহাস্য–প্রফুল্ল গীতি–মুখর স্নেহময় ভাই। তখন আমার এই অগ্নি–উদ্‌গারী নয়নেই যেন স্নেহের সুরধুনী ক্ষরে, বজ্রনির্ঘোষের মতো এই কাঠচোটা স্বরেই যেন করুণা আর স্নেহ ক্ষীর হয়ে ঝরে, আমার কণ্ঠ–ভরা গানে তাদের চিত্তের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়! আমার অন্তর আর বাহির যেন এমন একটা অস্বচ্ছ আবরণে চির–আবৃত থাকে যে, কেউ আমার সত্যিকার কান্নারত মূর্তিটি দেখতে না পায়, হাজার চেষ্টাতেও না!

খোদা, আমার অন্তরের এই উচ্ছ্বসিত তপ্তশ্বাস যেন আনন্দ–পূরবীর মুখরতানে চিরদিনই এমনি ঢাকা পড়ে যায়, শুধু এইটুকুই এখন তোমার কাছে চাইবার আছে। আর যদি এই অজানার অচিন ব্যথায় কোনো অবুঝ হিয়া ব্যথিয়ে ওঠে, তবে সে যেন মনে মনে আমার প্রার্থনায় যোগ দিয়ে বলে, —'আহা, তাই হোক্!' কেননা এমনিতর স্নেহ–কাঙাল যারা, —যাদের মৃত্যুতে এক ফোঁটা আঁসু ফেলবারও কেউ নেই এ দুনিয়ায়, যারা কারুর দয়া চায় না, অথচ এক বিন্দু স্নেহ–সহানুভূতির জন্যে উদ্বেগ–উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে, তাদের দেবার এর বেশি কিছু নেই, আর থাকলেও তারা তা চায়ও না। এই একটু স্নিগ্ধ বাণীই গুহার ম্লান বুকে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোর মতো তাদের সান্ত্বনা দেয়।

* * *

সে ছিল এমনি এক চাঁদিনী–চর্চিত যামিনী, যাতে আপনি দয়িতের কথা মনে হয়ে মর্মতলে দরদের সৃষ্টি করে। মদির খোশবুর মাদকতায় মল্লিকা–মালতীর মঞ্জুল মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনীগন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত অজানা একটা শোক–শঙ্কায় বক্ষ ভরে তুলেছিল। ...

সে এল মঞ্জীর–মুখর চরণে সেই মুকুলিত লতাবিতানে! তার বাম করে ছিল চয়িত ফুলের ঝাঁপি। কবরী–ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হয়ে তারই বুকে ঝরে ঝরে পড়ছিল, ঠিক পুষ্প–পাপড়ি বেয়ে পরিমল ঝরার মতো। কপোল–চুম্বিত

তার চূর্ণকুন্তল হতে বিক্ষিপ্ত কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এল, —ওগো ওঠো, দেখো ঘুমের দেশ পেরিয়ে স্বপ্ন-বধূ এসেছে। উল্লাস-হিল্লোলে শাখায় শাখায় ঘুমন্ত ফুল দোল খেয়ে উঠল! আমার কপাল ঘামে ভরে উঠল, বক্ষ দুরু-দুরু করে কাঁপিয়ে গেল সে কোন্ বিবশ শঙ্কা! ঘন ঘন শ্বাস পড়ে আমার হাতের কামিনীগুচ্ছটির দলগুলি খসে খসে পড়তে লাগল। আমার বোধ হলো, এ কোন্ ঘুমের দেশের রাজকন্যা আমার কিশোরী মানস-প্রতিমার পূর্ণ পরিণতির রূপে এসে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে! ভয়ে ভয়ে আমার আবিষ্ট চোখের পাতা তুলেই দেখতে পেলুক, বেতস লতার মতো সে আমার সামনে অবনত মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে যেন সে চলে যেতে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি ভীত জড়িত স্বরে বললুম, —'কে তুমি—পরি?'

তার আয়ত আঁখির এক অনিমিখ চাউনি দিয়ে আমার পানে চেয়েই সে থমকে দাঁড়াল! শুক্ল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার দুটি বড় বড় চোখে চোখ-ভরা জল। ... এক পলকে পরির নূপুরের রুনু-ঝুনু শিঞ্জিনী চমকে যেন কি বলে উঠল। আনন্দ-ছন্দের হিন্দোলার দোল আর দুলল না! অসম্বৃতা তার লুণ্ঠিত চঞ্চল অঞ্চল সম্বৃত হলো। শিথিল বসনার ফুল্ল কপোলে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িম্বের মতো হিঙ্গুল হয়ে ফুটল! সমীরের থামার সাথে সাথে যেন উলসিত-সরসী-সলিলের কল-কল্লোল নিথর হয়ে থামল, আর তারই বুকে একরাশ পাতার কোলে দুটি রক্ত-পদ্ম ফুটে উঠল। ত্রস্তা কুরঙ্গীর মতো ভীতি তার নলিন-নয়নে করুণার সঞ্চার করলে। বার-বার সংযত হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে কইলে, —'তুমি—আপনি কখন এলেন?—'

আমি ব'ললুম, —'আজ এসেছি! তুমি বেশ ভাল আছ পরি?'

সে একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে কইলে, 'হ্যাঁ, আজ এখানে মা আর আমাদের বাড়ির সকলে বেড়াতে এসেছেন। এ-বাগানটা ভাইজান নতুন করে করলেন কিনা! —ঐ যে তাঁরা পুকুরটার পাড়ে বসে গল্প করছেন।'

আমার নেশা যেন অনেকটা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বললুম, 'ওঃ, আজ প্রায় দু'বছর পরে আমাদের দেখা, নয় পরি? তোমাকে যেন একটু রোগা-রোগা দেখাচ্ছে? কোনো অসুখ করেনি তো?'

সে তার ব্যথিত দুটি আঁখির আর্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে অনেকক্ষণ চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, —'না!—'

তার পরেই যেন তার কি কথা মনে পড়ে গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কয়ে উঠল, 'আপনি! এখানে কেন আর? যান! ...'

এক নিমিষে এমন আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না যেন দপ্ করে নিভে গেল। একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনায় সমস্ত দেহ আমার অনেকক্ষণের জন্যে নিসাড় হয়ে রইল। কখন যে মাথা ঘুরে পড়ে পাশের বেঞ্চিটার হাতায় লেগে আমার বাম চোখের

কাছে অনেকটা ফেটে গিয়ে তা দিয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ করে খুন ঝরছিল, আর পরি তার আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে আমার ক্ষতটায় পটি বেঁধে দিয়েছিল, তা আমি কিছুই জানতে পারিনি! যখন চোখ মেলে চাইলুম, তখন পরি আমার আঘাতটাকে জল চুঁইয়ে দিচ্ছে, আর সেই চোঁয়ানো জলের চেয়েও বেগে তার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু চুঁয়ে পড়ছে! ...এতক্ষণে আহত অভিমান আমার সারা বক্ষ আলোড়িত করে গুমড়ে উঠল। বিদ্যুদ্বেগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আহত স্বরে বললুম, 'বড় ভুল হয়েছে পরি, তুমি আমায় ক্ষমা করো!'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন কি সামলে নিলে, তারপরে আনমনে চিবুক-ছোঁয়া তার একটা পীত গোলাবের পাপড়ি নখ দিয়ে টুঙতে টুঙতে অভিভূতের মতো কি বলে উঠল!

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না, বললুম, 'তবে যাই পরী!'

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আহ্‌, তাই যাও!'

কিন্তু জ্যোৎস্না-বিবশা নিশীথিনীর মতোই যেন তার চরণ অবশ হয়ে উঠেছিল, তাই কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত বদনে সে পাথরের মতো সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। যখন দেখলুম হেমন্তে শিশির-পাতের মতো তার গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, তখন অতি কষ্টে আমার এক বুক দীর্ঘশ্বাস চেপে চলে এলুম। তখন তীক্ষ্ণ ক্লেশের চোখা বাণ আমার বাইরে-ভিতরে এক অসহনীয় ব্যথার সৃষ্টি করছিল। মনে হচ্ছিল, এই চাঁদিমা-গর্বিত যামিনীর সমগ্র বক্ষ ব্যেপে সাহানা সুরের পাষাণ-ফাটা কান্না আকণ্ঠ ফুঁপিয়ে উঠছে, আর তাই সে শুধু সিক্ত চোখে মৌন মুখে আকাশ-ভরা তারার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, আকাশের মতো আমারও মর্ম ভেদ করে এমনি কোটি কোটি আগুন-ভরা তারা জ্বলছে, উষ্ণতায় সেগুলো মার্তণ্ডের চেয়েও উত্তপ্ত। স্থির সৌদামিনীর মতো সেগুলো শুধু জ্বালাময়ী প্রখর তেজে জ্বলছে—ধু-ধু-ধু!

* * *

এটাও একবার কিন্তু মনে হয়েছিল সে দিন যে, আহ্‌, কি হতভাগা আমি! যা পেয়েছিলাম, তাতেই সন্তুষ্ট থাকলুম না কেন?

দূরে থেকে ঐ একটু অনুরাগ-সঞ্চিত সলাজ চাউনি, —নানান্‌ কাজের অনর্থক ব্যস্ততার আড়ালে দু-তিন বার দৃষ্টি-বিনিময়, হঠাৎ একটি শিহরণ-ভরা পরশ, —যাই-যাই করেও না যেতে পারার মাধুরীময় সলজ্জ কুণ্ঠা, মুখর হাসি ওষ্ঠ-অধরের নিষ্পেষণে চাপতে গিয়ে চোখের তারায় ফুটে ওঠা, আর সেই শরমে কর্ণমূলটি আরক্ত হয়ে ওঠা—এই সব ছোট-খাট পাওয়া আর টুকরো টুকরো আনন্দের গাঢ় অনুভূতি আমার প্রাণে যে এক নিবিড় মাধুরীর মাদকতা ঢেলে নেশায় মশগুল করে রেখেছিল, তার চেয়েও বেশি আমি তো আর পেতে চাইনি, তবে কেন সে আমায় এত অপমান করলে?—

আমি তাকে ভালবেসে আসছি, সে-যে কবে থেকে তার কোনো দিন-ক্ষণ মনে নেই ; বড় প্রাণ দিয়েই ভালোবেসেছি তাকে, কিন্তু কোনো দিন কামনা করিনি। আগেও মনে হতো আর আজও হয় যে, তাকে না পেয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থই হয়ে গেল, তবু প্রাণ ধরে কোন দিনই তো তাকে কামনা করতে পারিনি। বরং যখনই ঐ বিশ্রী কথাটা—মিলন আর পাওয়ার এবড়ো-খেবড়ো দিকটা, একটুখানির জন্যে মনের কোণে উঁকি মেরে গিয়েছে, তখনই যেন লজ্জায় আর বিতৃষ্ণায় আমার বুক এলিয়ে পড়েছে। এত ভুবন-ভরা ভালবাসা আমার কি শেষে দুদিনেই বাসি হয়ে পড়তে দেব? —ছি ছি! না না!

সে-দিন মনে হয়েছিল, যে-ভালবাসা দু'জনের দেহকে দু'দিক থেকে আকর্ষণ করে মিলিয়ে দেয়, সে তো ভালবাসা নয়, সেটা অন্য কিছু বা মোহ আর কামনা। হয়তো এই মোহটাই শেষে ভালবাসায় পরিণত হতে পারত এমনি দূরে দূরেই থেকে, কিন্তু এক নিমিষের মিলনেই সে পবিত্র ভালবাসা কেমন বিশ্রী কদর্যতায় ভরে গেল! প্রেমের মিলন তো এত সহজে এমন বিশ্রী হয় না! তাই জীবন আমার ব্যর্থ হবে জেনেও আমি প্রাণ থাকতে তার সঙ্গে মিলিনি। জীবন-ভরা দুঃখ আর ক্লেশ-যাতনা অপমানের পসরা মাথা পেতে নিয়েছি, তবু আমি ভুলেও ভাবতে পারিনি যে, এমনি নির্লজ্জের মতো এসে এই আঁধার-পথের মামুলি মিলনে আমার প্রিয়ার অবমাননা করি। আমি জানি, এমনি করেই তাকে এমন করে পাব, যে-পাওয়া সকলে পায় না। কেউ বলে না দিলেও আমার বিশ্বাস আছে যে, আজ যাকে ব্যর্থ বলে মনে করছি, আমার জীবনে সেই ব্যর্থতাই একদিন সার্থকতায় পুষ্পিত পল্লবিত হয়ে উঠবে—... আ মলো, কী লিখতে গিয়ে কীসব বাজে কথা লিখছি! হাঁ, কী বলছিলুম? তাকে ভালবাসি বলেই তাকে এমন করে এড়িয়ে এলুম, এই কথাটা বুঝতে না পেরেই কি সে আমায় এমন করে প্রত্যাখ্যান করলে। হায়! প্রাণপ্রিয়তমের পাওয়াকে এড়িয়ে চলবার ধৈর্য আর শক্তি পেতে যে আমি কত বেশি বেদনা আর কষ্ট পেয়েছি, তা তুমি বুঝবে না পরি—বুঝবে না! তবু কিন্তু বড় দুঃখ রয়ে গেল যে, হয়তো তুমি আমার ভালবাসার গভীরতা বুঝতে পারলে না। তোমায় অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে তোমায় যত বেদনা দিয়েছি, তার চেয়ে কত বেশি ব্যথা যে আমাকে চাপতে হয়েছে, কত বড় কষ্ট যে নীরবে সইতে হয়েছে, তা যদি তুমি জানতে পারতে পরি, তাহলে সে দিন এই কথাটা মনে করে আমায় এত বড় আঘাত করতে পারতে না।...

আমি জানি প্রিয়, সে-দিন তোমার আসবেই আসবে, যে-দিন আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সকল কথা সকল আশা অন্তত তোমার কাছে লুকানো থাকবে না। এ তুমি নিজেই আপনা-আপনি বুঝতে পারবে, কাউকে তা বলে দিতে বা বুঝিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু সে-দিন কি আমি আর এ-জীবনে জানতে পারব প্রিয়, তুমি আমায় ভুল বোঝোনি? তা যদি না জানতে পরি, তবে আফসোস প্রিয়, আফসোস!...

এই নাও, আমার সব ঘুলিয়ে গেল দেখছি ! এ যেন ঠিক ঘুমের ঘোরে হাজার রকমের স্বপ্ন দেখার মতো। কোনোটার সঙ্গে কোনোটারই সামঞ্জস্য নেই, অথচ অলক্ষ্য থেকে স্বপ্ন-রানি সবগুলিকে একটি ক্ষীণ সুতো দিয়েই গেঁথে দিচ্ছে ! আমার সব কথাগুলো যেন ঠিক লাখো ফুলের এলোমেলো মালা !

আবার আমার মনে হচ্ছে আমার পক্ষে তার কাছে ও-রকম করে কথা কওয়া বা দেখা দেওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি। কেননা সে নিশ্চয় মনে করেছিল যে, আমি আমার মিথ্যা অহঙ্কারকে কেন্দ্র করে তার কাছে ত্যাগের গর্ব দেখাতে গিয়েছিলুম, আর তাই হয়তো যখন এই কথাটা তার হঠাৎ মনে হলো, অমনি কেমন একটা বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে উঠল, আর সে আমায় ও-রকম নির্দয়তা না দেখিয়েই পারলে না। আর একটা কথা, কেউ একটু সামান্য প্রশ্রয় দিলেই আমাদের মতো স্নেহ-বুভুক্ষু হতভাগারা এতটা বাড়াবাড়ি করে তোলে, যে, সে তখন এই দুর্ভাগাদের চেতন করিয়ে দিতে বাধ্য হয়, আর আমরা সেইটাকে হয়তো অপমানের আঘাত বলেই মনে করি। এটা তো আমাদেরই দোষ।

অন্তরের গোপন কথা অন্তরেই না রাখতে পেরে বাইরে প্রকাশ করে দেওয়ার যে দুর্বার লজ্জা আর অক্ষমণীয় অপমান, তা হতে আমায় রক্ষা করো খোদা, রক্ষা করো ! এর যা শাস্তি, তা বড় নির্মম নিষ্করুণ হয়েই আমার মাথার ওপর চাপাও।

কিন্তু ঘুমের ঘোর আমার এখনও কাটেনি। মন এমন একটা জিনিস বা মনের এমন একটা দুর্বলতা আছে যে, সে সহজে কোনো জিনিসের শক্ত দিকটা দেখতে চায় না। বুঝলেও অবুঝের মতো সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে চায় ! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কে যেন মনের মুণ্ডটা ধরে ঐ নিষ্করুণ নীরস দিকটাই দেখতে বাধ্য করায়; সে বোধ হয়, মনেরই পেছনে প্রচ্ছন্ন একটা দুর্নিবার শক্তি।

দেখেছ মজা ! আমার মন এটা নিশ্চয়ই জেনে বসেছে যে, সে আমাকে আমার চেয়েও বেশি ভালবাসে। তবে সে-দিন যে সে আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে ? সে বড় দুঃখে গো, বড় দুঃখে ! তার মতো অভিমানিনীর আত্ম-মর্যাদাকে ডিঙিয়ে চলার সামর্থ্য নেই। তাই বড় কষ্টে তাকে এত শক্ত হতে হয়েছিল। নইলে ঐ নিষ্ঠুর কথাটা বলবার পরই কেন হু-হু করে অশ্রুর হড়পা বান বয়ে গেল তার চোখের বুকের সব আবরণ ভাসিয়ে দিয়ে ! সব মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু এটা—এত বড় একটা সত্য তো মিথ্যা হতে পারে না। অন্ধ, তুমি সেই সময় যদি তার মর্মন্তুদ ব্যথার বেদনা বুঝতে পারতে, আর এই অভিমান-বিধুর অকরুণ কথার উৎস কোথায় দেখতে পেতে, তাহলে আজ ঐ মিথ্যা দুঃখটা তোমায় এত কষ্ট দিত না ! সে যদি এত বেশি অভিমানিনী না হতো, তাহলে সাধারণ রমণীর মতো অনায়াসে তোমার পায়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে কেঁদে উঠত,—ওগো অকরুণ দেবতা ! খুব করেছ ! খুব উদারতা দেখিয়েছ, আর এ-হতভাগিনীকে জ্বালিও না ! এতই দেবত্ব দেখাতে চাও যদি, তবে এস না।

কিন্তু তাহলে তো 'আমার প্রিয় মহান !' এই কথাটির গৌরবে আমার রিক্ত বুক এমন করে ভরে উঠতে পারত না ! —ভালই করেছ খোদা, তুমি ভালই করেছ ! প্রতি দিনের মতো আজ তাই বড় প্রাণ হতেই বলছি, —তুমি চির-মঙ্গলময় ! আবার বলছি, —'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী !'

* * *

এ আর এক দিনের কথা। ...... পরি তার তে-তালার দালানের কামরায় ব'সে নিশীথ-রাতের সুষুপ্তিকে ব্যথিয়ে আনমনে গাচ্ছিল, —দিগ্‌বালারা আজ জাগল না। নব-ফাল্গুনে মেঘ করেছে। মুখর ময়ূরের কলকণ্ঠের সাথে মাঝে মাঝে আকুল মেঘের ঝম্‌ঝমানি শোনা যাচ্ছে, ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ! ... নিত্যকার নৃত্য-মুখর প্রভাত এখন রোজই স্তব্ধ হয়ে শুধু ভাবে আর ভাবে। বর্ষণ-পুলকিত পুষ্প-আকুলিত এই বল্লী-বিতানের আর্দ্র-স্নিগ্ধ ছায়ে বসে আমার মনে হয়, আমার প্রিয়তমাকে আমি হারিয়েছি, আবার মনে হয়, না, বড় বুক ভরেই পেয়েছি গো, তাঁকে পেয়েছি ! আজ আমার ফুল-শয্যার নিশিভোর হবে। এ ভোরে বারিও ঝরবে, বারি-বিধৌত ফুলও ঝরবে, আবার শিশুর-মুখে-অনাবিল-হাসির মতো শান্ত কিরণও ঝরবে। ওগো আমার বসন্ত-বর্ষার বাসর-নিশি, তুমি আর যেও না—হায়, যেও না !

আমার বিজন কুটিরে সেই গান আমার বিনিদ্র কানে যেন এক রোদন-ভরা প্রতিধ্বনি তুলছিল। আমি ভাবছিলুম যে, হায়, মাঝে আর তিনটি দিন বাকি ! তারপর এই পনেরো বছরের চেনা-গলার মিঠা আওয়াজ আর শুনতে পাব না, এই আমার বিশ বছরের জীবনে জড়িয়ে-পড়া নিতান্ত আপনার মানুষটিকে হারাতে হবে। কিন্তু হয়তো সারা জনম ধরে এরই রেশ আমার প্রাণে বীণার ঝঙ্কার তুলবে। ... এই তিনটি দিনই মাত্র তাকে আমার বলে ভাবতে পারব, তার পরে আমার কাছে তার চিন্তাটা যেমন দূষণীয়, তার কাছেও আমার চিন্তাটা সেই রকম অমার্জনীয় অপরাধ হবে ! আর এক জনের হয়ে সে কোন্ দূর দেশে চলে যাবে, আমিও চলে যাব সে কোন্ বাঁধন-হারার দেশ পেরিয়ে। তারপর দীর্ঘ বিধুর-মধুর অলঙ্‌ঘনীয় একটা ব্যবধান ! ...

এই সব কথা মনে পড়তেই আমি বৃষ্টি-ধারার ঝম্‌ঝমানির সাথে গলার সুর বেঁধে গাইলুম,—ওগো প্রিয়তম, এস আমরা দু-জনেই পিয়াসী চাতক-চাতকীর মতো কালো মেঘের কাছে শান্ত বৃষ্টি-ধারা চাই। আমরা চাঁদের সুধা নেব না প্রিয় ! আমরা তো চকোর-চকোরী নই। চাতক-মিথুন বাদলের দিনে আমরা চাইব শুধু বর্ষণের পূত আকুল ধারা। এস প্রেয়সী আমার, এই আমাদের ফাল্গুনের মেঘ-বাদলের দিনে আমরা উভয়ে উভয়কে স্মরণ করি আর চলে যাই ! এই বসন্ত-বর্ষার নিশীথিনীর মতোই আমার মনের মাঝে এস তোমার গুঞ্জরণ-ভরা ব্যথিত চরণ ফেলে ! ... তার পরে দূরে দাঁড়িয়ে সজল চারিটি চোখের চাউনির নীরব ভাষায় বলি, —'বিদায়' ! ...

সে আমার গান শুনেছিল কিনা জানিনে। কিন্তু সে-সময় মেঘের ঝরা থেমেছিল, আর তার বাতায়ন চিরে ম্লান একটু দীপ-শিখা আমার বিজন কুটিরে কাঁপতে কাঁপতে নেমেছিল ! ...

তারপর ঝড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাড়া পাগল মেঘের ঐ একরোখা শব্দ, —রিম্—ঝিম্—রিম্। ...

*   *   *

বিসর্জনের দিন। নহবৎ-খানায় তারই বিসর্জনের বাজনা বাজছে। সান্ত্বনা আর অশান্ত এক-বুক বেদনা—এই দুটো মিলে আমায় এমন অভিভূত করে ফেলেছে, যে, অতি কষ্টে আমার এ শ্রান্ত দেহটাকে খাড়া করে রেখেছি। আর—আর একটু পরেই যেন খুঁটি-দিয়ে-খাড়া করা এই জীর্ণ ঘরটা হুড়মুড় করে ধ্ব'সে পড়বে। ...

বাইরে বেরিয়ে এলুম। সেখানেও ঐ একই একটা অসোয়াস্তি আর অরুন্তুদ যন্ত্রণা ! নিদাঘ সাঁঝের ধূসর আকাশ ব্যথায় উদাস-পাণ্ডুর হয়ে ধরার বুক আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, আর অলক্ষ্যে ক্রমেই সে বেদনায় গুমোট কালো জমাট হয়ে আসছিল। আমের মুকুলের সাথে পাশের গোরস্থান থেকে গুলঞ্চের মালঞ্চ যে করুণ সুগন্ধের আমেদ দিচ্ছিল, তাতে আমি কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারছিলুম না। ওঃ ! সে কি দুর্জয় অহেতুক কান্নার বেগ ! এই রোদনের সাথে একটা ক্লান্তি-ভরা স্নিগ্ধতাও যেন ফেনিয়ে আমার ওষ্ঠ পর্যন্ত ছেপে উঠেছিল !

*   *   *

পরির বিয়ে হ'ল। ... দৃষ্টি-বিনিময় হলো। সম্প্রদান হলো। তার পরেই আমি আর এই কথাটা গোপন রাখতে পারলুম না, যে, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলে যে, আমাদের মতো আত্মীয়-স্বজনহীন ভবঘুরে হতভাগাদের জন্যেই বিশেষ ক'রে এই সৈন্যদলের সৃষ্টি! আমিও মনে মনে ব'ললুম, —'তথাস্তু'। —দু'-একজন বন্ধু মামুলি ধরনের লৌকিকতা দেখিয়ে একটু-আধটু দুঃখ প্রকাশও করলেন।

সে-দিন কেঁদেছিল শুধু আমার দূর সম্পর্কের একটি ছোট বোন। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে বললে, —'যাও ভাই-জান ! হয়তো আর তোমায় ফিরে পাব না। তবু কিন্তু তুমি এত বড় একটা কাজে যাচ্ছ যে, সেটায় বাধা দেওয়াও মস্ত পাপ আর স্বার্থপরতা। এমন একটা কাজে জীবন উৎসর্গ করতে গেলে দেশের কোনো বোনই যে তার ভাইকে বাধা দিতে পারে না ! আমাদের দেশে বীরাঙ্গনা না থাকলেও বীর-ভাইদের বোন হওয়ার মত সৌভাগ্যবতী অনেক রমণী আছেন। তাঁরাও নিশ্চয়ই নিজের ভাইকে বীর-সাজে সাজিয়ে দেশরক্ষা করতে পাঠাতে পারেন। ভুলে যেও না ভাই-জান যে, রণদুর্মদ মুসলমান জাতির উষ্ণ রক্ত আমাদেরও

দেহে রয়েছে। আমরাও আসছি সেই একই উৎস হতে। এ-রক্ত তো শীতল হবার নয় !' ...

আমি আমার এই মুখরা বোনটিকে বড় বেশি স্নেহ করতুম। তাই তার সে-দিনকার এই সব কথার গৌরবে আমার বুক ভরে উঠেছিল ! আমার অসম্বরণীয় অশ্রু রুখতে গিয়ে দেখলুম, ততক্ষণে আমার ছোট বোনের চোখ দু'টি জলে ভাসছে ! তাকে আর কখনও কাঁদতে দেখিনি। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে আমায় বললে, — 'তোমাকে কেউ বাধা দিতে নেই বলে তুমি হয়তো অন্তরে বড় কষ্ট পাচ্ছ ভাই-জান, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো যে, আমার মতো আজ অনেকেই তোমার কথা ভেবে লুকিয়ে কাঁদছে ! —হ্যাঁ, একটা কথা। একবার আমার সই পরিদের বাড়ি যাও। এ শেষ-দেখায় কোনো লজ্জা-শরম ক'রো না ভাই ! পরি বড় অস্থির হয়ে পড়েছে, তার অন্তিম অনুরোধ, একবার তাকে দেখা দাও।' ...

হায় রে সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ঝরিণী-স্বরূপা ভগিনিগণ ! তোরা চিরকালই এমনি সন্ন্যাসিনী, অথচ ভারে ভারে পবিত্র স্নেহ ঘরে ঘরে বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস ! বড় দুঃখ, তোদের সহজে কেউ চেনে না। যে হতভাগার বোন নেই, সেই বোঝে তার দুঃখ-কষ্ট কত বড় ! মুখে অনেক সময় তোদের কষ্ট দেবার ভান করলেও তোরা বোধ হয় সহজেই বুঝিস, যে, আমাদেরও বুকে তোদেরই মতো অনাবিল একটি স্নেহ-প্রীতির প্রশান্ত ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, তাই তোরা মুখ টিপে হাসিস। আবার কাজের সময় কেমন করে এত বড় তোদের স্নেহ-বেষ্টনীকে ধূলিসাৎ করে দিস ! ...

আমার এই বড় গৌরবের, বড় স্নেহের বোনটিকে আশীর্বাদ করবার ভাষা পাইনি সে-দিন ! তার আনত মস্তকে শুধু দু-ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আমার প্রাণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিল।

খুব সহজেই পরির সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। এই নির্বিকার তৃপ্তিতে আমার নিজেরই বিস্ময় এল ! কি করে এমন হয় ?

পরি নব-বধূর বেশে এসে যখন আমার পা ছুঁয়ে সালাম করলে, তখন বরষার স্রোতস্বিনীর চেয়েও দুর্বার অশ্রুর বন্যা তার চোখ দিয়ে গলে পড়ছে ! মুহূর্তের জন্যে দুর্জয় একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে আমার বুকটা যেন খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। প্রাণপণে আমি আমার অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত স্বরকে সহজ সরল করে তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ-সজল কণ্ঠে বললুম, 'চির-আয়ুষ্মতী হও ! সুখী হও !'

সে শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ! তারপর মহিমময়ী রানীর মতোই চলে গেল !

যখন আমার ভাঙা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে শেষ-চাওয়া চেয়ে নিলুম, তখন মনে হলো যেন 'সজ্‌নে ফুলের হাত-ছানিতে' আমার পল্লী-মাতা আমায় ইশারায় বিদায় দিলে ! একবার নদীপারের শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে মনে হলো যেন তার ডালে ডালে নিরাশ প্রেমিকের 'খুন-আলুদা' হৃৎপিণ্ডগুলো টাঙানো রয়েছে ! ... সে-

দিন ছল-ছল ময়ূরাক্ষীর নির্মল ধারা তেমনি মায়ের বুকের শুভ্র ক্ষীর-ধারার মতোই বয়ে যাচ্ছিল !

স্বপ্নের মতো বিহ্বলতায় ভরা সে কোন্ সুরপুর হতে আধঘুমে গীত আধখানা গানের প্রাণস্পর্শী ব্যঞ্জনা আমার কানে এল,—

'অনেক দিনের অনেক কথা ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে !'

শান্তির মতো শুভ্র এক-বুক পবিত্রতা নিয়ে এই অজানার দিকে তখন পাড়ি দিলুম ! আর একটিবার আমার শূন্য ঘরটার দিকে অশ্রু-ভরা দৃষ্টি ফিরিয়ে আকুল কণ্ঠে কয়ে উঠলুম, —'জয় অজানার জয় !'

*   *   *

পরির কথা

ময়ূরেশ্বর—বীরভূম

সব ছাপিয়ে আমার মনে পড়ছে তাঁরই গাওয়া অনেক আগের একটা গানের সান্ত্বনা,—

'অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন্ একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন্ হাওয়া,
দিনের পরে দিন চলে যায় যেন তারা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হতেই তাদের যাওয়া-আসা ;
কখন্ আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া।
হারিয়ে যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে,
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে ;
সেই যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা,
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা।
এক পলকের পুলক যত, এক নিমিষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া !'

আমার আজ সেই কথাটাই বারেবারে মনে হচ্ছে যে, যাকে হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা করে কুড়িয়ে পেলুম, সেই আমার জীবনের হারে গাঁথা রইল ! আর সেই আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা নিয়ে আজ আমার দুখের থালা সাজিয়ে বসে আছি, —ওঃ সে বড় আশায় ! ... এ কোন্ সে-দিনের আশায় আর কার প্রতীক্ষায় ?

*　　　*　　　*

তিনি যখন আমায় আশীর্বাদ করতে এলেন, তখন একবার মনে হলো বুঝি এইবার আমার সকল বাঁধন টুটল ! ওঃ খোদা ! আমাদের বুকে তুমি রাশি রাশি ব্যথা আর দুঃখ বোঝাই করে রেখেছ, তা সহ্য করতে তেমনি ধৈর্য-শক্তি যদি আমাদের না দিতে, তাহলে আমাদের লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকত না, —অপমানের চূড়ান্ত হতো ! সে-দিন আমি নিজেকে সংযত করতে না পারলে আমার নারীত্বের মাথায় যে পদাঘাত পড়ত, তাতে আমি হয়তো আর এই আজকের মতো মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারতাম না ! তুমি হৃদয়ে বল দিয়েছ প্রভু, তাই অসঙ্কোচে এমন একটা গৌরব অনুভব করতে পারছি আজ, হোক না কেন সে গৌরব বড় কষ্টের !

আমার ভালবাসাই হয়তো তাঁর কর্তব্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সুখের জন্যে, তাঁর তৃপ্তির জন্যে আমি কেন তবে সে-পথ হতে সরে দাঁড়াব না? আমার সর্বস্বের বিনিময়েও যে তাঁকে সুখী করতে পেরেছি, এই তো আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা !

এই তাঁর চিন্তাটা যে আজ হতে জোর করে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, সেইটাই আমায় সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে। বাইরের শাসন আর ভিতরের শাসন এই দুটোয় মস্ত টানাটানি পড়ে গিয়েছে এখন। সমাজ, ধর্ম আমার মনকে মুখ ভাঙিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলছে, —সে চিন্তাটা তোমার ভয়ানক অন্যায়, অমার্জনীয় পাপ।

মনও বেশ প্রশান্ত হাসি হেসে বলছে, —আমি মিথ্যাকে মানব কেন? যা অন্তরের সত্য, সেইটাই আসল, সেইটাকে এড়িয়ে চললেই পাপ। গভীর সমাজ-তত্ত্বের সাথে গভীর সত্যের কথাটাও একবার ভেবে দেখো।

বাস্তবিক, অন্তরের গভীর সত্যকে বরণ করে নিতে গিয়ে সমাজ আর ধর্মকে আঘাত করা হয় বলে যদি মনে করি, তাহ'লে সেটা আমাদেরই ভুল ; কারণ আমরা সমাজ আর ধর্মের অন্তর্নিহিত আদত সত্যকে উপেক্ষা করে তাদের বাইরের খোলসটাকে আঁকড়ে ধরে মনে করি, আমাদের মতো সত্যবিশ্বাসী আর নেই। আমাদের এ অন্ধবিশ্বাস যে মিথ্যা, তা সব চেয়ে বেশি করে জানি আমরা নিজেরাই। তবু সেটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না, উল্টো হাজার 'ফ্যাচাং'-এর দলিল নজির পেশ করব ! কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে অন্তরের সত্যকে উপেক্ষা করে এই যে আর একজনকে আমার স্বামী বলে নিজ মুখে মেনে নিলাম, তার কি হবে ?

মনও যেন তখন বিরক্তি-বিতৃষ্ণায় জ্বলে উঠে বলে, —হাঁ, একটা বড় কাজ করছ বলে এই যে এত বড় সত্যের অবমাননা করলে, তার শাস্তি খুব কঠোর নির্দয়ভাবেই পেতে হবে। এখন যে তাকে আর চিন্তা করতেও পাবে না, এইটাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি !

মনের এই অভিমান-ভরা উক্তিতে আমি না কেঁদে থাকতে পারিনে। আমারও কেন মনে হয় যে, আমি ইচ্ছে করেই তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছি, কিন্তু বুক-ভরা অভিমান আমার তাঁর বিরুদ্ধে এখনও জমে রয়েছে ! প্রিয়ের বিরুদ্ধে এ-অভিমান আমার জন্মে জন্মে সঞ্চিত রইল।

* * *

কাল ছিল আমার ফুল-শয্যা। এই বাসর রাত্রিটি অনেক নারীর জীবনে মাত্র একটি নিশির জন্যেই সুখদ হয়ে আসে। এর বিনোদ স্মৃতিটা প্রভাতের শুকতারার চেয়েও স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে দুঃখ-বেদনা-ক্লিষ্ট নারীর জীবনে অনেকখানি আনন্দের আলো বিকীর্ণ করে !

কিন্তু এমন সুখ-নিশিতেও কি জানি কেন কিছুতেই আমার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করতে পারছিলুম না। আমার স্বামী আমার হাত ধরে তুলে আর্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, —কেন কাঁদছ পরি ? —ব্যথায় তাঁর স্বর আহত হয়ে উঠল।

আমি বড় কষ্টে উপাধানে তেমনি করে নিজের এই নির্লজ্জ চোখ দুটোকে লুকিয়ে মনে মনে বললুম, —বুকে বড় বেদনা ! আমার হাতে তাঁর তপ্ত অশ্রু টস্-টস্ করে ঝরে পড়তে লাগল ! পুরুষমানুষ যে কত কষ্টে এমন করে কাঁদতে পারে, তা বুঝে আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হবার উপক্রম হলো। একটু পরেই তিনি বেশ স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে আমার মনের কথাটি টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমার বেদনা তো আমি জানি পরি ! তোমার এ বুকজোড়া বেদনা কি দিয়ে আরাম করতে পারব বলো ?'

এক নিমেষে আমার লুপ্ত জ্ঞান যেন ফিরে এল। আমি সোজা হয়ে বসে বললুম, —'আপনি সব জানেন ?'

তিনি করুণ হাসি হেসে বললেন, —'তুমি বোধ হয় জানো না যে, আজহার আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমরা বরাবর দু'জনে এক সঙ্গেই পড়েছি। সে যাবার আগে আমায় বলেছে। তাকে আমি বরাবরই চিনি, —সে মিথ্যা বলে না, সে শিশুর মতোই সরল। তবু সকল কথা জেনেও মনে হচ্ছে, আমি তাকে সুখী করতে গিয়েও কি যেন মস্ত অন্যায় করেছি। এখন ভাবছি যে, তাকে সুখী তো করতেই পারিনি, উল্টো তার দুঃখ-কষ্টকে হয়তো আরও বাড়িয়ে দিয়েছি। সে হতভাগা বোধ হয় শান্তিতে মরতেও পারবে না ! এই আমার জীবনে প্রথম আর শেষ অন্যায়। সে আমার পা ধরে মুক্তি চেয়েছিল। তখন কিন্তু বুঝিনি, সে কোন্ মুক্তি ! —আমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি পরি, কিন্তু এতে আত্মতৃপ্তির চেয়ে আত্মগ্লানিই বেশি করে পেলুম ; কেননা আমার অবস্থাটা এখন ঠিক সেই রকমের হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চায়, অথচ কাউকেই

সন্তুষ্ট করতে পারে না ! ... আজহার প্রতিজ্ঞা করেছে যে, এই কথাটা তার জীবনে আর দ্বিতীয়বার মুখ দিয়ে বেরুবে না, আর তার সত্যে আমার বিশ্বাসও আছে। সে তোমাকে সুখী করবার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছে। বলো পরি, তুমি কিসে সুখী হবে ?' ...

আমি তাঁর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললুম, —'তুমি আমায় এক বিন্দু ছেড়ে থেকো না, তোমার এই পায়ে এমনি করে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দিও। আমার বড় কষ্ট !' ...

অনেকক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে থেকে তিনি আমায় বুকে তুলে নিয়ে বললেন, —'না পরি, পায়ে কেন, এই বুকে করে রাখব ! এমন রত্ন সে-হতভাগা কি ক'রে জান ধরে আমায় বিলিয়ে দিতে পারল, তাই ভাবছি !' —বলেই হেসে উঠলেন।

এক মুহূর্তে এই সোজা লোকটির সরলতায় আমার বুক বেদনায় আর শ্রদ্ধায় আলোড়িত হয়ে উঠল। তবু মনে মনে না বলে পারলুম না যে, এমন করে বিলিয়ে দিতে গেলে যে বড্ডো বেশি ভালবাসতে হয় আগে, এ-ক্ষমতা কি যার-তার থাকে ? আবার কি মনে করে তিনি আমায় বলে উঠলেন, —'যা হয়ে গেছে, তার জন্যে খামখা লজ্জিত হয়ো না পরী। —বীর সে, দেশের কাজে গিয়েছে, তাকে আর ডেকো না। মনে করো, যা হয়ে গেছে, তা শুধু ঘুমের ঘোরে !' বলেই তিনি আবার মাথাটা জোর করে তুলে সুর করে গাইতে লাগলেন,—

'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির,
উঠ বীর-জায়া, বাঁধো কুন্তল, মোছো এ-অশ্রু-নীর !'

এ কি রহস্য খোদা ! ... এ দেবতাকে যেন কোনোদিন প্রতারণা না করি, এই শক্তি দাও, হৃদয়ে এমনি বল দাও ! —এখন শুধু শিশুর মতো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার। শান্তি দাও খোদা, শান্তি দাও এঁকে—তাঁকে, আর এমনি ব্যথিত বিশ্ববাসীকে !

আহা ! ভালোবাসা দিয়ে যারা ভালবাসা পায় না, তাদের জীবন বড় দুঃখের, বড় যাতনার। আবার এই জন্যে সেটা এত যাতনার যে, ঐ না-ভালবাসার দরুন কাউকে অভিযোগ করবারও নেই। জোর করে তো আর কাউকে ভালবাসানো যায় না।

আমি কি আবার ভালোবাসতে পারব গো ? কি করে ভুলব ? যে বিদায় নিয়ে এমন করে জয়ী হয়ে চলে গেল, তাকে যে সারা জীবনেও কিছুতেই ভোলা যায় না ! তিনি যদি আমার সামনে থেকে অন্য কোনো দিকে জীবনটা সার্থক করে তুলতেন, তাহলে হয়তো তাঁকে ভুলতেও পারতাম। সব হারিয়ে যে এমন জীবনটা ব্যর্থ করে দিলে এই হতভাগিনীর জন্যে, হায় ! তাকে কি ভোলা যায় ? নারীর ভালবাসা কি এত ছোট ?

ঐ যে এখনও আমার স্বামী তেমনি হাসিমুখে গাচ্ছেন,—

'ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুম-ঘোর !'

অতৃপ্ত কামনা

সাঁঝের আঁধারে পথ চলতে চলতে আমার মনে হলো, এই দিনশেষে যে হতভাগার ঘরে একটি প্রিয় তরুণ মুখ তার 'কালো চোখের করুণ কামনা' নিয়ে সন্ধ্যাদীপটি জ্বেলে পথের পানে চেয়ে থাকে না, তার মতো অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আর নেই!

আমারই বেদনা-রাগে রঞ্জিত হয়ে গগনের পশ্চিম দুয়ারে জ্বালা সন্ধ্যা-তারা আমার মুখে তার অশ্রু-ভরা ছল-ছল চোখ দিয়ে চেয়ে ঐ কথাটিতে সায় দিলে। ঝিল্লি-তান-মুখরিত মাঠের মৌন পথ বেয়ে যেতে যেতে শ্রান্ত চিন্তা কয়ে গেল,—'তোমার ব্যথা বোঝে শুধু ঐ এক সাঁঝের তারা!'

যদি কোনো ব্যথাতুর একটি পল্লি হতে আর একটি পল্লিতে যেতে এমনি সাঁঝে একা শূন্য মাঠের সরু রাস্তা ধরে চলতে থাকে, আর তার সামনে এক টুক্‌রো টাট্‌কা কাটা-কল্‌জের মতো এই সন্ধ্যাতারাটি ফুটে ওঠে, তবে সেই বুঝবে কত বুক-ফাটা ব্যথা সে-সময় তার মনে হয়ে তাকে নিপীড়িত করতে থাকে।

এই মলিন মাঠের শূন্য বুকে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, শুধু কোথায় সান্ধ্য নীড়ে বসে একটি 'ধুলো-ফুরফুরি' শিশ্ দিয়ে দিয়ে বাউল গান গাইছে, আর তারই সূক্ষ্ম রেশ রেশমি সুতোর মতো উড়ে এসে আমার আন্‌মনা-মনে ছোঁওয়া দিচ্ছে! একটি দু'টি করে আস্‌মানের আঙিনায় তারা এসে জুটছে, আমার মনের মাঝেও তাই অনেক দিনের অনেক সুপ্ত কথার, অনেক লুপ্ত স্মৃতির একটির পর একটির উদয় হচ্ছে। ...

আমার এই একই কথা, একই ব্যথা যে কত দিক দিয়ে কত রকমে মনে পড়ছে, তার আর সংখ্যা নেই। তবু বারেবারে ও-কথাটি ও-ব্যথাটি জাগবেই! মন আমার এ বেদনার নিবিড় মাধুর্যকে আর এড়িয়ে যেতে পারলে না। সাপ যেমন মানিক ছেড়ে তার সেই মানিকটুকুর আলোর বাইরে যেতে পারে না, আমারও হয়েছে তাই। আমার এই বুকের মানিক বেদনাটুকুর অহেতুক অভিমানের মায়া এড়িয়ে যেতে পারলাম না!

অনেক দূরে হাটের ফের্‌তা কোন্ ব্যথিতা পল্লি-বধূ মেঠো-সুরে মাঠের বিজন পথে গেয়ে যাচ্ছিল,—

'পরের জন্যে কাঁদ রে আমার মন,
হায়, পর কি কখন হয় আপন?'

আমি মনে মনে বললাম—হয় রে অভাগি, আপন হয় ; তবে অনেকে সেটা বুঝতে পারে না। বুকের ধনকে ছেড়ে গেলেই লোকে ভুল বুঝে বলে, —'পর কি কখন হয় আপন ?' আর একজনও ঠিক এমনি ভুল করে আমায় ছেড়ে গেছে, সে বেদনা ভুলবার নয় !

পথের বিরহিণীর ঐ প্রাণের গান আমায় মনে করিয়ে দিলে অমনি আর একজন অভিমানিনীর কথা। সেই দিল্-মাতানো স্মৃতিটি মাঝিহারা ডিঙির মতো আমার হিয়ার যমুনায় বারেবারে ভেসে উঠছে।

তাতে-আমাতে পরিচয় তো শুধু ছেলে-বেলা থেকে নয়—তারও অনেক আগে থেকে ; সেই চির-পরিচয়ের দিন তারও মনে নেই, আমারও মনে নেই। ... আমাদের পাড়াতেই তাদের বাড়ি।

তাকে আমার বিশেষ করে দরকার হতো সেই সময়, যখন কাউকে মারবার জন্যে আমার হাত দুটো ভয়ানক নিশ্‌পিশ্ ক'রে উঠত। এ-মারারও আবার বিশেষত্ব ছিল, যখন মারবার কারণ থাকত তখন তাকে মারতাম না ; কিন্তু বিনা কারণে মারাটাই ছিল আমার খেপা-খেয়াল। আমার এ-পিটুনি খাওয়াটাকে সে পছন্দ করত কি না জানিনে, তবে দু'-দিন না মারলে সে আমার কাছে এসে হেসে বলত, —'কই ভাই, এ দু'-দিন যে আমায় মারো নি ?'

আমি কষ্ট পেয়ে বলতাম, —'না রে মোতি, তোকে আর মারব না ! তার পর, সে সময় আমার হাতের সামনে যা-কিছু ভাল জিনিস থাকত, তাই তাকে দিয়ে যেন আমার প্রাণে গভীর তৃপ্তি আসত ! মনে হতো, এই নিয়ে সে হয়তো আমার আঘাতটাকে ভুলবে।

বই থেকে ছবি ছিঁড়ে তাকে দেওয়াই ছিল আমার সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। এর জন্যে প্রায়ই পাঠশালায় সারা দিন কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। কিন্তু যখন দেখতাম যে, আমার দেওয়া ঐ মহা উপহার সে পরম আগ্রহে আঁচলের আড়াল করে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলের বিছানা পেতে দিয়েছে, কিংবা তার খেলাঘরের দেওয়ালে ভাত দিয়ে সেগুলো এঁটে দিয়েছে, তখন আমার পাঠশালার সব অপমান ভুলে যেতাম। কিন্তু তার ঐ মেনি বেড়ালটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারতাম না, তাকে যে অত আদর করবে রাত-দিন, এ যেন আমার সইত না। সে আমায় রাগিয়ে তুলবার জন্যে কোনো দিন আমার-দেওয়া সবচেয়ে ভাল ছবিটা আঠা দিয়ে ঐ মেনি বেড়াল-ছানাটার পিঠে এঁটে দিত, আমিও তখন থাপ্পড়ের চোটে তার দুলালী বিড়াল-বাচ্চাকে ত্রি-ভবন দেখিয়ে দিতাম।

তার দেখাদেখি আমিও সময় বুঝে যে দিন সে রেগে থাকত বা মুখখানা হাঁড়ি-পানা করে বসে থাকত, তখন জোর ধুমসুনি দিয়ে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম। তখন আমার আনন্দ দেখে কে ! সে যত কাঁদত, আমি তত মুখ ভেংচিয়ে তাকে কাঁদিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতাম। এক এক দিন তার পিঠের চামড়ায় পাঁচটি আঙুলের কালো দাগ ফুটিয়ে তবে ছাড়তাম ! আশ্চর্য হয়ে দেখতাম, ঐ মার খাওয়ার পরেই

সে বেশ শায়েস্তা হয়ে গেছে ; আর এক মিনিটে কেমন করে সব ভুলে গিয়ে জল-ভরা চোখে-মুখে প্রাণ-ভরা হাসি এনে আমার আঙুলগুলো টেনে মুচড়িয়ে ফুটিয়ে দিতে দিতে বলছে, —'তোমার এই মারহাট্টা হাতের দুষ্টু আঙুলগুলোকে একেবারে ভেঙে নুলো করে দিতে হয় ! তা হলে দেখি, তোমার ঐ ঠুঁটো হাত দিয়ে কেমন করে আমায় মারো !'

তার হাসি দেখে রেগে পিঠের ওপর মস্ত একটা লাথি মেরে বলতাম, —'তাহলে এমনি করে তোর পিঠে ভাদুরে তাল ফেলাই !'

সে কাঁদতে কাঁদতে তার দাদিজিকে বলে দিত গিয়ে এবং তিনি যখন চেলা-কাঠ নিয়ে আমায় জোর তাড়া করতেন, তখন সে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ত। রাগে তখন আমার শরীর গশ্-গশ্ করত। তাই আবার ফাঁকে পেলেই তাকে পিটিয়ে দোরস্ত করে দিতাম।

কোনোদিন বা তার খেলা-ঘরের সব ভেঙে-চুরে একাকার করে দিতাম, এই দিন সে সত্যি-সত্যি খেপে গিয়ে আমার পিঠে হয়তো মস্ত একটা লাঠির ঘা বসিয়ে দিন পনেরো ধরে লুকিয়ে থাকত, ভয়ে আর কিছুতেই আমার সামনে আসত না। সেই সময়টা আমার বড্ডো দুঃখ হতো। আ ম'লো, ও-লাঠির বাড়িতে আমার এ মোষ-চামড়ার কি কিছু হয় ? আর লাগলই বা ! তাই বলে কি বাঁদ্‌রি এমন করে লুকিয়ে থাকবে ? তারপর যখন নানান্ রকমের দিব্যি করে কসম খেয়ে ফুসলিয়ে তাকে ডেকে আনতাম, তখন সে আমার লম্বা চুলগুলো নিয়ে নানান্ রকমের বাঁকা-সোজা সিঁথি কেটে দিতে দিতে বলত, 'দেখো ভাই, আর আমি কখ্খনো তোমায় মারব না ! যদি মারি তো আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়, পোকা হয় !'

তারপরে হঠাৎ বলে উঠত, —'আচ্ছা ভাই, তুমি যদি আমার মতন বেটি ছেলে হতে, তাহ'লে বেশ হতো, —নয়? —দাও না ভাই, তোমার চুলগুলো আমার ফিতে দিয়ে বেঁধে দিই।' কোনোদিন সে সত্যি-সত্যিই কখন্ কথা কইতে কইতে দুষ্টুমি করে চুলে এমন বিউনি গেঁথে দিত যে, তা ছাড়াতে আমার একটি ঘণ্টা সময় লাগত।

তারপর কি হলো ?—

এই শূন্য মাঠের খানিকটা রাস্তা পেরিয়েই আমার মনের শাশ্বত শ্রোতা জিজ্ঞেস করে উঠলে,—হাঁ ভাই, তারপর কি হলো ?

আমার হিয়ার কথক কিছুক্ষণ এই নিজ্ঝুম সাঁঝের জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে যেন তার কথা হারিয়ে ফেললে ! হঠাৎ এই নীরবতাকে ব্যথিয়ে সে কয়ে উঠল, —'না—না, তোমায় আমি ভালবাসি ! সে-দিন মিথ্যা কয়েছিলাম মোতি, মিথ্যা কয়েছিলাম !' তার এই খাপছাড়া আক্ষেপ সাঁঝের বেলায় তোড়ি রাগিণী আলাপের মতো যেন বিষম বে-সুরো বাজল ! —সে আবার স্থির হয়ে তার সুর-বাহারে পূরবীর মূর্ছনা ফোটালে ! চির-পিয়াসী আমার চিরন্তন তৃষিত আত্মা প্রাণ ভ'রে সে সুর-সুধা পান করতে লাগল।

এমনি করেই আমাদের দিন যাচ্ছিল। সে যখন এগারোর কাছাকাছি, তখন তাকে জোর করে অন্দর-মহলের আঁধার কোণে ঠেসে দেওয়া হলো।

সে কি ছটফটানি তখন তার আর আমার ! মনে হলো, এই বুঝি আমার জীবন-স্রোতের ঢেউ থেমে গেল ! স্রোত যদি তার তরঙ্গ হারায়, তবে তার ব্যথা সে নিজেই বোঝে, বাঁধ-দেওয়া প্রশান্ত দিঘির জল তার সে বেদন বুঝবে না। মুক্তকে যখন বন্ধনে আনবার চেষ্টা করা হয়, তখনই তার তরঙ্গের কল্লোলে মধুর চল-চপলতার কলহ-বাণী ফুটে ওঠে ! তাই এ-রকমে চলার পথে বাধা পেয়েই আমাদের সহজ ঢেউ বিদ্রোহী হয়ে মাথা তুলে সামনের সকল বাধাকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলে। চির-চঞ্চলের প্রাণের ধারা এই চপল গতিকে থামাবে কে ? পথের সাথী আমার হঠাৎ তার চলায় বাধা পেয়ে বক্র-কুটীল গতি নিয়ে তার সাথীকে খুঁজতে ছুটল। এতদিনে যেন সে তার প্রাণের ঢেউ-এর খবর পেল !—

সর্বক্ষণ কাছে পেয়ে যাকে সে পেতে চেষ্টা করেনি, সে দূরে সরে এই দূরত্বের ব্যথা, ছাড়াছাড়ির বেদনা তার বুকে প্রথম জেগে উঠতেই সে তাকে চিনল এবং বলে উঠল, —যাকে চাই তাকে পেতেই হবে।

বঞ্চিত স্নেহের হাহাকার, ছিন্ন বাসনার আকুল কামনা তার বুকে উদ্দাম উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন সে তার এই আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়কে নতুন পথে নতুন করে খুঁজতে লাগল। সে অন্তরে বুঝলে, সে সাথী না হলে আমি আমার গতি হারাব ! এই রকম মুক্তি আর বন্ধনের যুঝাযুঝির মাঝে পড়ে সে কাহিল হয়ে উঠল ! —সমাজ বললে, —রাখ্ তোর এ-মুক্তি—আমি এই দেওয়াল দিলাম !

সেই দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে রক্ত-গঙ্গা বহালে, পাষাণের দওয়াল—ভাঙতে পারলে না !

এ-দিকে আমাকে কেউ রাখতে পারলে না ! লোকের চলার উল্টো পথে উজান বেয়ে চলাই হলো আমার কাজ। অনেক মারামারি করেও যখন আমাকে স্কুলের খাঁচায় পুরতে পারলে না, তখন সবাই বললে, —এ ছেলের যদি লেখাপড়া হয় তবে সুগ্রীব-সহচর দগ্ধমুখ হনুবংশ কি দোষ করেছিল ? তারাও হাল ছেড়ে দিল, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখলাম এই বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যত তাকে ভুলে রয়েছি, ততই যেন সে আমার একান্ত আপনার হয়ে আমার নিকটতম কাছে এসে আমার ওপর তার সব নির্ভরতা সঁপে গেছে।

যমুনা আসছিল সাগরের পানে, ঐ সাগরও তার দিগন্ত-ছোঁওয়া ঢেউয়ে আকুলতায় লক্ষ বাহুর ব্যগ্রতা নিয়ে তার দিকে ছুটে যেতে চাইল ! দু'জনেই অধীর হয়ে পড়েছিল এই ভেবে—হায়, কবে কোন্ মোহনায় তাদের চুমোচুমি হবে, তারা এক হয়ে যাবে ! ...

আর আমাদের দেখা-শোনা হতো না। কথা যা হতো, তা কখনও সবাইকে লুকিয়ে ঐ একটি চোরা-চাওয়ায়, নয়তো বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দু'টি তৃষিত অতৃপ্ত দৃষ্টির

বিনিময়ে ! ঐ এক পলকের চাওয়াতেই যে আমাদের কত কথা শুধানো হয়ে যেত, কত ব্যথা-পুলক শিউরে উঠত, তা ঠিক বোঝানো যায় না !

* * *

আরও পাঁচ বছর পরের কথা ! ...

একদিন শুনলাম তার বিয়ে হবে, মস্ত বড় জমিদারের ছেলে বি-এ পাশ এক যুবকের সাথে। বিয়ে হবার পর সে শ্বশুর-বাড়ি চলে যাবে, তার সাথে আমার এই চোখের চাওয়াটুকুও ফুরাবে, এই ব্যথাটুকুই বড় গভীর হয়ে মর্মে আমার দাগ কেটে বসে গেল ! এ ব্যথার প্রগাঢ় বেদনা আমার বুকের ভিতর যেন পিষে পিষে দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু যখন মেঘ-ছাড়া দীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো সহসা এই কথাটি আমার মনে উদয় হলো যে, সে সুখী হবে, তখন যেন আমি আমার নতুন পথ দেখতে পেলাম। বললাম, —না, আমি জন্মে কারুর কাছে মাথা নত করিনি, আজও আমাকে জয়ী হতে হবে ? আর দুঃখই বা কিসের ? সে ধনী শিক্ষিত সুন্দর যুবকের অঙ্কলক্ষ্মী হবে, অভাগী মেয়েদের সুখী হবার জন্যে যা-কিছু চাওয়া যায় তার সব পাবে ; কিন্তু হায়, তবু অবুঝ মন মানে না ! মনে হয়, আমার মতন এত ভালবাসা তো সে পাবে না !

এই কথা ক'টি ভাবতে গিয়ে আমার বুক কান্নায় ভরে এল, —আমার যে বাইরের দীনতা তাই মনে পড়ে তখন আমাকে আমার অন্তরের সত্য-প্রেমের গৌরবের জোরে খাড়া হতে হলো। এক অজানার ওপর তীব্র অভিমানের আক্রোশে বললাম, নিজের সুখ বিলিয়ে দিয়ে এর প্রতিহিংসা নেব। ত্যাগ দিয়ে আমার দীনতাকে ভরে তুলব।

এত দ্বন্দ্বের মাঝে 'আমার প্রিয় সুখী হবে' এই কথাটির গভীর তত্ত্ব প্রাণে আমার ক্রমেই কেটে কেটে বসতে লাগল, তারপর হঠাৎ এক সময় আমার বুকের সব ঝন্‌ঝা ঝড় বেদনা-তরঙ্গ ধীর শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে গেল ! বিপুল পবিত্র সান্ত্বনায় তিক্ত মন আমার যেন সুধাসিক্ত হয়ে গেল। আঃ ! কোথায় ছিলে এতদিন ওগো বেদনার আরাম আমার ? এতদিন পরে নিশ্চিন্ততার কান্না কেঁদে শান্ত হলাম !

এ কোন্ অর্ফিয়াসের বাঁশির মায়া-তান, এমন করে আমার মনের দুরন্ত সিন্ধুকে ঘুম পাড়িয়ে গেল ? ... হায়, এতদিন বাঁশির এই জাদু-করা সুর কোথায় ছিল ? —

সেদিন নিশীথরাতে তার বাতায়নের পানে চেয়ে তাই গেয়েছিলাম, ...

'আমি বহু বাসনার প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে ?
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।'

বাঃ, এরই মধ্যেই দেখছি মাঠের সারা পথটা পেরিয়ে গাঁয়ের সীমা-রেখার কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর হতে ঘরে ঘরে মাটির আর কেরোসিনের যে ধোঁওয়া-ভরা দীপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই আমার মন কেমন ঐ প্রদীপ-জ্বালা ঘরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে! মনে হচ্ছে, ঐ দীপের পাশে ঘোমটা-পরা একটি ছোট মুখ হয়তো তার দু'চোখ-ভরা আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে পথের পানে চেয়ে আছে। দখিন হাওয়ায় গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে অমনি সে চমকে উঠছে, —ঐ গো বুঝি তার প্রতীক্ষার ধন এল! তার বুকে এইরকম আশা-নিরাশার যে একটা নিবিড় আনন্দ ঘুরপাক খাচ্ছে, তারই নেশায় সে মাতাল!

আমার মনের সেই চিরকেলে অক্লান্ত বিরহী শ্রোতা তাড়া দিয়ে কয়ে উঠল, —ও সব পরে ভেবো'খন, তারপর কি হলো, বলো!

তখন গাঁয়ের মাথায় মায়ের নত-আঁখির স্নেহ-চাওয়ার মতো নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে। করুণ বেদনার সাথে পবিত্র স্নিগ্ধতা মিশে আমার নয়ন-পল্লব সিক্ত করে আনলে!

জল-ভরা চোখে আমার বাকি কথাটুক মনে পড়ল। ...

তার বিয়ের দিন-কতক আগের এক রাতে তাতে-আমাতে প্রথম ও শেষ গোপন-দেখা-শোনা। সে বললে, —'এ বিয়েতে কি হবে ভাই?'

আমি বললাম, —'তুমি সুখী হবে!'

সে আমার সহজ-কণ্ঠ শুনে তার বয়সের কথা, আমার বয়সের কথা—আমাদের ব্যবধানের কথা সব যেন ভুলে গেল। মাথার ওপর আকাশ-ভরা তারা মুখ টিপে হেসে উঠল। সে আবার তেমনি করে সেই ছেলে-বেলার মতো আমার হাতের আঙুলগুলো ফুটিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তা কি করে হবে? তোমাকে যে ছেড়ে যেতে হবে, তোমাকে যে আর দেখতে পাব না!'

এত দিনে তার এই নতুন রকমের আর্দ্র কণ্ঠের বাণী শুনলাম! তার টানা টানা চোখের ঘন দীর্ঘ পাতায় তারার ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হয়ে জানিয়ে দিল, সে কাঁদছে!

আমি বললাম, —'তোমার কথা বুঝতে পেরেছি মোতি! কিন্তু তুমি যার কাছে যাবে, সে তোমায় আমার চেয়েও বেশি ভালবাসবে; আর তুমি সেখানে গিয়ে আমাদের সব কথা ভুলে যাবে!'

অন্যে আমার প্রিয়কে আমার চেয়েও বেশি ভালবাসবে, এই চিন্তাটাও যেন অসহ্য। তার স্বামী আমার চেয়ে ধনী হোক, সুন্দর হোক, শিক্ষিত হোক, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি ভালবাসবে আমার ভালবাসার মানুষটিকে, বড় অভিমানেই ঐ কথাটা আমি বললাম, কিন্তু এ-কথাটা বলেই এবার আমারও যে বিপুল কান্না কণ্ঠ ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল। সে কান্না রুধবার শক্তি নেই—শক্তি নেই! মূর্ছাতুরার মতো সে আমার হাতটা নিয়ে জোরে তার চোখের ওপর চেপে ধরে আর্ত কণ্ঠে কয়ে উঠল, 'না—না—না!' কিসের এ 'না'?

আমি তীব্র কণ্ঠে কয়ে উঠলাম, 'এ হতেই হবে মোতি, এ হতেই হবে ! আমায় ছাড়তেই হবে !'

তখন এক অজানা দেবতার বিরুদ্ধে আমার মন অভিমানে আর তিক্ততায় ভরে উঠেছে। সে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কয়ে উঠল, —'ওগো, চিরদিন তো আমায় মেরে এসেছ, এখনও কি তোমার মেরে সাধ মেটেনি? তবে মারো, আরও মারো—যত সাধ মারো !'

কত দিনের কত কথা কত ব্যথা আমার বুকের মাঝে ভরে উঠল ! তার পরেই তীব্র তীক্ষ্ণ একটা অভিমানের কঠোরতা আমায় ক্রমেই শক্ত করে তুলতে লাগল ! মন বললে—জয়ী হতেই হবে !

আমি ক্রুর হাসি হেসে মোতিকে বললাম, 'হুঁ ! কিছুতেই মানবে না তো, তবে সত্যি কথাটাই বলি, —মোতি, তোমায় যে আমি ভালবাসি না !'

কথাটা তার চেয়ে আমার বুকেই বেশি বাজল। সে তীরবিদ্ধা হরিণীর মতো চমকে উঠে বললে, —'কি ?'

আমি বললাম, —'তোমায় এতদিন শুধু মিথ্যা দিয়ে প্রতারিত করে এসেছি মোতি, কোনোদিন সত্যিকার ভালবাসিনি !'

আমার কণ্ঠে যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আহত ফণিনীর মতো প্রদীপ্ত তেজে দাঁড়িয়ে সে গর্জন করে উঠল, —'যাও, চলে যাও—তোমায় আমি চাইনে, সরে যাও ! তুমি জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর, বে-দিল্ ! —যাও, সরে যাও ! তোমার পায়ে পড়ি চলে যাও, আর আমার ভালবাসার অপমান করো না !'

দু'-চোখ হাত দিয়ে টিপে কাল-বৈশাখীর উড়ো ঝন্ঝার মতো উন্মাদ বেগে সে ছুটে গেল ! আমি টাল খেয়ে মাথা ঘুরে প'ড়তে প'ড়তে শুনতে পেলাম আর্ত-গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিয়ে-বাড়ির ছাল্না-বাঁধা আঙিনায় কে দড়াম করে আছড়ে পড়ে গোঙিয়ে উঠল, —'মা—গো !'

* * *

ঐ—যে অনেক দূরের খেয়া-পারের ক্লান্ত মাঝির মুখে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মনের চিরন্তন কান্নাটি ফুটে উঠছে, ও যেন আমারই মনের কথা,—

'মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

ওগো আমার মনের মাঝি, আমার এ-ক্লান্তি-ভরা জীবন-তরী আর যে বাইতে পারিনে ভাই ! এখন আমায় কূল দাও, না হয় কোল দাও।

আমার মনে বড় ব্যথা রয়ে গেল, সে হয়তো আমার ব্যথা বুঝলে না ! যাকে ভালবাসি, তাকে ব্যথা দিতে গিয়ে আমার নিজের বুক যে ব্যথার আঘাতে, বেদনার

কাঁটায় কত ছিন্ন-ভিন্ন কি-রকম ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে, হায়, তা যদি সে জানত,—তা যদি মোতি বুঝতে পারত ! ওঃ, যাকে ভালবাসি সেও যদি আমাকে ভুল বোঝে, তবে আমি বাঁচি কি নিয়ে ? আমার এ-রিক্ত জীবনের সার্থকতা কি ? হায়, দুনিয়ায় এর মত বড় বেদনা বুঝি আর নেই !

* * *

এই তো আমার গাঁয়ের আম-বাগানে এসে ঢুকেছি। ঐ তো আমার বন্ধ-করা আঁধার ঘর। চার পাশে দীপ-জ্বালানো কোলাহল-মুখরিত স্নেহ-নিকেতন, আর তারই মাঝে আমার বিজন আঁধার কুটির যেন একটা বিষ-মাখা অভিশাপ-শেলের মতো জেগে রয়েছে। দিনের কাজ শেষ করে বিনা-কাজের সেবা হতে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময় রোজ যে-কথাটি মনে হয়, বন্ধ দুয়ারের তালা খুলতে খুলতে আজও সেই কথাটিই আমার মনের চির-ব্যথার বনে দাবানল জ্বালিয়ে যাচ্ছে !

একে একে সব ঘরেই প্রদীপ জ্বলবে, শুধু আমার একা ঘরেই আর কোনো দিন সন্ধ্যা-দীপ জ্বলবে না ! সেই ম্লান দীপ-শিখাটির পাশে আমার আসার আশায় কোনো কালো-চোখের করুণ-কামনা ব্যাকুল হ'য়ে জাগবে না !

বাইরে আমার ভাঙা দরজায় উতল হাওয়ার শুধু একরোখা বুক-চাপড়ানি আর কারবালা-মাতম রণিয়ে উঠল,—

'হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতি-হারা !'

আমার হিয়ার চিতার চিরন্তনী ক্রন্দসীও সাথে সাথে কেঁদে উঠল,—

'হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতি-হারা !'

রাজবন্দীর চিঠি

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা
মুক্তি–বার, বেলা–শেষ

প্রিয়তমা মানসী আমার !

আজ আমার বিদায় নেবার দিন। একে একে সকলেরই কাছে বিদায় নিয়েছি। তুমিই বাকি। ইচ্ছা ছিল, যাবার দিনে তোমায় আর ব্যথা দিয়ে যাব না। কিন্তু আমার যে এখনো কিছুই বলা হয়নি। তাই ব্যথা পাবে জেনেও নিজের এই উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিটাকে কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। তাতে কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবে না, কেননা তোমার মনেতো চিরদিনই গভীর বিশ্বাস যে, আমার মতন এত বড় স্বার্থপর হিংসুটে দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

আমার কথা তোমার কাছে কোনোদিনই ভালো লাগেনি (কেন, তা পরে বলছি), আজো লাগবে না। তবু লক্ষ্মী, এই মনে করে চিঠিটা একটু পড়ে দেখো যে, এটা একটা হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া পথিকের অস্ত–পারের পথহারা পথে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বিদায়–কান্না। আজ আমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম। আমার কথাগুলো তোমার বে–দাগ বুকে না–জানি কত দাগই কেটে দেবে ! কিন্তু বড় বেদনায় প্রিয়, বড় বেদনায় আজ আমায় এত বড় বিদ্রোহী, এত বড় স্বেচ্ছাচারী উন্মাদ করে তুলেছে। তাই আজো এসেছি কাঁদাতে। তুমিও বলো, আমি আজ জল্লাদ, আমি আজ হত্যাকারী কসাই। শুনে একটু সুখী হই।

আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। তাই কোনো কথাই হয়তো গুছিয়ে বলতে পারব না। যার সারাজীবনটাই বয়ে গেল বিশৃঙ্খল আর অনিয়মের পূজা করে, তার লেখায় শৃঙ্খলা বা বাঁধন খুঁজতে যেও না। হয়তো যেটা আরম্ভ করব সেইটেই শেষের, আর যেটায় শেষ করব সেইটেই আরম্ভের কথা ! আসল কথা, অন্যে বুঝুক চাই নাই বুঝুক, তুমি বুঝলেই হলো ! আমার বুকের এই অসম্পূর্ণ না–কওয়া কথা আর ব্যথা তোমার বুকের কথা আর ব্যথা দিয়ে পূর্ণ করে ভরে নিও। —এখন শোনো।

প্রথমেই আমার মনে পড়ছে (আজ বোধ হয় তোমার তা মনেই পড়বে না), তুমি যেন একদিন সাঁঝে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে, —কি করলে তুমি ভালো হবে ?

তোমারই মুখে আমার রোগ–শিয়রে এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন শুনে অধীর অভিমানের গুরু বেদনায় আমার বুকের তলা যেন তোলপাড় করে উঠল !

হায়, আমার অসহায় অভিমান ! হায়, আমার লাঞ্ছিত অনাদৃত ভালোবাসা ! আমি তোমার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। দেওয়া উচিতও হতো না ! তখন আমার হিয়ার বেদনা-মন্দিরে যেন লক্ষ তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যর্থ জীবনের আর্ত হাহাকার আর বঞ্চিত যৌবনের সঞ্চিত ব্যথা-নিবেদনের গভীর আরতি হচ্ছিল। যার জন্যে আমার এত ব্যথা, সেই এসে কিনা জিজ্ঞেস করে, —তোমার বেদনা ভালো হবে কিসে? ...

মনে হলো, তুমি আমায় উপহাস আর অপমান করতেই অমন করে ব্যথা দিয়ে কথা কয়ে গেলে। তাই আমার বুকের ব্যথাটা তখন দশ গুণ হয়ে দেখা দিল। আমি পাশের বালিশটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার সবচেয়ে বেশি লজ্জা হতে লাগল, পাছে তুমি আমার অবাধ্য চোখের জল দেখে ফেলো ! পাছে তুমি জেনে ফেলো যে, আমার বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে ! যে আমার প্রাণের দরদ বোঝে না, সেই বে-দরদির কাছে চোখের জল ফেলা আর ব্যথায় এমন অভিভূত হয়ে পড়ার মতো দুর্নিবার লজ্জা আর অপমানের কথা আর কি থাকতে পারে? কথাও কইতে পারছিলুম না, ভয় হচ্ছিল এখনই আর্দ্র গলার স্বরে তুমি আমার কান্না ধরে ফেলবে।

যাক, ভগবান আমায় রক্ষা করলেন সে বিপদ থেকে। তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলে। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেলে। তুমি বোধ হয় আজ পড়ে হাসবে, যদি বলি যে, আমার তখন মনে হলো, যেন তুমি যাবার বেলায় ছোট্ট একটি শ্বাস ফেলে গিয়েছিলে। হায় রে অন্ধ বধির ভিখিরি মন আমার ! যদি তাই হতো, তবে অন্তত কেন আমি এমন করে শুয়ে পড়লুম, তা একটু মুখের কথায় শুধাতেও তো পারতে !

তুমি চলে যাবার পরেই ব্যথার অভিমানে আমার বুক যেন একেবারে ভেঙে পড়ল। নিষ্ফল আক্রোশে আর ব্যর্থ বেদনার জ্বালায় আমি হুঁক্‌রে হুঁক্‌রে কাঁদতে লাগলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তারপর ডাক্তার এল, আত্মীয়-স্বজন এল, বন্ধু-বান্ধব এল। সবাই বললো, —হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বড় অস্বাভাবিক। গতিক ... ডাক্তার বললে, —রোগী হঠাৎ কোনো—ইয়ে—কোনো—বিশেষ কারণে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছে। এ কিন্তু বড্ডো খারাব। এতে এমনও হতে পারে যে ... ।

বাকিটুকু ডাক্তার আমতা আমতা করে না বললেও আমি সেটা পূরণ করে দিলুম, —'একেবারে নির্বাণদীপ, গৃহ অন্ধকার !' না ডাক্তারবাবু? —বলেই হাসতে গিয়ে কিন্তু এত কান্না পেল আমার যে, তা অনেকেরই চোখ এড়াল না। সত্যিই তখন আমার কণ্ঠ বড় কেঁপে উঠেছিল, অধর কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। অনেক সাধ্য-সাধনা করেও কেউ আর আমায় তুলতে পারলে না। আমার গোঁয়ার্তুমির অনেকক্ষণ ধরে নিন্দে করে বন্ধু-বান্ধবরা বিদায় নিলে। আমিও মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ দিলুম।

হায়, এই নিষ্ঠুর লোকগুলো কি আমায় একটু নিরিবিলি কেঁদে শান্তি পেতেও দেবে না? ... তখনো তোমরা সবাই কেউ আমার পাশে, কেউ বা আমার শিয়রে

বসেছিলে। হঠাৎ মনে হলো, তুমি এসে আমার হাত ধরেছ। এক নিমেষে আমার সকল ব্যথা যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। এবারেও কান্না এল, কিন্তু সে যেন কেমন এক সুখের কান্না ! তবে এ কান্নাতেও যে অভিমান ছিল না, তা নয়। তবু তোমার ঐ ছোঁয়াটুকুর আনন্দেই আমি আমার সকল জ্বালা সকল ব্যথা-বেদনা মান-অপমানের কথা ভুলে গেলুম। মনে হলো, তুমি আমার—তুমি আমার—একা আমার ! হায় রে শাশ্বত ভিখিরি ! চিরতৃষাতুর দীন অন্তর আমার ! কত অল্প নিয়েই না তুই তোর আপন বুকের পূর্ণতা দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলতে চাস, তবু তোর আপন জনকে আর পেলিনে।

খানিক পরেই আমি আবার সকলের সঙ্গে দিব্যি প্রাণ খুলে হাসি-গল্প জুড়ে দিলুম দেখে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে। কেউ বুঝলে না, হয়তো তুমিও বোঝোনি, কেমন করে অত অধীর বেদনা আমার এক পলকে শান্ত স্থির হয়ে গেল। সে সুখ সে ব্যথা শুধু আমি জানলুম আর আমার অন্তর্যামী জানলেন। হাঁ, সত্যি বলব কি? আরো মনে হয়েছিল, সে ব্যথা যেন তুমিও একটু বুঝতে পেরেছিলে? দেখছ কি ভিখিরি মন আমার ! তুমি না জানি আমায় কতই ছোট মনে করছ ! আহা একবার যদি মিথ্যা করেও বলতে লক্ষ্মী যে, আমার ব্যথার কারণ অন্তত তুমি মনে মনে জেনেছ, তাহলে আমি আজ অমন করে হয়তো ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়তুম না ! আমার জীবন এমন ছন্ন-ছাড়া 'দেবদাস'-এর জীবন হয়ে পড়ত না ! যাঃ, খেই হারিয়ে বসেছি আমার কথার।

হাঁ, সে দিন তোমার ঐ একটু উষ্ণ ছোঁয়ার আনন্দেই বিভোর হয়ে রইলুম। তার পরের দিন মনে হতে লাগল, তোমায় আড়ালে ডেকে বলি, কেন আমার এ বুক-ভরা ব্যথার সৃষ্টি। সারাদিন তোমার পানে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলুম, যদি আবার এসে জিজ্ঞেস করো তেমনি করে, 'কি করলে তুমি ভাল হবে?'

*　　　　*　　　　*

হায়রে দুর্ভাগার আশা ! তুমি ভুলেও আর সে-কথাটি আর একবার শুধালে না এসে ! সারাদিন আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে বেলা-শেষের সাথে সাথে আমারও প্রাণ যেন কেমন নেতিয়ে পড়তে লাগল। আমার কাঙাল আত্মার এক নির্লজ্জ বেদনা ভুলবার জন্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় গানটা বড় দুঃখে বড় প্রাণ ভরেই গাইতে লাগলুম,—

'তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
　ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা।
　কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা,
　তবু আমার মনে আছে আশা,
　　　　তোমার পায়ে ঠেক্‌বে তারা স্বামী॥

টেনেছিল কতই কান্না হাসি,
বারেবারেই ছিন্ন হলো ফাঁসি!
শুধোয় সবাই হতভাগ্য বলে—
'মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে?'
জানি জানি, নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি॥'

আমার কণ্ঠ আমার আঁখি আমারই ব্যথায় ভিজে ভারি হয়ে উঠল। আমার গানের সময় আমি আর বাহিরকে ফাঁকি দিতে পারিনে। সে-সুর তখন আমার স্বরে কেঁপে কেঁপে ক্রন্দন করে, সে-সুর সে-কান্না আমার কণ্ঠের নয়, আমার প্রাণের ক্রন্দসীর। গান গেয়ে মনে হলো, যেন এই বিশ্বে আমার মতন ছন্নছাড়ারও অন্তত একজন বন্ধু আছেন, যিনি আমার প্রাণের জ্বালা, মর্ম-ব্যথা বোঝেন, আমার গান শুনে যাঁর চোখের পাতা ভিজে ওঠে। তিনি আমার অন্তর্যামী। অমনি এ-কথাটিও মনে হয়েছিল যে, যদি সত্যি আমার কেউ প্রিয়া থাকত, তাহলে সে আমার ঐ 'শুধোয় সবাই হতভাগ্য বলে, মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে?'—ঐটুকু শুনবার পরই আর দূরে থাকতে পারত না, তার কোলে আমার মাথাটি থুয়ে সজল কণ্ঠে বলত, —'ওগো, আমার কোলে প্রিয়, আমার কোলে!' তার তরুণ কণ্ঠে করুণ মিনতি ব্যথায়-অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠত, —'ছি লক্ষ্মী! এ গান গাইতে পারবে না তুমি!'

কি বিশ্রী লোভী আমি, দেখেছ? তুমি হয়তো এতক্ষণ হেসে লুটিয়ে পড়েছ আমার এই ছেলে-মান্‌ষি আর কাতরতা দেখে! তুমি হয়তো ভাবছো, কি করে এত বড় দুর্জয় অভিমানী, দুরন্ত বাঁধন-হারা এমন করে নেতিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারে, কেমন করে এক বিশ্বজয়ীর এত অল্পে এমন আশ্চর্য এত বড় পরাজয় হতে পারে! তা ভাবো, কোনো দুঃখ নেই। আমিও নিজেই তাই ভাবছি। কিন্তু ভয় হয় প্রিয়, কখন তোমার এত গরব না-জানি এক নিমিষে টুটে গিয়ে 'সলিল বয়ে যাবে নয়ানে!' সেই দিন হয়তো আমার এ-ভালোবাসার ব্যথা বুঝবে। আমার এই পরাজয়ের মানেও বুঝবে সে-দিন।

যাক, যা বলছিলাম তাই বলি। —গান গেয়ে কেন আমার মনে হলো, আমার অন্তর্যামী বুঝি আমার আঁখির আগে এসে নীরবে জল-ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে। চোখের জল মুছে সামনে চাইতেই, —'ও খোদা! কে তুমি দাঁড়িয়ে অমন করুণ চোখে আমার পানে চেয়ে? আহা, চটুল চোখের কালো তারা দুটি তাদের দুষ্টুমি চঞ্চলতা ভুলে গিয়ে ব্যথায় যেন নিথর হয়ে গেছে! সে পাগল-চোখের কাজল আঁখি-পাতা যেন জল-ভারাতুর। ওগো আমার অন্তর্যামী! তুমি কি সত্য-সত্যই এই সাঁঝের তিমিরে আমার আঁখির আগে এসে দাঁড়ালে? হে আমার দেবতা! তবে কি আমার আজিকার এ সন্ধ্যা-আরতি বিফলে যায়নি? আমি আমার সব কিছু ভুলে কেমন যেন আত্মবিস্মৃতের মতো বলে উঠলুম, তুমি আমার চেয়ে কাউকে বেশি ভালবাসতে পাবে না! কেমন?'

কোনো কথা না বলে তুমি আমার কোলের ওপরকার বালিশটিতে এসে মুখ লুকালে। কেন? লজ্জায়? না সুখে? না ব্যথায়? জানি না, কেন। তাই তো আজ আমার এত দুঃখ আর এত প্রাণ-পোড়ানি। তোমার প্রাণের কথা তুমি কোনো দিনই একটি কথাতেও জানাওনি, তাই তো আজ আমার বুক জুড়ে এত না-জানার ব্যথা। অনেক সাধ্য-সাধনায় তুমি মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু বললে না, কেন অমন করে মুখ লুকালে। সেদিন একটিবার যদি মিথ্যা করেও বলতে, —হে আমার চির-জনমের প্রিয়! যে ...। না, না, যাক সেকথা।

এইখানে একটা মজার খবর দিই তোমাকে। এই হাজত-ঘরে বসেও আমার এমন অসময়ে মনে হচ্ছে, যেন আমি একজন কবি। রোসো, এখনই হেসে লুটিয়ে পড়ো না! তোমার চেয়ে আমি ভাল করেই জানি যে, আমার কবি না হওয়ার জন্যে যা-কিছু চেষ্টা-চরিত্তির করার প্রয়োজন, তার কোনোটাই বাদ দেননি ভগবান। তাই আমার বাহির-ভিতর সব কিছুই যেন খোট্টাই মুল্লুকের চোট্টাই ভেইয়্যার মতোই কাঠখোট্টা! তবু যদি আমি কবি হতুম, তাহলে আমার এই ভাবটাকে কি সুন্দর করেই না বলতুম, —

> শুধু অনাদর শুধু অবহেলা শুধু অপমান!
> ভালবাসা? —সে শুধু কথার কথা রে!
> অপমান কেনা শুধু! প্রাণ দিলে পায়ে দলে যাবে তোর প্রাণ!
> শুধু অনাদর, শুধু অবহেলা, শুধু অপমান!

যাক, যা হইনি, কপাল ঠুকলেও আর তা হচ্ছিনে। এখন যা আছি, তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দাঁড়াও, —অভিমান অভিমান করে চেঁচিয়ে হয়তো ও-কথাটার অপমানই করছি আমি। নয় কি? আমার মতন হয়তো তুমিও ভাবছ, কার ওপর এ অভিমান আমার? কে আমায় এ অধিকার দিয়েছে এত অভিমান দেখাবার? একবিন্দু ভালোবাসা পেলাম না, অথচ এক সিন্ধু অভিমান নিয়ে বসে আছি! তবু শুনে আশ্চর্য হবে তুমি যে, সত্যি-সত্যিই আমার বড্ড অভিমান হয়। যার ওপর অভিমান করি, সে আমার এ-অভিমান দেখে হাসবে, না দু'-পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবে, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপও করি না। চেয়েও দেখি না, আমার এত ভালবাসার সম্মান সে রাখবে কিনা, শুধু নিজের ভালবাসার গরবে আর অন্ধতায় মনে করি, সেও আমায় ভালবাসে! তাই তো আজ আমার এত লাঞ্ছনা ঘরে-বাইরে!

অনেক পথিক-বালা এ পথিকের পথের ব্যথা মুছিয়ে দিতে চেয়েছিল, হয়তো ভালও বেসেছিল (শুনে হেসো না), আমি কিন্তু ফিরেও চাইনি তাদের পানে। ওর মধ্যে আমার কতকটা গরবও ছিল। মনে হতো, এ বালিকা তো আমার সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারবে না, অনর্থক কেন তার জীবনটাকে ব্যর্থ করে দেবো? যে-সে এসে আমার মতন বাঁধন-হারা বিদ্রোহীর মনটাকে এত অল্প সাধনায় জয় করে নেবে, এও যেন

সইতে পারতুম না। তাই কোনো হতভাগীর মনে আমার ছাপ লেগেছে বুঝতে পারলেই আমি অমনি দূরে—অনেক দূরে সরে যেতুম ; আর দেখতুম, তার এ আকর্ষণের জোর কত—সে সত্যি আমায় ভালবাসে, না একটু করুণা করে, না ওটা মোহ? ঐ দূরে সরে যাবার আর একটা কারণ ছিল যে, আমাদের কাউকে যেন কোনো দিন অনুতাপ করতে না হয় শেষে কোনো ভুলের জন্যে।

আমার এক জায়গায় বড় দুর্বলতা আছে। স্নেহের হাতে আমার মতো এমন করে কেউ বুঝি আত্মসমর্পণ করতে পারে না। তাই কেউ স্নেহ করছে বুঝলেই অমনি বাঁধা পড়বার ভয়ে আমি পালিয়ে যেতুম। ঐ দূরে গিয়ে কিন্তু অনেকেরই ভুল ধরা পড়ে গেছে। অনেকেই নাকি আমায় ভালবেসেছিল, কিন্তু তাদের সকলেরই মনের মিথ্যেটা আমি দেখতে পেয়েছিলুম ঐ দূরে সরে গিয়েই। তাদের কেউ আমায় তার জীবন ভরে পেতে চায়নি। আমি পথিক, তাই পথের মাঝে আমায় একটু ক্ষণের জন্যে পেতে চেয়েছিল মাত্র। তাই কেউ আমায় কোনোদিনই তার হাতের নাগালের মধ্যেও পেলে না। অনেকে বলে, হয়তো এটাও আমার অভিমান। জানি না। কিন্তু দু-এক জায়গায় একটু আত্মবিস্মৃত হয়ে যেই নিকটে আসতে চেয়েছি, অমনি সে আমার দেবতার—আমার ভালবাসার বুকে জোর পদাঘাত করেছে। তবু কি তুমি বলবে, ও আমার অহেতুক অভিমান?

এইখানে একটা কথা মনে রেখো কিন্তু যে, এই যে যারা আমায় পেতে চেয়েছিল, তাদের সকলেই আগে আমায় ভালবেসেছিল, আমি কখনও তাদের ভালোবাসিনি। অত পেয়েও আমার মন চিরদিন বলে এসেছে—এ নহে, এ নহে!

হায় আমার অতৃপ্ত হিয়া! কাকে চাস তুই? কে সে তোর প্রিয়তমা? কে সে গরবিনী, কোথায় কোন্ আঙিনা-তলে তোর তরে মালা-হাতে দাঁড়িয়ে রে? ... আমার মনের যে মানসী প্রিয়া, তাকে না পেয়েই তো কাউকে ভালোবাসতে পারলুম না এ-জীবনে! কতগুলো কচি বুকই না দলে গেলুম আমার এই জীবনের আরম্ভ হতে না হতেই, তা ভেবে আজ আর আমার কষ্টের অন্ত নেই। তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে, আমি কখনও কারুর ভালোবাসার অপমান করিনি। কাউকে ভালোবেসেছি বলে প্রলোভন দেখিয়ে শেষে পথে ফেলে চলে যাইনি। উল্টো তাদের কাছে দু-হাত জুড়ে ক্ষমাই চেয়েছি, অমনি করে সুদূর থেকেই। আমায় ভালো না বাসতে অনুরোধ করে তার পথ থেকে চিরদিনের মতো সরে গিয়েছি। পাছে কোনোদিন কোনো কাজে তার বাধা পড়ে, সেই ভয়ে আর কোনোদিন তার পথের পাশ দিয়েও চলিনি। অনেকে আমায় অভিশাপও দিয়েছে আমার এই নির্মমতার জন্যে, অনেকে আবার অহঙ্কারী দর্পী বলে গালও দিয়েছে।

এমনি করে বিজয়ী বীরের মতো আপন মনে পথে-বিপথে আমার রথ চালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এমন সময় একদিন সকালে তোমায় আমায় দেখা। হঠাৎ আমার রথ থেমে গেল। আমার মন কি এক বিপুল সুখে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল, —পেয়েছি, পেয়েছি! আমার মনের পথিক-বন্ধু হঠাৎ ম্লান মুখে আমার সামনে এসে বললে—বন্ধু

বিদায় ! আর তুমি আমার নও ; এখন তুমি তোমার মানসীর ! তোমার পথের শেষ হয়েছে। দেখলুম, সে-পথের শেষে দিগন্তের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এতদিন আমায় শত সাধ্য-সাধনা করেও পথিক-বালারা আমার রথ থামাতে পারেনি, কতজন রথের চাকার সামনে বুক পেতে শুয়ে পড়েছে, আমি হাসতে হাসতে তাদের বুকের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু হায়, আজ আমার এ কি হলো ? রথ যে আর চলে না ! তুমি শুধু আমার পানে চোখ তুলে চাইলে মাত্র, একটু সাধলেও না যে, পথিক ! আমার দ্বারে একটু থামো !

তবু আমার দুঃখ হলো না, মান-অপমান জ্ঞান রইল না, আমি মালা-হাতে রথ থেকে নেমে পড়লুম। তোমার গলায় আমার জন্ম-জন্মের সাধের গাঁথা মালা পরিয়ে দিলুম। তুমি নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলে। তোমার ঐ মৌন বুকের ভাষা বুঝতে পারলুম না। প্রাণ যেন কেমন করে উঠল। তুমি সুখী হলে, না ব্যথা পেলে, কিছুই বোঝা গেল না। অমনি চির-অভিমানী আমার বুকে বড়ই বাজল। ভগবান কেন অন্যের মনটি দেখবার শক্তি দেননি মানুষকে ? কিন্তু তোমার প্রতি অভিমান আমার যতই হোক, তোমাকে নালিশ করবার কিছুই ছিল না আমার (আজো নেই)। আমি যে তোমার মনটি না জেনেই তোমায় ভালবেসেছি। চিরদিন জয় করে ফিরে তোমার গলায় যে হার-মানা হার পরিয়েছি—তুমি যে আমার মানসী প্রিয়া ! আমার মনে-মনে জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে ছবি আঁকা ছিল, যাকে খুঁজতে এমন করে আমার এমন চিরন্তন-পথিক বেশ, সে-মানসীকে দেখেই চিনে নিয়েছি। তাই আমি একটুক্ষণের জন্যেও ভেবে দেখিনি, তুমি এ পরাজিত বিদ্রোহীর নৈবেদ্য-মালা হেসে গ্রহণ করবে, না পায়ে ঠেলে চলে যাবে। তুমি যদি আমায় ভাল না বাসতে পার, তার জন্যে তো তোমায় দোষ দিতে পারিনে। আমি জানি, খুব জানি প্রিয়, যে, কোনো মানুষেরই মন তার অধীন নয়। সে যাকে ভালবাসতে চায়, যাকে ভালবাসা কর্তব্য মনে করে, মন তাকে কিছুতেই ভালোবাসবে না। মন তার মনের মানুষের জন্যে নিরন্তর কেঁদে মরছে, সে অন্যকে ভালোবাসতে পারে না। কত জন্ম ধরে তোমায় খুঁজে বেরিয়েছি এমনি করে, তুমি কিন্তু ধরা দাওনি। এবারেও ধরা দিলে না। কখন কোন্ জন্মে কোন্ নাম-হারা গাঁয়ের পাশে তোমায় আমায় ঘর বাঁধব, কখন তুমি আমায় ভালবাসবে জানিনে। তবু আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমার এত বিপুল অভিমান তোমার ওপর।

ধরো, আমার এ-অভিমান যদি মিথ্যে হয়, যদি সত্যিই তুমি আমায় ভালোবাসো, তাহলে হয়তো মনে করবে যে, আমি কেন তোমায় ভুল বুঝে এমন করে কষ্ট পাচ্ছি। কেন তোমাকে এমন করে ব্যথা দিচ্ছি। সেই কথাটি জানবার জন্যেই কাল সারা রাত্তির ধরে তোমার দয়ার দান চিঠি কটি নিয়ে হাজারবার করে পড়েছি, কিন্তু হায়, তাতেও এমন কিছু পেলুম না, যাতে করে আমার এই নির্মম ধারণা, কঠোর বিশ্বাস দূর হয়ে যেতে পারে। আমার দুঃখে, আমার বেদনায় করুণা-বিগলিত হৃদয়ে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছ, অনেক কিছু লিখেছ, অনেক জায়গায় পড়তে পড়তে চোখের জলও বাধা মানে না, কিন্তু 'তোমায় আমি ভালোবাসি' এই কথাটি কোথাও লেখোনি—ভুলেও না। ঐ

কথাটি ঢাকবার জন্যে যে সলজ্জ কুণ্ঠা বা আকুলতা, তাও নেই কোনো চিঠির কোনোখানটিতেই। হায় রে অন্ধ বিশ্বাস আমার! তবু এতদিন কত অধিকার নিয়ে কত অভিমান করেই না তোমায় চিঠি দিয়ে এসেছি। সেই লজ্জায় সেই অপমানে আজ আমার বুকের বেদনা শতগুণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, তবু কিন্তু আর তোমায় ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারছিনে। এবার যে আমি আগে ভালোবেসেছি! যে আগে ভালোবাসে, প্রায়ই তার এই দুর্দশা এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তাই বড় দুঃখে আজ অবিশ্বাসী নাস্তিকের মতো এই বলে মরতে যাচ্ছি যে, পৃথিবীতে ভালোবাসা বলে কোনো জিনিস নেই। ভালবেসে ভালোবাসা পাওয়া যায় না এই অবহেলার মাটির ধরায়। মানুষ যে কত বড় ঘা খেয়ে অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়, তা যে নাস্তিক হয়, সেই বোঝে। জানি, ভালোবেসে আত্মদানেই তৃপ্তি। বিশ্বাসও করি, যে, যাকে সত্যিকার ভালোবাসা যায়, সে অপমান আঘাত করলে হাজার ব্যথা দিলেও তাকে ভোলা যায় না। প্রিয়ের দেওয়া সেই ব্যথাও যেন সুখের মতোই প্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে এত প্রাণ-ঢালা ভালোবাসার বিনিময়ে একটু ভালবাসা পাবার জন্যে প্রাণটা হা-হা করে কেঁদে ওঠে না, এ যে বলে, সে সত্যি কথা বলে না।

পুরুষ জন্ম-জন্ম সাধনা করেও নারীর মন পাচ্ছে না। নারীর অন্তরের রহস্য বড় জটিল, বড় গোপন। নারী সব দিতে পারে, কিন্তু তার মনের গোপন মঞ্জুষার কুঞ্চিকাটি যেন কিছুতেই দিতে চায় না। শুনেছি, কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলে তবে তার হাতে ঐ চাবিকাঠিটি নাকি সমর্পণ করে। তোমার ওপর আজ আমার এত অভিমান কেন, জানো? তুমি আমার সকল আদর সকল সোহাগ আমার দুরন্ত ভালবাসার সকল বাড়াবাড়ি নীরবে সয়ে গেছ। কখনো এতটুকু প্রতিবাদ করোনি। তোমার মুখ দেখে কোনোদিন বুঝতে পারিনি, তুমি আমার সে আদর-সোহাগে ব্যথা পেয়েছ, না সুখী হয়েছ। তোমার মুখে কোনোদিন এক রেখা হাসিও ফুটে উঠতে দেখিনি সে সময়। তাই আজ এই কথাটি ভাবতে বুক আমার ভেঙে প'ড়ছে যে, হয়তো তুমি দায়ে পড়েই আমার অত বাড়াবাড়ি নীরবে সয়েছ, হয়তো ওতে কত ব্যথাই পেয়েছ মনে মনে। কোনো চিঠিতে ও-কথাটির ভুলেও উল্লেখ করোনি। তাই মনে হয়, ওটাকে কোনোরকমে চাপা দেওয়াই তোমার ইচ্ছা। আচ্ছা, তাই হোক! এইবার সকল ভুল সকল যাতনা চিরতরেই চাপা পড়বে, ফিরলেও আর সে-কথা কখনো তুলব না, না ফিরতে তো নয়ই। তাতে প্রাণ যত বেশিই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাক না কেন। যদি ফিরি, তবে আর একবার আত্মবিদ্রোহী হবার শেষ চেষ্টা করব। কিন্তু হায়! কার কাছে এ-কথা বলছি! কোন্ পাষাণ মৌন-নির্বাক দেবতা আমার এ তিক্ত ক্রন্দন শুনছে? যা বলছিলাম, তাই বলি।

আমি কেন সুখী হতে পারছিনে, জানো? সাধারণ লোকের মতন সহজ ভালোবাসায় তুষ্ট হতে পারছিনে বলে। আমারই চারি পাশে আর সক্কলে কেমন খাচ্ছে-দাচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছে আবার তখনই মিল হয়ে যাচ্ছে,—এমনি করে তাদের সুখে-দুঃখে বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই সাধারণের পথ ধরে চলতে পারিনে বলেই ওদের একজন

হয়ে সুখী হওয়া তো দূরের কথা, অমনি অসুখীও হতে পারলুম না। ওরা বিয়ে করে, ছেলে-পিলে হয়, বড় হয়ে বিয়ে দেয়, জামাই-বউ ঘরে আসে, —বাস্, আর কি চাই? ওরই মধ্যে হাসে, কাঁদে, সব করে। ওরা ওতেই সুখী। ওরা যা পেয়েছে তাতেই তুষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয়, বেচারাদের শতকরা নব্বই জনই যেন জানে না আর জানতে চায় না যে, যে-মানুষটিকে নিয়ে এতদিন ঘরকন্না করছে, সেই মানুষটির মনটিই তার নয়। দুইজনাই দুইজনের মন কোনোদিন বোঝেনি, বুঝবার দরকারও হয়নি। এত কাছাকাছি থেকেও তাই—মনের দেশে দুইজন দুইজনের সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ফাঁকি আমার চোখে যে-দিন ধরা পড়েছে, সেই দিন থেকে আমি আর কাউকে সাথী করে ঘর বাঁধতে সাহস পাচ্ছিনে। সদা ভয় হয় আর ব্যথাও বাজে এই কথাটি ভাবতে যে, আমারই বুকে মাথা রেখে আমারই জীবন-সঙ্গিনী অন্যের কথা ভাববে, তার ব্যর্থ জীবনের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর আমি তারই কাছে আমার ভালোবাসার অভিনয় করে যাব, সেও দায়ে পড়ে দিব্যি সয়ে যাবে, —উঃ! এ-কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে! আমি যাকে নিয়ে বাসা বাঁধব, আগে দেখে নেব তার মনের মানুষটি আমার মনের মানুষটিকে চিনেছে কিনা। তা যত জন্মে না হবে, তত জন্ম আমি হয় মায়ের লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে মায়ের কোলেই থাকব, নতুবা লোটা-কম্‌লি নিয়ে এমনি বোম্-বোম্ করেই বেড়িয়ে বেড়াব।

আমি মানুষ দেখেই তার মনের কথা ধরে দিতে পারি বলে বড্ডো গর্ব করে এসেছি এতদিন, আর অনেক জায়গাতেই চিনেওছি ঠিক। কিন্তু তোমার কাছে যে এমন করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে যাবে, তা কে জানত! সত্যই,

> 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কখন্ কে ধরা পড়ে কে জানে!
> সকল গরব হায়, নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়ানে!'

তা না হলে এত বড় দুর্দান্ত দুর্বার আমাকেও তুমি আজ শিশুর মতন করে কাঁদাচ্ছ! তুমি আর-সকলের কাছে এত সরল, আর আমার কাছেই কেন এত দুর্বোধ হয়ে পড়েছ, বলতে পারো লক্ষ্মীমণি? —হাঁ, একটি কথা নিবেদন করে রাখি এর মধ্যে—যখন জীবনে বড্ডো ক্লান্ত হয়ে পড়বে তোমার ভালোবাসার অবমাননা দেখে, যখন দেখবে তোমার বুক-ভরা অভিমান পদাহত হয়ে ধুলোয় পড়ে লুটাচ্ছে, যখন নিরাশায় বুক ভেঙে যেতে চাইবে (খোদা না করুন), সে-দিন এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়ো প্রিয় আমার, যে, এই দুঃখের সংসারেও অন্তত একজন ছিল, যে তোমায় বড় প্রাণ ভরে ভালোবেসেছিল। বিনিময়ে তার এক কণাও ভালোবাসা সে পায়নি, তবু সে এতটুকু ব্যথা রেখে যায়নি তোমার জন্যে, এমনকি কোনোদিন তোমার কাছে তা নিয়ে অনুযোগও করেনি। সে তোমায় পেলে মাথার মণি করে রাখত। তোমাকে রাজ-রাজেন্দ্রাণী করবার সকল ক্ষমতা, সকল সাধ তার ছিল। তোমার এত ভালবাসা এত অভিমানের অধিকারী হলে সে এমন করে তার বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা উদ্দাম তরুণ জীবনকে এত অল্প দিনে ব্যর্থ করে এমন করে বিদায় নিত না! সে অনেক—অনেক বড় কিছু বিশ্বের বিস্ময়

হতে পারত। বড় ব্যথায় তার সারা জীবনটা বিদ্রোহ আর স্বেচ্ছাচারিতা করেই কেটে গেল। আরও মনে করো যে, পরপারে গিয়েও সে শান্ত হতে পারেনি, চিরদিনের মতো এবারেও সে সেখানে তোমারই তরে মালা হাতে করে তার অশান্ত জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে পথে পথে ঘুরে। তোমায় বুকে করে তুলে নেবার জন্যে সে সকল সময় তোমার পানে তার সকল প্রাণ-মন নিয়োজিত করে রেখেছে। সে যে তোমায় সত্যিই ভালবাসে, তাই প্রমাণ করতে সে তার নিজের গর্দানে নিজে খড়গ হেনে মরেছে! আরও মনে করো সেই দিন, যাকে তুমি একদিন মনে মনে তোমরা সুখের পথের কাঁটা, তোমার জীবনের অভিশাপ মনে করেছিল, সে-ই তোমার সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল থেকে বাঁচবার জন্যেই চিরদিনের মতো তোমার পথ হতে সরে গিয়েছে। মনে কোরো, যাকে তুমি অনাদর করেছ, তার এককণা ভালোবাসা পাবার জন্যে বহু হতভাগিনী বহুদিন ধরে সাধনা করেছিল, কিন্তু সে কোনোদিন তার মানসী-প্রিয়া—তোমায় ছাড়া আর কারুর পানে একটু হেসেও চাইতে পারেনি, পাছে তোমার অভিমান হয়, পাছে তুমি ব্যথা পাও ভেবে।

আর একটা ছোট কথা এইখানে মনে পড়ে গেল। শুনে তুমি হয়তো আমায় কি ভাববে, জানি না। তোমার বিরুদ্ধে যে-যে কারণে আজ এত বড় বুক-জোড়া অভিমান নিয়ে যাচ্ছি, এটাও তারই একটা। সেটা আর কিছু নয়, কাল চিঠিগুলো তোমার পড়তে পড়তে হঠাৎ ও-কথাটা মনে পড়ে গেল। তুমি জানো, আমি বড্ডো হিংসুটে। তোমায় অন্যে ভালোবাসবে, এ-চিন্তাটাও সইতে পারিনে, দেখতে পারা তো দূরের কথা। সকলে তোমার খুব প্রশংসা করুক, তোমায় ভালো বলুক, তাতে খুবই আনন্দ আর গৌরব অনুভব করব, কিন্তু তাই বলে অন্যকে তোমায় ভালোবাসতে তো দিতে পারিনে। আমি চাই, তুমি একা আমার—শুধু আমার—ভিতরে বাইরে পরিপূর্ণরূপে আমার হও, আর আমিও পূর্ণরূপে তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সুখী হই। আমি ছাড়া তোমাকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না—কখনোই না, কিছুতেই না। তাই যখনই আমি দেখেছি যে, অন্যে তোমার দিকে একটু চেয়ে দেখেছে আর তুমিও তার পানে হেসে চেয়েছ, অমনি মনে হয়েছে এক্ষুণি গিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিই। কিন্তু খোদা তোমাকে রূপ আর গুণ এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন যে, তোমায় দেখেই লোকে ভালোবেসে ফেলে। ভালোবাসা-পিয়াসী তৃষাতুর মানুষের মন তোমাকে যে ভালো না বেসেই পারে না। তাই কতদিন মনে হয়েছে যে, তোমাকে নিয়ে এমন বিজন বনে পালাই, যেখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না। চোখ মেললেই আমি তোমাকে দেখব, তুমি আমাকে দেখবে। আমার এ যেন রাহুর প্রেম। নয়? আমায় ছেড়ে অন্যকে তুমি ভালোবাসবে, আমার এই ব্যথাটাই সবচেয়ে মর্মন্তুদ। তাই তো এমন করে তোমার কাছে যাচঞা করে এসেছি, যে, আমার চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবাসতে পারবে না—পারবে না। কিন্তু তুমি আমার অত সকরুণ মিনতি শুনেও কোনোদিন কথা ক'য়ে তা জানাওনি, একটু মিথ্যা করে মাথা দুলিয়েও বলোনি, যে, হাঁ গো হাঁ! ... শুধু নিস্তব্ধ মৌন হয়ে গেছ। তোমার তখনকার ভাবের মানেটা আজও বুঝতে পারছিনে বলেই আমার এত

প্রাণপোড়ানি আর ছট্‌ফটানি। আজ আমি বড় সুখে মরতে পারতাম, যদি আমার এই চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ির ক্ষণেও জানতে পারতাম তোমার সত্যিকার মনের কথা। এখন জানাতে চাইলেও হয়তো আর জানতে পারবে না। যদিই পারতে, তাহলে হয়তো চির-হতভাগ্য বলে একটু করুণা করে আমায় অনেক কিছু সিক্ত সান্ত্বনা দিয়ে আমায় প্রবোধ দিতে, কিন্তু হায় প্রিয় আমার, এ মৃত্যুপথের পথিককে আর ভুলাতে পারতে না, সে সুযোগ তাই আমি ইচ্ছা করেই দিলাম না তোমায়। যখন তুমি আমার এই চিঠি পড়বে, তখন আমি তোমার নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ব। দেখ, আমার আজ মনে হচ্ছে, পুরুষদের মতন বোকা ভ্যাবাকান্ত আর নেই, অন্তত মেয়েদের কাছে। পুরুষ যেমন করে ভালোবাসা পাবার জন্যে হা-হা করে উন্মাদের মতন ছুটে যায়, তা দেখে মনে হয়, এর এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা বুঝি স্বয়ং ভগবানও মেটাতে পারবে না, কিন্তু তাকে একটি ছোট্ট মিষ্টি কথা দিয়ে তোমরা এমনই ভুলিয়ে দিতে পারো যে, তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এত বড় দুর্দান্ত দুর্বিনীতকে ঐ একটু মিষ্টি করে 'লক্ষ্মীটি' বলে গিয়ে একটু কপালে হাতটি রাখলে, বা গিয়ে তার হাতটি ধরলেই সে যত দূর-হতে-পারা-সম্ভব সুশীল সুবোধ বালকটির মতন শান্ত হয়ে পড়ে। তোমার মনে কি আছে, তা ভেবে দেখতে চায় না, ঐ একটু পেয়েই ভালোবাসার কাঙাল পুরুষ এত বেশি বিভোর হয়ে পড়ে। তবু তোমরা এই বেচারা হতভাগা পুরুষদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দাও না। কিছুতেই তোমাদের মনের কথাটি পাওয়া যায় না, সব ভালোবাসাটুকু পাওয়ার আশা তো মরীচিকার পেছনে ছোটার মতোই। কোথায় যেন তোমাদের মনের সীমা-রেখা, কোথায় যেন তোমাদের ভালোবাসার তল, কোথায় যেন তার শেষ ! আমি তাই অবাক হয়ে অনেক সময় ভাবি আর ভাবি ! মনে করো না যে, এগুলো সকলেরই মনের ভাব। আমি আমার এখনকার মনের ভাবগুলো সোজাসুজি জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। এমনি করে পুরুষ নারীর কাছে চিরদিন প্রতারিত হয়ে আসছে। কারণ, তারা বাইরে যত বড় কর্মী বিদ্বান আর বীর হোক না কেন, তোমাদের কাছে তারা একের নম্বর বোকা, একেবারে ভেড়া বনে যার বললেও অত্যুক্তি হয় না। তোমাদের কাছে থেকেও তোমাদের মন বুঝতে স্বয়ং ভগবান পারবে না, এ আমি আজ জোর গলায় বলছি। তোমরা নারী, তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে স্নেহ করা, সেবা করা, যে কেউ হোক না কেন, তার দুঃখ দেখলে তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে, একটু সেবা করতে ইচ্ছে হয়। ওতে তোমাদের গভীর আত্মপ্রসাদ, নিবিড় তৃপ্তি। এইখানে তোমরা দেবী, সন্ন্যাসিনী। এই ব্যথিতের ব্যথা মুছাতে তোমরা সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারো, কিন্তু তাই বলে সবাইকে ভালবাসতে পারো না, আর ভালবাসোও না। এইখানে পুরুষ সাংঘাতিক ভুল করে বসে। তোমাদের ঐ সেবা আর করুণাটুকু সে ভালোবাসা বলে ভুল করে দেখে, অবশ্য যদি সে তোমায় ভালবেসে ফেলে। আর যাকে জানো যে, সে সত্যি-সত্যিই তোমাকে বড় প্রাণ দিয়েই ভালোবাসে, অথচ তুমি কিছুতেই তাকে ভালোবাসতে পারছ না ; তাহলে তার জন্যেও তুমি সকল রকম বাইরের ত্যাগ স্বীকার করতে পারো, তার সেবা করো, শুশ্রূষা করো, তার ব্যথায় সান্ত্বনা দাও, কত চোখের জল ফেলো করুণায়,

—তবু কিন্তু ভালোবাসতে পারো না। বাইরের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারো তার জন্যে, কিন্তু মনের সিংহাসনে রাজা করে কিছুতেই তাকে বসাতে পারো না।

কিন্তু অন্ধ অবোধ পুরুষ তোমাদের ঐ স্বভাবজাত করুণাকেই ভালোবাসা মনে করে বড় বেশি আনন্দ পায়, সুখ অনুভব করে। হায় রে অভাগা ! তাকে পরে তার জন্যে আবার দুঃখও পেতে হয় অনেক গুণ বেশি। কারণ, মিথ্যা যা, তা একদিন-না-একদিন ধরা পড়েই। হঠাৎ একদিন নিশীথে বুকে জড়িয়ে ধরেও সে ধরে ফেলে যে, আমার এই নিকটতম মানুষটি আমার সবচেয়ে সুদূরতম। আমার বুকে থেকেও এ আমার নয়। একে হারিয়েছি, হারিয়েছি এ-জনমের মতো ! সে-যাতনা যে কি নিদারুণ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝত না। এ ভুল-ভাঙার সাথে সাথে অনেকেরই বুক নিষ্করুণভাবে ভেঙে যায়, তার জীবন চিরতরে নিষ্ফল ব্যর্থ হয়ে যায় ! সে তখন নির্মম আক্রোশে নিজের ওপর নির্দয়তম ব্যবহার করে নিজের সে ভুলের শোধ নেয় ! সে আত্মহত্যা করে, এক নিমেষে নয়, একটু একটু করে কচলিয়ে কচলিয়ে !

তোমাদের নারীজাতিকে আমি খুব বেশি শ্রদ্ধা করি, প্রাণ হতে তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তাদের ওপর আমার এই অভিযোগ চিরদিন রয়ে গেল যে, তারা পুরুষের ভালোবাসার বড় অনাদর করে, বড় অবহেলা অপমান করে ! তারা নিজেও জীবনে সুখী হয় না, অন্যকেও সুখী করতে পারে না। আমাদের সমাজের বেদনার সৃষ্টি এইখানেই। যে তাকে সকল রকমে সুখী করে তার বাহির ভিতরে রানি করে দেবী করে রাখতে পারত, রূপ-যৌবন-গরবিনী নারী তাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়। সে-হতভাগার রক্ত-ঝরা প্রাণের ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে আল্‌তা পরে। পরে তাকে এর জন্যে অনুতাপ করতে হয় সারাটা জীবন ধরে, তা জানি। ভালোবাসাকে অবমাননা করে সে-ও জীবনে আর ভালোবাসা পায় না, তখন তার জীবন বড় দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, বিষিয়ে ওঠে। তখন হয়তো তার বেশি করে তাকেই মনে পড়ে, যে তার এক কণা ভালোবাসা পেলে আজ তাকে মাথায় নিয়ে নাচত। তোমরা হয়তো ভুরু কুঁচকে বলবে, এ আমার মিথ্যা ধারণা। তা বলো, আমি যা দেখছি, তাই বলছি। তোমরা একটা কথা বলবে—নারী বড় ভালোবাসার কাঙালিনী। একটু আদর পেলে তাকে সে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেলে। ...

শুনে হাসি পায় আমার। একটু আদর তো ছোট কথা, জন্ম-জন্ম ধরে পাখিটির মতো করে বুকে রেখে, আদর-সোহাগ করে ভালোবেসেও তোমার মন পাইনি, শুধু এই একটা উদাহরণ দেখিয়েই ক্ষান্ত হলুম। আমার মতন হতভাগা দু-দশটা প্রায়ই দেখতে পাবে পথে-ঘাটে টোঁ-টোঁ কোম্পানির দলে। নেহাৎ চোখের মাথা না খেলে তোমরা তা অস্বীকার করতে পারবে না।

যাক, আমি হিংসের কথা বলতে গিয়ে কি সব বাজে বকলুম। আমি বলতে চাই, যে, আমি তোমায় দেখিয়ে-দেখিয়ে তোমারই চোখের সামনে একে ওকে কত আদর করেছি, কিন্তু কোনোদিন তোমার তাতে হিংসে হয়নি। তুমি কোনোদিন বাইরে ভিতরে এতটুকু চঞ্চল বা বিচলিত হওনি। তুমি মনে মনে জানো যে, তুমি আমার নও, তুমি

আমায় ভালোবাসতে পারো না, অতএব আমি যাকেই যত আদর ভালোবাসা দেখাই, তাতে তোমার কিছুই আসে যায় না। আমার ওপর যখন তুমি কোনো দাবিই রাখো না, তখন আমায় যে-কেউ ভালোবাসুক বা আমি যাকেই ভালোবাসি, তাতে তোমার কি আসে যায়?

আমার এখন মনে হচ্ছে কি, জানো? আমি যদি তোমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে হতে পারতুম, তাহলে তোমার ভালোবাসার মানুষটিকে ভালোবেসে দেখাতুম তোমার বুকে কেমন ব্যথা বাজে, কত বেদনা লাগে!

এত কথা কেন জানালুম, জানো? আমি আজ রাজবন্দী। প্রেসিডেন্সি জেলের হাজতে বসে তোমায় এই চিঠি দিচ্ছি। কাল আমার বিচার হবে। বিচারে দু'টি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তো হবেই। জেলের এক কর্মচারী দৈবক্রমে আমারই এক বন্ধু—শৈশবকালের। আমাদের আজ আশ্চর্য রকমের দেখাশোনা। স্কুলে আমাদের দুইজনের মধ্যে বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট কে হবে এই নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। ওঁরই কৃপায় এত বড় চিঠি এমন করে লেখবার অবসর আর সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি, তা নাহলে কারুক্খে কোনো কিছু জানিয়ে যেতে পারতুম না। ভগবান বন্ধুর আমার মঙ্গল করুন!

তুমি মনে করবে, মাত্র দু'বছরের জেল হবে হয়তো, তার জন্যে এমন বিদায়-কান্না কেন? আবার তো ফিরে আসব। কিন্তু আমি জানি, আমি আর ফিরব না। তোমায় এতদিন বলিনি, লুকিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু আজ যাবার দিনে কষ্ট পাবে জেনেও জানিয়ে যাচ্ছি। আমার যক্ষ্মা হয়েছে—যাকে আমাদের দেশে শিবের অসাধ্য রোগ বলে। ডাক্তার কতবার আমায় পরিশ্রম করতে মানা করেছে, আমার কত বন্ধু আমায় কত মিনতি করে হাতে-পায়ে ধরে এখন কিছু দিনের জন্যে বিশ্রাম করতে বলেছে, আর আমি ততই দ্বিগুণ বেগে কাজ করেছি। সে সময় তুমি যদি আমায় একটিবার মানা করতে করুণা করে নয়—ভালোবেসে, তাহলে কি করতুম, জানি না; কিন্তু তুমি তো আর আমার এ ভীষণ রোগের খবর জানতে না! তাহলে দয়া করে হয়তো আমায় মিনতি করে লিখতে ভালো হবার জন্যে।...

তবু কিন্তু তোমার সকল শাসন মেনে চলছি আমি আমার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এমন করে আর কেউ আমায় কথা শোনাতে পারেনি, এ-বিশ্বে এত বড় স্পর্ধা তুমি ছাড়া আর কারুর হয়নি, যে, আমায় শাসন করে, হুকুম শোনায়! —যদি কোনো অপরাধ ক'রে থাকি তোমার কাছে কোনোদিন, তবে তা ভুলে যেও না, ক্ষমা কোরো এই ভেবে যে, তুমি যাকে কিছুতেই ভালোবাসতে পারোনি, সে-ই তোমার সকল কথা তার শেষ দিন পর্যন্ত খোদার পবিত্র বাণীর চেয়েও পবিত্রতর মনে করে মেনে চলেছে। এইটুকু ভেবে পারো তো একটু আনন্দ অনুভব কোরো। আমার মতন দুর্জয় বাঁধন-হারাকে তুমি জয় করেছিলে, এই ভেবেও একটু গৌরব কোরো।

দু-বছর না হয়ে যদি মাত্র ছয় মাসেও সশ্রম কারাদণ্ড হয় আমার, তাহলেও আমার ফিরবার কোনো আশা নেই। যক্ষ্মায় আমার শরীরটাকে খেয়ে ফেলেছে, আর ব্যথায়

আমার বুকে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। এর ওপর জেলের খাটুনি। কখন যে আমায় হৃদক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, তা বলতে পারিনে। এখনই একটু পরিশ্রম করলেই আমার নাকে মুখে অজস্র ধারে রক্ত নির্গত হয়। হয়তো ইচ্ছা করলে বাঁচতেও পারতুম, কেননা আমার ইচ্ছাশক্তির ও প্রাণ-শক্তির ওপর আমার গভীর বিশ্বাস আছে। কিন্তু আর সে ইচ্ছা নেই লক্ষ্মী। এখন ফিরাতে এলেও হয়তো আমি ফিরতে পারতুম না। বড় দুঃখেই বলতে হতো, —'অবেলায় প্রিয়তম, এ যে অবেলায় !' তাছাড়া, বাঁচতে পারতুম যদি জীবনটাকে অন্য কোনো বড় দিক দিয়ে সার্থক করে তুলতে পারতুম, তাও পারলুম না। অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করে দেখা গেল। আর পারবও না। তাই আজ হাল ছেড়ে দিয়ে বলছি, —'সন্ধ্যে হলো গো, এবার আমায় বুকে ধরো।' এত শীঘ্র এমন করে ধরা পড়ব, তা আমি দুদিন আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। কেননা আমার আশা ছিল, এর চেয়েও অনেক বড় কাজ করে মরণ-বরণ করা। কিন্তু তা আর ঘটে উঠল না। কারণগুলো জেনে আর কি হবে বলো।

তবে বিদায় হই। বিদায়-বেলায় অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, যেন তুমি জীবনে একটি দিন সত্যিকার ভালোবেসে দুঃখ পেয়ে আমার ব্যথা বোঝো ! তোমার জীবনের অভিশাপ আজ এ পৃথিবী ছেড়ে চলল ! আর ভয় নেই !

হাঁ, যদি পারো আশীর্বাদ করো, যেন এবার জন্ম নিলে তুমি যাকে ভালবাসো, সে-ই হয়ে জন্মগ্রহণ করি ! —ওঃ ! কি অন্ধকার ! ... ইতি—

তোমার চির-জীবন-জোড়া অভিশাপ আর অমঙ্গল—
শ্রীধূমকেতু

বাঁধনহারা

উৎসর্গ

সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
করকমলেষু

বন্ধু আমার ! পরমাত্মীয় ! দুঃখ-সুখের সাথী !
তোমার মাঝারে প্রভাত লভিল আমার তিমির রাতি।
চাওয়ার অধিক পেয়েছি—বন্ধু আত্মীয় প্রিয়জন,
বন্ধু পেয়েছি—পাইনি মানুষ, পাইনি দরাজ মন।
চারিদিক হতে বর্ষেছে শিরে অবিশ্বাসের গ্লানি,
হারায়েছি পথ—আঁধারে আসিয়া ধরিয়াছ তুমি পাণি।
চোখের জলের হয়েছ দোসর, নিয়েছ হাসির ভাগ,
আমার ধরায় রচেছে স্বর্গ তব রাঙা অনুরাগ।
হাসির গঙ্গা বয়েছে তোমার অশ্রু-তুষার গলি,
ফুলে ও ফসলে শ্যামল করেছ ব্যথার পাহাড়তলি !
আপনারে ছাড়া হাসায়েছ সবে হে কবি, হে সুন্দর ;
হাসির ফেনায় শুনিয়াছি তব অশ্রুর মর্‌মর্ !
তোমার হাসির কাশ-কুসুমের পার্শ্বে বহে যে ধারা,
সেই অশ্রুর অঞ্জলি দিনু, লহ এ 'বাঁধন-হারা'।

—নজরুল

কলিকাতা
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

[ক]

করাচি সেনানিবাস,
২০এ জানুয়ারি (সন্ধ্যা)

ভাই রবু !

আমি নাকি মনের কথা খুলে বলিনে বলে তুমি খুব অভিমান করেছ? আর তাই এতদিন চিঠি-পত্তর লেখনি? মনে থাকে যেন, আমি এই সুদূর সিন্ধুদেশে আরব-সিন্ধুর তীরে পড়ে থাকলেও আমার কোনো কথা জানতে বাকি থাকে না! সমঝে চলো, তারহীন বার্তাবহ আমার হাতে!

আমি মনে করেছিলাম,—সংসারি লোক, কাজের ঠেলায় বেচারির চিঠি-পত্তর দেবার অবসর জোটেনি এবং কাজেই আর উচ্চ-বাচ্য করবার আবশ্যক মনে করিনি; কিন্তু এর মধ্যে তলে-তলে যে এই কাণ্ড বেধে বসে আছে, তা এ বান্দার ফেরেশ্‌তাকেও খবর ছিল না!—শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াবে জানলে আমি যে উঠোন পর্যন্ত নিকিয়ে রাখতাম।

আমি পল্টনের 'গোঁয়ার গোবিন্দ' লোক কিনা, তাই অত-শত আর বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন দেখছি তুমিও ডুবে ডুবে জল খেতে আরম্ভ করেছ!

আমার আজ কেবলই গাইতে ইচ্ছে করছে সেই গানটা, যেটা তুমি কেবলই ভাবি সাহেবাকে (ওরফে ভবদীয় অর্ধাঙ্গিনীকে) শুনিয়ে শুনিয়ে গাইতে—

মান করে থাকা আজকে কি সাজে?
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জ মাঝে!

হাঁ,—ভাবি সাহেবাও আমায় আজ এই পনর দিন ধরে একেবারেই চিঠি দেননি। স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী কিনা!

তোমার একখান ছোট্ট চিঠি সেই এক মাস পূর্বে—হাঁ, তা প্রায় একমাস হবে বৈকি!—পেয়ে তার পরের দিনই 'প্যারেডে' যাওয়ার আগে এলোমেলো ভাবের কি কতকগুলো ছাই-ভস্ম যে লিখে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার এখন মনে নেই। সেদিন মেজাজটা বড় খাট্টা ছিল, কারণ সবেমাত্র 'ডিউটি' হতে 'রিলিভ' হয়ে বা মুক্তি পেয়ে এসেছিলাম কিনা! তারপরেই আবার কয়েকজন পলাতক সৈনিককে ধরে আনতে 'ডেরাগাজি খাঁ' বলে একটা জায়গায় যেতে হয়েছিল। এসব হ-য-ব-র-ল'র মাঝে কি

আর চিঠি লেখা হয় ভাই? তুমিই বা আর কিসে কম? এই একটা ছোট্ট ছুঁতো ধরে মৌনব্রত অবলম্বন করলে! এ মন্দ নয় দেখছি।

তুমি যে মনুকে লিখে জানিয়েছ যে, আমি 'মিলিটারি লাইনে' এসে গোরাদেরই মতো কাটখোট্টা হয়ে গেছি তাও আর আমার জানতে বাকি নেই। আগেই বলেছি, তারহীন বার্তাবহ হে, ওসব তারহীন বার্তাবহের সন্দেশ!

যখন আমায় কাটখোট্টা বলেই সাব্যস্ত করেছ, তখন আমার হৃদয় যে নিতান্তই সজ্‌নে কাঠের ঠ্যাঙার মতো শক্ত বা ভাঙা বাঁশের চোঙার মতো খন্‌খনে নয়, তা রীতিমতোভাবে প্রমাণ করতে হবে। বিলক্ষণ দূর না হলে আমি অবিশ্যি এতক্ষণ 'যুদ্ধং দেহি' বলে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াতাম; কিন্তু এত দূর থেকে তোমায় পাকড়াও করে একটা 'ধোবি আছাড়' দিবার যখন কোনোই সম্ভাবনা নেই, তখন মসিযুদ্ধই সমীচীন। অতএব আমি দশ হাত বুক ফুলিয়ে অসিমুক্ত মসীলিপ্ত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি—'যুদ্ধং দেহি!'

তোমার কথামতো আমি কাটখোট্টা হয়ে যেতে পারি, কিন্তু এটা তো জানো ভায়া যে, খোট্টাকাঠের উপরও চোট পড়লে সেটা এমন আর্তনাদপূর্ণ খং শব্দ করে ওঠে, যেন ঠিক বুকের শুকনো হাড়ে কেউ একটা হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিলে আর কি! তোমার মতো 'নবনীতকোমল মাংসপিণ্ডসমষ্টি'র পক্ষে সেটার অনুভব একেবারে অসম্ভব না হলেও অনেকটা অসম্ভব বৈকি!

তাছাড়া যেটা জানবার জন্যে তোমার এত জেদ, এত অভিমান, তার তো অনেক কথাই জানো। তার উপরেও আমার অন্তরের গভীরতর প্রদেশের অন্তরতম কথাটি জানতে চাও, পাকে-প্রকারে সেইটেই তুমি কেবলই জানাচ্ছ।—আচ্ছা ভাই রবু, আমি এখানে একটা কথা বলি, রেগো না যেন!

তোমার অভিমানের খাতিরে বেশি, না, আমার বুকের পাঁজর দিয়ে-ঘেরা হৃদয়ের গভীরতম তলে নিহিত এক পবিত্র স্মৃতিকণার বাহিরে প্রকাশ করে ফেলার অবমাননার ভয় বেশি, তা আমি এখনো ঠিক করে বুঝে উঠতে পারিনি। তুমিই আমায় জানিয়ে দাও ভাই, কি করা উচিত!

আচ্ছা ভাই, যে শুক্তি আর কিচ্ছু চায় না, কেবল ছোট্ট একটি মুক্তা হৃদয়ের গোপন কোণে লুকিয়ে থুয়ে অতল সমুদ্রের তলে নিজেকে তলিয়ে দিতে চায়, তাকে তুলে এনে তার বক্ষ চিরে সেই গোপন মুক্তাটা দেখবার এ কী মূঢ় অন্ধ আকাঙ্ক্ষা তোমাদের! এ কী নির্দয় কৌতূহল তোমাদের!

যাক শিগগির উত্তর দিয়ো। ভাবি সাহেবাকে চিঠি দিতে হুকুম করো নতুবা ভাবি সাহেবাকে লিখব তোমায় চিঠি দিতে হুকুম করবার জন্যে।

খুকির কথা ফুটেছে কি? তাকে দেখবার বড় সাধ হয়। ... সোফিয়ার বিয়ে সম্বন্ধে এখনও এমন উদাসীন থাকা কি উচিত? তুমি যেমন ভোলানাথ, মাও তথৈবচ! আমার এমন রাগ হয়!

আমার জন্যে চিন্তা করো না। আমি দিব্যি কিষ্কিন্ধ্যার লবারের মতো আরামে আছি। আজকাল খুব বেশি প্যারেড করতে হচ্ছে। দু'দিন পরেই আহুতি দিতে হবে কিনা! আমি পুনা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাশ করে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত শক্ত মাংসপেশীগুলো দেখাতে পারতাম!

দেখেছ, সামরিক বিভাগের কি সুন্দর চটক কাজ? এখানে কথায় কথায় প্রত্যেক কাজে হাবিলদারজিরা হাঁক পাড়ছেন, 'বিজলি কা মাফিক চটক হও;—শাবাশ জোয়ান!'

এখন আসি। 'রোল-কলের' অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হলো। হাজিরা দিয়ে এসে বেল্ট, ব্যান্ডোলিয়র বুট, পট্টি (এসব হচ্ছে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুর-মতো সাফ-সুত্‌রো করে রাখতে হবে। কাল প্রাতে দশ মাইল 'রুট্ মার্চ' বা পায়ে হন্টন।—ইতি

তোমার 'কাটখোট্টা লড়ুয়ে' দোস্ত
নূরুল হুদা

করাচি সেনানিবাস
২১শে জানুয়ারি (প্রভাত)

মনু!

আজ করাচিটা এত সুন্দর বোধ হচ্ছে সে আর কি বলব! কি হয়েছে জানিস?

কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে—যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো ভিজে চুলগুলো পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে! এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলট-পালট করবার জোগাড় করেছিল, তা তার এখনকার এ-সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আসমানি রং-এর ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাবি-নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গম্ভীর উদাস চাউনিতে চেয়ে আছে। আর আর্দ্র ঋজু চুলগুলো বেয়ে এখনো দু-এক ফোঁটা করে জল ঝরে পড়ছে আর নবোদিত অরুণের রক্তরাগের ছোঁয়ায় সেগুলো সুন্দরীর গালে অশ্রুবিন্দুর মতো ঝিলমিল করে উঠছে! কিন্তু যতই সুন্দর দেখাক, তার এই গম্ভীর সারল্য আর নিশ্চেষ্ট ঔদাস্য আমার কাছে এতই খাপছাড়া খাপছাড়া ঠেকছে যে, আমি আর কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছিনে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা ;— মেঘে মেঘে জটলা, তার উপর হাড়-ফাটানো কন্‌কনে বাতাস ; করাচি-বুড়ি সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দুরের ধারে গাছপালাশূন্য ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরুথুরু করে কেঁপেছে, আর এখানকার এই শান্ত-শিষ্ট মেয়েটিই তার মাথার ওপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ঢেলেছে। বজ্রের হুঙ্কার তুলে বেচারিকে আরো শঙ্কিত করে তুলেছে; বিজুরির তড়িতালোকে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে আর সঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝন্‌ঝার সঙ্গে হো-হো করে হেসেছে। তারপর সকালে উঠেই এই দিব্যি শান্ত-শিষ্ট মূর্তি, যেন কিচ্ছু জানেন না! আর কি, বলো তো ভাই এতে কার না হাসি পায়? আর এ একটা বেজায় বেখাপ্পা রকমের অসামঞ্জস্য কিনা? আমার ঠিক এই প্রকৃতির দু-একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে। খুব একটা 'জাঁদরেলি' গোছের দাপাদাপি দৌরাত্মির চোটে পাড়া মাথায় করে তুলেছেন ; হঠাৎ তাঁর মনে 'দার্শনিকের অন্যমনস্কতা' চলে এল আর অম্‌নি এক লাফে তিনি তাঁর বয়সের আরো বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একজন প্রকাণ্ড প্রৌঢ়া গৃহিনীর মতো জলদ্‌গম্ভীর হয়ে বসলেন এবং কাজেই আমার মতো ঠোঁট কাটা ছ্যাবলার পক্ষে তা নিতান্তই সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সে রকম ধিঙি মেয়েদের বিপক্ষে আমি আর অধিক বাক্যব্যয় করতে সাহস করিনে ; কারণ—কারণ এই বুঝলে কিনা—এখনও আমার 'শুভদৃষ্টি' হয়নি। ভবিতব্য বলা যায় না ভাই! কবি গেয়েছেন,—(মৎকর্তৃক সংস্কৃত)—

প্রেমের পিঠ পাতা ভুবনে,
কখন কে চড়ে বসে কে জানে।

অতএব এই স্থানেই আমার সুন্দরী-গুণ-কীর্তনে 'ফুলস্টপ্',—পূর্ণচ্ছেদ!

আমার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন গো-মুক্ষুর মতো যা-তা প্রলাপ শুনে তোর চক্ষু হয়তো এতক্ষণ চড়ক গাছ হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তও হচ্ছিস দস্তুরমতো। নয়?—হবারই কথা! আমার স্বভাবই এই। আমি এত বেশি আবোল-তাবোল বকি যে, লোকের তাতে শুধু বিরক্ত হওয়া কেন, কথঞ্চিৎ শিষ্ট প্রয়োগেরই কথা!

যাক এখন ও-সব বাজে কথা। কি বলছিলাম? আজ প্রাতের আকাশটার শান্ত-সজল চাউনি আমায় বড্ড ব্যাকুল করে তুলেছে। তার ওপর আমাদের দয়ালু নকিব (বিউগ্লার) শ্রীমান্ গুপীচন্দর এইমাত্র 'নো প্যারেড' (আজ আর প্যারেড নেই) বাজিয়ে গেল। সুতরাং হঠাৎ-পাওয়া একটা আনন্দের আতিশয্যে সব ব্যাকুলতা ছাপিয়ে প্রাণটা আজকাল আকাশের মতো উদার হয়ে যাবার কথা! তাই গুপীকে আমরা প্রাণ খুলে আশীর্বাদ দিলাম সব, একেবারে চার হাত-পা তুলে। সে আশীর্বাদটা শুনবি? 'আশীর্বাদং শিরশ্ছেদং বংশনাশং অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্ঠং পুড়ে মরং।' এ উৎকট আশীর্বাদের জুলুমে বেচারা গুপী তার 'শিঙ্গে' (বিউগ্‌ল) ফেলে ভোঁ দৌড় দিয়েছে। বেড়ে আমোদে থাকা গেছে কিন্তু ভাই।

এমনি একটা আনন্দ পাওয়ার আনন্দ পাওয়া যেত, যখন বৃষ্টি হওয়ার জন্য হঠাৎ আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। স্কুল-প্রাঙ্গণে ছেলেদের উচ্চ হো-হো রোল, রাস্তায় জলের সঙ্গে মাতামাতি করতে করতে বোর্ডিং-এর দিকে সাংঘাতিক রকমের দৌড়, সেখানে গিয়ে বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুখের ওপর এমন 'বাদল দিনে' ভুনিখিচুড়ি ও কোর্মার সারবত্তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে কোমর বেঁধে অকাট্য যুক্তিতর্ক প্রদর্শন, অনর্থক অনাবিল অট্টহাসি,—আহা, সে কি আনন্দের দিনই না চলে গেছে! জগতের কোনো কিছুরই বিনিময়ে আমাদের সে মধুর হারানো দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। ছাত্র-জীবনের মতো মধুর জীবন আর নেই, একথাটা বিশেষ করে বোঝা যায় তখন, যখন ছাত্র-জীবন অতীত হয়ে যায়, আর তার মধুর ব্যথাভরা স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে ঝগ-ঝগ করে ওঠে।

আজ ভোর হতেই আমার পাশের ঘরে (কোয়ার্টারে) যেন গানের ফোয়ারা খুলে গেছে, মেঘমল্লার রাগিণীর যার যত গান জমা আছে 'স্টকে' কেউ আজ গাইতে কসুর করছেন না। কেউ ওস্তাদি কায়দায় ধরছেন,—'আজ বাদরি বরিখেরে ঝম্‌ঝম্!' কেউ কালোয়াতি চা'লে গাচ্ছেন,—'বঁধু এমন বাদরে তুমি কোথা!'—এই উল্টো দেশে মাঘ মাসে বর্ষা, আর এটা যে নিশ্চয়ই মাঘ মাস, ভরা ভাদর নয়,—তা জেনেও একজন আবার কবাটি খেলার 'চুঁ' ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন,—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' সকলের শেষে গম্ভীর মধুরকণ্ঠ হাবিলদার পাণ্ডেমশাই গান ধরলেন,—'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীলগগনে, সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।' গানটা সহসা আমার কোন সুপ্ত ঘায়ে যেন বেদনার মতো গিয়ে বাজল! হাবিলদার সাহেবের কোনো সজল-কাজলআঁখি প্রেয়সী আছে কিনা, এবং আজকার এই 'শ্যামল ঘন নীল গগন' দেখেই

তার সেইরূপ এক জোড়া আঁখি মনে পড়ে গেছে কিনা, তা আমি ঠিক বলতে পারি নে, তবে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন আমারই হৃদয়ের লুকানো সুপ্ত কথাগুলো এই গানের ভাষা দিয়ে এই বাদল রাগিণীর সুরের বেদনায় গলে পড়ছিল। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম,

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে॥
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া-থাকা
বিদায় খনে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥
ঝর ঝর ঝরে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে
কোন খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয় কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥

গান হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন সমঝদার টেবিল, বই, খাটিয়া যে যা পেয়েছে সামনে, তাই তালে-বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছে। এক একজন যেন মূর্তিমান 'বেতাল পঞ্চবিংশতি।' আবার দু-একজন বেশি রকমের রসজ্ঞ ভাবে বিভোর হয়ে গোপাল রায়ের অনুকরণে—'দাদা গাই দেখ্‌সে, গরু তার কি দেখব ; দ্যাখ্ ঠাকুরদ্দার বিয়ে, ধুচনি মাথায় দিয়ে ;—বাবারে, প্যাট গ্যালরে, শা... তোর কি হোলোরে' ইত্যাদি সুমধুর বুলি অবিরাম আওড়িয়ে চলেছেন। যত না বুলি চলেছে, মাথা-হাত-পা-মুখ নড়ছে তার চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের বেশি! গানটা ক্রমে 'আঙ্কোর প্লিজ'—'ফিন জুড়ো' প্রভৃতির খাতিরে দু'তিনবার গীত হলো। তারপর যেই এসে সমের মাথায় ঘা পড়েছে, এমনি চিত্র-বিচিত্র কণ্ঠে সীমা ছাড়িয়ে একটা বিকট ধ্বনি উঠল, 'দাও গরুর গা ধুইয়ে!—তোমার ছেলের বাপ মরে যাক ভাই! তুই মরলে আর বাঁচবিনে বাবা!' সঙ্গে সঙ্গে বুটপট্টি পরা পায়ে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য!—এদের এ উৎকট সমঝ-বুদ্ধিতে গানটার অনেক মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেলেও মনে হচ্ছে এও যেন আমাদের আর একটা ছাত্রজীবন। একটা অখণ্ড বিরাঠ আমোদ এখানে সর্বদাই নেচে বেড়াচ্ছে। যারা কাল মরবে তাদের মুখে এত প্রাণ-ভরা হাসি বড্ডো অকরুণ!

আমার কানে এখনও বাজছে—

—পড়িল মনে
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া-থাকা
বিদায় খনে।

আর তাই আমার এ পরানপুটে কোনখানে ব্যথা ফুটছে, আর হৃদয়কোণে কার কথা বেজে বেজে উঠছে।

আমি আমার নির্জন কক্ষটিতে বসে কেবলই ভাবছি যে, কার এ 'বিপুল বাণী এমন ব্যাকুল সুরে' বাজছে, যাতে আমার মতো শত শত হতভাগার প্রাণের কথা, হৃদয়ের ব্যথা এমন মর্মন্তুদ হয়ে চোখের সামনে মূর্তি ধরে ভেসে ওঠে? ওগো, কে সে কবিশ্রেষ্ঠ, যাঁর দুটি কালির আঁচড়ে এমন করে বিশ্বের বুকের সুষুপ্ত ব্যথা চেতনা পেয়ে ওঠে? বিস্মৃতির অন্ধকার হতে টেনে এনে প্রাণ প্রিয়তমের নিদারুণ করুণ স্মৃতিটি হৃদয়ের পরতে-পরতে আগুনের আখরে লিখে থুয়ে যায়? আধ-ভোলা আধ-মনে-রাখা সেই পুরানো অনুরাগের শরমজড়িত রক্তরাগটুকু চির-নবীন করে দিয়ে যায়। কে গো সে কে?—তার এ বিপুল বাণী বিশ্ব ছাপিয়ে যাক, সুরের সুরধুনী তাঁর জগতময় বয়ে যাক! তাঁর চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার!

'বিদায় খনের' নীরবে চেয়ে থাকার স্মৃতিটা আমার সারা হৃৎপিণ্ডটায় এমন একটা নাড়া দিলে যে, বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে আমারও আঁখি সজল হয়ে উঠেছে। ভাই মনু, আমায় আজ পুরানো দিনের সেই নিষ্ঠুর স্মৃতি বড্ডো ব্যথিয়ে তুলেছে! বোধ হয় আবার ঝরঝর করেই জল ঝরবে। এ আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা ধরবার কোথাও ঠাঁই নেই।

খুব ঘোর করে পাহাড়ের আড়াল থেকে এক দল কালো মেঘ আবার আকাশ ছেয়ে ফেললে! আর কাগজটা দেখতে পাচ্ছিনে, সব যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

* * *

(বিকেল বেলা)

হাঁ, এইবার চিঠিটা শেষ করে ফেলি। সকালে খানিকক্ষণ গান করে বিকেলবেলা এখন মনটা বেশ হালকা মতো লাগছে।

চিঠিটা একটু লম্বা চওড়া হয়ে গেল। কি করি, আমার লিখতে বসলে কেবলই ইচ্ছা হয় যে, হৃদয়ের সমস্ত কথা, যা হয়তো বলতে সঙ্কোচ আসবে, অকপটে লিখে যাই। কিন্তু সবটা পারি কই? আমার সবই আবছায়ার মতো। জীবনটাই আমার অস্পষ্টতায় ঘেরা।

রবিয়লকে চিঠি লিখেছি কাল সন্ধ্যায়। বেশ দু-একটা খোঁচা দিয়েছি! রবিয়ল অসঙ্কোচে কেন, তার ওপর স্বতই আমার ভক্তিমিশ্রিত কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব

আসে। তবুও সে ব্যথা পাবে বলে আমি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই তার সঙ্গে চিঠি-পত্তর ব্যবহার করি। কথাটা কি জানো? সে একটু যেন মুরুব্বি ধরনের, কেমন রাশ-ভারি লোক, তাতে পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে পড়ছে। এরূপ লোকের সঙ্গে আমাদের মতো ছাল-পাতলা লোকের মোটেই মিশ খায় না। কিন্তু ও আর আমি যখন বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুলে পড়তাম, তখন তো এমন ছিল না।

লোকটার কিন্তু একটা গুণ, লোকটা বেজায় সোজা! এই রবিয়ল না থাকলে বোধ হয় আমার জীবন-স্রোত কোন অচেনা অন্য দিকে প্রবাহিত হতো। রবু আমায় একাধারে প্রাণপ্রিয়তম বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ ভ্রাতার মতোই দেখে। রবিয়লের—রবিয়লের-চেয়েও সুন্দর স্নেহ আমি কখনও ভুলব না।

সংসারে আমার কেউ না থাকলেও রবিয়লদের বাড়ির কথা মনে হলে মনে হয় যেন আমার ভাই-বোন-মা সব আছে!

রবিয়লের স্নেহময়ী জ্যোর্তিময়ী জননীর কথা মনে হলে আমার মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে।—আমি কিন্তু বড্ডো অকৃতজ্ঞ! না? বড্ডো অকৃতজ্ঞ! না?

এখন আসি ভাই,—বড্ডো মন খারাপ কচ্ছে। ইতি—

হতভাগা—
নূরুল হুদা

[খ]

সালার
২৯শে জানুয়ারি
(প্রভাত,—চায়ের টেবিল সম্মুখে)

নূরু!

তোর চিঠিটা আমার ভোজপুরি দারোয়ান ম'শায়ের 'থ্রু' দিয়ে কাল সান্ধ্য-চায়ের টেবিলে ক্লান্ত করুণ বেশে এসে হাজির। দেখি, রিডাইরেক্টের ধস্তাধস্তিতে বেচারার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আমি ক্ষিপ্রহস্তে সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ, প্রভুভক্ত লিপিবরের বক্ষ চিরে তার লিপিলীলার অবসান করে দিলাম।—বেজায় উষ্ণমস্তিষ্ক চায়ের কাপ তখন আমার পানে রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে চেয়ে ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে লাগল। খুব ধৈর্যের সঙ্গে তোর লিপিচাতুর্য—যাকে আমরা মোটা কথায় বাগাড়ম্বর বলি—দেখে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ ঢেলে আগে চায়ের ক্রোধ নিবারণ করলাম। তারপর দু'চামচ চিনির আমেজ দিতেই এমন বদরাগি চায়ের কাপটি দিব্যি দুধে-আলতায় রঙিন হয়ে শান্ত-মধুর রূপে আমার চুম্বনপ্রয়াসী হয়ে উঠল। তুই শুনে ভয়ানক আশ্চর্য হবি

যে, তোর 'কোঁদলে' 'চামুণ্ডা' 'রণরঙ্গিণী' ভাবি সাহেবা 'তত্রস্থানে' সশরীরে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অবশ্যি তখন গুম্ফশ্মশ্রুবহুল বিশাল লাঠিস্কন্ধে ভোজপুরি মশাই ছিলেন না সেখানে এবং তাঁর মৌরসিস্বত্ব বেমালুম বেদখল হচ্ছে দেখেও তিনি কোনো আপিল পেশ করেননি।

আহা হা! তাঁর মতো স্বামীসুখাভিলাষিণী, 'উদ্ভট ত্যাগিনী' এ ঘোর কলিকালের মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে, নিতান্তই দুর্লভ। আশা করি মৎকর্তৃক তোর শ্রদ্ধেয়া ভাবি সাহেবার এই গুণকীর্তন (কোঁদলে রণরঙ্গিণী আর চামুণ্ডা এই কথা কটি বাদ দিয়ে কিন্তু!) তোর পত্র মারফতে তাঁর গোচরীভূত হতে বাকি থাকবে না।

আমাদের খুকির বেশ দু-একটি করে কথা ফুটছে।—এই দ্যাখ, সে এসে তোর চিঠিটার হাঁ-করে থাকা ক্লান্ত খামের মুখে চাম্‌চা চাম্‌চা চা ঢেলে তার তৃষ্ণা নিবারণ করচে, আর বলচে 'চা—পিয়াচ!'—সে তোর ঐ রণসাজ পরা খেজুর গাছের মতো ফটোটা দেখে চা—চা করে ছুটে যায়, আবার দু'এক সময় ভয়ে পিছিয়ে আসে। এই খুদে মেয়েটা সংসারের সঙ্গে আমায় পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে। শুধু কি তাই? এ 'আফলাতুন' মেয়ের জুলুমে মায়েরও পরমার্থ-চিন্তা অনেক কমাতে হয়েছে। আর সোফিয়ার তো সে জান! মা'কে সেদিন এই নিয়ে ঠাট্টা করাতে, মা বললেন, 'বাবা, মূলের চেয়ে সুদ পিয়ারা! এখন ঠাট্টা করছিস, পরে বুঝবি, যখন তোর নাতিপুতি হবে।'—মা'র নামাজ পড়ার তো সে ঘোর বিরোধী। মা যখন নামাজ পড়বার সময় সেজদা যান, সে তখন হয় মায়ের ঘাড়ে চড়ে বসে থাকে, নতুবা তাঁর 'সেজদার জায়গায় বসে 'দা-দা' করে এমন করুণভাবে কাঁদতে থাকে যে, মায়ের আর তখনকার মতো নামাজই হয় না! আবার দেখাদেখি সেও খুব গম্ভীরভাবে নামাজ পড়ার মতো মায়ের সঙ্গে ওঠে আর বসে! তা দেখে আমার তো আর হাসি থামে না! এই এক রত্তি মেয়েটা যেন একটা পাকা মুরুব্বি! ঝিদের অনুকরণে সে আবার মায়ের হাত-মুখ খিঁচিয়ে মায়ের সাথে 'কেজিয়া' করতে শিখেছে। দুষ্টু ঝিগুলোই বোধ হয় শিখিয়ে দিয়েছে,—খুকি কেজিয়ার সময় মাকে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, 'দুঃ! ছতিন।—ছালা—ছতিন!'

তোকে অনেক কথাই জানাতে হবে। কাজেই চিঠিটা হয়ত তোরই মতো 'বক্তিমে'য় ভরা বলে বোধ হবে। অতএব একটু মাথা ঠাণ্ডা করে পড়িস। আমরা হচ্ছি সংসারী লোক, সবসময় সময় পাই না। আবার সময় পেলেও চিঠি লেখার মতো একটা শক্ত কাজে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না। তাতে আমার ধাত তো তোর জানা আছে,—যখন লিখি তখন খুবই লিখি, আবার যখন লিখিনে তখন একেবারে গুম্। তুই আমার অভিমানের কথা লিখেছিস, কিন্তু ঐ মেয়েলি জিনিসটার সঙ্গে আমার বিলকুল পরিচয় নেই। আর তারহীন বার্তাবহের সন্দেশ বলে বেশি লাফালাফি করতে হবে না তোকে, ও সন্দেশওয়ালার নাম আমি চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন, আমার সহধর্মিণী-সহোদর শ্রীমান মনুয়র! দেখেছিস আমার দরবেশি কেরামতি। তুই হচ্ছিস একটি নিরেট আহাম্মক, তা না হলে ওর কথায় বিশ্বাস করিস? হাঁ, তবে একদিন কথায় কথায় তোকে কাঠখোট্টা বলে ফেলেছিলুম বটে! কিন্তু তোর

এখনকার লেখার তোড় দেখে আমার বাস্তবিকই অনুশোচনা হচ্ছে যে, তোকে ও রকম বলা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে! এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোর ঘাড়ে কিছু ভয়ানক রকমের উপাধিব্যাধি চড়িয়ে দি', কিন্তু নানান ঝনঝাটে আমার বুদ্ধিটা আজ মগজে এমন সাংঘাতিক রকমে দৌড়ে বেড়াচ্ছে যে, তার লাগামটি কষে ধরবারও জো'টি নেই!...

এই হয়েছে রে, — হ—য়ে—ছে! ইতিমধ্যে পাশের ঘরে মুড়ো ঝাটাহস্তে দুটো ঝি-এর মধ্যে একটা কোঁদল 'ফুল ফোর্সে' আরম্ভ হয়ে গেছে।—বুঝেছিস এই মেয়েদের মতো খারাপ জানোয়ার আর দুনিয়ায় নেই। এরা হচ্ছে পাঁতিহাসের জাত। যেখানে দু'চারটে জুটবে, সেখানেই 'কচরকচর বকরবকর' লাগিয়ে দেবে। এদের জ্বালায় ভাবুকের ভাবুকতা, কবির কল্পনা এমন করুণভাবে কর্পূরের মতো উবে যায় যে, বেচারিকে বাধ্য হয়ে তখন শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লম্বকর্ণ ভারবাহীর মতোই নিশ্চেষ্ট ভ্যাবাকান্ত হয়ে পড়তে হয়। গেরো-গেরো! দুত্তোর মেয়ে-মানুষের কপালে আগুন! এরা এ ঘর হতে আমায় উঠাবে তবে ছাড়বে দেখছি। অতএব আপাতত চিঠি লেখা মুলতবি রাখতে হলো ভাই। আমার ইচ্ছে হয়, এই মেয়েগুলোকে গরু-খেদা করে খেদিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঠেলে উঠাই গিয়ে। ওঃ, সব গুলিয়ে দিলে আমার!

* * *

(দুপুর বেলা)

বাপ রে বাপ! বাঁচা গেছে!—ঝি দু'টোর মুখে ফেনা উঠে এইমাত্র তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য মাত্র সে ঝগড়াটা ধামাচাপা আছে। এই অবসরে আমিও চিঠিটা শেষ করে ফেলি। নইলে, ফের জেগে উঠে ওরা যদি ঝগড়াটার জের চালায় তাহলেই গেছি আর কি!

অনেক সময় হয়তো আমার কাজে কথায় একটু মুরুব্বি ধরনের চা'ল অলক্ষিতেই এসে পড়ে। আর তোর মতো চিরশিশু মনের তাতেই ঠেকে হোঁচট খেয়ে ভ্যাবা-চ্যাকা লেগে যায়, নয়? কিন্তু আমার এদিন ছিল না, আমার মনে তোরই মতো একটি চিরশিশু জাগ্রত ছিল রে, সে আজ বাঁধা পড়ে তার সে সরল চঞ্চলতা আর আকুলতা ভুলে গিয়েছে। তাই বড় দুঃখে আমার সেই মনের বনের হরিণশিশু জলভরা চোখে আকাশের মুক্ত নীলিমায় চেয়ে দেখে, আর তার এই সোনার শিকলটায় করুণভাবে ঝঙ্কার দেয়। ... যাক ওসব কথা। তোকে একটা নীরস তত্ত্বকথা শুনাতে চাই এখানে, সেইটাই মন দিয়ে শোন।—

মানুষ যতদিন বিয়ে না করে, ততদিন তার থাকে দুটো পা। সে তখন স্বচ্ছন্দে যে কোনো দ্বিপদ প্রাণীর মতো হেঁটে বেড়াতে পারে, মুক্ত আকাশের মুক্ত পাখির মতো স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতেও পারে;—কিন্তু যেই সে বিয়ে করলে, অমনি হয়ে

গেল তার দু'জোড়া বা এক গণ্ডা পা। কাজেই সে তখন হয়ে গেল একটি চতুষ্পদ জন্তু। বেচারার তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার ক্ষমতা তো গেলই (কারণ চার-চারটে পা নিয়ে তো কোনো জন্তুকে উড়তে দেখলাম না!) অধিকন্তু সে হয়ে পড়ল একটা স্থাবর জমি-জমারই মতো। একেবারে মাটির সঙ্গে 'জয়েন্'! তারপর দৈবক্রমে যদি একটি সন্তান এসে জুটল তাহলে হলো সে একটি ষট্পদ মক্ষিকা—সর্বদাই আহরণে ব্যস্ত। আর একটি বংশবৃদ্ধি হলেই—অষ্টপদ পিপীলিকা ; দিন নেই, রাত নেই,—ছোটো শুধু আহারের চেষ্টায়। তারপর, এই বংশবৃদ্ধি যখন বংশ-ঝাড়েরই মতো চরম উন্নতি লাভ করল, অর্থাৎ কিনা নিতান্ত অর্বাচীনের মতো গিন্নি যখন এক বস্তা সন্তান প্রসব করে ফেললেন, বেচারা পুরুষ তখন হয়ে গেল একেবারে বহুপদবিশিষ্ট একটি অলস কেন্নো! বেশ একটা হতাশ—নির্বিকার ভাব! কোনো বস্তু নেই—ছুঁলেই জড়সড়।

আমার এত দূর উন্নতি না হলেও যখন আল্লার নাম নিয়ে শুরু হয়েছে রে ভাই, তখন কি আর একে আগোড় দিয়েও ঠেকানো যাবে! এ রকম অবস্থায় পড়লে যে সত্যি সত্যিই সবারই মত বদলায়!

তারপর, ওরে ছ্যাঁচা ঝিনুক! তুই যে কত করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাস সমুদ্দুর, না ডোবার ভিতরে, কিন্তু পারবি কি! আমি যে এঁটেল 'লটে-ছ্যাঁচড়' ডুবুরি! তুই পারস্যোপকূলের সমুদ্রের পাঁকে গিয়ে লুকোলেও এ ডুবুরির হাত এড়াতে পারবিনে, জেনে রাখিস। মানিক কি কখনো লুকোনো যায় রে আহাম্মক? খোশবু'কে কি রুমাল চাপা রাখা যায়? ... হায় কপাল, এই কুড়ি-একুশ বছর বয়সে তোর মতো উদাসীনরা আবার সংসারের কি বুঝবে? শুধু কবির কল্পনায় তোরা সংসারকে ভালবাসি, এখানে যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর কেবল তাই তোদের স্বচ্ছ প্রাণে প্রতিফলিত হয়, তাই তোদের সঙ্গে আমাদের দুনিয়াদার লোকের কিছুতেই পুরোমাত্রায় খাপ খায় না। এক জায়গাতে একটু ফাঁক থাকবেই থাকবে, তা আমরা যতই মিশ খাওয়াতে চেষ্টা করি না! কারণ বড় কঠিনভাবে দুনিয়ার—বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর সত্যগুলো আমাদের হাড়ে-হাড়ে ভোগ করতে হয়! তোরা কল্পনারাজ্যের দেবশিশু, বনের চখা-হরিণ, আর আমরা বাস্তব জগতের রক্ত-মাংসে-গড়া মানব, খাঁচার পাখি!—এইখানেই যে ভাই মস্ত আর আদত বৈষম্য!

কোনো ফরাসি লেখক বলেছেন যে, খোদা মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন শুধু মনকে গোপন করবার জন্যে। আর এ একেবারে নিরেট সত্য কথা। তাই আমার কেন মনে হচ্ছে যে, তুই বাইরে এত সরল, এত উদার, এমন শিশু হয়েও যেন কোন এক বিপুল ঝন্ঝা, কি একটা প্রগাঢ় বেদনার প্রচ্ছন্ন বেগ অন্তরে নিয়তই চেপে রাখছিস—মানুষকে বোঝা যে বড্ডো শক্ত ব্যাপার, তা জানি, কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়াও নেহাৎ সহজ নয়। তোদের মতো লোককে চিনতে পারেন এক তিনিই, যিনি নিজের বুকে বেদনা পেয়েছেন ; আর সেই বেদনা দিয়ে যদি তিনি তোর বেদনা বুঝতে পারেন তবেই, তা নাহলে যত বড়ই মনস্তত্ত্ববিদ হন, এ রকম শক্ত জায়গায় তাঁরা ভয়ানকভাবে ঠকবেন!

একটি প্রস্ফুটিত ফুলের হাসিতে যে কত কান্নাই লুকানো থাকে, তা কে বুঝবে? ফুলের ঐ শুভ্র বুকে যে ব্যথার কীটে কত দাগ কেটেছে, কে তা জানতে চায়?—আমরা উপভোগ করতে চাই ফুলের ঐ হাসিটি, ঐ উপরের সুরভিটুকু!

সত্য বলতে গেলে, আমি যতই বড়াই করি ভাই, কিন্তু তোকে বুঝে উঠতে পারলাম না। যখনই মনে করেছি, এই তোর মনের নাগাল পেয়েছি, অমনি তোর গতি এমন উল্টো দিকে ফিরে যায় যে, আমি নিজের বোকামিতে নিজেই না হেসে থাকতে পারিনে। এই তোর যুদ্ধে যাবার আগের ঘটনাটাই ভেবে দেখ না!—আমার যেন একদিন মনে হলো যে, সোফিয়ার সই মাহ্‌বুবাকে দেখে তুই মুগ্ধ হয়েছিস। তাই বড় আনন্দে সেদিন গেয়েছিলাম, 'এবার সখি সোনার মৃগ দেয় বুঝি ধরা!' এবং আমার মোটা বুদ্ধিতে সব বুঝেছি মনে করে তার সঙ্গে তোর বিয়ের সব ঠিক-ঠাক করলাম, এমন সময় হঠাৎ একদিন তুই যুদ্ধে চলে গেলি। আমার ভুল ভাঙল অনেকের বুক ভাঙল! সোনার শিকল দেখে পাখি মুগ্ধ হয়ে যেন কাছিয়ে এসেছিল, কিন্তু যেই জানলে ওতে বাঁধনের ভয় আছে, অমনি সে সীমাহীন আকাশে উড়ে গেল।

এইখানে আর একটা কথা বলি, কিন্তু তুই মনে করিস না যেন যে আমি নিজের সাফাই গাইছি। প্রথমে সত্য সত্যই তোর এ বিয়েতে আমার উৎসাহ ছিল না, যদিও কেউ ক্ষুণ্ন হবে বলে আমি একথাটা কাউকে তেমন জানাইনি। তার প্রধান কারণ, তুই কোথাও কোন ধরা-ছোঁওয়া দিসনি। আবার যেখানে ইচ্ছা করে ধরা দিতে গিয়েছিস্, সেইখানেই কার নিষ্ঠুর হাত এসে তোকে আলাদা করে দিয়েছে, মুক্ত করে দিয়েছে। সে-কোন চপল যেন তোর খেলার সাথী! সে-কোন চঞ্চলের যেন তুই ছাড়া-হরিণ! তাই কোনো বাঁধন তোকে বাঁধতে পারে না। কিন্তু মস্ত বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই মানুষের মন বুঝতে বেশি ওস্তাদ। ... আমার মস্ত বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই মানুষের মন বুঝতে বেশি ওস্তাদ! কিন্তু এখন দেখছি, সব ভুয়ো। কারণ তোর মাননীয়া ভাবি সাহেবাই আমায় কান-ভাঙানি দিয়েছিলেন এবং সাফ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তুই নাকি মাহ্‌বুবাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলি, এমনকি তুই নাকি আর তোর মধ্যে ছিলিনে এবং মাহ্‌বুবাও নাকি তোর পায়ে একেবারে মনঃপ্রাণ 'ডারি' দিয়েছিল। এমন দু'তরফা ভালবাসাকে মাঝ-মাঠে শুকোতে দেওয়া আমাদের মতো নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে এক রকম পাপ কিনা, তাই বড় খুশি হয়েই তোদের এ-বুকের ভালবাসাকে সোনার সুতোয় গেঁথে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কাজের বেলায় হয়ে গেল যখন সব উল্টো, তখন যত দোষ এই নন্দ ঘোষের ঘাড়েই হুড়মুড় করে পড়ল! অবশ্য আমার একটু সব দিক ভেবে কাজ করা উচিত ছিল, কিন্তু যুবতীদের—আবার তিনি যদি ভার্যা হন, তবে তো কথাই নেই—এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে, যাতে মহাজাহাঁবাজ পুরুষেরও মন একেবারে গলে মোম হয়ে যায়! তখনকার মতো বেচারার আর আপত্তি করবার মতো কোনো শক্তিই থাকে না। সাধে কি আর জ্ঞানীরা বলেছেন যে, মেয়েরা আগুন, আর পুরুষ সব মোম,—কাছাকাছি হয়েছে কি গলেছে। আমি আমার ধৈর্যশীলতার জন্যে চির-প্রসিদ্ধ কি-না, তাই এখন যত মিথ্যা অপরাধের বোঝাগুলোও

নির্বিকার চিত্তে বইতে হচ্ছে। এক কথায়,—ঐ যে কি বলে,—আমি হচ্ছি 'সাহেবের দাগা পাঁঠা!'

তারপর, আমি এখন ভাবছি যে, যে-যুদ্ধের মানুষ কাটাকাটির বিরুদ্ধে 'বক্তিমের' তোড়ে তুই সুরেনবাবুর রুটি মারবার জোগাড় করেছিলি, মাঝে আবার জীবহত্যা মহাপাপ বলে স্রেফ্ শাকান্নভোজী নিরামিষ-প্রাণী বা পরমহংস হয়ে পড়েছিলি, সেই তুই জানিনে কোন অনুপ্রেরণায় এই ভীম নরহত্যার যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লি! জানিনে, সে কোন্ বজ্রবাঁশি তোকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল, তোর এই বাঁধন-হারা প্রাণটিকে জননী জন্মভূমির পায়ে ফুলের মতো উৎসর্গ করে দিতে! তবে কি এটা তোর সেই বিপরীত স্বভাবটা, যেটা অন্যায়ের খোঁচা না খেলে জেগে উঠত না? অন্যায়কে রুখতে গিয়ে এক একদিন তুই যে রকম খুনোখুনি ব্যাপার বাধিয়ে তুলতিস, তা-তো আর কারুর অবিদিত নেই। আমি এখনও ভাবি, সে সময় কি রকম প্রদীপ্ত হয়ে উঠত একটা অমানুষিক শক্তিতে তোর ঐ অসুরের মতো শরীরটা। আসান্‌সোলে ম্যাচ খেলতে গিয়ে যেদিন একা এক প্রচণ্ড বংশদণ্ড দিয়ে প্রায় এক শত ইংরেজকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়েছিলি, সেই দিন বুঝেছিলাম তোর ঐ কোমল প্রাণের আড়ালে কত বড় একটা আগ্নেয় পর্বত লুকিয়ে আছে, যেটা নিতান্ত উত্তেজিত না হলে অগ্নুদ্‌গিরণ করে না।

বড় কৌতূহল হয়, আর জানাও দরকার, তাই তোর সমস্ত কথা জানতে চেয়েছিলাম। তাতে যদি তোর কোনো পবিত্র স্মৃতির অবমাননা হয় মনে করিস, তবে আমি তা জানতে চাইনে। আমি সে রকম নরাধম নই। কিন্তু এ কোন ভাগ্যবতী রে, যে তোর এমন হাওয়ার প্রাণেও রেখা কেটে দিয়েছে? সে কোন সুন্দরীর বীণের বেদন তোর মতো চপল হরিণকে মুগ্ধ করেছে? কেন তুই তবে এসব কথা কাউকে জানাসনি? তুই সত্য সত্যই একটা মস্ত প্রহেলিকা!

সোফিয়ার বিয়ে নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তুই নিজের চরকায় তেল দে। তোর মতো বিবাহ-বিদ্বেষী লোকের আবার পরের বিয়ের এত ভাবনা কেন? আমরা মনে করেছি, আর তোর ভাবিরও নিতান্ত ইচ্ছা যে, মনুয়রের সঙ্গে ওর বিয়ে দিই। তোর কি মত? তবে আরো দু'চার মাস দেরি করতে হবে। কেননা মনুর বি.এ. পরীক্ষা দেবার সময় খুব নিকট। ওর পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেলেই শুভ কার্যটা শেষ করে ফেলব মনে করছি। তুই সেই সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি আসতে পারবি না কি? তুই না এলে যে ঘরের সব-কিছু কাঁদবে।

তোর সামনে সোফিয়া তোর খুব বদনাম করত আর তোর সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করত বটে, কিন্তু তুই যাবার পর হতেই তার মত আশ্চর্য রকমে বদলে গিয়েছে। সে এখন তোর এত বেশি প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছে যে, আমি হিংসে না করে থাকতে পারছিনে। তোর এই যুদ্ধে যাওয়াটাকে যে একটা মস্ত কাজের মতো কাজ বলে ডঙ্কা পিটুচ্ছে। তুই চলে যাবার পর ওর যদি কান্না দেখতিস! সাত দিন সাত রাত না-খেয়ে না-দেয়ে সে শুধু কেঁদেছিল। এখনও তোর কথা উঠলেই তার চোখ

ছলছল করে ওঠে। ... সে তার হাতের বোনা কয়েকটা 'কম্ফর্টার' আর ফুল তোলা রুমাল পাঠিয়েছে তোকে, বোধ হয়ে পেয়েছিস। তোকে তোদের এই যুদ্ধের পোশাকে দেখবার জন্যে সে বড্ডো সাধ করেছে। এখনকার ফটো থাকে তো পাঠাস। যখন যা টাকা-কড়ির দরকার হবে জানাস। এখন আর কোনো কষ্ট হয় না তো? এখানে সব এক রকম ভাল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, তুই আমায় নবনীতকোমল মাংসপিণ্ড-সমষ্টি বলে ঠাট্টা করেছিস্, কিন্তু এখন এলে দেখতে পাবি, এই দু'বছরেই সংসার আর বিবি সাহেবার চাপে আমি শজ্‌নে কাঠের চেয়েও নীরস হয়ে পড়েছি। তোর উপরটা লোহার মতো হলেও ভিতরটা ফুলের চেয়েও নরম! তুই বাস্তবিকই শুক্তি, উপরটা ঝিনুকের শক্ত খোসায় ঢাকা আর ভিতরে মানিক। আর আমি হচ্ছি ঐ—শজ্‌নে কাঠের শুকনো ঠ্যাঙা,—না উপরটা মোলায়েম, না ভিতরে আছে কিছু রস-কষ। একেবারে ভুয়ো-ভুয়ো! ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
হাড়গোড়-ভাঙা 'দা'
রবিয়ল

বাবা নূরু!

আমার স্নেহ-আশিস জানবে। মা'কে এরই মধ্যে ভুলে গেলে নিমকহারাম ছেলে? আমাকে ভুলেও একটা চিঠি দেওয়া হলো না এতদিনের মধ্যে? আমি প্রথমে রেগে চিঠিই দিইনি। যে ছেলে মায়ের নয়, তার ওপর দাবি-দাওয়া কিসের? ওরে, তোরা কি করে মায়ের মন বুঝবি? তা যদি বুঝতিস তবে আর এমন করে জ্বালিয়েপুড়িয়ে খাক করতিসনে আমায়। নাই বা'হলাম তোর গর্ভধারিণী জননী আমি, তবু আমি কোনো দিন তোকে অন্যের বলে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! একটা কথা আছে, 'পেটে ধরার চেয়ে চোখে-ধরা বেশি লাগে।' তোরা একথা বুঝতে পারবিনে।

আমি চিঠি লিখতাম না বাবা, তবে রবু সেদিন হাসতে হাসতে বললে, 'মা-জান, তুমিই ভাল করে নূরুর কথাবার্তায়, গল্পে যোগ দিতে না বলে সে রেগে চলে গিয়েছে।' দেখেছিস কথার ছিরি? 'ছিচে পানি' আর মিছে কথা মানুষের গায়ে বড় লাগে। তা কথাটা মিথ্যে হলেও আমার জানে এত লাগল—যেমন মায়ের দোষে ছেলে চলে যাবার পর সেই ব্যথাটা মায়ের প্রাণে গিয়ে বাজে! জানি, তুই কখ্‌খনো সে রকম ভাবতে পারিসনে, তবু এইখানে কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখি বাপ, কেননা, 'হায়াত-মওতের' কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই! আমার দিন তো এবার ঘনিয়েই আসছে। একদিন এমন ঘুমিয়ে পড়ব যে, তোরা ঘরগুষ্টি মিলে কেঁদেও আর জাগাতে পারবিনে। আহা, খোদা তাই যেন করেন, তোদের কোনো অমঙ্গল যেন আমায় আর দেখে যেতে না হয়। শোকে-শোকে এ বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। তাই এখন খোদার কাছে চাইছি, যেন তোর হাতের

মাটি পেয়ে মরতে পারি। আমার জান তোর ওখানেই পড়ে আছে, কখন ছেলের কি হয়!

দু'এক সময় তোর ছেলেমি আর ক্ষ্যাপামি দেখে খুবই বিরক্ত হতাম, কিন্তু ঐ বিরক্তির মধ্যে যে কত স্নেহ-ভালোবাসা লুকানো থাকত তোরা ছেলেমানুষ তা' বুঝতে পারবিনে। কিন্তু এসব তুচ্ছ কথা কি এখনও তোর প্রাণে জাগে? মায়ে-ছেলের যে কত আদর-আবদার হয় বাপ।

অবশ্যি আমার এও মনে পড়ে যে, তুই যখন অনবরত বকর-বকর করে আমাদের সংসারী লোকের পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক কথাগুলো বকে যেতিস আর নিজের ভাবে নিজেই মশ্‌গুল হয়ে পড়তিস, তখন আমি হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠে অন্য কাজে যেতাম, তোর কিন্তু কথার ফোয়ারায় ফিং ফুটে যেত। তোদের ছেলে-পিলের দলে কি আর আমাদের মতো সেকেলে মুরুব্বিদের বসে থাকা মানায়?—রবু বলে কি, এই সবে তোর মনে বড্ডো কষ্ট হতো। সত্যি কি তাই? রবুর মতো বোকা ছেলে তো আর তুই নস যে, এইসব মনে করে আমায় কষ্ট দিবি!

তোরা এই সব ছেলে-মেয়েগুলোই তো আমাদের দুশমন। মা'দের যে কত জ্বালায় জ্বলতে হয়, কি চিন্তাতেই যে দিন কাটাতে হয়, তা যদি ছেলেরা বুঝত তাহলে দুনিয়ার মা'রা ছেলেদের খামখেয়ালির জন্য এত কষ্ট পেত না। উঃ, হাড় কালি হয়ে গেল রে, হাড় কালি হয়ে গেল।

এখন দিনরাত খোদার কাছে মুনাজাত করছি, কখন তোকে আবার এ যমের মুখ থেকে সহি-সালামতে ফিরিয়ে আনেন। কি পাগলামিই না করলি, একবার ভেবে দেখ দেখি।

খুব ভাল করে থাকিস! খাবার-দাবার খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় সেখানে? আমাদের পোড়া মুখে যে আহার রুচে না! খেতে গেলেই মনে হয়,—আহা, ছেলে আমার কোন্ বিদেশে হয়তো না-খেয়ে না-দেয়ে পড়ে আছে, আর আমি হতভাগী মা হয়ে ঘরে বসে বসে রাজভোগ গিলছি। অমনি চোখের জলে হাতের ভাত ভেসে যায়।

জলদি চিঠি দিস আর সেখানকার কথা জানাস।

বাকি সব রবুর চিঠিতে জানবি। আর লিখতে পারছিনে। তারা কেউ তোর চিঠি পড়ে আমায় শুনায় না। নিজে কি যে ছাই-পাঁশ লেখে দু'দিন ধরে, তাও জানায় না। আমার হাত কাঁপে, তবু নিজেই লিখলাম চিঠিটা। কি করি বাবা, মন যে বালাই, কিছুতেই মানে না। তাছাড়া আমিও মুরুক্ষুর মেয়ে নই! আমার বাবাজি (আল্লাহ্ তাঁকে জিন্নত নসিব করুন) মৌলবি-মৌলানা লোক ছিলেন, তাঁর পায়ের এতটুকু ধূলা পেলে তোরা বত্তিয়ে যেতিস! ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

তোর মা

বাঁকুড়া
২৬এ জানুয়ারি
(বিকেল বেলা)

অথ নরম গরম পত্রমিদম কার্যনঞ্চাগে বিশেষ ! বাঙালি পল্টনের তালপাতার সিপাই শ্রীল শ্রীযুক্ত নূরুল হুদা বরাবরেষু। ...

বুঝলি নূরু ! তোর চিঠি নিয়ে কিন্তু আমাদের বোর্ডিং-এর কাব্যিরোগাক্রান্ত যাবতীয় ছোকরাদের মধ্যে একটা বিভ্রাট রকমের আলোচনা চলেছে। এঁদের সবাই ঠাউরেছেন, তুই একটা প্রকাণ্ড 'হবু-কবি বা কবি-কিশলয় ! তোর যে ভবিষ্যৎ দস্তুরমতো 'ফর্সা' এবং ক্রমে তুই-এই যে রবি বাবুর 'নোবেল প্রাইজ' কেড়ে না নিস, অন্তত তাঁর নাম রাখতে পারবি, এ সিদ্ধান্তে সকলেই একবাক্যে সম্মতিসূচক ভোট দিয়েছেন। তবে আমার ধারণা একটু ভিন্নরকমের। ভবিষ্যতে তুই কবিরূপে সাহিত্য-মাঠে গজিয়ে উঠবি কিনা, তার এখনও নিশ্চয়তা নেই,—কিন্তু 'কপি' হয়েই আছিস। কেননা কবির চেয়ে কপির উপাদানই তোর মধ্যে বেশি !—আর, ছোকরাদের ঐ হৈ-চৈ-এর সম্বন্ধে আমার বিশেষ তেমন বক্তব্য নেই, তবে এইমাত্র বললেই যথেষ্ট হবে যে, উপরে হৈ-হৈ ব্যাপার। রৈ-রৈ কাণ্ড ! ! জার্মানির পরাজয় ! ! ! লেখা থাকলেও ভিতরে সেই—ফসিউল্লার গোলাব-নির্যাস, চারি আনা শিশি। নয়তো সিলেট চুন !

তাই বলে মনে করিসনে যেন যে, দেঁতো 'ক্রিটিকে'র মতো ছোবলে তোকে আমি জখম করে দিচ্ছি। আমিও আবার হুজুগে-সমালোচকদের হল্লায় সায় দিয়ে বলছি, কপালের দোষে নিতান্তই যদি তুই সাহিত্য-রথী না হোস, তবে অন্তত সাহিত্য-কোচোয়ান বা গাড়োয়ান হবিই হবি। আর ঐ আগেই বলেছি, কবিবর না হোস কপিবর তো হবিই !

তুই কবি নাহলে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন জবরদস্ত কবি, তা'তে সন্দেহ নাস্তি! প্রমাণস্বরূপ,—আমি হলে তোর ঐ বর্ষাস্নাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা কিরকম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় করতাম অবধান কর (যদিও বর্ণনাটি 'আন্দাজিক্যালি' হবে !) :

ঝরা থেমেছে! উলঙ্গ প্রকৃতির স্থানে স্থানে এখনও জলের রাশ থৈ থৈ করছে। দেখে বোধ হচ্ছে যেন একটি তরুণী সবেমাত্র স্নান করে উঠেছে, আর তার ভেজা পাৎলা নীলাম্বরী শাড়ি ছাপিয়ে নিটোল উন্মুখ যৌবন ফুটে ফুটে বেরিয়েছে ! এখনো ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোট মিহিন জলের কণা ফিন্‌ফিন্ করে ঝরছে। ঠিক যেন কোনো সুন্দরী তার একরাশ কালো কশ-কশে কেশ তোয়ালে দিয়ে ঝাড়ছে, আর তারই সেই ভেজা চুলের ফিন্‌কির ঝাপট আমাদিগকে এমন ভিজিয়ে দিচ্ছে ! এখনও রয়ে রয়ে ক্ষীণ বিজুলি চম্‌কে চম্‌কে উঠছে, ও বুঝি ঐ সুন্দরীর তড়িতাঙ্গ সঞ্চালনের ললিত-

চঞ্চল গতিরেখা। আর ঐ যে ক্ষান্ত বর্ষণ-স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুগ্ধ দু-চারটি গায়ক-পাখির ঈষৎ-ভেসে আসা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ও বুঝি স্নাতা সুন্দরীর চারু নূপুরের রুনু-ঝুনু কিংবা বলয়-কাঁকনের শিঞ্জিনী! আর ঐ যে তার শেফালির বোঁটায়-ছোবানো ফিরোজা রঙের মলমলের মতো মিহিন শাড়ি আর তাতে ঘন-সবুজ-পাড় দেওয়া, ওতে যেন কে ফাগ ছাড়িয়ে দিয়েছে! ও বোধ হয় আবিরও নয় ফাগও নয়,—কোনো একজন বাদশাজাদা ঐ তরুণীর ভালোবাসায় নিরাশ হয়ে ঐ দুটি রাতুল চরণতলে নিজকে বলিদান দিয়েছে আর তারই কলিজার এক ঝলক খুন ফিং দিয়ে উঠে, সুন্দরীর বাসন্তী-বসন অমন করে রক্ত-রঞ্জিত করে তুলেছে,—ওগো, তাই এ সাঁঝবেলাতে সুন্দরীর মন এত ভারি!—

কেমন লাগল? দেখলি তো, আমি তোর মতো আর ছোট কবি নই। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় রে, নূরু, যে কেউ আমায় চিনতে পারলে না! পরে কিন্তু দেশের লোককে পস্তাতে হবে, বলে রাখছি। তুই হয়তো হাসছিস, কিন্তু আমি বলি কি, তার একটা মস্ত কারণ আছে। রবিবাবুকে ইয়োরোপ আর আমেরিকার লোক যে রকম বড় আর উঁচু করে দেখে, আমাদের দেশে সে রকম পারে কি? উল্টো, যারা তাঁর লেখার এক কানা-কড়িও বোঝেন না, তাঁরাই আবার যত রকমে পারেন তাঁর নিন্দা করেন। যেন এইসব সমালোচক রবি-কবির চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁরা সেটা দেখাতে চান না, আর দেখালেও নাকি দেশে কেউ সমঝদার নেই। এঁরাই কিন্তু মনে মনে রবি বাবুর পায়ে লক্ষ-হাজারবার সালাম না করে থাকতে পারেন না, তবু বাইরে নিন্দে করবেনই। কাজেই এসব লোককে সমালোচক না বলে আমি বলি পরশ্রীকাতর। এর একটা আবার কারণও আছে; আমরা দিন-রাত্তির ওঁকে চোখের সামনে দেখছি,—আর যাকে হরদম দেখতে পাওয়া যায়, এমন একটা ব্যক্তি যে সারা দুনিয়ার মশহুর একজন লোক হবেন, এ আমরা সইতে পারি নে। তাই, অধিকাংশ কবিই জীবিতকালে শুধু লাঞ্ছনা আর বিড়ম্বনাই ভোগ করেছেন। ধর, আমার লেখা যদি ছাপার অক্ষরে বেরোয়, তবে অনেকেই ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে যাবে। কারণ আমারও তাদেরি মতো দুটো হাত দুটো পা। কোনো একটা অতিরিক্ত অঙ্গ, অন্তত পেছনে একটা লেজুড়ও নেই,—যার থেকে আমি একটা এরকম অস্বাভাবিক জানোয়ারে পরিণত হতে পারি!—একদিনকার একটা মজা শোন! একটা উচ্চ মাসিক পত্রিকায় আমার লেখা একটা গল্প প্রকাশিত হতে দেখে আমার এক বন্ধু ভয়ানক অবাক হয়ে আর চটে বলেছিলেন—আরে মিয়া, হুঃ! আমি না কইছিলাম যে, এসব কাগজ লইতাম না? এইসব ফাজিল চ্যাংরারা যাহাতে ল্যাহে, হেই কাগজ না আবার মানুষে পড়ে? আমার চারড্যা ট্যাহা না এক্কেবারে জলে পরলোনি?

যাক, সৈনিক জীবন কেমন লাগছে? ও-জীবন আমার মতো নরম চামড়ার লোকের পোষায় না রে ভাই, তোর মতো ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরই এসব কোস্তাকুস্তি সাজে!

তুই শুনে খুব খুশি হবি যে, যে-লোকগুলো তোর মতো এমন 'ধড়-পড়ে' ইব্‌লিস ছোকরাকে দু'চোখে দেখতে পারত না, তারাও এখন তোকে রীতিমতো ভয়-ভক্তি করে।

তবে তারা এটাও বলতে কসুর করে না যে, তোদের মতো মাথা খারাপ শয়তান ছোকরাদেরই জন্যে এ বঙ্গবাহিনীর সৃষ্টি।

তারপর একটা খুব গুপ্ত কথা।—বুবু সাহেবা আমায় ক্রমাগত জানাচ্ছেন যে, যদি আমার ওজর-আপত্তি না থাকে, তাহলে শ্রীমতী সোফিয়া খাতুনের (ওর্ফে তাঁর ননদের) পাণিপীড়ন ব্যাপারটা আমার সঙ্গেই সম্পন্ন করে দেন। ও-রকম একটা খোশখবর শুনে আমার খুবই 'খোশ' হওয়া উচিত ছিল, কেননা তাহলে রবিয়ল মিয়াকে খুব জব্দ করা যেত। তিনি আমার ভগ্নিকে বিয়ে করে আইনমতে আমায় শালা বলবার ন্যায্য অধিকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু রাত্তির দিন ভদ্র-অভদ্র লোকের মজলিসে মহ্‌ফিলে যদি ঐ একই তীব্র-মধুর সম্বন্ধটা বারবার শতেকবার জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নিতান্ত নিরীহ প্রাণীরও তাতে আপত্তি করবার কথা। খুব ঘনিষ্ঠ আর সত্যিকার মধুর সম্বন্ধ হলেও লোকে 'শালা আর শ্বশুর' এই দুটো সম্বন্ধ স্বীকার করতে স্বতই বিষম খায়, এ একটা ডাহা সত্যি কথা! অতএব আমিও জায়বদ্‌লি বা Exchange স্বরূপ তাঁর সহোদরার পাণিপীড়ন করলে তার বিষদাঁত ভাঙা যাবে নিশ্চয়ই, তবে কিনা সেই সঙ্গে আমারও 'তিন পাঁচে পঁচাত্তর' দাঁত ভাঙা যায়। কেননা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যে, আমার ভবিষ্যৎ অঙ্কলক্ষ্মীটি আদৌ গো-বেচারি প্রিয়ভাষিণী নন, বরং তাঁতে লক্ষ্মীমেয়ের কোনো গুণই বর্তে নাই। সবচেয়ে বেশি ভয়, ইনি আবার ভয়ানক বেশি সুন্দরী, মানে এত বেশি সুন্দরী, যাদের 'চরণতলে লুটিয়ে পড়িতে চাই' বা 'জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই' আর কি! যাদের ঈষৎ আড়চোখো চাউনিতে আমাদের মাথা একেবারে বিগড়ে যায়। যাদের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখে আমরা আনন্দে অস্বাভাবিক রকমের বদন ব্যাদান করে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ি। —আজকাল ঐ ঘোড়া-রোগেই গরিব কাঁচা যুবকগুলো মরছে কিনা।—আর নূরু, লাজের মাথা খেয়ে সত্যি কথা বলতে কি ভাই, অহম্ গরিব নাবালকও ঐ রোগেই মরেছে রে, ঐ রোগেই ম—রে—ছে! জানি না আমার কপালে শেষ পর্যন্ত কি আছে,—মুড়ো-ঝাঁটা, না মিষ্টি ঠোনা!

তোর মত কি? কি বলিস দেবো নাকি চোখ-মুখ বন্ধ করে বিয়েটা ... ? (আঃ, একটু ঢোক গিলে নিলুম রে!)

বাড়িতে বাস্তবিকই সকলে বড্ডো মুষড়ে পড়েছেন তোর এই চলে যাওয়াতে। আমাদের গ্রামটায় প্রবাদের মতো হয়ে গিয়েছিল যে, তোর আর আমার মতো এমন সোনার চাঁদ ছেলে আর এমন অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লোকে নাকি আর কখনও দেখেনি। এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে পড়তে যাওয়া, এক সঙ্গে বাড়ি আসা, ওঃ, সে কথাগুলো জানাতে হলে এমন ভাষায় জানাতে হয়, যে ভাষা আমার আদৌ আয়ত্ত নয়। ওরকম 'সতত সঞ্চরমান নবজলধরপটলসংযোগে' বা 'ক্ষিত্যপতেজো পটাক্ দুম্' ভাষা আমার একেবারেই মনঃপুত নয়। পড়তে যেন হাঁপানি আসে, আর কাছে অভিধান খুলে রাখতে হয়! অবিশ্যি, আমার এ মতে যে অন্য সকলের সায় দিতে হবে, তারও কোনো মানে নেই। আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গি নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরক্তিজনক, এমনকি অনেকে

একে 'ফাজলামি' বা 'বাঁদারামি' বলেও অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু আমার এ হালকা ভাবের কথা—হালকা ভাষাতেই বলা আমি উচিত বিবেচনা করি। তার ওপর, চিঠির ভাষা এর চেয়ে গুরুগম্ভীর করলে সেও একটা হাসির বিষয় হবে বৈ তো নয়!—যাক, কি বলছিলাম? এখন যখন আমি একা তাঁদের বাড়ি যাই, তখন বুবু সাহেবা আর কিছুতেই কান্না চেপে রাখতে পারেন না। তাঁর যে শুধু ঐ কথাটাই মনে পড়ে, এমনি ছুটিতে আমরা দু'জনে বরাবর একসঙ্গে বাড়ি এসেছি। তারপর যত দিন থাকতাম, ততদিন বাড়িটাকে কিরকম মাথায় করেই না রাখতাম? ...

হাঁ, আমাদিগকে যে লোক 'মোল্লা দোপেঁয়াজা' বলে ঠাট্টা করত, তুই চলে যাবার পর কিন্তু সব আমায় স্রেফ, 'একপেঁয়াজা মোল্লা' বলছে।

যাক ও-সব ছাইপাঁশ কথা—নূরু, কত কথাই না মনে হয় ভাই, কিন্তু বড় কষ্টে হাসি দিয়ে তোরই মতো তা ঢাকতে চেষ্টা করি! ... আবার কি আমাদের দেখা হবে?

পড়াশুনায় আমার আর তেমন উৎকট ঝোঁক নেই। আর কিছুতে মন বসে না। যাই, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ইতি—

কলেজ-ক্লান্ত
মনুয়র

সালার
৬ই ফাল্গুন

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

ভাই নূরুল হুদা, আমার শত স্নেহাশিস জানবে। অনেকদিন চিঠি দিতে পারিনি বলে তুমি তোমার ভাই সাহেবের পত্রে অনুযোগ করে বেশ একটু খোঁচা দিয়েছ। কি করি ভাই, সংসারের সব ঝক্কি এখন আমার ওপর। তুমি তো সব জান, আম্মাজান কিছু দেখেন না। আগে বরং দু-এক সময় তিনি বিষয়-আশয়ের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে দুটো উপদেশ দিতেন। এখন তাও বন্ধ। দিন-রাত নামাজ-রোজা নিয়ে নিজের ঘরটিতে আবদ্ধ, আর বাইরে এলেই ওঁর ওপর খুকির তখন ইজারা দখল!

তারপর তোমার ভাই সাহেবের কথা আর বোলো না। দিনে-রাত্তিরে 'কমসে কম' পঁচিশ কাপ চা গিলছেন আর বই নিয়ে, না হয় এস্রাজ নিয়ে মশগুল আছেন। ঐসব বলতে গেলেই আমি হই 'পাড়া-কুঁদুলি, রণচণ্ডী, চামুণ্ডা' আর আরো কত কি! আমার মতো এই রকম আরো গোটা কতক সহধর্মিণী জুটলেই নাকি স্বামীস্বত্বে স্বত্ববান বাংলার তাবৎ পুরুষপালই জব্দ হয়ে যাবেন। কপাল আমার! তা যদি হয়, তাহলে বুঝি যে একটা মস্ত ভাল কাজ করা গেল। এদেশের মহিলারা যখন সহধর্মিণীর ঠিক মানে বুঝতে পারবেন, স্বামীর দোষকে উপেক্ষা না করে তার তীব্র প্রতিবাদ করে স্বামীকে

সৎপথে আনতে চেষ্টা করবেন, তখনই ঠিক স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হবে। স্বামীকে আস্কারা দিয়ে পাপের পথে যেতে দেয় যে-স্ত্রী, সে আর যাই হোক, সহধর্মিণী নয়। যাক ওসব কথা, এখন আমার ইতিহাসটা শোনো, আর বলো আমি কি করে কোন দিক সামলাই।—সাংসারিক কোনো কথা পাড়তে গেলেই তোমার ভাই সাহেবের ভয়ানক মাথা দপদপ করে, আর যে-কোনো কাজেই দু'-তিন কাপ টাটকা চায়ের জোগাড় করতে হয়! চা'টা যদি একটু ভাল হলো তবে আর যায় কোথা? একেবারে দিল-দরিয়া মেজাজ! আরাম-কেদারায় সটান শুয়ে পড়েন, আর যা বলব তাতেই 'হুঁ'। তোমার সদাশিব কথাটা ভয়ানকভাবে খেটেছে ওঁর ওপর। কিন্তু ভাই, এতে তো আর সংসার চলে না। বিষয়-আশয় জমিদারি সব ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে ভাং-খাওয়া বাবাজির মতো বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে কি সব ঠিক থাকে, না কাজেরই তেমনি শৃঙ্খলা হয়? মাথার উপর মুরুব্বি থাকাতে যতদিন যা করেছেন সেজেছে। আমি তো হদ্দ হলাম বলে বলে। কতই আর প্যাঁচা-খ্যাঁচরা করব মানুষকে? একটু বুঝিয়ে বলতে গেলেই মুখটি চুন করে আস্তে আস্তে সেখান হতে সরে পড়া হয়। সেদিনের মতোই একেবারেই গুম। সন্ধে নাগাদ আর টিকিটির পর্যন্ত দেখা নেই। আমি নাচার হয়ে পড়েছি ওঁকে নিয়ে। পড়তেন জাহাঁবাজ মেয়ের হাতে, তবে বুঝতেন, কত ধানে কত চাল। তুমি যতদিন ছিলে, ততদিন যা একআধটু কাজকর্ম দেখতেন। তুমি যাওয়ার পর থেকেই উনি এরকম উদাসীনের মতো হয়ে পড়েছেন।—আর তুমিই যে অমন করে চলে যাবে, তা কে জানত ভাই?—আজ আমি সন্তানের জননী, সংসারের নানান ঝন্‌ঝাট আমারই মাথায়, কাজেই চিন্তা করবার অবসর খুব কমই পাই; তবুও ঐ হাজার কাজেরই ফাঁকে তোমার সেই শিশুর মতো সরল শান্ত মুখটি মনে পড়ে আমায় এত কষ্ট দেয় যে, সে আর কি বলব? আজ চিঠি লিখতে বসে কত কথাই না মনে পড়ছে।—

আমি যখন প্রথম এ ঘরের বৌ হয়ে আসি, তখন ঘরটা কি-জানি কেন বড্ডো ফাঁকা-ফাঁকা বলে বোধ হতো। ঘরে আর কেউ ছেলে-মানুষ ছিল না যে কথা কয়ে বাঁচি। আমাদের সোফি আর পাশের বাড়ির মাহ্‌বুবা তখনও নেহাত ছেলেমানুষ, আর সহজে আমার কাছও ঘেঁষত না। কে নাকি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, আমি মেম সাহেব! সে কত কষ্টে তাদের ভয় ভাঙাতে হয়েছিল। ... তারপর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তোমার ভাই সাহেব তোমায় আবিষ্কার করে ধরে আনলেন। তুমি নাকি তখন স্কুলে যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতেই ঘুরে বেড়াতে। টোঁ টোঁ সন্ন্যাসী বা দরবেশ-গোছের কিছু হবে বলে, মাথায় লম্বা চুলও রেখেছিলে; মাঝে মাঝে আবার গেরুয়া বসন পরতে। এইসব অনেক-কিছু কারণে তোমার ভাই সাহেব তোমাকে একজন মহাপ্রাণ মহাপুরুষের মতোই সমীহ করলেও আমি একদিন বলেছিলাম যে, এসব হচ্ছে আজকালকার ছোকরাদের উৎকট বাজে ঝোঁক আর পাগলামি। তবে লম্বা চুল রাখবার একটা গূঢ় কারণ ছিল,—সে হচ্ছে, তুমি একজন 'মোখ্‌ফি' কবি; আর কবি হলেই লম্বা চুল রাখতে হবে। অবশ্য, এ আমি তোমার লুকানো কবিতার খাতা দেখে বলছি তা

মনে করো না।—তবে তুমি বলতে পারো যে, তোমার উদাসীন হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তোমার বাপ-মা সবাই মারা পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত স্নেহ-বন্ধনই কালের আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু সত্য বলতে গেলে এসবের পেছনে কি আর একটা নিগূঢ় বেদনা লুকানো ছিল না, ভাই? আগেও আমার ছোট ভাই মনুর কাছে শুনেছিলাম। তোমাতে আর মনুতে যে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তা ওরই মুখে শুনেছিলাম। সে তোমার যেসব গুণের কথা বলত, তাতে স্বতই লোকের মনে হবার কথা যে, এ ধরনের জীবের বহরমপুরই উপযুক্ত স্থান। কয়েকবার বিপন্নকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলে, এমন কথা শুনেও আমি বলেছিলাম, ওসব রক্তগরম তরুণদের খামখেয়ালি বা ফ্যাশান। ওর সঙ্গে একটা উৎকট যশোলিপ্সাও যে আছে, তাও আমি অসঙ্কোচে বলতাম। কিন্তু যেদিন তোমার ভাই সাহেব আর আমার ছোট ভাইটির সাথে আমাদের ঘরে অসঙ্কোচে নিতান্ত আপন জনের মতো এসে তুমি দাঁড়ালে, তখন বাস্তবিকই এক পলকে আমার ওসব মন্দ ধারণাগুলো একেবারে কেটে গেল। তোমার ঐ নির্বিকার ঔদাস্যের ভাসা ভাসা করুণ কোমল দৃষ্টি আর শিশুর মন, অনাড়ম্বর সহজ সরল ব্যবহার দেখে আপনি তোমার ওপর একটা মায়া জন্মে গেল। আর যারা নিজেদের প্রতি এরকম উদাসীন তাদের প্রতি মায়া না হয়েই যে পারে না। তাই সেদিন আমার বাপ-মা-মরা অনাথ ছোট ভাইটির সাথে তোমাকেও আমার আরো একটি ছোট ভাই বলে ডেকে নিলাম। ...

তোমার সরল অট্টহাস্যে এই ঘর একদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল,—গল্পের রহস্যালাপের তোড়ে এই ফাঁকা ঘরকেই তুমি মজলিসের মতো সরগরম করে তুলেছিলে—সেই ঘর আজো আছে; তবে, তেমনি ফাঁকা! অনাবিল ঝর্নাধারার মতো উদ্দাম হাসির ধারায় সে ঘরকে কেউ আর বিকৃত করে না, তাই সে নীরব-নিঝুম এক ধারে পড়ে আছে। আমাদেরও কেউ আর তেমন অনর্থক উৎপাতের জুলুমে তেতো-বিরক্ত করে তোলে না, তেমন উন্মাদ হট্টগোলে বাড়িকে মাথায় করে তোলে না, তাই আমাদেরও কাজে আর সে প্রাণ সে উৎসাহ নেই! সব যেন মন-মরা! ফাল্গুন বনের বুকভরা দুষ্টুমির চপলতা যেন অসম্ভাবিত রূপে আসা পৌষের প্রকোপে একেবারে হিম হয়ে গেছে—এই রকম বিরক্ত হওয়াতেও যে একটা বেশ আনন্দ পাওয়া যেত এ-তো অস্বীকার করতে পারবে না।

আচ্ছা ভাই নূরু! তুমি কেন এমন করে আমাদের না বলে না কয়ে চলে গেলে। অবশ্যি, আমাদের বললে, হয়তো সহজে সম্মতি দিতাম না, কিন্তু যদি নিতান্তই জোর করতে আর আমরা দেখতাম যে, তোমার ব্যক্তিগত জীবনে একটা সত্যিকার মহৎ কাজ করতে যাচ্ছ, তাহলে আমরা কি এতই ছোট যে তোমায় বারণ করে রাখতাম? তোমার গৌরবে কি আমাদেরও একটা বড় আনন্দ অনুভব করবার নেই?

তোমার ভাই সাহেব সদাসর্বদাই শঙ্কিত থাকতেন,—তুমি কখন কি করে বসো এই ভেবে; এই নিয়ে আমি কতদিন তাঁকে ঠাট্টা করেছি, এখন দেখছি, ওঁরই কথা ঠিক হলো।

তুমি তোমার প্রাণের অনাবিল সরলতা আর প্রচ্ছন্ন-বেদনা দিয়ে যে সকলকে কত বেশি আপনার করে তুলেছিলে, তা তুমি নিজেও বুঝতে পারোনি। তুমি যে অনবরত হাসির আর আনন্দের সবুজ রঙ ছড়িয়ে প্রাণের বেদনা-অরুণিমার রক্তরাগকে লুকিয়ে রাখতে আর তলিয়ে দিতে চাইতে, এটা আমার কখনও চক্ষু এড়ায়নি। তাই তোমার এই হাসিই অনেক সময় আমায় বড়ই কাঁদিয়েছে। তোমার ঐ ঘোর-ঘোর চাউনিতে যে বেদনার আভাস ফুটে উঠত, সে যে সবচেয়ে অরুন্তুদ !—মা'র মতো গম্ভীর লোকও তুমি চলে যাবার পর কত অঝোর নয়নে কেঁদেছেন। তোমার ভাইতো পাথরের মতো হয়ে পড়েছিলেন। খুকি পর্যন্ত কেমন 'হেদিয়ে' গিয়েছিল।

তোমার ভাই বেচারা এখনও আক্ষেপ করে বলেন,—হয়তো আমাদের দোষেই নূরু আমাদের ছেড়ে গেল !' কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। কেননা সেরকম কিছুতো কোনোদিন ঘটে নি। সত্যি বটে, তুমি অতি অল্পতেই রেগে উঠতে, কিন্তু সেটাকে রাগ বললে ভুল বলা হবে। ওটাকে রাগ না বলে সোজা কথায় বলা উচিত ক্ষেপে ওঠা ; ঠিক যেন ঘাড়ের ঘুমন্ত একটা ভূতের ঝাঁ করে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠা, কাজেই ওতে না রেগে আমরা আমোদই পেতাম বেশি। একটা খেপা লোককে খেপিয়ে যে কত আমোদ, তা যারা খেপাতে জানে তারাই বোঝে। তোমার স্কন্ধবাসী ভূত মহাশয়কে খুঁচিয়ে তাতিয়ে তোলা তাই এত বেশি উপভোগের জিনিস ছিল আমাদের। তবে 'উনি' যে তোমার একটা আবছায়া বলে উপহাস করেন, সেইটাই সত্যি না কি?

আমায় বড় বোন বলে ভাবতে, তাই তোমার দুটি হাত ধরে অনুরোধ করছি, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোমার সব কথা লিখে জানাবে কি? যে সব কথা নিতান্ত আপত্তিকর বা গোপনীয় সেসব কথা আমি আন্দাজেই বুঝে নেবো, তোমায় স্পষ্ট করে খুলে লিখতে বলছিনে। মেয়েদের বিশ্বাসঘাতক বলে বদনাম থাকলেও আমি কথা দিচ্ছি যে, তোমার কোনো কথা কাউকে জানাব না। বড় বোনের ওপর এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারো কি?

এখন আমাদের সোফিয়া মাহ্‌বুবা সম্বন্ধে দু'-একটা কথা তোমায় জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি, বিরক্ত হয়ো না বা রাগ করো না—লক্ষ্মীটির মতো তখন যদি তাকে তোমার অঙ্কলক্ষ্মী করে নিতে, তবে বেচারির আজ এত কষ্ট পেতে হত্তো না। তুমি জানো, একে বেচারির অবস্থা ভাল ছিল না—বিপদের উপর বিপদ—সেদিন তার বাবাও আবার সাতদিনের জ্বরে মারা গেছেন। এক মামারা ছাড়া তো তাদের খোঁজ-খবর নেবার কেউ ছিল না দুনিয়ায়, তাই তারা এসে সেদিনে মাহ্‌বুবাদের সবকে নিজের ঘরে নিয়ে গেছেন। এত বুঝালাম, অনুরোধ করলাম আমরা, এমনিক পায়ে পর্যন্ত ধরেছি—কিন্তু মাহ্‌বুবার মা কিছুতেই এখানে আমাদের বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না। থাকবেনই বা কি করে? তুমি তো ওঁদের এ-দেশ ছাড়ালে ! যে অপমান তুমি করেছ ওঁদের, যে আঘাত দিয়েছ ওঁদের বুকে, যে রকম প্রতারিত করেছ ওঁদের আশালুব্ধ মনকে, তাতে অবস্থাপন্নলোক হলে তোমার ওপর এর রীতিমতো প্রতিহিংসা না নিয়ে ছাড়তেন না! তাঁদের অবমাননা-আহত প্রাণের এই যে নীরব কাৎরানি, তা যদি সবার বড় বিচারক

খোদার আরশে গিয়ে পৌঁছে তাহলে তার যে ভীষণ অমঙ্গল–বজ্র তোমার আশে–পাশে ঘুরবে, তা ভেবে আমি শিউরে উঠছি, আর দিন–রাত খোদাতা'য়ালার কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করছি। এই মাহ্‌বুবার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, এতে আমরা বলব, তাঁর হায়াত ছিল না—কে বাঁচাবে ; কিন্তু লোকে বলছে,তোমার হাতের এই অপমানের আঘাতই তাঁকে পাঁজর–ভাঙা করে দিয়েছিল। আর বাস্তবিক, ওঁরা তো কেউ প্রথমে রাজি হননি বা বড় ঘরে বিয়ে দিতে আদৌ লালায়িত ছিলেন না, আমিই না হাজার চেষ্টা–চরিত্তির করে সমঝিয়ে ওঁদের রাজি করি। তোমার ভাই সাহেব কিন্তু প্রথমেই আমায় 'বারহ' মানা করেছিলেন—শেষে একটা গণ্ডগোল হবার ভয়ে, কিন্তু আমি তা শুনিনি ! আমি সে সময় এমন একটা ধারণা করেছিলাম, যা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তুমি হাজার অস্বীকার করলেও আমি জোর করে বলতে পারি যে, মাহ্‌বুবাকে দেখে তুমি নিজেও মরেছিলে আর তাকেও মিথ্যা আশায় মুগ্ধ করে তার নারী–জীবনটাই হয়তো ব্যর্থ করে দিলে। অবশ্য তোমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে মেলা–মেশা এমনকি দেখাশুনা পর্যন্ত ঘটেনি, এ আমি খুব ভাল করেই জানি ; কিন্তু ঐ যে পরের জোয়ান মেয়ের দিকে করুণ–মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে থাকা, তার মনটি অধিকার করতে হাজার রকমের কায়দা–কের্‌দানি দেখানো, এ–সব কি জন্যে হতো ? এগুলো তো আমাদের চোখ এড়ায়নি ! খোদা আমাদের দুটো চোখ দিয়েছেন, এক–আধটু বুদ্ধিও দিয়েছেন। আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, আমি বড্ডো বুকভরা স্নেহ দিয়েই তোমাদের এ পূর্বরাগের শরম–রঙিন ভাবটুকু উপভোগ করতাম, কারণ আমি জানতাম দু–দিন বাদে তোমরা স্বামী–স্ত্রী হতে যাচ্ছ, আর তাই আমাদের সমাজে এ পূর্বরাগের প্রশ্ন নিন্দনীয় হলেও দিয়েছি। নিন্দনীয়ই বা হবে কেন ? দুইটি হৃদয় পরস্পরকে ভাল করে চিনে নিয়ে বাসা বাঁধলেই তো তাতে সত্যিকার সুখ–শান্তি নেমে আসে ! যেমন আকাশের মুক্ত পাখিরা। দেখেছ তাদের দুটিতে কেমন মিল ? তারা কেমন দু'জনকে দুজন চিনে নিয়ে মনের সুখে বাসা বাঁধে, ঘরকন্না করে। এ দেখে যার চোখ না জুড়ায়, সে পাষাণ, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হিংসুক। হৃদয়ের এ অবাধ পরিচয় আর মিলনকে যে নিন্দনীয় বলে, সে বিশ্ব–নিন্দুক। যাক সে–সব কথা, কিন্তু তুমি কোন সাহসে বাঁশির সুরে একটি কিশোরী হরিণীকে কাছে এনে তাকে জালিমের মতো এমন আঘাত করলে ! এইখানেই তোমাকে ছোট ভাবতে আমার মনে বড্ডো লাগে ! এর মূলে কি কোনো বেদনা কি কোনো–কিছু নিহিত নাই ? ধর, এতে আমার যে অপমান করেছ তা নয়তো স্নেহের অনুরোধে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অন্যে সে অপমান সইবে কেন ? তাদের তো তার অধিকার দাওনি ! আর তোমার যদি বিয়ে করবার একান্তই ইচ্ছা ছিল না, তবে প্রথমে কি ভেবে—কিসের মোহে পড়ে রাজি হয়েছিলে ? আবার রাজি হয়ে যখন সব ঠিকঠাক,—তখনই বা কেন এমন করে চলে গেলে ? গরিব হলেও তাঁদের বংশমর্যাদা অনেক উচ্চ, এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল।

কিছু মনে করো না। বড্ডো বুক তোলপাড় করে উঠল, তাই উত্তেজিত হয়ে অনেক কর্কশ কথা লিখলাম। তোমার ওপর আমার স্নেহের দাবি আছে বলেই এত কথা এত

জোর করে কঠিনভাবে বলতে পারলাম। তাছাড়া বরাবরই দেখেছ আমি একটু অন্য ধরনের মেয়ে। যা সত্যি, অপ্রিয় হলেও তা বলতে আমি কখনও কুণ্ঠিত হই না। যাকে স্নেহ করি, তার অন্যায়টাই বুকে সবচেয়ে বেশি বাজে।

সোফিয়ার চেয়েও মাহ্‌বুবার ওপর আমার বেশি মায়া জন্মে গেছিল। মেয়েটা যেমন শান্ত তেমনি লক্ষ্মীমেয়ের সমস্ত গুণই তাতে বর্তে ছিল। তাছাড়া দরিদ্রতার করুণ সসঙ্কোচ ছায়াপাতে তার স্বভাবসরল সুন্দর মুখশ্রী আরো মর্মস্পর্শী মধুর হয়ে ফুটে উঠত আমার কাছে। সে যেদিন চলে গেল, সোফি সেদিন ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল, তিন-চার দিন পর্যন্ত তাকে এক ঢোক পানি পর্যন্ত খাওয়াতে পারিনি,—একেবারে যেন মরবার হাল ! মাও না কেঁদে পারেননি। আহা, পোড়াকপালিকে কি আজ এমন করে বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হত, যদি তুমি তার সোনার স্বপন এমন করে ভেঙে না দিতে। অভাগি যাবার দিনে আমার গলাটা ধরে কি কাঁদাই না কেঁদেছে। তার দু'চোখ দিয়ে যেন আঁশুর দরিয়া বয়ে গিয়েছে ! আর একদিন সে কেঁদেছিল ভাই, লুকিয়ে এমনি গুমরে গুমরে কেঁদেছিল, যেদিন তুমি যুদ্ধে চলে যাও !—আমার বুক ফেটে কান্না আসছে, এ হতভাগীর পোড়াকপাল মনে করে। ... সে সোমত্থ হয়ে উঠেছে, সুতরাং তার মামুরা যে তাকে আর থুবড়ো রাখবে তাতো মনে করতে পারিনে, বা ও নিয়ে জোর করেও কিছু বলতে পারি নে। বোধ হয় ঐখানেই কোথাও দেখে-শুনে বে-থা দেবে। তাঁদের অবস্থা খুব সচ্ছল হলেও বড্ডো কৃপণ,—নাকি পিঁপড়ে চিপে গুড় বের করে। তাই বড় দুঃখ আর ভয়ে আমার বুক দুরুদুরু করছে। বানরের গলায় মুক্তোর মালার মতো ও হতচ্ছাড়ি কার কপালে পড়ে, কে জানে ! গরিব ঘরের মেয়ে হলেও সে আশরাফ ঘরের—তাতে অনিন্দ্যসুন্দরী, ডানাকাটা পরি বললেই হয়,—তার ওপর মেয়েদের যে সব গুণ থাকা দরকার, খোদা তাকে প্রায় সমস্তই ডালি ভরে দিয়েছেন। আমিও তাকে সাধ্যমতো লেখাপড়া, বয়নাদি চারুশিল্প, উচ্চ শিক্ষা—সব শিখিয়েছি। কেন এত করেছিলাম ! আমার খুব আশা ছিল, তার রূপগুণের ফাঁদে পড়ে তোমার মতন সোনার হরিণও ধরা দেবে, তোমার এই লক্ষ্যহীন বিশৃঙ্খল বাঁধন-হারা জীবনের গতিও একটা শান্ত সুন্দরকে কেন্দ্র করে সহজ স্বচ্ছন্দ ছন্দে বয়ে যাবে,—পাশের মাঠে সবুজ শ্যামলতার সোনার স্মৃতি রেখে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, খোদা করেন আর ! কারুর দোষ নেই ভাই, দোষ ওরই পোড়াকপালের—আর সবচেয়ে বেশিদোষ আমার।

মানুষ শেখে দেখে, নয়তো ঠেকে। আমিও জীবনে মস্ত একটা ভুল করতে গিয়ে দস্তুরমতো শিক্ষা পেলাম। নানান দেশের নানান রকমের গল্প উপন্যাস পড়ে আমার একটা গর্ব হয়েছিল যে,লোক-চরিত্র বুঝবার আমার অগাধ ক্ষমতা, কিন্তু আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে গেল।

যাক, তোমায় অনেক বকলাম ঝকলাম, অনেক উপদেশ দিলাম, অনেক আঘাত করলাম, তাই শেষে একটা খোশখবর, দিচ্ছি, অবশ্যি সেটার সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যায়নি, তবে কথায় আছে, 'খোশ-খবর কা ঝুটা ভি আচ্ছা !' কথাটা আর কিছু নয়,—আমার হাড়-জ্বালানে ননদিনী শ্রীমতী সোফিয়া খাতুনের বিয়ে—বিয়ে ! বিয়ে ! আমার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভবদীয় সখা, শ্রীমান মনুয়রের সঙ্গে। বুঝেছ? মনুর বি.এ. পরীক্ষার ফলটা বেরুলেই শুভ কাজটা শিগগীর শিগগীর শেষ করে দেবো মনে করছি। এবার মনুর দু-দুটা বি.এ. পাশ। কথাটা হঠাৎ হলো ভেবে তুমি হয়তো অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু ওতে অবাক হবার কিছুই নেই, অনেকদিন থেকেই ওটা আমরা ভিতরে ভিতরে সমাধান করে রেখেছিলাম এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ সতর্ক হয়েছিলাম যাতে কথাটা তোমাদের দুই ফাজিলের একজনেরও কানে গিয়ে না ঢোকে। কারণ তুমি আর মনু এই দুটি বন্ধুতেই এত বেশি বেয়াদব আর 'চেবেল্লা' হয়ে পড়েছিলে যে, অনেকে তোমাদের শয়তানের ভাইরা-ভাই বলতেও কসুর করত না। এই বিয়ের কথাটা তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে তোমরা যে প্রকাশ্যেই ঐ কথাটা নিয়ে বিষম আন্দোলন আলোচনা লাগিয়ে দিতে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আগে নাকি ছেলেরা মুরুব্বিদের সামনে বিয়ের কথা নিয়ে কখনও 'টু' পর্যন্ত করতে সাহস করত না, কিন্তু আজকালকার দু'পাতা 'ইঞ্জিরি'-পড়া ইঁচড়ে পাকা ডেঁপো ছেলেরা গুরুজনের নাকের সামনে তাদের ভাবী অর্ধাঙ্গিণীর রূপ-গুণ সম্বন্ধে বেহায়ার মতো কাঁকাল 'কোমর' বেঁধে তর্ক জুড়ে দেয়—এই হচ্ছে প্রাচীন-প্রাচীনাদের মত। ছিঃ মা, কি লজ্জা !

সোফিয়ার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সে বোধ হয় আজকাল দর্শন পড়ছে কিংবা অন্য কিছুতে (?) পড়েছে। কেননা সে দিন দিন যেন কেমন একরকম উন্মনা হয়ে পড়ছে। তোমার দেওয়া 'উচ্ছল জলদল কলরব' ভাবটা তার আজকাল একেবারে নেই। সে প্রায়ই গুরু-গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবে—আর ভাবে ! তবে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, এই যা ভরসা। কেননা মেয়েরা অনেকেই বিয়ের আগে ও-রকম একটু মন উড়ু উড়ু ভাব দেখিয়ে থাকেন, এ আমাদের স্ত্রী-অভিজ্ঞতার বাণী। বিয়ের মাদকতা কি কম রে ভাই ! হতভাগা তুমিই কেবল এ রসে বঞ্চিত রইলে ! তাছাড়া দু'দিন বাদে যাকে দস্তুরমতো গিন্নিপনা করতে হবে, আগে হতেই তাকে এরকম গ্রাম্ভারি চালে ভবিষ্যতের একটা খসড়া চিন্তা করতে দেখে হাসা বা বিদ্রূপ করা অন্যায়,—বরং দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করাই ন্যায়-সঙ্গত।

সোফিয়াকে সেদিন তোমায় চিঠি দেবার জন্যে বলতে গিয়ে তো অপ্রতিভের শেষ হতে হয়েছে আমায় ! আমার প্রস্তাবটা শুনে সে নাক সিঁটিকিয়ে—একটা বিচিত্র রকমের অঙ্গভঙ্গি করে—মুখের সামনে মেম-সাহেবদের মতো চার-পাঁচ পাক ফর-ফর করে ঘুরে-দুই হাত নানা ভঙ্গিতে আমার নাকের সামনে নাচিয়ে একেবারে মুখ ভ্যাঙচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'আমার এত দায় ফাঁদে নি—গরজ পড়েনি লোককে খোশামুদি করে চিঠি দেবার !' আমি তো একেবারে 'থ' ! কথাটা কি জানো !—সে বড্ডো বেশি অভিমানী কিনা, তাই এতটুকুতেই রেগে ট্যাসকণার মতো 'ট্যা, 'ট্যা' করে ওঠে। তুমি সবাইকে চিঠি দিয়েছ আর তাকেই দাওনি, এবং নাকি নেহায়েৎ বেহায়াপনা করে তার ভাইকে তার বিয়ে না ছাই-পাঁশ সম্বন্ধে কি লিখেছ, এই হয়েছে তার রাগের আসল কারণ। তুমি এখানে থাকলে হয়তো সে রীতিমতো একটা কোঁদল পাকিয়ে বসত, কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখেই সে ভিতরে ভিতরে রাগে এমন গস্ গস্ করছে। এ সকলের

সঙ্গে তার আরও কৈফিয়ত এই যে, তার হাতের লেখা নাকি এতই বিশ্রী এবং বিদ্যাবুদ্ধি এতই কম যে তোমার মতো পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধুরন্ধর ব্যক্তির নিকট তা নিয়ে উপহাসাস্পদ হতে সে নিতান্তই নারাজ ! এ-সব তো আছেই, অধিকন্তু তার মেজাজটা নাকি আজকাল বহাল খোশ-তবিয়তে নেই—অবশ্য আমার মতো ছেঁদো, ছোট, বেহায়া লোকের কাছে কৈফিয়ত দিলে তার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগবে বলে সে মনে করে ! য়্যা আল্লাহ্ !—কি আর করি ভাই ! নাচার ! ! আমি ভাল করেই জানি যে, এর ওপর আর একটি কথা বললেই লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে ; আমার চুল ছিঁড়ে, নুচে, খামচিয়ে, কামড়িয়ে গায়ে থুথু দিয়ে আমাকে এমন জব্দ আর বিব্রত করে ফেলবে যে তাতে আমি কেন, পাথরের মূর্তিরও বিচলিত হবার কথা !

বাপরে বাপ ! যে জবরদস্ত জালিম জাহাঁবাজ মেয়ে !—আমার তো ভয় হচ্ছে, মনু ওকে সামলাতে পারলে হয়।

অনেক লেখা হলো। মেয়েদের এই বেশি বকা, বেশি লেখা প্রভৃতি কতকগুলো বাহুল্য জিনিস স্বয়ং ব্রহ্মাও নিরাকরণ করতে পারবেন না। আমরা মেয়েমানুষ সব যেন কলের জল বা জলের কল। একবার খুলে দিলেই হলো।

* * *

যাক, যা হবার ছিল, হয়েছে। এখন খোদা তোমায় বিজয়ী বীরের বেশে ফিরিয়ে আনুন, এই আমাদের দিন-রাত্তির খোদার কাছে মুনাজাত। যে মহাপ্রাণ অদম্য উৎসাহ আর অসম সাহসিকতা নিয়ে তরুণ যুবা তোমরা সবুজ বুকের তাজা খুন দিয়ে বীরের মতো স্বদেশের মঙ্গল সাধন করতে, দুর্নাম দূর করতে ছুটে গিয়েছ, তা হেরেমের পুরস্ত্রী হলেও আমাদের মতো অনেক শিক্ষিতা ভগিনীই বোঝেন, তাই আজ অনেক অপরিচিতার অশ্রু তোমাদের জন্যে ঝরছে। এটা মনে রেখো যে, পৌরুষ আর বীরত্ব সব দেশেরই মেয়েদের মস্ত প্রশংসার জিনিস, সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষের ঐ গুণটিই আমাদের বেশি আকর্ষণ করে !—অন্ধ স্নেহ-মমতা বড় কষ্ট দিলেও দেশমাতার ভৈরব আহ্বানে তাঁর পবিত্র বেদির সামনে এই যে তুমি হাসতে হাসতে তোমার কাঁচা, আশাআকাঙ্ক্ষায় প্রাণটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছ, এ গৌরব রাখবার ঠাঁই যে আমাদের ছোট বুকে পাচ্ছিনে ভাই ! আজ আমাদের এক চক্ষু দিয়ে অশ্রুজল আর অন্য চক্ষু দিয়ে গৌরবের ভাস্বর জ্যোতি নির্গত হচ্ছে।

খোদার 'রহম' ঢাল হয়ে তোমায় সকল বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করুক, এই আমার প্রাণের শেষ শ্রেষ্ঠ আশিস।

এখন আসি ভাই। খুকি ঘুম থেকেই উঠে কাঁদছে !—শিগগির উত্তর দিয়ো। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভাবী
রাবেয়া

[ঘ]

শাহ্‌পুর
১০ই ফাল্গুন,
(নিঝুম রাত্তির)

ভাই সোফি !

অভিমানিনী, তুমি হয়তো এতদিনে আমার ওপর রাগ করে ভুরু কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে, গুম্ হয়ে বসে আছ ! কারণ আমি আসবার দিনে তোমার মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলাম যে, গিয়েই চিঠি দেবো ; আমার এত বড় একটা চুক্তির কথা আমি ভুলিনি ভাই, কিন্তু নানান কারণে, বারো জঞ্জালে পড়ে আমায় এ–রকমভাবে খেলো হয়ে পড়তে হলো তোমার কাছে। সোজাভাবেই সব কথা বলি—এখানে পৌঁছেই বোন, আমার যত কিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেছে, কি এক বুক অসোয়াস্তি যেন বেরোবার পথ না পেয়ে শুধু বুক–জোড়া পাঁজরের প্রাচীরে ঘা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কদিন থেকে মাথাটা বোঁ–বোঁ করে ঘুরছে আর মনে হচ্ছে, সেই সঙ্গে যেন দুনিয়ার যত কিছু আমার দিকে তাকিয়ে কেমন একরকম কান্না কাঁদছে, আর সেই অকরুণ কান্নার যতি মাঝে মাঝে একটা নির্মম জিনের কাঠ–চোটা বিকট হাসি উঠছে হো—হো—হো ! সামনে তার নিঝুম গোরস্থানের মতো 'সুম–সাম' হয়ে পড়ে রয়েছে আমাদের পোড়ো–বাড়িটা। তারই জীর্ণ দেওয়ালে অন্ধকারের চেয়েও কালো একটা দাঁড়কাক বীভৎস গলাভাঙা স্বরে কাৎরাচ্ছে, 'খাঁ—আঃ !—আঃ— !' দুপুর রোদ্দুরকে ব্যথিয়ে ব্যথিয়ে তারই পাশের বাজ–পড়া অশত্থ গাছটায় একটা ঘুঘু করুণ কণ্ঠে কূজন কান্না কাঁদছে, 'এস খুকু—উ—উঃ !' বাদলের জুলুমে আমাদের অনেক দিনের অনেক স্মৃতি–বিজড়িত মাটির ঘরটা গলে গলে পড়ছে,—দেখতে দেখতে সেটা একটা নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেল—চারি ধারে তার তেশিরে কাঁটা, মাঝে চিড়চিড়ে, আকন্দ, বোয়ান এবং আরো কত কাঁটাগুল্মের ঝোপ–ঝাড়, তাদের আশ্রয় করে ঘর বেঁধেছে বিছে, কেউটে সাপ, শিয়াল, খটাস,—ওঃ, আমার মাথা ঘুরছে, আর ভাবতে পারছিনে। ... যখন মাথাটা বড্ডো দপদপ করতে থাকে আর তারই সঙ্গে এই বীরভূমের একচেটে করে–নেওয়া 'মেলেরে' জ্বর (ম্যালেরিয়ার আমি এই বাংলা নাম দিচ্ছি !) হু–হু করে আসে, তখন ঠিক এই রকমের সব হাজার এলোমেলো বিশ্রী চিন্তা ছায়াচিত্রের মতো একটার পর একটা মনের ওপর দিয়ে চলে যায়। আজ তাই ভাই সোফিয়া রে ! বড় দুঃখেই বাবাজিকে মনে করে শুধু কাঁদছি—আর কাঁদছি ; খোদা যদি, অমন করে, তাঁকে আমাদের মস্ত দুর্দিনের দিনে ওপরে ডেকে না নিতেন, তাহলে কি আজ আমাদের এমন করে বাপ–দাদার ভিটে ছেড়ে পরের গলগ্রহ হয়ে 'অন্‌হেলা'র ভাত গিলতে হতো বোন ? আজ এই নিশীথ–রাতে স্তব্ধ মৌন–প্রকৃতির বুকে একা জেগে আমি তাই খোদাকে জিজ্ঞাসা করছি—নিঃসহায় বিহগ–শাবকের ছোট্ট নীড়খানি দুরন্ত বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর কি লাভ ? পাক তিনি, তবে একি পৈশাচিক আনন্দ রয়েছে তাঁতে ? হায় বোন, কে বলে দেবে সে কথা ?

তুই হয়তো আমার এ-সব 'পাকামো' 'বুড়োমি' শুনে ঝঙ্কার দিয়ে উঠবি, 'মাগো মা! এত কথাও আসে এই পনেরো ষোলো বছুরে ছুঁড়ির! যেন সাতকালের বুড়ি আর কি?' কিন্তু ভাই, যাদের ছেলেবেলা হতেই দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ হতে হয়, যাদের জন্ম হতেই টাল খেয়ে খেয়ে চোট খেয়ে খেয়ে বড় হতে হয়, তারা এই বয়সেই এতটা বেশি গম্ভীর আর ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে যে, অনেকের চোখে সেটা একটা অস্বাভাবিক রকমের বাড়াবাড়ি বলেই দেখায়। অতএব যে জিনিসটা জীবনের ভেতর দিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করিসনি, সেটাকে সমালোচনা করতে যাসনে যেন। যাক ওসব কথা।—

মা তাঁর বাপের বাড়ি বলে এখানে এসে এখন নতুন নতুন বেশ খুশিতেই আছেন। আমি জানি, তাঁর এ হাসি-খুশি বেশিদিন টিকবে না। তবুও কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না। আমার মনে সুখ নেই বলে অন্যকেও কেন তার ভাগী করব? তাছাড়া চির-দুঃখিনী মা আমার যদি তাঁর শোকসন্তপ্ত প্রাণে একটুখানি পাওয়া সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ শুধু একটুক্ষণের জন্যেও পান, তবে তাঁর মেয়ে হয়ে কোন প্রাণে তাঁকে সে আনন্দ হতে বঞ্চিত করব? এ-ভুল তো দু'দিন পরে ভাঙবেই আপনি হতে!—আর এক কথা, মায়ের খুশি হবার অধিকার আছে এখানে, কেননা এটা তাঁর বাপের বাড়ি। আর তারই উল্টো কারণে হয়েছে আমার মনে কষ্ট। অবশ্য আমিও নতুন জায়গায় (তাতে মামার বাড়ি) আসার ক্ষণিক আনন্দ প্রথম দু-একদিন অন্তরে অনুভব করেছিলাম, কিন্তু ক্রমেই এখন সে আনন্দের তীব্রতা কর্পূরের উবে যাওয়ার মতো বড় সত্বরই উবে যাচ্ছে। হোক না মামার বাড়ি, তাই বলে যে সেখানে বাবার বাড়ির মতো দাবি-দাওয়া চলবে, এতো হতে পারে না। মানি, মামার বাড়ি ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয় আর লোভনীয় স্থান, কিন্তু যদি স্রেফ দু-চার দিনের মেহ্মান হয়ে শুভ পদার্পণ হয় সেখানে। যাঁরা মামার বাড়িতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে বা একটু বেশিদিনের জন্যে থেকেছেন, তাঁরাই একথার সারবত্তা বুঝতে পারবেন। অতিথি স্বরূপ দু-একদিন থেকে যাওয়াই সঙ্গত কুটুম বাড়িতে। আমি এখানে অতিথি মানে বুঝি যাঁদের স্থিতি বড় জোর এক তিথির বেশি হয় না। যিনি অতিথির এই বাক্যগত অর্থের প্রতি সম্মান না রেখে শার্দূলের লুব্ধা মাতৃস্বসার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-তিথি। আর, তাঁর ভাগ্যে সম্মানও ঐ বাঘের মাসি বিড়ালের মতো চাটু আর হাতার বাড়ি, চেলাকাঠের ধুমসুনি! এঁরাই আবার অর্ধচন্দ্র পেয়ে চৌকাঠের বাইরে এসে, আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি দেখিয়ে বেইজ্জতির ওজুহাতে চক্ষু দুটো উষ্ণ কটাহের মতো গরম করে গৃহস্বামীর ছোটলোকত্বের কথা তারস্বরে যুক্তিপ্রমাণসহ দেখাতে থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জতের কান্নাও কাঁদেন। আহা! লজ্জা করে না এসব বেহায়াদের? এ যেন 'চুরি কে চুরি উল্টো সিনাজুরি!' থাক এ-সব পরের 'নিন্দে'-চর্চা, এখন বুঝলি, মেয়েদের এই 'ধান-ভানতে শিবের গীত'—এক কথা বলতে গিয়ে আরো সাত কথার অবতারণা করা আর গেল না। কথায় বলে 'খস্লৎ যায় মলে।'—আমি বলছিলাম যে, আমার মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কেউ যদি মামাদের ঘাড়ে ভর করে এসে বসে, তবে সেখানে সে বেচারির আব্দার তো চলেই না, স্নেহ-আদরের ও দাবি-দাওয়ার

একটা সপ্রতিভ অসঙ্কোচ আর্জিও পেশ করা যায় না। একটা বিষম সঙ্কোচ, অপ্রতিভ হওয়ার ভয়, সেখানে কালো মেঘের মতো এসে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। যার ভেতরে এতটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে সে কখনও এরকমভাবে ছোট আর অপমানিত হতে যাবে না! ঐ কি বলে না, 'আপনার ভিটেয় কুকুর রাজা।' কুকুরের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যত বড়ই শত্রু হোক আর পেছন দিকে হাঁটবার সময় নেজুড় যতই কেন নিভৃততম স্থানে সংলগ্ন করুক, যদি একবার যো-সো করে নিজের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবে আর যায় কোথা! আরে বাপরে বাপ। অমনি তখন তার বুক সাহসের চোটে দশ হাত ফুলে ওঠে। তাই তখন সে তার নেজুড় যতদূর সম্ভব খাড়া করে আমাদের বাঙালি পুরুষ পুঙ্গবদেরই মতো তারস্বরে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকে কিন্তু সেই এটাও অবশ্যস্বীকার্য যে, এমন বীরত্ব দেখাবার সময়ও অন্তত অর্ধেক শরীর তার দোরের ভিতর দিকেই থাকে আর ঘন ঘন দেখতে থাকে যে, তাড়া করলে 'খেঁচে হাওয়া' দেবার মতো লাইন ক্লিয়ার আছে কিনা। এই সারমেয় গোষ্ঠীর মতো আমাদের দেশের পুরুষদেরও এখন দু'টি মাত্র অস্ত্র আছে, সে হচ্ছে ষাঁড়-বিনিন্দিত কণ্ঠের গগনভেদী চিৎকার আর মুলা-বিনিন্দিত বড় বড় দন্তের পূর্ণ বিকাশ আর খিচুনি! তাই আমরা আজো মাত্র দুই জায়গায় বাঙালির বীরত্বের চরম বিকাশ দেখতে পাই; এক হচ্ছে, যখন এঁরা যাত্রার দলে ভীম সাজেন, আর দুই হচ্ছে, যখন এঁরা অন্দর মহলে এসে স্ত্রীকে ধুমসুনি দেন। হাঁ—হাঁ, আর এক জায়গায়,—যখন এঁরা মাইকেলি ছন্দ আওড়ান! ... আর এঁরা এসব যে করতে পারেন, তার একমাত্র কারণ, তাঁদের সে সময় মস্ত একটা সান্ত্বনা থাকে যে, যতই করি না কেন, এ হচ্ছে 'হামারা আপ্না ঘর!'

এইখানে আর একটা কথা বলে রাখি ভাই। আমার চিঠিতে এই যে কর্কশ নির্মম রসিকতা আর হৃদয়হীন শ্লেষের ছাপ রয়েছে, এর জন্যে আমায় গালাগালি করিসনে যেন। আমার মন এখন বড় তিক্ত—বড় নীরস—শুষ্ক। সেই সঙ্গে অব্যক্ত একটা ব্যথায় জান শুধু ছটফট করছে। আর কাজেই আমার অন্তরের সেই নীরস তিক্ত ভাবটার ও হৃদয়হীন ব্যথার ছটফটানির ছোপ আমার লেখাতে ফুটে উঠবেই উঠবে—যতই চেষ্টা করি না কেন, সেটাকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারব না। এরকম সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এই দ্যাখ না, আমার মনে যখন যে ভাব আসছে বিনা দ্বিধায় অনবরত লিখে চলেছি,—কোথায়ও সংযম নেই, বাঁধন নেই, শৃঙ্খলা—'সিজিল' কিচ্ছু নেই,—মন এতই অস্থির, মন এখন এতই গোলমেলে।

হাঁ, মামার বাড়ির সকলে যেই জানতে পেরেছে যে, আমরা খাস-দখল নিয়ে তাঁদের-বাড়ি উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো জড় গেড়ে বসেছি, অমনি তাঁদের আদর-আপ্যায়নের তোড় দস্তুরমতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! এটাই স্বাভাবিক। নতুন পাওয়ার আনন্দটা, নতুন পাওয়া জিনিসের আদর তত বেশি নিবিড় হয়, সেটা যত কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। কারণ, নতুন ও হঠাৎ-পাওয়া আনন্দেরও একটা পরিমাণ আছে, আর সেই পরিমাণের তীব্রতাটা জিনিসের স্থিতির কালানুযায়ী কম-বেশি হয়ে থাকে। যেটার স্থিতিকাল মাত্র একদিন, সে ঐ আনন্দের সমগ্র তীব্রতা ও উষ্ণতা একদিনেই পায়। যেটা

দশদিন স্থায়ী, সে ঐ সমগ্র আনন্দটা দশদিনে একটু একটু করে পায়। আমি এখন এই কথাটার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কারণ, অন্য সময় যখন এখানে এসেছি, তখন এই বাড়ির সকলে উন্মুখ হয়ে থাকত কিসে আমাদের খুশি রাখবে, দিন-রাত ধরে এত বেশি আদর-সোহাগ ঠেসে দিত যে, তার কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকবার জো ছিল না। তাই তখন মামার বাড়ির নাম শুনলে আনন্দে নেচে উঠতাম। এখানে এসে দুদিন পরে এখানটা ছেড়ে যেতেও কষ্ট হত ! মামানি, নানি, মামু, খালাদের কোল থেকে নামতে পেতাম না। গায়ে একটু আঁচড় লাগলে অন্তত বিশ গণ্ডা মুখে জোর সহানুভূতির 'আহারে ! ছেলে খুন হয়ে গেল !' ইত্যাদি কথা উচ্চারণ হত। তাই বলে মনে করিস নে যেন যে, আজো আমি তেমনি করে কোলে চড়ে বেড়াবার জন্যে উস্‌খুস করছি, এখন আমি আর সে কচি খুকি নই। এখানকার মেয়েমহলের মতে—একটা মস্ত থুবড়ো ধাড়ি মেয়ে ! এই রকম কত যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয় দিনের মাথায়, তার আর সংখ্যা নেই। আর, যেখানকার পৌনে ষোল আনা লোকের মুখে-চোখে একটা স্পষ্ট চাপা বিরক্তির ছাপ নানান কথায় কাজের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেখানে নিজেকে কতটুকু ছোট করে রাখতে হয়, জানটা কি রকম হাঁপিয়ে ওঠে সেখানে, ভাব দেখি ! এই উপেক্ষার রাজভোগের চেয়ে যে ঘরের মাড়ভাত ভালো বোন ! মামুজিরা আমায় খুবই স্নেহ করেন, কিন্তু তাঁরা তো দিন-রাত্তির ঘরের কোণে বসে থাকেন না যে সব কথা শুনবেন। আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের ! তার ওপর আবার এক এক জনের চাল এক এক রকমের। কেউ যান ছার্তকে, কেউ যান কদমে, কেউ যান দুলকি চালে। কথায় কথায় টিপ্পনি, কিন্তু মামুজিদের ঘরে দেখলেই আমাদের প্রতি তাঁদের নাড়ির টান ভয়ানক রকমের বেড়ে ওঠে, আমাদের পোড়া কপালের সমবেদনায় পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বা উনুনে কাঁচা কাঠ দিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদেন ! মামুজিরা বাইরে গেলেই আবার মনের ঝাল ঝেড়ে পূর্বের ব্যবহারের সুদশুদ্ধ আদায় করে নেন। আমি তো ভাই ভয়েই শশব্যস্ত। তাঁদের এক একটা চাউনিতে যেন আমার এক এক চুম্বন রক্ত শুকিয়ে যায়। দু-এক সময় মনে হয়, আর বরদাস্ত করতে পারিনে, সকল কথা খুলে বলি মামুজিদের, তারপর আমাদের সেই ভাঙা কুঁড়েতেই ফিরে যাই। কিন্তু এতটুকু টু শব্দ করলেই অমনি রঙ-বেরঙের গলায় মিঠেকড়া প্রতিবাদ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। ঘরের আণ্ডাবাচ্চা মায় বাড়ির ঝি পুঁটি বাগদি পর্যন্ত তখন আমার ওপর টীকা-টিপ্পনির বাণ বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন। এঁদের সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, থুবড়ো আইবুড়ো মেয়ের সাত চড়ে রা বেরোবে না, কায়াটি তো নয়ই, ছায়াটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না, গলার আওয়াজ টেলিফোন যন্ত্রের মতো হবে, কেবল যাকে বলবে সেই শুনতে পাবে,—বাস্ ! খুব একটা বুড়োটে ধরনের মিচকেমারা গম্ভীর হয়ে পড়তে হবে, থুবড়ো মেয়ে দাঁত বের করে হাসলে নাকি কাপাস মহার্ঘ হয় ! কোন অলঙ্কার তো নয়ই, কোন ভালো জিনিসও ব্যবহার করতে বা ছুঁতেও পাবে না, তাহলে যে বিয়ের সময় একদম 'ছিরি' (শ্রী) উঠবে না। ঘরের নিভৃততম কোণে ন্যাড়া বোঁচা জড়-পুঁটুলি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে চুপসে বসে থাক !—এই রকম সে কত কথা ভাই, ওসব বারো 'ভজকট' আমার ছাই মনেও থাকে না আর শুনতে

শুনতে কানও ভোঁতা হয়ে গেছে। 'কান করেছি ঢোল, কত বোলবি বোল !' তাছাড়া একথা অন্যকে বলেই বা কি হবে? কেই বা শুনবে আর কারই বা মাথা ব্যথা হয়েছে আমাদের পোড়াকপালিদের কথা শুনতে ! খোদা আমাদের মেয়ে জাতটাকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেই পাঠিয়েছেন, আমাদের হাত-পা যেন পিঠমোড়া করে বাঁধা, নিজে কিছু বলবার বা কইবার হুকুম নেই। খোদা-না-খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি ! কাজেই, আছে আমাদের শুধু অদৃষ্টবাদ, সব দোষ চাপাই নন্দ-ঘোষস্বরূপ অদৃষ্টেরই ওপর ! সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো মামুলি কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বেচারা নিজেই আজ তক অ-দৃষ্ট ! ... আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণ ধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি ! আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মতো কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায় এখনো,—কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিণ্ড। ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম। বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তকনাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসীবৃত্তিই করে আসছি, কারণ হজরত আদমের বাম পায়ের হাড্ডি হতে প্রথম মেয়ের উৎপত্তি। বাপরে বাপ ! আজ সেই কথা টলবে? এসব কথা মুখে আনলেও নাকি জিভ খসে পড়ে। কোন্ কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষদের পায়ের নিচে বেহেশ্‌তে, আর সেসব কেতাব ও আইন-কানুনের রচয়িতা পুরুষ ! ... দুনিয়ার কোনো ধর্মই আমাদের মত নারী জাতিকে এতটা শ্রদ্ধা দেখায়নি, এত উচ্চ আসনও দেয়নি, কিন্তু এদেশের দেখাদেখি আমাদের রীতি-নীতিও ভয়ানক সঙ্কীর্ণতা আর গোঁড়ামি-ভণ্ডামিতে ভরে উঠেছে। হাতে কলমে না করে শুধু শাস্ত্রের দোহাই পাড়লেই কি সব হয়ে গেল?

আর শুধু পুরুষদের বা বলি কেন, আমাদের মেয়েজাতটাও নেহাৎ ছোট হয়ে গেছে, এদের মন আবার আরো হাজার কেসেমের বেখাপ্পা বেয়াড়া আচার-বিচারে ভরা, যার কোনো মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই ! এই ধর না এই বাড়িরই কথা। ভয়ানক অন্যায় আর অত্যাচার যেটা, চির অভ্যাস মতো সেটার বিরুদ্ধে একটু উচ্চবাচ্য করতে গেলেই ওম্‌নি গুষ্টিশুদ্ধ মেয়ের দঙ্গল আমার ওপর 'মারমূর্তি' হয়ে উঠবে আর গলা ফেড়ে চেঁচিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলবে 'মাগো মা, মেয়ে নয় যেন সিঙ্গিচড়া ধিঙ্গি ! এ যে জাঁদরেল জাহাঁবাজ মরদের কাঁধে চড়ে যায় মা ! আমরা তো দেখে আসছি, সাত চড়ে থুবড়ো মেয়ের রা বেরোয় না, আর আজকালকার এই কলিকালের কচি ছুঁড়িগুলো—যাদের মুখ টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, তাদের কিনা সব তাতেই মোড়লি সাওকুড়ি আবার মুখের ওপর চোপা। মুখ ধরে পুয়ে মাছের মতো রগড়ে দিতে হয়, তবে না থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যায় ! আমাদেরও বয়েস ছিল গো, আজ হয়তো বুড়ি হয়েচি,—কই বলুক তো কে বাপের বেটি আছে,—ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে ! তাতে আর কাজ নেই ! একটু জোরে কাশলেও যেন শরমে মরমে মরে যেতাম, আর এখনকার 'খলিফা' মেয়েদের কথায় কথায় ফোঁপরদালালি,—যেন, অজবুড়ি ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !' ... সময় কাটবে বলে ভাবিজির কাছ হতে দু-চারটে বই আর মাসিকপত্র সঙ্গে এনেছি, এই না দেখে এরা তো আর বাঁচে না ! গালে হাত দিয়ে কত রকমেরই না অঙ্গভঙ্গি করে

জানায় যে, রোজকেয়ামত এইবারে একদম নিকটে! একটু পড়তে বসলে চারিদিক থেকে ছেলেমেয়ে বুড়িরা সব উঁকি মেরে দেখবে আর ফিসফিস করে কত কি যে বলবে তার ইয়ত্তা নেই। আমি নাকি আমার বিদ্যে জাহির করতে তাদের দেখিয়ে বই পড়ি, তাই তারা রটনা করেছে যে, আমি দু-দিন বাদে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাছা মেরে জজ ম্যাজিস্টর হয়ে য়্যা চেয়ারে বসব গিয়ে! আমি তো এদের বলবার ধরন দেখে আর হেসে বাঁচিনে! মেয়েদের চিঠি লেখা শুনলে তো এরা যেন আকাশ থেকে পড়ে। মাত্র নাকি এই কলিকাল, এঁরা বেঁচে থাকলে কালে আরো কত কি তাজ্জব ব্যাপার চাক্ষুষ দেখবেন! তবে এরা যে আর বেশিদিন বাঁচবেন না, এই একটা মস্ত সান্ত্বনার কথা! আমাদের এই ধিঙ্গি মেমগুলোই নাকি এদের জাতের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে; এইসব ভেবে ভেবে ওদের রাত্তির বেলায় ভালো করে নিদ্ হয় না, আর তারই জন্যে তাদের অনেকেই চোখে 'গোগাল' পরে গেছে! ... এই রকম সব অফুরন্ত মজার কথা—সেসব লিখতে গেলে আর একটা 'গাজি মিঞার বস্তানি' বা মধু মিঞার দফ্তর হয়ে যাবে। তবু এতগুলো কথা তোকে জানিয়ে আমি আমার মনটা অনেক হালকা করে নিলাম। আমার শুধু ইচ্ছে করছে, তোর সঙ্গে বসে তিনদিন ধরে এদের আরো কত কি মজার গল্প নিয়ে আলোচনা করি, তবে আমার সাধ মেটে! তাই যা মনে আসছে, যতক্ষণ পারি লিখে যাই তো? কেননা, জানি না আবার কখন কতদিন পরে এঁদের চক্ষু এড়িয়ে তোকে চিঠি লিখতে পারব। এখনও মনের মাঝে আমার লাখো কথা জমে রইল। ডাকে চিঠি দিলাম না, তাহলে তো লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেত! তাই এই পত্রবাহিকা এলোকেশী বাগদির মারফতেই খুব চুপি চুপি চিঠিটা পাঠালাম। আমাদের গাঁয়ের ও-পাড়ার মাল্‌কা বিবিকে মনে আছে তোর? ইনি সেই পাড়া-কুঁদুলি মাল্‌কা, যিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মেয়েদের সাথে ছেলেবেলায় কোঁদল করে বেড়াতেন। আমার এক মামাতো ভাইয়ের সাথে এঁর বিয়ে হয়েছে, তুই তো সব জানিস। এর ভাইয়ের নাকি বড্ডো ব্যামো, তাই এলোকেশী ঝিকে খবর নিতে পাঠাচ্ছেন। তাঁকে বলেই এই চিঠিটা এমন লুকিয়ে পাঠাতে পারলাম! মাল্‌কা প্রায়ই আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে, আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বেচারি এখন বড্ডো শায়েস্তা হয়ে গেছে। তার মস্ত বড় সংসারের মস্ত ভার ঐ বেচারির একা ঘাড়ে.. চিঠিটা যত বড়ই হোক না কেন, আমি আজ আমার জমানো সব কথা জানিয়ে তবে ছাড়ব। দশ ফর্দ চিঠি দেখে হাসিসনে, বা ফেলে দিসনে যেন। এই চিঠি লিখতে বসে আর লিখে কি যে আরাম পাচ্ছি, সে আর কি বলব! আমার মনের চক্ষে এখন তোর মূর্তিটি ঠিক ঠিক ভেসে উঠছে।

সত্যি বলতে কি ভাই,—রাত্তির-দিন এই দাঁত-খিচুনি আর চিবিয়ে চিবিয়ে গঞ্জনা দেখে শুনে এই সোজা লোকগুলোর ওপর বিরক্তি আসে বটে, তবে ঘেন্না ধরেনি। এদের দেখে মানুষের দয়া হওয়াই উচিত! এর জন্য দায়ী কে?—পুরুষরাই তো আমাদের মধ্যে এইসব সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই আমাদের ভেতর যিনি এইসব পুরুষদের বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা অসূর্যম্পশ্যা বা হেরেম-জেলের বন্দিনী হলেও নিতান্ত চোর-দায়ে ধরা পড়ি নি। অন্তত পর্দার ভিতরেও একটু নড়েচড়ে

বেড়াবার দখল হতে খারিজ হয়ে যাইনি। আমাদেরও শরীর রক্ত-মাংসে গড়া ; আমাদের অনুভব শক্তি, প্রাণ, আত্মা সব আছে। আর তা বিলকুল ভোঁতা হয়ে যায়নি। আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্ছেন, কিন্তু আমি একে উচ্চ শিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখছেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। কেননা, এঁরা যত শিক্ষিত হচ্ছেন, ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখছেন, আমাদের মেয়ে জাতের ওপর দিন দিন তাঁদের রোখ চড়ে যাচ্ছে। তাঁরা মহিষের মতো গোঙানি আরম্ভ করে দিলেও কোনো কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ে, তাহলে তারা প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন। ওঁদের যে সাত খুন মাফ ! হায় ! কে বলে দেবে এদের যে, আমাদেরও স্বাধীনভাবে দুটো কথা বলবার ইচ্ছে হয় আর অধিকারও আছে, আমরাও ভালমন্দ বিচার করতে পারি। অবশ্য, অন্যান্য দেশের মেয়ে বা মেমসাহেবদের মতো মর্দানা লেবাস পরে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়াতে চাইনে বা হাজার হাজার লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে গলাবাজিও করতে রাজি নই, আমরা চাই আমাদের এই তোমাদের গড়া খাঁচার মধ্যেই একটু সোয়াস্তির সঙ্গে বেড়াতে-চেড়াতে ; যা নিতান্ত অন্যায়, যা তোমরা শুধু খামখেয়ালির বশবর্তী হয়ে করে থাক সেইগুলো থেকে রেহাই পেতে ! এতে তোমাদের দাড়ি হাসবে না বা মান-ইজ্জতও খোওয়া যাবে না, আর সেই সঙ্গে আমরাও একটু মুক্ত নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচবো, রাত্তির দিন নানান আগুনে সিদ্ধ আমাদের হাড়ে একটু বাতাস লাগবে ! তোমরা যে খাঁচায় পুরেও সন্তুষ্ট নও, তার ওপর আবার পায়ে হাতে গলায় শৃঙ্খল বেঁধে রেখেছ, টুঁটি টিপে ধরেছ,—থামাও, এ-সব জুলুম থামাও ! তোমরা একটু উদার হও, একটু মহত্ত্ব দেখাও,—এতদিনকার এইসব একচোখা অত্যাচারের সঙ্কীর্ণতার খেসারতে এই এক বিন্দু স্বাধীনতা দাও,—দেখবে আমরাই আবার তোমাদের নতুন শক্তি দেব, নতুন করে গড়ে তুলব। দেশকাল পাত্রভেদে যেটুকু দরকার, আমরা কেবল তাই-ই চাইছি, তার অধিক আমরা চাইবই বা কেন আর চাইলেই তোমরা দেবে কেন? ... যাক বোন, আমাদের এসব কথা নিয়ে, অধিকার নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে শেষে কি 'আয়রে বাঘ—না গলায় লাগ'-এর মত কোন সমাজপতির এজলাসে পেশ হব গিয়ে, অতএব এইখানেই এসব অবান্তর কথায় ধামাচাপা দিলাম।

আমার এইসব যা তা বাজে বকুনির মধ্যে বোধ হয় আমার মূল সূত্রটা ধরতে পেরেছিস। দিন-রাত্তির মনটা আমার খালি উড়ু উড়ু করছে অথচ মনের এ ভাব-গতিকের রীতিমতো কারণও খুঁজে পাচ্ছিনে। এমন একটা সময় আসে, যখন মনটা ভয়ানক অস্থির হয়ে ওঠে, —অথচ কেন যে অমন হয়, কিসের জন্যে তার সে ব্যথিত ছটফটানি, তা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, নিজেই ভালো করে বুঝে উঠা যায় না ! সে বেদনার কোথায় যেন তল, কোথায় যেন তার সীমা ! অবশ্য রেশ কাঁপছে তার মনে, কিন্তু সে-কোন চিরব্যথার অচিন-বন পেরিয়ে আসছে এ রেশ, আর কোন অনন্ত আদিম বিরহীর বীণের বেদনে ঝঙ্কার পেয়ে? হায়, তা কেউ জানে না ! অনুভব করবে কিন্তু প্রকাশ করতে পারবে না ! ... আমার এরকম মন খারাপ হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে

বলবে তুমি, কিন্তু ভাই, আমি যে-কোনো লোকের মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি যে, সেসব মামুলি ব্যথা-বেদনার জন্যে অন্তরে এমন দরদ আসতেই পারে না। এ যেন কেমন একটা মিশ্র বেদনা গোছের ; জানের আনচান ভাব, মরমের নিজস্ব মর্মব্যথা যা মনেরও অনেকটা অগোচর। একটা কথা আমি বলতে পারি ;—যিনি যতই মানব-চরিত্রের ঘুণ হন, তিনি নিশ্চয়ই নিজের মনকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেন না। স্রষ্টার এইখানেই মস্ত সৃজন-রহস্য ছাপানো রয়েছে। আর এ আমাদের মনের চিরন্তন দুর্বলতা,—একে এড়িয়ে চলা যায় না ! ... আহ্ আহ্ ! ! দাঁড়া বোন,—আবার আমার বুকে সে-কোন আমার চির-পরিচিত সাথীর তাড়িয়ে দেওয়া চপল-চারণের ছেঁড়া-স্মৃতি মনের বনে খাপছাড়া মেঘের মতো ভেসে উঠছে ! সে কোন অজানার কান্না আমার মরমে আর্ত প্রতিধ্বনি তুলছে ! দাঁড়া ভাই, একটু পানি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তবে লিখব ! কেন হয় ভাই এমন ? কেন বুকভরা অতৃপ্তির বিপুল কান্না আমার মাঝে এমন করে গুমরে ওঠে ? কেন ?—আঃ খোদা !

* * *

বাহারে ! চিঠিটা শেষ না করেই দেখছি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ..

হাঁ,—এখন, ভাবিজিকে বলিস যেন ও মাসের আর এ মাসের সমস্ত মাসিক পত্রিকাগুলো এরই হাতে পাঠিয়ে দেন। ভুললে চলবে না। আর, তাঁকে বলবি, যেন আমায় মনে করে চিঠি দেন। সকলকে চিঠি লিখবার সময় কই, আর সুবিধাই বা কোথা। নইলে সকলকে আলাদা আলাদা চিঠি দিতাম। তুই ওঁদের সব কথা বুঝিয়ে বলবি, যেন কেউ অভিমান না করেন। আমি কাউকে ভুলিনি। সবাই যেন আমায় চিঠি দেন কিন্তু—হে ! আমার মতন তাঁদের তো এরকম জিন্দান-কুঁয়ায় পড়ে থাকতে হয়নি ! কাজেই কারুর আর কোনো ওজর শুনছিনে। ভাবিজি, ভাইজি, মা, সবাই আমায় আর মনে করেন কি ?—তারপর, এসব তো হলো, এখনো যে আদত মানুষটিই বাকি। আমার পিয়ারের খুকুমণি 'আনারকলি'কেমন আছে। এখানে কোনো ছেলেমেয়ে দেখলেই আমার খুকুরানির কথা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখও ছলছল করে ওঠে ! আমার এই দুর্বলতায় আমার নিজের কত লজ্জা পায়। কারণ তোরা হয়তো মনে করবি এ একটা বাড়াবাড়ি। ঐ এক টুকরো ছোট্ট মেয়েটাকে আমি যে কত ভালোবেসেছি ; তা তোরা বুঝবি কি ছাই-পাঁশ ? কথায় বলে, 'বাঁজায় জানে ছেলের বেদন !' অবশ্যি আমিও যদিচ এখনো তোদেরই মতো ন্যাড়া বোঁচা, কিন্তু আমার মন তো আর বাঁজা নয় ! এরই মধ্যে তোর গোলাবি গাল হয়তো শরমে লাল হয়ে গেছে ! কিন্তু রোস্, আরো শোন ! মনে কর, আমি যদি বলি যে, আমার নিজের একটা মেয়ে থাকলে আমি ভাবিজির সঙ্গে অদল-বদল করতাম, তাহলে তুই বিশ্বাস করিস ? দাঁড়া, এখনই ধেই ধেই করে খেমটাওয়ালিদের মতো নেচে দিসনে যেন রাগের মাথায় ; আরো একটু শুনে যা—সত্যি বলতে কি সোফি, আমারও একটি ঐ রকম ছোট্ট আনার-কলির মা হতে বড্ডো সাধ

হয় ! কথাটা নিশ্চয়ই তোর মতন চুলবুলে 'লাজের মামুদ'-এর কাছে কাঁচা ছুঁড়ির মুখে পাকা বুড়ির কথার মতো বেজায় বেখাপ্পা শুনাল, না? বুঝবি লো, তুইও বুঝবি দু-দিন বাদে আমার এই কথাটি ! এখন শরমে তোর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠছে, গোস্বায় তোর পাতলা রাঙা ঠোঁট ফুলে ফুলে কাঁপছে (আহা, ঠিক আমের কচি কিশলয়ের মতো !) কিন্তু এই গায়েবি খবর দিয়ে রাখলাম, এক গরিবের কথা বাসি হলে ফলবেই ফলবে ! মেয়েদের যে মা হবার কত বেশি শখ আর সাধ, তা মিথ্যা না বললে কেউ অস্বীকার করবে না ! কি একটা ভালো বইয়ে পড়েছিলাম যে, আমাদেরই মা আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন ! তলিয়ে বুঝে দেখলে কথাটা সুন্দর সত্যি আর স্বাভাবিক বোধ হয়।—হাঁ, কিন্তু দেখিস ভাই লক্ষ্মীটি, তোর পায়ে পড়ছি, ভাবিজিকে এ-সব কথা জানতে দিসনে যেন। শ্রীমতী রাবেয়া যার নাম, তিনি যে এসব কথা শুনলে আমায় সহজে ছেড়ে দেবেন, তা জিবরাইল এসে বললেও আমি বিশ্বাস করব না। একে তু দুষ্টু বুদ্ধিতে তিনি অজেয়, তার ওপর একাধারে তিনি আমার গুরু বা ওস্তাদ আর ভাবিজি সাহেবা ! (সেই সঙ্গে রামের সুগ্রীব সহায়ের মতো তুমিও পিছনঠেলা দিতে কি কসুর করবে?) নানাদিক দিয়ে দেখে আমি চাই যে, আমার সবকিছু যেন চিচিং-ফাঁক না হয়ে যায় ! কেননা এ হচ্ছে স্রেফ্ তোতে-আমাতে দু-সই-এ গোপন কথা। এখানে বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ।

এতটা বেহায়াপনা করে সাত কালের বুড়ি মাগির মতো এত কথা এমন করে খুলে কি করে লিখতে পারলাম দেখে হয়তো তুই 'আই—আই—গালে কালি মা !' ইত্যাদি অবাক-বিস্ময়ের বাণী উচ্চারণ করছিস ; কিন্তু লিখতে বসে দেখবি যে, মেয়েতে-মেয়েতে (তার ওপর আবার তারা তোর আমার মত সই হলে আর দূর দেশে থাকলে তো কথাই নেই !) যত মন খুলে সব কথা অসঙ্কোচে বলতে বা লিখতে পারে, অমন কেউটি আর পারে না। পুরুষরা মনে করে, তাদের বন্ধুতে-বন্ধুতে বসে যত খোলা কথা হয়, অমন বোধ হয় আমাদের মধ্যে হয় না ; কিন্তু তারা যদি একদিন লুকিয়ে মেয়েদের মজলিসে হাজিরা দিতে পারে, তাহলে তারা হয়তো সেইখানেই মেয়েদের পায়ে গড় করে আসবে। ও-সব কথা এখন যেতে দে, কিন্তু আমি ভাই সত্যি সত্যিই মনের চোখে দেখছি, তুই এতক্ষণ লাফিয়ে-চিল্লিয়ে তোর সেই বাঁধা বুলিটা আওড়াচ্ছিস্, 'মাহবুবাকেই বই পড়িয়ে পড়িয়ে ভাবিজি একদম লজ্ঝড় করে তুলছেন !' আর সেই সঙ্গে আমার দুঃখও হচ্ছে এই ভেবে যে, তুই এমন আর কাকে আঁচড়াবি কামড়াবি? পোড়াকপাল, বরও জুটলো না এখনো যে, বেশ এক হাত হাতাহাতি খামচা-খামচি লড়াইটা দেখেও একটু আমোদ পাই ! আল্লারে আল্লাহ্ ! আমাদের এই তথাকথিত শরীফের ঘরে শুধু ঝুড়ি-ঝুড়ি থুবড়ো ধাড়ি মেয়ে ! বর যে কোথা থেকে আসবে তার কিন্তু ঠিক-ঠিকানা নেই ! ...

তারপর, আমি চলে আসবার পর খুকি আমায় খুঁজেছিল কি? আমার কেবলই মনে হচ্ছে, যেন খুকি খুব বায়না ধরেছে, মাথা কুটে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদছে, আর তোরা কেউ এই দুলালি আবদেরে প্রাণীটির জিদ থামাতে পারছিসনে। আমায় দেখলেই

কিন্তু কান্নার মুখে পূর্ণ এক ঝলক হাসি ফুটে উঠত এই মেয়ের মুখে, ঠিক ছিন্ন মেঘের ফাঁকে রোদ্দুরের মতো! কেন অমন হতো জানিস?' আমি মানুষ বশ করার ওষুধ জানি লো, ওষুধ জানি। বশ করতে জানলে অবাধ্য জানোয়ারকে বশ করাই সবচেয়ে সহজ!

আরো কত কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু লিখে শেষ করতে পারছিনে। তাছাড়া, একটা কথা লিখবার সময় আর একটা কথার খেই হারিয়ে ফেলছি। মনের স্থৈর্যের দরকার এখানে। কিন্তু হায়, মন যে আমার ছট্‌ফটিয়ে মরছে! ঘুমুই গিয়ে এখন, ভোর হয়ে এল। কেউ কোথাও জাগেনি, কিন্তু একটা পাপিয়া 'চোখ গেল, উহু চোখ গেল' করে চেঁচিয়ে মরছে। কে তার এই কান্না শুনছে তার যে খবরও রাখে না।

খুব বড় চিঠি না দিস যদি, তা হলে আমার মাথা খাস! বুঝলি?

তোর 'কলমিলতা'—
মাহ্‌বুবা

পুনশ্চ—

নূরুল হুদা ভাইজির কোনে খবর পেয়েছিস কি? তিনি চিঠিতে কি-সব কথা লেখেন?—মাহ্‌বুবা

সালার
১২ই ফাল্গুন

সই মাহ্‌বুবা!

এলোকেশী দূতীর মারফত তোর চিঠিটা পেয়ে যেন আমার মস্ত একটা বুকের বোঝা নেমে গেল। বাস্‌রে বাস্‌। এত বড় দস্যি মেয়ে তুই! কি করে এতদিন চুপ করে ছিলি? জানটা যেন আমার রাত-দিন আই-ঢাই করত। এখন আমার মনে হচ্ছে যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেলাম। যেদিন চিঠিটা পাই, সেদিনকার রগড়টা শোন আগে। তারপর সব কথা বলছি!—পরশু বিকেলে তোর ঐ বিন্দে দূতী মহাশয়া যখন আমাদের বাড়ির দোরে শুভ পদার্পণ করছেন, তখন দেখি এক পাল দুষ্টু ছেলে তার পিছু নিয়েছে আর সুর-বেসুরের আওয়াজে চিৎকার করছে, 'আকাশে সর্‌ষে ফোটে, গোদা ঠ্যাং লাফিয়ে ওঠে!' আর বাস্তবিকই তাই—ছেলেদেরই বা দোষ কি! বুড়ির পায়ে যে সাংঘাতিক রকমের দুটি গোদ, তা দেখে আমারই আর হাসি থামে না। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল, যে, আল্‌বোর্জ-পাহাড়-ধ্বংসী রুস্তমের গোর্জের মতো এই মস্ত ঠ্যাং দুটো বয়ে এই মান্ধাতার আমলের পুরানো বুড়ি এত দূর এল কি করে! ভাগ্যিস বোন, ভাইজি তখন দলিজে বসে এসরাজটা নিয়ে ক্যাঁ কোঁ করছিলেন, নইলে এসব পাখোয়াজ ছেলেরা বুড়িকে নিশ্চয়ই

সেদিন 'কীচক' বধ করে দিত। মাগি রাস্তা চলে যত না হয়রান হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পেরেশান হয়েছিল ঐ ছ্যাঁচড়া ছেলে-মেয়ের দঙ্গলকে সপ্তস্বরে পূর্ণ বিক্রমে গালাগালি করাতে আর ধুলা-বালি ছুঁড়ে তাদের জব্দ করবার বৃথা চেষ্টায়। ঘরে এসে যখন সে বেচারি ঢুকল, তখন তার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, ভিজে ঢাকের মতো গলা বসে গেছে! ভাবিজি তাড়াতাড়ি তাকে শরবৎ করে দেন, মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে তেল দিয়ে পাখা করে দেন, তবে তখন বেচারির ধড়ে জান আসে! ওর সে সময়কার অবস্থা দেখে আমার এত মায়া হতে লাগল! কিন্তু কি করি, আমি তো আর বেরোতে পারিনে ভাই, কেউ আর আমায় অচেনা লোকের কাছে বের হতে দ্যায় না। ভাইজান বলেন বটে, কিন্তু তাঁর কথা কেউ মানে না। ও নিয়ে আমি কত কেঁদেছি, ঝগড়া করেছি ওঁদের কাছে। লোকে আমায় দেখলে বোধ হয় আমার 'উচকপালি' 'চিরুনদাঁতি'র কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে! না? যাক,—আমি প্রথমে তো তাকে দেখে জানতে পারি নি যে, সে তোদের শাহপুর থেকে আসছে। পরে ভাবিজির কাছে শুনলাম যে, সে তোদের ওখান থেকে জবরদস্ত একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে। ভাবিজি প্রথমে তো কিছুতেই চিঠি দিতে চান না, অনেক কাড়াকাড়ি করে না পেরে শেষে যখন জানলাটায় খুব জোরে জোরে মাথা ঠুকতে লাগলাম আর ভাইজান এসে ওঁকে খুব একচোট বকুনি দিয়ে গেলেন, তখন উনি রেগে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে। আমার তখন খুশি দেখে কে! রাগলেনই বা, ওঃ, উনি রাগলে আমার বয়েই গেল আর কি! তাই বলে আমার চিঠি ঐসব বেহায়া ধাড়িকে পড়তে দিই,—আবদার! এইসব কলহ-কেজিয়া করতেই সাঁঝ হয়ে এল! তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে দোর বন্ধ করে তোর চিঠিটা পড়তে লাগলাম। প্রথম খানিকটা পড়ে আর পড়তে পারলাম না। আমারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসছিল। আচ্ছা ভাই 'কল্‌মিলতা'! তুই মনে ভাবছিস হয়তো যে, আমি এখানে খুবই সুখে আছি। তা নয় সই, তা নয়। তোকে ছেড়ে আমার দিনগুলো যে কি রকম করে কাটছে, তা যদি তুই জানতিস, তাহলে এত দুঃখেও তোর আমার জন্যে কষ্ট হতো। আমি যে তোদের ঐ শূন্যপুরী ঘরটার দিকে তাকালেই কেঁদে ফেলি বোন! আমাদের ঘরের সব কিছুতেই যে তোর ছোঁয়া এখনো লেগে রয়েছে। তাই মনে হয়, এখানের সকল জিনিসই তোকে হারিয়ে একটা মস্ত শূন্যতা বুকে নিয়ে হা-হা করে কাঁদছে। সেই সঙ্গে আমারও যে বুক ফেটে যাবার জো হয়েছে!— পোড়া কপাল তোর। মামার বাড়িতেও এই হেনস্থা, অবহেলা! যখন যার কপাল পোড়ে, তখন এমনই হয়। তোর পোড়ার-মুখি আবাগি মামানিদের কথা শুনে রাগে আমার গা গিস্‌গিস্ করছে! ইচ্ছে হয়, এই জাতের হিংসুটে মেয়েগুলোর চুল ধরে খুব কষে শখানিক দুমাদ্দুম কিল বসিয়ে দিই পিঠে, তবে মনের ঝাল মেটে! জানি, ও দেশের মেয়েরা ঐ রকম কোঁদুলে হয়। দেখেছিস তো ও-পাড়ার শেখদের বৌ দুটো? বাপরে বাপ, ওরা যেন চিলের সঙ্গে উড়ে ঝগড়া করে! মেয়ে তো নয়, যেন কাহারবা! তোদের কথা শুনে মা, ভাবিজি ভাইজান কত আফ্‌সোস করতে লাগলেন। তোদের উঠে যাবার সময় মা এত করে বুঝালেন তোর মাকে, তা খালাজি কিছুতেই বুঝলেন না। কেন বোন, এও তো তাঁরই বাড়ি! মা-জান

সেদিন তোদের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন, আর কত আরমান করতে লাগলেন যে, আমি তো তোদের নিজের করতে চাইলাম, আর জানতামও চিরদিন নিজের বলেই, তা তারা আমাদের এ দাবির তো খাতির রাখলে না। মাহ্‌বুবাকে তো নিজের বেটিই মনে করতাম, তা ওর মা ওকেও আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ! কি করি, জোর তো নেই !, ... এই রকম আরো কত আক্ষেপের কথা ! এখানে ফিরে আসবার জন্যে মাও ফের চিঠি দেবেন খালাজিকে, আজ ঐ নিয়ে ভাইজানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পায়ে পড়ি ভাই, তুই যেন কোনো ল্যাঠা লাগাসনে আর ওরই সাথে। বরং খালাজিকে বুঝিয়ে বলিস, যাতে তিনি থির হয়ে সব কথা ভালো করে বুঝে দেখেন। সত্যি করে বলছি। ভাই, তোকে ছেড়ে থাকলে আমি একদম মরে যাব। এই কদিনই আমার চেহারা কিরকম শুকিয়ে গেছে, তা যদি আসিস, তখন নিজে দেখবি। ভাইজান বলছিলেন, তিনি নিজেই যাবেন পাল্কি নিয়ে তোদের আনতে। তাই আমার কাল থেকে এত আনন্দ হচ্ছে সে আর কি বলব ! এখন, এ কদিন ধরে যে তোর জন্যে খুবই কান্নাকাটি করেছিলাম, তা মনে হয়ে আমার বড্ডো লজ্জা পাচ্ছে। সত্যি সত্যিই, ভাবিজি যে বলেন, আমার মতো ধাড়ি মেয়ের এত ছেলে–মানষি আর কাঁদাকাটা বেজায় বাড়াবাড়ি, তাতে কোনও ভুল নেই। এখন তুই ফিরে আয় তো, তারপর দেখব। তোর ঐ এক পিঠ চুলগুলো ধরে এবার আর রোজ রোজ বেঁধে দিচ্ছিনে, মনে থাকে যেন। থাকবি রাত্তির দিন ঐ সেই বই পড়া কপালকুণ্ডলার মতো এলো চুলে। তুই যাবার পর থেকে গল্প করতে না পেয়ে জানটা যেন হাঁপিয়ে উঠছে আমার। মর পোড়া–কপালিরা, কেউ যদি গল্প করতে চায় ! সারাক্ষণই ছাই–পাঁশ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাগো মা ! এই রকম গুম হয়ে বসে থাকলে তো আমার মতন লোকের আর বাঁচাই হয় না দুনিয়ায়। মা তো আর ও–সব ছেলে–মানষি ভালোবাসেন না। ভাবিজিও যত সব ছাই–ভস্ম রাজ্যের বই আর মাসিক পত্রিকার গাদায় ডুবে থাকেন। নিজে তো মরেছেন, আবার আমাকেও ঐরকম হতে বলেন। কথা শুনে আমার গা পিত্‌পিতিয়ে ওঠে ! পড়বি বাপু তো এক আধ সময় পড় দিনের একটু আধটু কাজের ফাঁকে, তা না হয়ে রাত্তির জেগে বই পড় ! অমন বই–পড়ার মুখে নুড়োর আগুন জ্বালিয়ে দিই আমি। আমার তো ভাই দুটো গল্প পড়বার পর যেন ছট্‌ফটানি আসে, মাথা ধরবার জোগাড় হয়। তার চেয়ে বসে বসে দু–ঘন্টা গল্প করব যে কাজে আসবে ! এই কথাটি বললেই আমাদের মুরুব্বি ভাবিটি হেসেই উড়িয়ে দেন। তারপর, বুঝেছিস রে, আমাদের এই ভাবিজি আবার কবিতা গল্প লিখতে শুরু করে দিয়েছেন রাত্রি জেগে। আমি সেদিন হঠাৎ তাঁর একটা ঐরকম খাতা আবিষ্কার করেছি। ওসব ছাই–ভস্ম কিছুই বুঝতে পারা যায় না, শুধু হেঁয়ালি। তবে, আমাদের খুকিকে নিয়ে যে কবিতাগুলো লেখা, সেগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে। এখন দেখছি, এই লোকটিকে রীতিমতো আদব করে চলতে হবে।

তারপর 'আনারকলি'র কথা বলি শোন ! আমার এই খুদে ভাইঝিটিই হয়েছে আমার একমাত্র সাথী। তাছাঠা বাড়ির আর কারুর সঙ্গে বনে না আমার। গল্প করায় কিন্তু খুকি আমাকেও হার মানিয়েছে। এই কচি খুকিটি যেন একটা চঞ্চল ঝরনা।

অনবরত ঝরঝর ঝরঝর বকেই চলেছে। আর, সে বকার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। এখন দায়ে পড়ে, ওর ঐসব হিজিবিজি কথাবার্তাই আমাকে অবলম্বন করতে হয়েছে, আর ক্রমে ভালোও লাগছে। তুই চলে যাবার পর সে 'ফুপুদি দাবো, ফুপুদি দাবো' বলে দিন কতক যেন মাথা খুঁড়ে মরছিল, এখনও সময় সময় জিদ ধরে বসে। যখন 'না,— ফুপুদি দাবো' বলে এ খামখেয়ালি মেয়ে জিদ ধরে, তখন কার সাধ্যি যে থামায়। যত চুপ করতে বলব, তত সে চেঁচিয়ে–চিল্লিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ধুলো–কাদা মেখে একাকার করবে। বাড়িশুদ্ধ লোক মিলে তাকে থামাতে পারে না। কোনোদিন গল্প করতে করতে বা আবোল–তাবোল বকতে বকতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ঘাড়টি কাৎ করে বলে, লাল ফুপু নেই—মলে দেছে।' সঙ্গে সঙ্গে মুখটি তার এতটুকু, চুন হয়ে যায় আর একটি ছোট্ট নিঃশ্বাসও পড়ে, আমার জানটা তখন সাত পাক মোচড় দিয়ে ওঠে বোন ! ভাবিজির চোখ দিয়েও টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ে। আমি তাকে সেদিন যখন জানিয়ে দিলুম যে, তাঁর লাল ফুফু সাহেবা মামুবাড়ি সফর করতে গেছেন, তখন থেকে লাল ফুফুর আহ্লাদি দরদি ভাইঝিটি হাততালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে আর বলে,—'তাই তাই তাই, মামা–বালি দাই, মামি মাজি ভাত দিলে না দোরে হেদে পালাই !' তোর চিঠিতে এই যে পেন্সিলের দাগগুলো দেখছিস, এগুলো এই দুষ্টু মেয়েরই কাটা। আমি যখন চিঠি লিখতে বসি, তখন সে আমার ঘাড়ে চড়ে পিঠে কিল মেরে জোর আপত্তি করতে শুরু করে দিল, সে কিছুতেই আমায় চিঠি লিখতে দেবে না, এখন তাকে ছবি দেখাও। তারপর যেই বলা যে, এ চিঠি তাঁরই প্রিয় মাননীয়া লাল ফুফু সাহেবার, তখন সে ঝোঁক নিলে, 'আমি তিথি লেখব ফুপুদিকে।' ভাল জ্বালা বুন, সে কি আর থামে ! কি করি, নাচার হয়ে একটা ভোঁতা পেন্সিল তার হাতে দিয়ে দুলালির মান রক্ষে করা গেল, না দিলে সে চিঠিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দিত, যে মেয়ের রাগ ! এই মেয়েটা কি পাকাবুড়ি বুন, তোর চিঠিটা হাতে করে সে মুখকে মাল্‌সার মতো গম্ভীর করে আধ ঘণ্টাখানিক ধরে যা'তা' বকতে লাগল আর পেন্সিলটা যেখানে সেখানে বুলিয়ে প্রমাণ করতে লাগল যে, সেও লেখা জানে ! আমার তো আর হাসি থামে না। হাসলে আবার তিনি অপমান মনে করেন কিনা, কারণ তাঁর আত্মসম্মানবোধ এই বয়সেই ভয়ানক রকম চাগিয়ে উঠছে, তাই তাঁর কাণ্ড দেখে হাসলে তিনি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। ঠোঁট ফুলিয়ে, কেঁদেকেটে খামচিয়ে কামড়িয়ে একেবারে তস–নস করে ফেলবেন। এই চিঠি লেখবার সময়ও ঠিক ঐরকম যোগাড় হয়েছিল, হয়তো আজকে আর এটা লেখাই হতো না— ভাগ্যি সেই সময় আমাদের সেই বেঁড়ে বেড়ালিটা তার নাদুস্–নুদুস্ বাচ্চা চারটে নিয়ে সপরিবারে আমার কামরায় দুর্গতিনাশিনীর মতো এসে হাজির হলো, তাই রক্ষে। নইলে হয়েছিল আর কি ! বেড়াল–ছানাগুলো দেখে খুকি একেবারে আত্মহারা হয়ে সব ছেড়ে তার পেছন পেছন দে ছুট। শ্রীমতী বিড়াল–গিন্নি সে সময়ের মতো সে স্থান থেকে অন্তর্ধান হওয়াই সমীচীন বোধ করলেন। খুকি বেড়াল বাচ্চাগুলোর কানে ধরে ধরে বুঝাতে চেষ্টা করে যে সে ঐ বাচ্চা চতুষ্টয়ের মাসি–মা বা খালাজি। অবশ্য, বাচ্চাগুলো বা তাদের মা প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে কিছু মত প্রকাশ করতে সাহস করেনি ! উল্টে, খুকি

যখন তাদের কান ধরে ঝুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'পুছু, আমি—আমি তোল কালাজি ! না?' বেচারি বেড়াল বাচ্চা তখন করুণ সুরে বলে ওঠে, 'মিউ !' অর্থাৎ না স্বীকার করে করি কি? এই গরিব বাচ্চাগুলোর ওপর খুকির আমাদের যে মাসির মতোই নাড়ির টান টনটনে সে বিষয়ে আমার আর এই গরিব বেচারিদেরও ঘোর সন্দেহ আছে। মার্জার-পত্নী মহাশয়া তো সেটা স্বীকার করতে একদম নারাজ,—তবু সন্তানবাৎসল্য অপেক্ষা যে লাঠির বাড়ির গুরুত্ব অনেক বেশি, তা বিড়ালির বিলক্ষণ জানা আছে, তাই তার বুবু সাহেবা অর্থাৎ কিনা আমাদের খুকুমণি সেখানে এলেই সে ভয়ে হোক নির্ভয়ে হোক—সে স্থান সত্বরই ত্যাগ করে ! খুকুও তখন বাচ্চাগুলোকে টেনেহিঁচড়ে চাপড়িয়ে লেজ দুমড়ে, কান টেনে যে রকম নব নব আদর-আপ্যায়ন দেখায়, তা দেখে 'মা মরে মাসি ঝুরে' কথাটা একদম ভুয়ো বলে মনে হয়। ... আমি বুন কিন্তু এসব দেখতে পারিনে। এইসব অনাছিষ্টি, বেড়ালছানা নিয়ে রাত্তির-দিন ঘাঁটাঘাঁটি, হতভাগা ছেলেপিলের যেন একটা উৎকট ব্যামো। এই বেড়ালছানাগুলোর গায়ে এত পোকা যে ছুঁতেই ঘেন্না করে, তাকে নিয়ে এই দুলালি মেয়ে সারাক্ষণই ঘাঁটবে নয়তো কোলে করে এনে বিছানায় তুলবে। সেদিন দেখি,—ছি, গাটা ঝাঁটরে উঠছে !—ওর গা বেয়ে ঝাঁকড়া চুলের ভিতর ঢুকছে কত বেড়াল-পোকা। ওর মা তো রাগের চোটে ওকে ধুম্‌সিয়ে একাকার করে ফেললে। আমি শেষে সে কত করে গা ধুইয়ে চুল আঁচড়িয়ে পোকাগুলো বের করে দিলাম। আর এই হারামজাদা বেড়ালছানাগুলোও তেমনি, খুকুকে দেখলেই ওদের বুনঝির নাড়িতে টনক দিয়ে ওঠে, আর তাই লেজুড় খাড়া করে সকরুণ মিউ মিউ সুরে ওদের এই মানুষ খালাজির কাছে গিয়ে হাজির হবে। রাগে আর ঘেন্নায় আমার গা হেলফেলিয়ে ওঠে এইসব জুলুম দেখে। অন্য কেউ এসে এই বাচ্চাগুলোকে ছুঁতে গেলেই তখন গায়ের রোঁয়া খাড়া করে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সামনের একটি পা চাটুর মতো করে তুলে এমন একটা ফোঁৎ ফোঁৎ শব্দ করতে থাকে যে, আমি তো হেসে লুটিয়ে পড়ি। বাচ্চাগুলোর চেহারা দেখেই তো একে হাসি পায়, তার ওপর একমুঠো প্রাণীর এই এতবড় কেরদানি দেখে আরো হাসতে ইচ্ছা করে। দাঁড়া, আর দুদিন দেখি, তারপর ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় করব, এসব আপদগুলোকে ! ... তোর শেখানো মত খুকি এখন তার নাম বলতে শিখেছে, আনান্‌কলি।

ভাবিজিও তোকে চিঠি দিলেন। দেখছি, এই দু-দিন ধরে তিনি আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে লিখছেন। আমি তাঁকে তোর চিঠিটা দেখতে দিইনি কিনা এই হচ্ছে তাঁর রাগ। কিছুতেই আমাকে তাঁর চিঠিটা দেখালেন না। না-ই দেখালেন,—আমার বয়েই গেল ! আমার সঙ্গে ভাবিজির আড়ি ! দেখি এইবার কে সেধে ভাব করতে আসে ! আচ্ছা মাহ্‌বুবা, তুই আমায় ওঁর সব কথা লুকিয়ে-জানিয়ে দিতে পারিস? তাহলে ওঁর সব গুমোর ফাঁক করে দিই আমি।

মাল্‌কার কথা লিখেছিস। ওকে আবার চিনতে পারব না। কবছরই বা আর সে আসেনি, এই বোধ হয় বছর-পাঁচেক হল না? আচ্ছা, মেয়েদের ওপর একি জুলুম। পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে বাপের বাড়ি আসতে দেবে না, সামান্য একটু ঝগড়ার ছুতো নিয়ে।

... যদি পারিস তবে মাল্‌কাকে বলে এই মাগিকে দিয়ে আর একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিস। তাহলে খুব ভালো হয়, কেননা ঐ সঙ্গে ভাবিজির চিঠিটাও পাব। ... আচ্ছা ভাই, এ মাগির নাম এলোকেশী রাখল কে? এর যে আদতেই চুল নেই, তার আবার এলোকেশ হবে কি করে? যা দু'চারিটি আছে ঝাঁটিগাছের মতো এখনও মাথায় গজিয়ে, তাও আবার এলো করা নয়, মাথার ওপর একটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বড়ির মতো করে বাঁধা। আমার এত হাসি পাচ্ছে! এ যেন যার ঘরে একটা ম্যাচ বাক্স নাই, তার নাম দেদার বাক্স্যা। দিনকানা ছেলের নাম নজর আলী!

তারপর, তোর ভয় নেই লো ভয় নেই! তোর কুলের কথা কাউকে বলে দিইনি। তবে, আমার খুব রাগ হয়েছিল প্রথমে, আর এত লজ্জাও হচ্ছে তোর এইসব ছিষ্টিছাড়া কথা শুনে।—ছিঃ মা! তোমার গলায় দড়িও জোটে না? এক টাকুম জলে ডুবে মরতে পার না ধিঙ্গি বেহায়া ছুঁড়ি? আমি কাছে থাকলে তোর মুখ ঠেসে ধরতাম। থুবড়ো মেয়ের আবার মা হবার সাধ! তাতে আবার যে সে মেয়ের নয়, ভাই-র মেয়ের মা! আ--তোর গালে কালি! আয় তুই একবার পোড়ারমুখি হতভাগি, তার মজাটা ভালো করেই টের পাবি আমার কাছে!

পুরুষদের বিরুদ্ধে তোর যে মত, তাতে আমারও মতদ্বৈত নেই। আমিও তোর বক্তিমেয় সায় দিচ্ছি। উকিল—'মুখ-তৈয়ার'-এর মতো তুই যে-সব যুক্তিতর্ক এনেছিস তাতে আমার হাসিও পায় দুঃখও হয়, আবার রাগও হয়। কারণ আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, তোর এই মর্দানা হম্বিতম্বিতে কোনো পুরুষপুঙ্গবের কিছুমাত্র আসে যায় না,—এরকম কলিকালের মেয়েদের তারা থোড়াই কেয়ার করে। এর বিহিত ব্যবস্থা করতেও পারেন তাঁরা, তবে কিনা তাঁরা পৌরুষসম্পন্ন পুরুষ, তাই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চান না। যার গোঁফ আছে, তিনি তাতে চাড়া দিয়ে বলবেন, 'কত কত গেল রতি, ইনি এলেন আবার চক্‌রবতি! আর, আমিও বলি, দু-দিন পরে যে পুরুষ সোপর্দ হবি তা বুঝি মনে নেই! পড়িস, খোদা করে, আচ্ছা এক কড়া হাকিমের হাতে, তাহলে দেখব লো তাঁর এজলাসে তুই কত নথনাড়া আর বক্তিমে দিতে পারিস। তখন উল্টো এই অনধিকার চর্চার জন্যে তোর যা কিছু আছে, তার সব না বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, দেখিস! ... তোর মোকদ্দমা যে হঠাৎ একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল অর্থাৎ কিনা বিয়েটা মুলতবি রয়ে গেল, তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। ওঃ, তোর তরফের উকিল ভাবিজি সাহেব কি তজ্জন্য কম লজ্জিত আর মর্মাহত? তাই তিনি এখন তাঁর জবর জবর কেতাব ঘেঁটে, মস্ত আইন সংগ্রহ করে, অকাট্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগে পুনরায় আপিল রুজু করছেন (তার বরের নামে)! আসামির নামে জোর তলব ওয়ারেন্ট্‌ বেরিয়েছে। তবে এখন দিন বাড়বে কিছুদিন, এই যা। তা হোক, মায় খরচা তুই ডিক্রি পাবি, এ আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। তুই ইত্যবসরে একটা ক্ষতি-খেসারতের লিষ্টি করে রাখিস, আমি না হয় পেশকার হয়ে সেটা পেশ করে দেবো হুজুরে। তাই বলে ঘুষ নেওয়া ছাড়ছিনে। কিছু উপুড়হাত না করলে, বুঝেছিস তো, একেবারে মুলতবি! ভালই হলো এই মোকদ্দমাটা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে একটু বৈচিত্র্য, একটা রগড়ও

দেখা গেল !—তুই হয়তো অবাক হচ্ছিস, আমি এত কথা শিখলাম কি করে। কি করি, না শিখলে যে নয় ;—নারে কাল সন্ধেবেলায় ভাইজিতে আর ভাবিজিতে এই কথাগুলো হচ্ছিল, আমি আড়াল থেকে শুনে সেগুলো খুব মনে করে রেখেছিলাম। এখন তোর চিঠিতে সেই কথাগুলোই মজা দেখতে লাগিয়ে দিলাম। কি মজা ! ... সে যাক, তুই এখন তৈরি হয়ে থাকিস। বুঝেছিস আমার এই 'বীণা-পঞ্চমে বোল'?—দাঁড়া তো আসুক সে মজার দিন, তবে না তোর এ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার গুড়ে বালি পড়বে? দেখব তখন, খালাজিও তোকে কি করে ধরে রাখেন। তখন হবি আমাদের ঘরের বউ, বুঝেছিস্? আমার ঐ বদরাগি খালাজিটিকে একবার খুব দু'কথা শুনিয়ে দেব তখন। হ্যাঁ, আমি ছাড়বার পাত্তর নই যতই কেন মুখরা বলুন তিনি। তারপর, তোর গুপ্ত খবর—যা শেষ ছত্রে পুনশ্চে লিখেছিস, তার অনেকটা বোধ হয় আমার লেখায় জানতে পেরেছিস। নূরু ভাইজান নাকি বস্‌রা যাবেন শিগ্‌গির, লিখেছেন। বাঙালি পল্টন নাকি এইবার যুদ্ধে নামবে। তিনি লিখেছেন, কোনো ভয় নেই, তবু আমাদের প্রাণ মানবে কেন বোন? মা তো কেঁদে সারা। ভাইজান মন-মরা হয়ে পড়েছেন। ভাবিজি তো শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছেন এ কদিন ধরে। আমার মনও কেমন এক রকম করে এক আধ সময়। তবু আমি বলতে চাই কি, আমার কিন্তু ওতে এতটুকু ভয় হয় না। পুরুষের তো কাজ ঐক্য। আজ-কালকার পুরুষরা যা হয়েছেন তাতে ওদের জাতের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিল। ওদের হুবহু মেয়ে হবার সাধ,—সাজ-সজ্জা ধরন-ধারণ সবিতেই ! কাজেই শরীরটা হচ্ছে আমাদেরই মতো ননির ঢেলা, যাকে শুধু বিলাস-ব্যসনেই লাগানো যেতে পারে, কোনো শক্ত কাজে নয় ; আর বাক্যবাগীশ এত হয়ে পড়ছেন যে, মেয়ের জাত মুখ গুটোতে বাধ্য হয়েছে। ছিঃ বোন, এই কি পুরুষের কাজ? যে পুরুষের পৌরুষ নেই, তারা সত্যি সত্যিই গোঁফ কামিয়ে দেয় দেখে আর দুঃখ হয় না। আমাদের বাড়ির দারোয়ানটাকে গোঁফ কামানোর কথা বল্‌লে সে রাগে একেবারে দশ হাত লাফিয়ে ওঠে, কেননা ওদের আর কিছু নাই থাক, গায়ে পুরুষের শক্তি আছে ; উল্টো আমাদের দেশে গোঁফ রাখতে বললেই অনেকে ঐরকম লাফিয়ে উঠবেন, কেননা তাদের গায়ে মেয়েদের ঝাল আছে ! এঁরাই আবার বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে মেয়েদের অন্দরমহলে সেঁধিয়ে যাত্রার দলের ভীমের চেয়েও জোরে লাফ-ঝাঁপ জুড়ে দেন ! একেই বলে, 'নির্গুণো সাপের কূলোপানা ফণা'। আমার কেন মনে হচ্ছে, নূরু ভাইজি আবার বেঁচে ফিরে আসবেন, আর তুই হবি তাঁর—আমার এই পুরুষ ভাইয়ের—অঙ্কলক্ষ্মী। তুই হবি এক মহাপ্রাণ বিরাট পুরুষের সহধর্মিণী। আমার মনে এ জোর যে কে দিচ্ছে তা বলতে পারিনে, তবে কথা কি, আমার মন তোদের মতো শুধু অলক্ষুণে কথাই ভাবে না। ... এইখানে কিন্তু তোর সঙ্গে একটা মস্ত ঝগড়া আছে। বলি, হ্যাঁলো মুখপুড়ি বাঁদরি ! তোর আর বুদ্ধি হবে কখন? সে-কি কবরে গিয়ে? দু-দিন বাদে যে নূরু ভাইজির সাথে তোর বিয়ে হবে, কোন লজ্জায় তুই তাঁর নাম নিস, আবার ভাইজি বলে লিখিস? ওরে আমার ভাইয়ের দরদি বোনরে ! দূর আবাগি হতচ্ছাড়ি, তুই একদম বেহায়া বেল্লিক হয়ে পড়েছিস।

আচ্ছা ভাই 'কলমিলতা'! তুই আমার নূরু ভাইজানকে খুব জান থেকে ভালোবাসিস, না? সত্যি করে লিখিস ভাই,—নইলে আমার মাথা খাস। যদি ঝুট বলিস তাহলে তোর সাথে এই আঙুল ফুটিয়ে বলছি)—আড়ি-আড়ি—। তিন সত্যি করলাম একেবারে। আর, বাস্তবিক সই, আমার এ ভাইটির কাউকে শত্রু হতে দেখলাম না। কেই বা ওঁকে ভালোবাসে না?—যাকে খোদায় মারে, তাকে বুঝি সবাই এমনই একটা স্নেহের, বেদনভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখে। মনে হয়, আহা রে, হতভাগা, কি করে তুই এত দুঃখ হাসিমুখে বইছিস। অথচ সবচেয়ে মজা এই যে, যার জন্যে আমরা এত বেদনা, ব্যথা অনুভব করি, সে ভুলেও সে কথার উল্লেখ করে না, নিজের ভাবে নিজেই মশগুল। উল্টো তার দুঃখে কেউ এই সহানুভূতির কথা জানাতে গেলে তার সঙ্গে সে মারামারি করে বসে। এ মানুষ বড় সাবধান, যেই বুঝতে পারে যে, অন্যে তার বেদনা বুঝতে পেরেছে অমনি সে ছটফটিয়ে ওঠে ; তার ওপর তার ঐ অতবড় দুর্বলতা ধরে আহাম্মকের মতো তাতে হাত দিতে গেলে তো আর কথাই নাই, সে একেবারে ক্ষিপ্ত সিংহের মতো তার ওপর লাফিয়ে পড়ে।—আমার তো এই রকমই মনে হয়। নূরু ভাইজিকে যেন আমি অনেকটা এই রকমই বুঝি, অবশ্য একআধটু গরমিলও দেখা যায়। তুই কি বলিস? ...

থাকগে, এসব বারো কথা। শিগগির উত্তর দিস—ইতি—

তোর 'সজনে ফুল'
সোফিয়া

করাচি সেনা-নিবাস
১৫ই ফেব্রুয়ারি (দুপুর)

ভাবি সাহেবা!

হাজার হাজার আদাব। আপনার চিঠি পেয়েছি। সব কথা বুঝে উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা নেই আর সময়ও নেই। পরে যদি সময় পাই আর ইচ্ছা হয়, তবে আপনার সব অনুযোগের একটা মোটামুটি কৈফিয়ত ভেবে-চিন্তে দিলেও দিতে পারি। কিন্তু বলে রাখছি আমি,—আর আপনারা আমায় এরকম করে আঘাত করবেন না। মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা থাকে, কি সেটাকে প্রকাশ করাও যে একটা মস্ত বড় দুর্বলতা তা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছি। তা না হলে আজ আমি এত কষ্ট পেতাম না। আপনাদের এ আঘাত দেবার অধিকার আছে বটে, আমারও সইবার অধিকার আছে, কিন্তু সইবার শক্তি নেই আমার। এটা তো বোঝা উচিত ছিল। আমার এই কথা কটি বুঝতে চেষ্টা করে আমার এই নির্দয় কঠোরতাকে ক্ষমা করবেন।

দেখুন মানুষের যেখানে ব্যথা, সেইখানটা টিপেও যে আরাম পায়। অন্তরের বেদনাও ঠিক ঐ রকমের। তাই, জেনে হোক—না জেনে হোক, কেউ সেই বেদনায় ছোঁওয়া দিলে এমন একটা মাদকতা–ভরা আরাম পাওয়া যায়, যেটার পাওয়া হতে হাজার চেষ্টাতেও নিজেকে বঞ্চিত করা যায় না, বা এড়িয়ে চলবারও শক্তি অসাড় হয়ে যায়, এমনই ভয়ানক এর প্রলোভন। তাই আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আপনাদের দেওয়া এই আমার বেদনা আঘাত মধুর হলেও আমার কাছে অকরুণ—ভীষণ–দুর্বিষহ। এ আমাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এ প্রলোভনের মুখে একটু ঢিলে হয়ে পড়লেই পদ্মার ঢেউয়ে খড়–কুটাটির মতো ভেসে যাব।—সে কি ভয়ানক! আমার অন্তর শিউরে উঠছে। পায়ে পড়ি আপনাদের, আর আমায় এমন করে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না। আমার বেদনা ভরা দুর্বলতার মূল কোথায় জেনে ঠিক সেইখানে কসাই-র মতো ছুরি বসাবেন না। রক্ষা করুন—মুক্তি দেন আপনাদের এই স্নেহের অধিকার হতে। আমার প্রকাশ–করা দুর্বলতা আমারই ক্ষুব্ধ বুকে পল্টনের–জল্লাদের হাতের কাঁটার চাবুকের আঘাতের মতো বাজছে। তাই এ চিঠিটা লিখছি আর রাগে আমার অষ্টাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। আমার মতন বোকাচন্দ্র বোধ হয় আর দুনিয়ায় দুটি নেই।

আমাদের 'মোবিলিজেশন অর্ডার' বা যুদ্ধ–সজ্জার হুকুম হয়েছে। তাই চারদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেছে। খুব শীঘ্রই আরব–সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে, তাই আমার আনন্দ আর আমাতে ধরছে না। আমি চাচ্ছিলাম আগুন—শুধু আগুন—সারা বিশ্বের আকাশে–বাতাসে, বাইরে–ভিতরে আগুন, আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে, আর দেখি কোন আগুন কোন আগুনকে গ্রাস করে নিতে পারে, আরো চাচ্ছিলাম মানুষের খুন। ইচ্ছা হয়, সারা দুনিয়ার মানুষগুলোর ঘাড় মুচড়ে চোঁ চোঁ করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নিই, তবে আমার কতক তৃষ্ণা মেটে। কেন মানুষের ওপর আমার এত শত্রুতা? কি দুষমনি করেছে তারা আমার? তা আমি বলতে পারব না। তবে, তারা আমার দুশমন নয়, তবুও আমার তাদের রক্ত পানের আকুল আকাঙ্ক্ষা। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এখানে যে, এই মানুষেরই এতটুকু দুঃখ দেখে সময় সময় আমার সারা বুক সাহারার মতো হা—হা করে আর্তনাদ করে ওঠে। হৃদয়ের এই যে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত দুশমনি ভাব, এর সূত্র কোথায়,—হায়, কেউ জানে না। অনেক অনধিকারী আমার এ জ্বালা, এ বেদনা বুঝবে না ভাবি সাহেবা, বুঝবে না। বড্ডো ব্যস্ত, খালি ছুটোছুটি,—তারই মধ্যে তাড়াতাড়ি যা পারলাম, লিখে দিলাম। চিঠিটা দু–তিনবার পড়ে আমার বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা করবেন।

তারপর, আপনি মাহ্‌বুবার কথা লিখেছেন। সে অনেক কথা। এর সব কথা খুলে বলবার এখনও সময় আসেনি। তবে এখন এইটুকু বলে রাখছি আপনায় যে, মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আমার আনন্দ। আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুশমনি মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর। এই সৃষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনোই ক্ষমা

করতে পারব না,—পারব না। আমাকে লক্ষ জীবন জাহান্নামে পুড়িয়ে আমায় কবজায় আনবার শক্তি ঐ অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই। তাঁর সূর্য, তাঁর বিশ্ব গ্রাস করবার মতো ক্ষুদ্র শক্তি আমারও অন্তরে আছে ! আমি তাঁকে তবে ভয় করব কেন।—আপনি আমায় শয়তান বলবেন, আমার এ ঔদ্ধত্য দেখে কানে আঙুল দেবেন জানি,—ওহ্, তাই হোক ! বিশ্বের সব-কিছু মিলে আমায় শয়তান পিশাচ বলে অভিহিত করুক, তবে না আমার খেদ মেটে, একটু সত্যিকার আনন্দ পাই। আঃ !... যে মানুষের স্রষ্টাকে ভয় করিনে আমি, সেই মানুষকে ভয় করে আমার অন্তরের সত্যকে গোপন করব কেন ? আমি কি এতই ছোট, এতই নীচ ? আমার অন্তর মিথ্যা হতে দেবো না ! ... হাঁ, কি বলছিলাম ? আমি বিশ্বাসঘাতক—জল্লাদ ! বাঁশির সুরে হরিণীকে ডেকে এনে তার বুকে বিষমাখা তলোয়ার চালিয়ে আর 'জহর-আলুদা' তীর হেনেই আমার সুখ। সে কি আনন্দ ভাবি সাহেবা, সে কি আনন্দ এই হত্যায়। আমার হাত-পা-বুক বজ্রের মতো শক্ত হয়ে উঠছে।

কি আমায় মাতাল করে তুলছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে কোন অনন্ত যুগের অফুরন্ত কান্না কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠছে বিষের মতো—তীব্র হলাহলের মতো !—আর লেখার শক্তি নেই আমার !—ইতি।

নরপিশাচ

নূরুল হুদা

বাঁকুড়া

২রা ফেব্রুয়ারি

(নিশুত রাত্তির)

কবি-সৈনিক নূরু !

'একচোখো' 'এক-রোখো' প্রভৃতি তোর দেওয়া ঝুড়ি ঝুড়ি বিশেষণ আমি আমার আঁতুড়-ঘর থেকে এই বিশ বছরের 'যৈবন বয়েস' নাগাদ বরাবর কুইনাইন-মিক্সচারের মতন গলাধঃকরণ করতে প্রাণপণে আপত্তি জানিয়েছি, কারণ সে সময় এসব অপবাদে জোর 'চটিতং' হয়ে মনে করতাম তোর স্বভাবই হচ্ছে লোকের সঙ্গে কর্কশ বেয়াদবি করা আর মুখের ওপর নির্মম প্রত্যুত্তর করা। অনেক সময় তোর ঐ নির্ভীক সত্য ও স্পষ্টবাদিতা এবং ন্যায় ও আত্মসম্মানের গভীর অনুভূতিকে অহঙ্কার অহমিকা প্রভৃতি বলেও মনে করেছি। বন্ধুমহলেও তোর ঐ কথা নিয়ে অনেক সময় কুৎসা হয়েছে। কিন্তু আজ শোবার আগে হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ে গেল পাশের এক বালিকা-কণ্ঠে এই গানটা শুনে—

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।

আরো মনে পড়ল, এই গানটাই তোর মুখে হাজারবার শুনেছি এবং আজো কচি গলার সুরে তা শুনলাম, কিন্তু সে সময় তোর কণ্ঠে যে গভীর বেদনার আভাস ফুটে উঠত, জনম-জনম অতৃপ্ত থাকার ব্যথা-কান্না যে শিহরণ-ভরা মূর্ছনার সৃজন করত, তা এ বালিকার সরল কণ্ঠের সহজ সুরে পাই না। এই কথাটি মনে হতেই তোর সজল কাজল-আঁখির-আকুল-কামনা-ভরা চিঠিটা আর একবার পড়তে বড্ডো ইচ্ছে হলো। আজ এই নিশীথ রাতে তোর মেঘলা দিনের লেখা চিঠিটা পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, চিঠিটা প্রথম দিন পেয়ে কেন এমন অভিভূত হইনি ; সেদিন বুঝি চারিদিককার কোলাহলে তোর প্রাণের গভীর কথা আমায় তলিয়ে বুঝতে দেয়নি, শুধু ওতে যে মুক্ত হাসির স্বচ্ছ ধারাটুকু আছে, সেই ধারার কলোচ্ছ্বাসই আমার মন ভুলিয়েছিল। আজ যেন কোন গুণীর পরশে সহসা আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছে আর তোর মর্মের মর্মস্থলেরও নিষ্করুণ চিত্র দেখতে পেয়েছি। তাই আজ বুঝেছি ভাই, এ কি অকরুণ নিরেট হাসি তোর ! কান্না সওয়া যায়, কিন্তু বেদনাতুরের মুখে এই যে কুলিশ-কঠোর হিম হাসি, এ যে জমাট শক্ত অশ্রু-তুহিন এ যে পাথরও সইতে পারে না। যার প্রাণ আছে, বেদনার অনুভূতি আছে, যে এমনি নীরব রাতে একা বসে কোনো স্নেহহারার এমনি নীরস শুষ্ক হাসি শুনেছে, সেই বোঝে এ হাসি কত দুর্বিষহ ! তাই আজ তোর চিঠিটা পড়তে পড়তে বুকের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত তোলপাড় করে উঠতে লাগল !

একটি ছোট্ট প্রদীপ জ্বালিয়ে এই আঁধার বিভাবরীতে আমার সামনের বাতায়ন দিয়ে যতদূর দেখা যায় দেখতে চেষ্টা করছি আর ভাবছি—হায় তোর জীবনের রহস্যটা এই অন্ধকার-নিপীড়িত নিশীথের চেয়েও নিবিড় কৃষ্ণ পর্দায় আবৃত। সে বধির-যবনিকা চিরে তোর অন্তরে অনন্ত দিগ্‌মণ্ডলের সন্ধান নিতে যাচ্ছি আমার এই ঘরের প্রদীপটির মতোই ক্ষীণ কালো শিখা নিয়ে। তাই বুঝি অন্তরঙ্গ সখা হয়েও তোর ঐ অ-থই মনের থই পেলাম না, অসীম হিয়ার সীমারেখা ধরি-ধরি করেও ধরতে পারলাম না। ও-মন কেবলই আমাকে আকাশের মতো প্রতারিত করেছে ; যখনই মনে করেছি—ঐ ঐখানে গাঙের পারে আকুল আকাশ আর উদাস মাঠে চুমোচুমি হয়েছে, তখনই আমি প্রতারিত হয়েছি। সেই মিলন-সীমায় পদাঙ্ক আঁকতে যতই ছুটে গিয়েছি, ততই সে দিকের শেষ দূরে—আরো দূরে সরে গিয়েছে। কোথায় এ বাঁধন-হারা দিগ্বলয় কার অসীম আকাশের মোহনা, তা কে জানে। আমরা নিয়তই বাঁধন-বাঁধার ডোর সৃজন করে ঐ অসীমতাকে ধরবার চেষ্টা করছি, আর দুষ্ট চপল শশক-শিশুর মতো যে তত এক অজানা বনের গহন-পথের পানে ছুটে চলেছে। সে দুরন্ত-শিশু নেমে আসে কখনো মাঠের ধারে গাঁয়ের পাশে, কখনো গাঙ পেরিয়ে আমলকি-ছায়া-শীতল ঝর্না-তীরে, আবার কখনো শাল-পিয়াল আর পলাশবনের আলো-ছায়ায়। একটি পাতাঝরার শব্দ শুনেই সে চমকে উঠে অনেক দূরে গিয়ে তার চঞ্চল চোখের নীল চাউনির ইশারায় ভ্রান্ত পথিককে ডাকতে থাকে। তোর নিরুদ্দিষ্ট উদাসীন মন অমনি সে-কোন এক আবছায়া ভরা অচিন অসীমের পানে যে ছুটেছে, তা তুইই জানিস ; তোর এই কাণ্ডারিহীন হিয়ার তরী যে কোন

অকূলের কূল লক্ষ্য করে এমন খাপছাড়া পথে পাড়ি দিয়েছে, তা কোনো মাঝিই জানে না। আমি ভাবছি, হয়তো এ নিরুদ্দেশ যাত্রীর দুঃসাহসী ডিঙাখানি ঐ দুই অসীমের মোহনাতেই গিয়ে জয়ধ্বনি করবে, না হয় কোথাও ঘূর্ণি–আবর্তে পড়ে হঠাৎ ডুবে যাবে, হয়তো কোন চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডিঙার বাঁধন ছিন্ন–ভিন্ন হয়ে যাবে! ভবিষ্যৎটা আমি নির্দয়ভাবেই কল্পনা করলাম, কারণ আমি জানি নির্মম সত্য তোর কাছে কোনোদিন অপ্রিয় লাগেনি, এবারেও আমার এসব বেহুদা কথায় রাগবিনে বা দুঃখ পাবিনে আশা করি।

তোর সজল, কাজল–আঁখি প্রেয়সী যে কোন কোকাফ মুল্লুকের পরিজাদি, তাই ভেবে আমি আকুল হচ্ছি। শ্রীমতী মাহ্‌বুবা খাতুনই সে সৌভাগ্যবতী কিনা, সে সম্বন্ধে এখনো আমি সন্দেহ–দোলায় দুলছি। তাহলে তুই আগে মত দিয়ে পরে বিয়ের কদিন আগে তাকে কেন এমন করে এড়িয়ে ত্যাগ করে গেলি? তোর এ এড়িয়ে–যাওয়ার দু'রকম মানে হতে পারে; প্রথম, হয়তো তাকে ভালোবাসিসনি,—দ্বিতীয়, হয়তো তাকে মন দিয়ে ফেলেছিলি বলেই নিজের এই দুর্বলতা ধরা পড়ার ভয়ে এমন করে ভেসে গেলি। কোনটা সত্যি? আমার বোধ হয়, দ্বিতীয় ঘটনাটাই ঘটা খুব সম্ভব আর স্বাভাবিক। তুই আমার এইসব মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দেখে আমায় ঔপন্যাসিক ঠাউরাসনে যেন। সকলের পক্ষে যেটার অন্তরে উদয় হওয়া স্বাভাবিক, আমি কেবল সেইটাই যতটা প্রকাশ করা যায়, ভাষার বাঁধন দিয়ে আগলাবার চেষ্টা করচি। মাহ্‌বুবার অবস্থা আমি নিজে কিছু না দেখলেও বুবুজান যে রকম করে বলছিলেন, তাতে মর্মর দেউলেরও বুক ফেটে যাবার কথা। অবশ্য তিনি সব কথা খুলে বলতে পারছিলেন না আমার কাছে; কিন্তু ঐ বাধো বাধো–ভাবে কথাটা চাপতে গিয়েই সেটার গোপন তত্ত্ব যতটা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল, তাতে আমি হলফ করে বলতে পারি যে, সে বেচারির নরম বুকে তোর ভালোবাসার 'খেদং তীর' বড় গভীর করে বিঁধেছে! এ নিদারুণ শায়কের বিষ তার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে! বুঝি সে অভাগীর আর রক্ষে নেই। বুবুজানও এই ভেবে এক রকম অস্থির হয়েই পড়েছেন। তাঁর ভয়ের আদত কারণ বোধ হয়, তিনি মনে করেন যে, মৌন বুকের এই বধির চাপা ভালোবাসার গভীরতা যেমন বেশি, মারাত্মকও তেমনি। এই গভীর বেদনাই তাকে হত্যা করে ছাড়বে। ..., এইসব নানান দিক দেখে আমার আর ইচ্ছে হয় না ভাই যে বিয়ে করি। আমার অন্তরঙ্গ সখার বুভুক্ষু আঁখির আগে আমি নিজের ভালোবাসার ক্ষুধা মেটাব, আর সে শুধু গোবি–সাহারার তপ্ত বালুকায় দাঁড়িয়ে ছাতি–ফাটা পিয়াস নিয়ে তেষ্টায় বুক ফেটে মরবে, এমন স্বার্থপরের মতো ছোট কথা ভাবতেও যে আমার জানটা ওলট–পালট করে ওঠে ভাই! তাই আমি আজ গোলাবি শরবতের পেয়ালা ওষ্ঠের কাছে ধরে ভাবছি,—তিয়াষা মিটাই, না ঐ পেয়ালা চূর্ণ করে তোর মতো অজানার পথে বেরিয়ে পড়ি। তুই এ পথ–হারা অন্ধকে পথ দেখিয়ে দিতে পারিস? ভেসে পড়ি তাহলে আল্লা বলে! কিন্তু বলে রাখি, জটিল জটা–জুটিধারী লোটা–কম্বল–সম্বল কম্‌লি ওয়ালে' সাজতে আমি পারব না। নাগা সন্ন্যাসীর মতো স্বার্থের বৈরাগ্য আমার মুক্তি পথ নয়। আমার মতো গো–মুক্ষুর কথা যদি শুনিস,

তাহলে আমি বলি কি, তোর গুরুদেবের উদাত্ত নির্ভীক বাণীতে তুইও যোগ দিয়ে প্রদীপ্তকণ্ঠে বুক ফুলিয়ে বল্ ;—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ !'

আছে তোর এ সাহস? বল তাহলে আমিও বিস্‌মিল্লাহ্ বলে কাছা এঁটে একবার লেগে পড়ি।—

হ্যাঁ, তারপর—ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতিতে তোর কোন্ জাঁদরেল-তন্বীর বা জাঁহাবাজ কিশোরীর দাপাদাপি মনে পড়েছিল রে? আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনে। শুনি, কবিকুল নাকি কল্পলোকের জীব ; তাঁরা স্রেফ কল্পনা নিয়েই মশগুল ; তাঁদের কথায় বাস্তবতা একরকম 'নদারদ' বললেই হয়। আর, এই যদি হয় কবির সংজ্ঞা, তাহলে তুইও কবি (এবং সেই জন্যেই তোকে প্রথমেই কবি-সৈনিক বলে সম্বোধন করেছি) ! আচ্ছা, এই যে তোর খেলার সাথী দুষ্ট চপল প্রিয়া, ইনি তোর মানসী বধূ, না কোনো রক্ত-মাংসের শরীরধারিণী সত্যিকার মানবী? রাজকন্যা স্বপ্নরানি, পরিস্থানের বাদ্‌শাজাদি, ঘুমের দেশের আলোককুমারী বা ঐ কেসেমেরই যত সব উদ্ভট সুন্দরীদের রাঙা চরণের আশা যদি থাকে তোর, তবে দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালকের মতন ও-সব খাম-খেয়ালি এক্ষুনি ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ! গোলে-বকাওলিতেই লেখা থাক, বা আরব্য-উপন্যাসের উজিরজাদিই বলুন,—কিন্তু কই কাউকে তো সত্যি সত্যিই কোনো পাখনা-ওয়ালি পরি এসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলে শুনলাম না। পালঙ্ক শুদ্ধ উড়িয়ে না নিয়ে যাক রে ভাই, অন্তত বিছানার চাদরটা জড়িয়েও তো আমাকে ঐ পরি-বানুরা এক-আধ দিন তাঁদের আজব দেশে নিয়ে যেতে পারতেন। কত কত দিন শরৎ, হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বসন্তের চাঁদনি-চর্চিত যামিনীতে ছাদে শুয়ে শুয়ে সর্দি-কাশি ধরিয়েছি, কিন্তু এ পোড়াকপালের ঐ গগনমার্গের দিকে চক্ষু তেড়ে তাকানো ছাড়া আর ওড়া হলো না। বাদুড় চাম্‌চিকে উঠে যেতে অনেক অনেক দেখেছি, কিন্তু কোনো পরির আসমানি চাদর বা হেনায়-রাঙা পদ-পল্লব বা ডাঁশা আঙুরের মতন ঢল্‌ঢলে মুখ দেখা তো দূরের কথা, তাদের পাখা-পাখনারও একটি পালক বা কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।—সে সব যাক, এখন তোর নামে মস্ত একটা অভিযোগ দেবো, যে অভিযোগ কখনও দেবো বলে আমার আজকের রাতের আগে আর মনে হয়নি ! আজ যেন দিনের মতন সাফ্ বুঝতে পাচ্ছি, কখনো তোর মনের কথা পাইনি বা তোকে বুঝতেও পারিনি। শুধু তোর ঐ ওপরকার হাসির ছটাতেই ভুলে ছিলাম। আজ যখন তুই অনেক দূরের মরণের বুকে দাঁড়িয়ে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করছিস, যখন মনে পড়ছে যে হয়তো তোর সাথে আমাদের আর দেখা নাও হতে পারে, তখনই বুকের ভেতর এক অশান্ত অসোয়াস্তি তোলপাড় করে উঠছে—হায়, কেন এতদিন তোকে কাছে পেয়েও আরো কাছে পাইনি ; কেন তোকে বুঝতে পারিনি !—কার করুণা-মাখা অধর, কার বিদায় ক্ষণের চেয়ে থাকা তোকে মেঘলা-দিনে এমন উতলা

করে তোলে? সজল-মেঘ কার কাজল-নয়ন মনে করিয়ে দেয়? আমি তাই এ নিশীথ রাতে একলা বসে ভাবছি আর ভাবছি। সে কে? কোন কিশোরীর ভালোবাসার হীরা তোর মনের কাচকে দু'ফাঁক করে কেটে দিয়েছে? কোন খাতুনের মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে এমন চিরন্তনী হয়ে ফুটেছে? তা তুই আর হয়তো তোর মানসী দেবী ছাড়া কেউ জানে না। তোর জীবনের পথে আচম্কা আসা অনেকগুলি কচি-কিশোর মুখ মনের মাঝে ভেসে উঠছে, কিন্তু কোনোটাকেই মনে লাগছে না যে এ-তোর মর্মর মর্মে স্থায়ী নিবিড় দাগ কাটতে পারে। এ সবারই মাধুরী শুধু সৌদামিনীর মতো একটুখানিক চমকে হেসে আঁধার পথের যাত্রীর চোখ ঝলসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একটা কথা কিন্তু এইখানে মনে হচ্ছে আমার। —যদি কোনো এক কিশোরী কুমারীর মাঝে থাকত আমার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্তা সোফিয়া খাতুনের গভীর অভিমান-ভরা মিষ্টি দুষ্টমি আর অবাধ্য চপলতা এবং সেই সাথে শ্রীমতী মাহ্‌বুবা খাতুনের নিবিড় ভালোবাসা-মাখা করুণা ও বিদ্রোহ-মাধুর্যের আমেজ,—আর সেই সুন্দরী যদি নিঃসঙ্কোচে সহজ সরলভাবে তোকে তার পথে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারত, তবে একমাত্র সেই তোর বাঁধন-হারা জীবনটাকে এমন করে সবার মাঝে শুকিয়ে মরতে না দিয়ে সফলতার পুষ্পমঞ্জরীতে মঞ্জরিত করে তুলত।—

—তুই বাইরে যত বড়ই বেহায়া বেল্লিকপনা করিস না কেন, অন্তরে তোর মতন লাজুক আর কেউ নেই; তোর ভিতরের লজ্জাশীলতার কাছে আমাদের নব-বধূদেরও হার মানতে হবে। আমি বরাবর দেখে এসেছি, যেখানে বেশ সোজাভাবে মিশতে না পারার দরুন তোর গোপন দুর্বলতার শক্ত বাঁধন একটু শিথিল হয়ে এসেছে, সেইখানেই তুই মন্ত্রবশীভূত গোখরো সাপের মতন ফণা গুটিয়ে বসে পড়েছিস। বিশেষত, কোনো অচেনা সুন্দরী তরুণীর মুখোমুখি হলেই তুই দু-একদিন যেরকম ব্যতিব্যস্ত খাপছাড়া ভাব দেখাতিস কথায় কাজে, তার সত্যিকার গূঢ় হেতুটা কি বল দেখি? সেটা সুষমা-পিপাসু মনের সৌন্দর্য-তৃষা, না ঐ রূপের ফাঁদে ধরা পড়বার ভীতি-কম্পন? তোর আরো একটা দুর্বলতা ও শক্ত শক্তির কথা মনে পড়ছে আমার—তুই যেমন শিগগির কোনো কিছুতে অভিভূত হয়ে পড়তিস, সেই রকম শীঘ্রই আবার সেটার কবল থেকে নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারতিস। অবশ্য শেষের গুণটা পৌরুষ না হয়ে নির্মম নির্দয়তারই বেশি পরিচয় দেয়। তোকে যে ধরতে যাবে, তাকে আগে নিজেকে ধরা দিতে হবে। অনবরত স্নেহের সুরধুনী বইয়ে প্রীতির মরূদ্যান রচনা করে, তোর মরু-যাত্রী পিয়াসী আত্মাকে যদি কোনো নারী প্রলুব্ধ আকৃষ্ট করতে পারত, তাহলে বোধ হয় এই তরুণ বয়সেই তোর বেদনার বোঝা এত অসহ্য হয়ে উঠত না। তোর মতন বিপুল অভিমানী যে কারুর স্নেহ যাচ্ঞা করে না, তা আমি জানি। আমি আরো জানি, তোদের মতো অভিমানীদের আত্মসম্মান-জ্ঞান আর দুর্বলতা ধরা পড়বার ভয় ভয়ানক তীব্র সজাগ। কিন্তু এ আমি বলবই যে, এটা তোদের অনেকটা একগুঁয়েমি; তোদের মনের অতৃপ্ত কামনা একটা তরুণ বুকের স্নেহ-ভালোবাসা পাবার আশায়, দুটি টানা চোখ মদিরাভরা শিথিল চাউনির আবেশের ক্ষুধায়, একটি কম্পিত পাৎলা ঠোঁটের উষ্ণ

পরশের তৃষ্ণায় হা হা করে ছাতি ফেটে মরছে—বোশেখ-মধ্যাহ্নের আতপ-তপ্ত ভুখারি ভিক্ষুকের মতো। কিন্তু এত আকণ্ঠ পিপাসা নিয়েও সে তৃষাতুর কামনা শুধু তীব্র অভিমানের রোষে আত্মহত্যা করছে। নর-ঘাতকের মতো তোর বাসনার গর্দানে খড়গের ওপর খড়গ হেনে তাকে কাটতে তো পারছিসইনে, শুধু কচলিয়ে কচলিয়ে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা দিচ্ছিস! তবু পাষাণ তোদের বিক্ষুব্ধ ক্ষোভ মিটল না, মিটল না! এর ফল বড্ডো ভয়ানক, অতি নিষ্করুণ! তাই বলি ভাই নূরু, তোর পায়ে পড়ে বলি, ফিরিয়ে আন তোর এ গোঁয়ার মনকে এই গোবির তপ্ত ঊষর ধু-ধু শুষ্কতা হতে! এতে অন্ধ হবি, শক্তি হারাবি, অথচ কিছুই হবে না জীবনের। তোর মধ্যে যে বিরাট শক্তিসিংহ সুপ্ত রয়েছে, কেন তাকে এমন করে এক অজানার ওপর অন্ধ অভিমানের ক্ষিপ্ততায় হত্যা করবি? সংসারে থেকে সংসারের বাঁধনকে উপেক্ষা করে এ স্পর্ধার অট্টহাসি হেসে প্রকৃতির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব রে অসম্ভব! ফিরে আয় ভাই, ফিরে আয় এ ধ্বংসের বন্ধুর পথ হতে!—তোর প্রাণের অগ্নিবীণায় এই যে আগুন-ভরা দীপক-রাগ আলাপ, এ যে তোকে পুড়িয়ে খাক করে ছাড়বে ভাই! মেঘ-মল্লারের স্নেহ-স্নিগ্ধস্পর্শ ছাড়া এ আগুন শান্ত করবে কে? যদি ধরা না দেওয়া, বাঁধন এড়ানোতেই তোর আনন্দ, তবে তোর এ জীবন-ভরা চঞ্চলতা দিয়ে পথের ভ্রান্ত পথিকগুলোকে মুগ্ধ তৃষিকায় ফেলে যাওয়াটাই কি খুব বড় পৌরুষের কথা? এ কি পাণ্ডুর-পাংশু আনন্দ! জানি, তুই বলবি, 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ!' কিন্তু এতদিন ভুলেছি আজ আর ও-ফাঁকির কথায় ভুলছিনে। আজ তোর এই বাদলের কান্না-ভরা চিঠিটা পড়ছি, সেই সঙ্গে তোর অনেকদিনের অনেক কথা আমার মনের দিঘিতে বুদ্‌বুদ কাটছে, আর তারই সাথে মনে হচ্ছে তোর মনের মানুষের এতদিনে যেন অনেকটা নাগাল পেয়েছি। পল্লিমাঠের ভুলুনে ভূত-এর মতো আর এ চতুর মনকে পথ ভুলোতে পারছিসনে, বলে রাখলাম। এইবার যেন বুঝতে পারছি, তোর পাষাণ বুকের ভেতর জ্বলছে লক্ষ অমানুষিক ধৈর্যের আবরণ। তোর হৃদয়-ভরা বেদনার রক্ত-ঢেউ পাঁজরের বাঁধ ভেঙে কণ্ঠের সীমা ছাপিয়ে উঠতে দিনের পর দিন উত্তাল বিদ্রোহ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। তারই রুদ্র-কান্না হাসি হয়ে তোর রুক্ষ অধর-ওষ্ঠে আছাড় খাচ্ছে, হাঃ হাঃ হাঃ! শুধু হাসি—কাঠফোটা হাসি! আর প্রতারণা করতে পারবিনে রে আমায়, আর তুই মিথ্যা দিয়ে আমায় বারেবারে ঠকাতে পারবিনে; আজ আমার আপন আপন বেদনা দিয়ে তোর হাসি-কান্নার সত্য উৎস আবিষ্কার করেছি। তোর ব্যথার এ-অফুরন্ত উৎস চেনা-পথিকদের ছেয়ে ডুবিয়ে ফেলেছে; তোর ঐ বেদনা রাগ-রঞ্জিত পরশ-মণির ছোঁওয়া আমারও লৌহ-বর্মকে ব্যথা-কাঞ্চনের অরুণিমায় রাঙিয়ে তুলেছে! ওরে, তাই এ নিস্তব্ধ রাতে বিহ্বল-আমি একা-আমার আজ অন্তরের সত্য—মানবাত্মার সকল ভাবগুলি তোকে জানিয়ে বাঁচলাম। জানি এ-চিঠিটা আমার হাত পেরিয়ে গেলেই হয়তো আমার সঙ্কোচ আর অনুশোচনা জাগবে যে, তোকে এমন করে, তোর দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া বা চোরা-ব্যথায় অস্ত্র করা একেবারেই উচিত হয়নি। এ জেনেও আমার পত্র লেখার বলবতী ইচ্ছাকে রুখতে পারলাম না। কে জানে, আবার আমাদের নব মিলনের আনন্দ-

ভৈরবী আর প্রভাতীর কল-মুখর রাগিণী কোনো প্রভাতে রণে উঠবে কি না ! আঃ, তার চিন্তাটাও কত ব্যথা-কাতর কান্নায় কান্নাময়। হায় ভাই, সেদিন কি আর আসবে ?

বাড়ির খবর সব ভাল। মাহবুবা বিবি বর্তমানে মাতুলালয়-বাসিনী। সোফিয়া বিবি তেপ্‌সে-যাওয়া মাল্‌সার মতন নাকি আজকাল মুখ ভার করে থাকেন। রবিয়ল সাহেবের এস্‌রাজ-সারেঙ্গির কোঁকানি একটু মন্দা পড়েছে। আমার এখন লেখা-পড়ার চিন্তার চেয়ে বোঝা-পড়ার চিন্তাটাই বেশি।—ঐ যাঃ, একটা হুতুম-প্যাঁচা ডেকে উঠল রে—বড্ডো অলক্ষুণে ডাক ! শুয়ে পড়ি ভাই, মাথা নুয়ে আসছে !

তোর বিয়োগ-কাতর
মনুয়র

[চ]

করাচি সেনা-নিবাস,
(শ্রীঘর)
১৭ই ফেব্রুয়ারি

বাঁদর মনো !

শুয়োর-পাজি-ছুঁচো-উল্লু-গাধা-ড্যামরাডি-ফুল-বেল্লিক-বেলেল্লা-উজবক্‌-বেয়াদব-বেতমিজ !—ওঃ, আর যে মনে পড়ছে না ছাই, নইলে এ চিঠিতে অন্য কিছু না লিখে শুধু হাজার খানেক পৃষ্ঠা ধরে তোকে আষ্টে-পিষ্ঠে গাল দিয়ে তবে কখনো ক্ষান্ত হতাম ! একটা অভিধানও পাবার যো নেই এই শালার জিন্দাখানায়, নইলে দিনকতক ধরে এমনিতর চোখা চোখা গাল পসন্দ করে তোকে বিঁধতাম যে যার জ্বলনের চোটে তুই বিছুটি-আলকুসি-লাগানো ছাগলের মতন ছুটে বেড়াতিস—আর তবে না আমার প্রাণের জ্বালা হাতের চুলকুনি কতকটা মিটত ! আচ্ছা, তোদের ভাই-বোন সবারই ধাত কি একই রকমের ? তোদের ধর্মই কি মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া ? তোরা কি সুখ পাস এমন বেদিলের মতন বেদনা-ঘায়ে ভোঁতা ছুরি রগড়ে ? বল, ওরে হিংস্র জানোয়ারের দল, বল এতে তোদের কোন জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় ! কি বলব ভাগ্যিস তুই আমার হাতের নাগালের মধ্যে নেই, নইলে কামড়ে তোর বুকের কাঁচা মাংস তুলে ছাড়তাম ! হায়, আমার মন যে আজ কি রকম তড়পে তড়পে উঠছে তোদের এই মুরগি-পোষা ভালোবাসার জুলুমে, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে না পেরে শুধু এই চিঠির কাগজটাকে কামড়িয়ে—নিজের হাতের গোশত নিজে চিবিয়ে আমার অতৃপ্ত রোষের ক্ষোভ মিটাচ্ছি ! এখন আমার মনে হচ্ছে, হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনের মতন মস্ত এক লাফে এই দু-হাজার মাইল ডিঙিয়ে তোর ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোকে একদম 'কীচক-বধ' করে ফেলি তোর ঐ বাঁকুড়া কলেজটাকে গন্ধ-মাদন পর্বতের

মতন চড়্চড়্ করে উপড়ে ফেলে সটান গন্ধেশ্বরীর গর্ভে নিয়ে গিয়ে ফেলাই। তারপর ভাবি সাহেবার ঘরটা শুদ্ধ সারা সালারটাকে অযুত বিসুবিয়াসের অগ্নিস্রাবে একদম নেস্ত্‌-নাবুদ করে ফেলি ! ভারি সব পণ্ডিত মনস্তত্ত্ববিদ কিনা, তাই এইসব ডেঁপোমি করে চিঠি লেখা ! আমি নিজেকেই বা আর কি বলব, তোদের একটু পথ দেখাতেই তোরা 'খাইবার-পাস'-এর মধ্যের গোরা সৈন্যের মতন সেই পথ দিয়ে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষণ করে আমাকে ঘায়েল করে ফেললি ! যত দোষ এই আমি-শালার ! তোর আগেকার চিঠিটা পেয়ে খুশি হয়ে যে উত্তর লিখেছিলাম, তা আল্‌সেমি করে আর ডাকে দিইনি, তারপর তোর পরের বিশ্রী চিঠিটা পেয়েই তখ্‌খুনই সে-চিঠিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলেছি ! মনে করেছিলাম তুই ভালো,—আরে তওবা ! সব শিয়ালের একই ডাক ! পরের চিঠিটার পুরো উত্তর যে এখনই দেবই না, তা বোধ হয় আর লিখে জানাবার দরকার নেই ! যদি কোনোদিন আমি শান্ত হয়ে তোর অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, তবেই উত্তর দেবো—নইলে নয়। ভাবী সাহেবার চিঠিও তোরই মতো 'রাবিশ' যত-সব মন-গড়া কথায় ভরা। হবে না ? হাজার হোক, তিনি তো তোরই বোন ! আর কাজেই তুইও যে তাঁর সহোদর, তা মর্দের মতোই প্রমাণ করলি ! .... খোদা তোদের মঙ্গল করুন !

তোদের খবর যদি ইচ্ছা করিস দিতে পারিস। চিঠি-পত্র বন্ধ করলে বা খবর না পেলে যে খুব বেশি চিন্তিত হবো তা' ভুলেও মনে করিসনে যেন। সেদিন আর নেইরে মনু, সেদিন আর নেই ! এখন সারা দুনিয়া গোল্লায় গেলেও আমি দিব্যি শান্তভাবে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিতে থাকব। জাহান্নামে যাক তোর এই দুনিয়া ! আমার তাতে কি ? দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি যে, আমি তার জন্যে ঝুরে মরব ? মনে রাখিস,—দুনিয়া যদি হয় বুনো ওল, তবে আমি বাঘা তেঁতুল ; দুনিয়া যদি হয় সাপ, তবে আমি নেউল ; দুনিয়া যদি হয় রাধা-শ্যাম তবে আমি শ্রী কাঁধে-বাড়ি বল্‌রাম ! ... আর কত বলব ? কতই যা তা বকব ! এক কথায়, আমি এখন থেকে সংসারের মহাশত্রু ! সে যদি যায় পুবে, আমি যাব পশ্চিমে ! এই তিন সত্যি করে দুনিয়ার সঙ্গে দুষমনি পাতালাম, দেখি কে হারে—কে জেতে। দুর ছাই ! রাজ্যের ঘুমও আসছে যেন একেবারে আফিমের নেশার মতন হয়ে,—এইবারে মরণ-ঘুম এলেও তো বাঁচি ! আর, ঘুমকেই বা দোষ দেবো কি ! হাবিলদারজি আজ যে রকম দু-ঘন্টা ধরে আমায় মাটি খুঁড়িয়েছে ! এমন 'কেঠো' হাতেও ফোস্‌কা পড়িয়ে তবে ছেড়েছে !—হাঁ, এই হাবিলদার কিন্তু এক ব্যাটা ছেলে বটে ! একেই তো বলতে হয় সৈ-নি-ক পু—রু—ষ ! আমায় পুরো দুটি ঘণ্টা গাধার চেয়েও বেহেজ্‌ খাটিয়েছে, একবার কপালের ঘাম মুছতেও দেয়নি—এমনি জাঁক ! অত কষ্টের মধ্যেও আমার তাই একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আনন্দ শিরায় শিরায় গরম হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল, এবং তা এই ভেবে যে, আহা আর কেউ তো এমন করে দুঃখ দিয়ে আমার সব কিছু ভুলিয়ে দেয় না ! এমনি কঠোরতা—না, এর চেয়েও সাংঘাতিক পরুষতা—আমি সব সময় চাইছি, কিন্তু পাই খুব কম ! তাই আমার শাস্তির দরুন ঐ দু'ঘণ্টা খাটুনি হয়ে যাবার পর আমি হাবিলদার সাহেবের পাটাতন করা বুকে

জোর দুটো থাপ্পড় কসিয়ে বাহবা দিয়েছিলাম ! তীক্ষ্ণ উৎসাহের চোটে থাপ্পড় দুটো এতই রুক্ষ আর বে-আন্দাজ ভারি হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর চোখে সত্য-সত্যই 'ভুগ্‌জুগুনি' জ্বলে উঠেছিল। তাঁর চোখের তারা আমড়ার আঁটির মতন বেরিয়ে পড়লেও লজ্জার খাতিরে তিনি কিছুই হয়নি বলে কপট-হাসি হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। পরে কিন্তু তিনি সানন্দে স্বীকার করেছেন যে, আমি বাস্তবিকই তাঁকে একটু বেশি রকমই বে-সামাল করে ফেলেছিলাম এবং তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, এ-রকম কারে পড়লে দিনেও তারা দেখা যেতে পারে ! তবু এই হাবিলদারজিকে বাহাদুর পুরুষ বলতে হবে ; কারণ অন্যান্য নায়ক হাবিলদারদের মতন সে অপরাধীকে না ঘাঁটিয়ে বসে থাকতে দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে না—কর্তব্যে অবহেলা করে না। তাই আমাদের সৈনিক-সঙ্ঘ এঁর নাম রেখেছে, পাষণ্ড দুশমন সিং। এ বেচারা লেখা-পড়া জানে কম, কিন্তু নাচো কুদো ভুলো মৎ অর্থাৎ কাজের বেলায় ঠিক—একদম ঘড়ির কাঁটার মতো ! তাই আমাদের শিক্ষিত হাম্‌বাগের দল এখনো সাধারণ সৈনিক এবং ইনি শিগগিরই ভারপ্রাপ্ত সেনানী হতে যাচ্ছেন। ... পল্টনে এসে গাফেলিই তো এক মহা অন্যায়, তার ওপর ব্যাটা ছেলের আবার দুর্বলতা দেখে দেখি—পাছে বাংলার ননীর পুতুলদের নধর গায়ে একটু আঁচ লেগে তা গলে যায়, তাই তাঁদের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে উচ্চ সেনানীদের দিনকানা করা হয় ! যেই কোনো লেফ্‌টেন্যান্ট কাজ দেখতে আসেন, অমনি তারা এমনি নিবিষ্ট মনে, এত জোরে কাজ করতে থাকেন যে, তা দেখে স্বয়ং ব্রহ্মাও 'সাবাস জোয়ান' বলবার কথা ! কিন্তু সে যখন দেখে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা কাজ হওয়া উচিত ছিল, তার এক-চতুর্থাংশও হয়নি, তখন বেচারার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না ! গভীর গবেষণা করেও তার গোবরগাদা মগজে এর কারণটা আর সেঁদোয় না—আর কাজেই তাকে বলতে হয় 'বাঙালি জাদু জান্‌তা হেয় !' অবশ্য সবাই নয়, কিন্তু এই রকম করে অনেকেই বাঙালি ছেলেগুলোর কাঁচা মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। কাজেই আমার সঙ্গে এই ধরনের সব সৈনিকের প্রায়ই মুখোমুখি এবং সময়ে সময়ে হাতাহাতিও হয়ে যায়, আর শাস্তি ভোগটা করতে হয় আমাকেই সব্‌সে জিয়াদা ! রাজার জন্য কাজ না-ই করলি, কিন্তু এওতো একটা শিক্ষা ! যে-সামরিক শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য বাঙালি এই প্রথম লাভ করেছে, তাকে এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত ? আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের লোকের এত আশা, আমাদের প্রতি তাঁদের এত স্নেহ-আদরের সম্মান আমাদের প্রাণ দিয়েও রাখতে হবে। প্রাণ তো দিতেই এসেছি, তাই বলে লক্ষ্যচ্যুত হলে চলবে কেন ? এ-ভীরুতা যে সৈনিকের দুরপনেয় কলঙ্ক। ... পুরুষ-কা বাচ্চা পৌরুষকে বিসর্জন দেবো কেন ? সৈনিকের আবার দয়া-মায়া কিসের ? সিপাই-এর দিল হবে শক্ত পাথর, বুক হবে পাহাড়ের মতন অটল, আর বাহু হবে অশনির মতন কঠোর !—গর্দানে একটা 'রদ্দা' বসালেই যেন বুঝতে পারে, হাঁ পৃথিবীও ঘোরে, আর স্বর্গ মর্ত পাতাল বলেও তিনটে ভুবন আছে। মরদের যদি মর্দামিই না রইল, তবে তো সে নি-মোরাদে। পুরুষ মানুষের এরকম 'মাদিয়ানা' চাল দেখে মর্দানি আজকাল বাস্তবিকই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।

তারপর, আমার জন্যে বিশেষ কোনো চিন্তিত হবার দরকার নেই এখন, সম্প্রতি মাসখানেকের জন্যে। কারণ, গত পরশু এক শুভলগ্নে আমি আমার কোম্পানির সেনানী এক কাপ্তেন সাহেবকে একই ঘুষিতে 'চাঁদা মামা' দেখিয়ে এখন বন্দিখানায় বাস করছি! বড় দুঃখেই তাঁর সঙ্গে এরকম খোট্টাই রসিকতা করতে হয়েছিল, কেননা তিনি কিছু দিন থেকে নাকি আমার প্যারেড ও কাজে অসাধারণ চটক, নৈপুণ্য এবং কর্তব্য-পরায়ণতা দেখে আসছিলেন, তাই সেদিন যখন মেসোপোটেমিয়া যাবার জন্যে আমাদের 'বিবাহের খাকি-চেলি পরিধান-পূর্বক নববধূর মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আড়-চোখে-চোখে আমাদের পতি-দেবতাস্বরূপ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের শুভাগমন প্রতীক্ষা করছি আর ঘেমে তেতে লাল হচ্ছি—অবশ্য লজ্জায় নয়, খর চাঁদি-ফাটা রোদ্দুরের তাপে,—তখন হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাদের কোম্পানির সুবাদার সাহেবকে বললেন যে, আমার মেসোপোটমিয়া যাওয়া হবে না, নতুন রং-রুটদের শিক্ষা দেবার জন্যে করাচিতেই থাকতে হবে এবং আমাকে ঐ খেসারতের ক্ষতিপূরণস্বরূপ লান্স্-নায়কের পদে উন্নীত করা হবে। কথা শুনে আমার অঙ্গ জুড়িয়ে গেল আর কি! তাই তাঁর এ অন্যায় আবদারে প্রতিবাদ করায় তিনি বেদম খাপ্পা হয়ে চোখ রাঙিয়ে উঠলেন,—'মেরা হুকুম হেয়।' তোর হুকুমের নিকুচি করি! জানিস তো পুরুষের রাগ আনাগোনা করে,—তাই যেই দাঁত খিচিয়ে উঠেছে, অমনি চোস্ত্ গোছের পরিপক্ব একটি ঘুষি সাহেবের বাম চোয়ালে, তিনিও অবিলম্বে পপাত ধরণীতলে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পতন ও মূর্ছার' হাতে কলমে অভিনয়! তারপর, আমায় ঠেলে ঢোকানো হলো 'কোয়ার্টার গার্ডে' বা সামরিক হাজতে; তারপর বিচারে ২৮ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও গারদখানায় বাস! কুচ পরোয়া নেই। আমি এই সশ্রম কারাদণ্ডকে ভয় করলে আর জান দিতে আসতাম না! দুঃখ-কষ্টই তো আমার অপার্থিব চিরদিনের চাওয়া-পাওয়া ধন। ও যে আমার অলঙ্কার! তাই হাসিমুখেই তাকে বরণ করে নিয়েছি! আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি সাহেবকে ও-রকম আপ্যায়িত করেছিলাম কেন? তাতে আমি শুধু এইটুকু বলেছিলাম,—'সাহেব! সৈনিক হয়ে এসেছি মারামারি করবার জন্যই, প্রেম করবার জন্যে নয়!' তাছাড়া, দেখো না ভাই, একে আমার মনের ঠিক নেই এবং মনের সে তিক্ত ভাবটাকে কোনোরূপে চাপা দিতে চাইছিলাম দু'দিন বাদে আগুন দেখতে পাব এই আনন্দে,—আর ঠিক সেই সময় কিনা তিনি এসে আমায় 'কেতার্থ' করে দিলেন!

অতএব এখন কি করে আমার দিন কাটছে, আন্দাজেই মালুম করে নিতে পারবি। কিন্তু সে রকম ভাবতে পারাটাও তোমাদের অসামরিক লোকের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার; কারণ, সৈনিকের খাটুনি ধস্তাধস্তি কুস্তাকুস্তিও দেখোনি এবং তাদের মিলিটারি শাস্তি বা গারদখানার ধারণাও তোমাদের কল্পনার অতীত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। এখন খোদার নাম নিয়ে ভোরে উঠেই আমার গারদের ভিতর বসে হাত-পায়ের শিকলগুলোর ঝঙ্কার দিই। আহ্ সে কি মধুর বোল! আমার কানে তা যে-কোনো তিলোত্তমা-তুল্য ষোড়শী কুমারীর বলয় নূপুর রেশমি চুড়ির মধু শিঞ্জনের চেয়েও মিষ্টি হয়ে বাজে! তারপর শ্রীমান গুপীচন্দ্রের শিঙের (বিউগল) আওয়াজ 'কখন শুনি কখন

'শুনি' করে যুগল কর্ণ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। রাই বিনোদিনীর মতোই অহম্ জু–বন্দিনী তখন হাঁশ–পাঁশ করে ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের খাকি বসনও ভীতি–সঙ্কোচে আন্দোলিত হতে থাকে এবং আয়ান ঘোষ–রূপ এই লাঙ্গনায়েক নারায়ণ ঘোষের গোয়াল বা গারদ–ঘরে বসে শুনি,—'ঐ বুঝি বাঁশি বাজে !' অবিশ্যি, তা বন–মাঝে নয়, সন্ত্রস্ত মন–মাঝে !—হায়, সে কোন্ শ্যাওড়াতলায় হেলমেট–চূড়া–শিরে রাইফেল–বংশী হাতে আমার সান্ত্রী–কালাচাঁদ ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে আছেন ! আমার এই শ্যামকান্তের ত্রিভঙ্গ নাম সার্থক, কেননা বুটপট্টি পরার পর তাকে ঠিক তিন জায়গায় ভঙ্গ বলে মনে হয় প্রথম, পট্টি–লেপ্টানো পায়ের উপরে হাঁটুতে 'দ'–এর মতো একটা ভঙ্গ ; দ্বিতীয় তাঁর কোমর–বন্ধের বাঁধনের ঠেলায় এবং কতকটা স্বভাবতই ভঙ্গ ; তৃতীয় তাঁর স্বর ভঙ্গ। আরো আছে তাঁর পৃষ্ঠদেশ অষ্টাবক্র মুনির মতন বাঁকা বলে আমরা তাঁর নাম দিয়েচি 'ফ্লাগব্রোকেন' অর্থাৎ কিনা ধ্বজ–ভঙ্গ ! কিন্তু ঐ অষ্টাবক্রীয় ভঙ্গটাও হিসেবের মধ্যে ধরলে উনি চতুর্ভঙ্গ হয়ে যান বলে ওটা এখন ধরতার মধ্যে ধরিনে। ... হ্যাঁ, তারপর আমায় কি করতে হয় শোন। শ্রীদাম–রূপ ধরা–ধারী তাঁর এক সখা এসে আমায় কালার গোষ্ঠে নিয়ে যান ; আমিও মহিষ–গমনে আনত নেত্রে তাঁর অনুগমন করি। পথের মাঝে আমার লাজ–বিজড়িত শৃঙ্খল–পরা চরণে পঞ্চমে–বোলা বাণী বেজে ওঠে,—'রিনিকি ঝিনিকি রিনি ঝিনি রিনিকিনি কিম্নিরে।' তারপর এই মুখর 'মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জিরে' পথের যুবকবৃন্দকে চকিত করে গোষ্ঠে গিয়ে ঘন্টা দুই গোষ্ঠবিহার ! অর্থাৎ শ্যামের হুকুম মতো সামনের একটা ছোট্ট তালতমালহীন পাহাড় বারকতক দৌড়ে (ডবল মার্চ করে) প্রদক্ষিণ করে আসা—সেই দৌড়ানোর মাঝে মাঝে 'ডবল মার্ক টাইম' করা বা শিব ছাড়া যে সৈনিকেও তাণ্ডব নৃত্য করতে পারে, তা দেখিয়ে দেওয়া,—মধ্যে পরিখা–নল ডিঙিয়ে মর্কট–প্রীতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি। এ–সব লীলারে লীলা, একেবারে রাসলীলা ! এই দুই ঘণ্টা অমানুষিক কসরতের পরেও যখন পৈতৃক প্রাণটা হাতে করে ঘরে ফিরি, তখন স্বতই মনে হয়—নাঃ, 'শরীরের নাম মহাশয়' হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয় ! এ মহাশয়কে যা সওয়াবে তাই সয়। তারপর বেলা এগারো–বারোটায় যে আ–কাঁড়া রেঙ্গুনি চালের সফেন ভাতের মণ্ড আর আ–ছোলা আলুর ঘেঁট খেতে পাই, তা দেখে আমরা বলদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জীব বলে তো মনে হয় না। ডাল যা দু'–একদিন হয়, তাতে নাকে–কানে সরষের তেল দিয়ে ডুব মারলেও কলাই–এর সন্ধান পাওয়া যাবে না ! সকালে একবার ভেলি গুড় দিয়ে তৈরি এক হাতা যা চা পাই, তা না বলে দিলে বহু গবেষণাতেও কেউ চিনতে পারবে না যে, এ আবার কোন চিজ ! এ যেন রোগীকে জবরদস্তি করে পথ্য গেলানোর মতো, 'খাবিতো খৈ খা, না খাবি তো খৈ খা !' যাহোক, অতক্ষণ খাবি খাওয়ার পর ঐ জাব খাওয়াই তখন পরম উপাদেয়, অমৃত বলে বোধ হয়। তারপর একটু বাদেই পাথর কুড়ানো, ভাঙানো, আবার সন্ধেয় ঐ রকম প্যারেড বা গোষ্ঠবিহার এবং আরো কত বিশ্রী–সুশ্রী কাজ। সেসব শুনলে তোমার চক্ষু কাঁকড়ার মতন কোটরের বাইরে ঠেলে বেরিয়ে পড়বে। ... তবু কিন্তু বুক ফুলিয়ে বলছি বেড়ে আরামেই আছি। আমি এই পিঁজরা–পোলে আটক থেকেও কি করে হরদম গান গাই,

তা এখানকার সান্ত্রীসঙ্ঘ বুঝে উঠতে পারে না। এই দ্যাখ না, তোকে চিঠি লিখতে বসেছি,—আর সঙ্গে সঙ্গে গানও ধরে দিয়েছি,—

আরো আঘাত সইবে আমার সইবে আমারো,
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।

এই রকমে আমার দিনগুলো এখন যাচ্ছে, 'আদম-গাড়ি'র (রিকশা) মতন একঘেয়ে হচং করে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে।

শুনছি, কয়েদ হওয়ার দরুন আমায় নাকি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেতে দেওয়া হবে না। যদি তা হয়, তাহলে আর এক কাণ্ড করে বসে থাকব। তা এখন বলছিনে। এ-ব্যাটারা তো বুঝবে না যে, আমি কি জন্যে পল্টনে এসেছি। তাই সকলেই আমাকে শুধু ভুল বোঝে। অধিকাংশ সৈনিক যখন পদোন্নতির জন্য লালায়িত, তখন আমাকে প্রমোশন দিতে গেলেও আমি নিই না দেখে ওরা আমাকে 'কাঠখোট্টা' 'গোঁয়ার', 'হোড়' প্রভৃতি দুষ্পাচ্য গালাগালি দেয়। কিন্তু আমি জানি, দুঃখকে পাবার জন্যেই আমি এমন করে বাইরে বেরিয়েছি। আমি রাজা ও দেশের জন্যে আসি নি। অত বড় দেবতা বা স্বার্থত্যাগী মহাত্মা হয়ে উঠতে পারিনি এখনো ; আত্মজয়ই করতে পারলাম না আজো, তা আবার দেবতা ! তাই আজো আমি রক্তমাংসের গড়া গোঁয়ার গর্দভ মানুষই রয়ে গেলাম।... পরে বরং দেবতা হবার অভিনয় ও কসরত করে দেখা যাবে, যদি এই দুঃখ-কষ্ট বেদনা-ব্যথা বলে কোন জিনিস জানা নেই, যদি তাই হয়, তবে ও আনন্দ-বিহীন নির্বিকার দেবত্বকে দূর থেকেই হাজার হাজার সালাম ! যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে, তবে সে জীবন যে বেনিমক, বিস্বাদ ! এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে ; আর আজো সে ছুটেছে আমার পিছু পিছু উল্কার মতো উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে ! দুঃখও আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়ব না। সে যে আমার বন্ধু—প্রাণপ্রিয়তম সখা,—আমার ঝড়-বাদলের মাঝখানে নিবিড় করে পাওয়া সাথী ! এ পাওয়ার আনন্দের যে তীব্র নির্ম্মমতা ভরা মাধুর্য, তাকে এড়িয়ে যাবার সব শক্তি ঐ পথে পাওয়া বন্ধু দুঃখই হরণ করেছে। তাই বাউল গানের অলস সুরে সামনের উদাসীন পথে আমার ক্রন্দন-আনন্দ একটা একটানা বেদনা সৃজন করে চলেছে, দিগন্তের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের পানে প্রসারিত হয়ে গেছে সে-পথ। বুকের ভিতর ক্রন্দন জাগে তার সেই চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে 'এ-পথ গেছে কোনখানে গো কোন্‌খানে ?' মূক পথের সীমাহীন আধো-আবছায়া আঁখির আগে ক্লান্ত চাওয়ার মৌন ভাষায় কইতে থাকে, 'তা কে জানে !' এই অশেষের শেষ পেতে ততই প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। তাতেও কত আনন্দ ! এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা আর পথহীন পথ চলার গূঢ় আনন্দ, তা থেকে আমার অতৃপ্ত আত্ম-তৃপ্তিকে বঞ্চিত করব কেন ? তোরা অনুভূতিহীন আনন্দবিহীন পাথরের ঢেলা,—হয়তো একে 'সোনার পাথরবাটি' বা 'কাঁঠালেরআমসত্ত্ব'এর মতোই একটা অর্থহীন অনর্থ মনে করে প্রশ্ন করবি, 'যার সীমা নেই, শেষ নেই সে অজানার পিছনে ছোটার আবার আনন্দ কি।'

ঐ তো মজা ! এই অসীমের সীমা খোঁজায়, নিরুদ্দেশের চেষ্টায় যে দীর্ঘ অতৃপ্তির আশা-আনন্দ, সেই তো আমার উগ্র আকাঙ্ক্ষার রোখ চড়িয়ে দিচ্ছে। শেষ হলে যে এ-পথ চলারও শেষ, আর আমার আনন্দেরও শেষ, তাই আমি পথ চলি আর বলি,—যেন এ পথের আর শেষ না হয়। পাওয়ার আনন্দের শান্তির চাইতে, তাই আমি না-পাওয়ার আনন্দের অশান্তিকেই কামনা করে আসছি। যার জন্যে আমার এই অগস্ত্য-যাত্রা আমার সেই পথ-চাওয়া ধনকে কি এই পথের পাড়েই পাব ? সেও কি তবে আমার আশায় এই সীমার শেষে তার অনন্ত যৌবনের ডালি সাজিয়ে জন্ম জন্ম প্রতীক্ষা করে কাটাচ্ছে ! শুধু আমিই তাকে পেতে চাই ? সে কি পথ চলে না আমার আশায় ? না, না, সেও পেতে চায়, সেও পথ চলে ; নইলে কে আমায় আকর্ষণ করবে এমন চুম্বকের মতো ? কিসের এমন উন্মাদনাস্পন্দন আমার রক্তে-রক্তে টগবগ করে ফুটছে ?—তার বাঁশি আমি শুনেছি, তাই আমার এ অভিসারের যাত্রা ; আমার বাঁশি সে শুনেছে, তাই তারও ঐ একই দিক-হারা পথে অভিসার-যাত্রা ! আমি ভাবছি আমার এ-যাত্রার শেষ ঐ পথহীন পথের অ-দেখা পথিকের কুটির-দ্বারে,—পথের যে-মোহানায় গিয়ে পথহারা পথিক ঐ চেনা বাঁশির পরিচিত বেহাগ-সুর স্পষ্ট শুনতে পায়। সে বেহাগ-রাগে মিলনের হাসি আর বিদায়ের কান্না আলো-ছায়ার মতো লুটিয়ে পড়ে চারিপাশের পথে। কারণ ক্লান্ত পথিক এই চৌমাথায় এসে মনে করে, বুঝি তার চলার শেষ হলো ; কিন্তু সেই পথেরই বাঁক বেয়ে বেহাগের আবাহন তাকে অন্য আর এক পথে ডেকে নেয়। তারপর সকালের পথ তাকে বিভাসের সুরে, দুপুরের পথ সারেঙ-রাগে আর সাঁঝের পথ পূরবীর মায়াতানে পথের পর পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যায় ! হায়, একি গোলকধাঁধা ? কোথায় সে পথের বঁধু যার বাঁশি নিরন্তর বিশ্বমানবের মনের বনে এমন ঘর-ছাড়া ডাক ডাকছে ? যার অশরীরী ছোঁওয়া শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সারাক্ষণই বাইরে-ভিতরে অনুভব করছি, যে শুধু দুষ্টুমি করে পথই চালাচ্ছে, ধরা দিয়ে ধরা দিচ্ছে না ? পেয়েও তবে এই না পাওয়ার অতৃপ্তি কেন ? এর সন্ধান কে দেবে ? যে যায়, সে তো আর ফেরে না। এ অগস্ত্য-যাত্রার মানে কি ? ...

দুঃখ বলেছে সে আমাকে ঐ পথের শেষ দেখাবে। সে নাকি আমার ঐ বঁধুয়ার সখা। কোন পিয়াল বনের শ্যামলিমার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে চোর চপল তার বাঁশি বাজাচ্ছে, তাই সে দেখিয়ে দেবে ! তার সাথে গেলে সে এই লুকিয়ে লুকোচুরি ধরিয়ে দেবে। তাই দুঃখকে বরণ করেছি, তাকেই আমার পথের সাথী করেছি। সুখে যে-ক্লান্তি আছে, এ দুঃখে তা নেই ; এর বেদনা একটা বিপুল অগ্নি-শিখা বুকের মাঝে জ্বালিয়ে রেখেছে—সে-শিখা ঝড়ে নেভে না, বাদল-বর্ষায় ঠাণ্ডা হয় না। এই আগুন-শিখার নামই অশান্তি। আমার জীবন-প্রদীপ ততক্ষণই জ্বলছে আর জ্বলবে, যতক্ষণ এই অশান্তির 'রওগান' বা স্নেহপদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছে আর রাখবে। আগুন, ঝড়-ঝন্‌ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঘাত, বেদনা—এই অষ্টধাতু দিয়ে আমার জীবন তৈরি হচ্ছে, যা হবে দুর্ভেদ্য-মৃত্যুঞ্জয়—অবিনাশী !—আমার এ পথ শাশ্বত সত্যের পথ,—বিশ্বমানবের জনম জনম ধরে চাওয়া পথ। আমি আমার আমিত্বকে এ পথ

থেকে মুখ ফিরাতে দেবো না। পথ-বিচ্যুতি ঘটাতে সুখ তো প্রলোভন দেখাবেই ; কেননা তার দুশমন 'দুঃখ' যে আমার সাথী ; কিন্তু আর ফিরছিনে। এই যে দুঃখের বুক আঁকড়ে ধরেছি, এ আর ছাড়ছিনে ! আমি আজ আমার এই বিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা এবং দশ-বিশে দুশো বছরেরও বেশি আঘাত-বেদনা নিয়ে সত্য করেই বুঝেছি যে, দুঃখী যখন আনন্দকে পেতে সুখের পেছনে মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগের মতন অনুসরণ করে, তখন সে তার দুঃখের দৌলতে যে আনন্দটুকু পেয়েছিল তা তো হারায়ই, উল্টো সে আরো অনেকখানি পেছনে অসোয়াস্তির গর্তে গিয়ে পড়ে। তারপর তাকে আবার সেই আগে-চলা দুঃখের পথ ধরেই চলতে হয়। মৃগ-তৃষ্ণিকার মতো সুখ শুধু দূর-তৃষিত মানবাত্মার ভ্রান্তি জন্মায়, কিন্তু সুখ কোথায়ও নেই—সুখ বলে কোনো চিজের অস্তিত্বও নেই ; ওটা শুধু মানুষের কল্পনা, অতৃপ্তিকে তৃপ্তি দেবার জন্যে কান্নারত ছেলেকে চাঁদ ধরে দেবার মতো ফুসলিয়ে রাখা। আত্মা একটু সজাগ হলেই এ প্রবঞ্চনা সহজেই ধরতে পারে। ...

ওহ্, মাথাটা বড্ডো দপদপ করছে রে। গাটাও শির-শির করছে। কি লিখতে গিয়ে কি যে ছাই-পাঁশ এক ঝুড়ি বাজে বকলাম, তা ভেবে উঠতে পারছিনে। চিঠিটা আর একবার যে পড়ে দেখতে পারব তারও কোনো আশা নেই, এমনি শরীর-মনে অবসাদ আসছে। তার ওপর আবার আর এক জুলুম, করাচিতে এখন খুব বসন্ত আরম্ভ হয়েছে। খোদা এখন দুনিয়ার কিছু খরচ কমাতে ইচ্ছে করেন বোধ হয়। বসন্ত-রোগাক্রান্ত রোগীর চেয়ে যাদের বসন্ত হয়নি, তাদের জুলুমেই আমরা শুদ্ধ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমাদের লাইনের ওপারেই 'সোলজার বাজার' বলে একটা জায়গা আছে, সেখানেই বসন্ত-ভিতু আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা মিলে এমন বীভৎস কণ্ঠে হরি-সঙ্কীর্তন করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সামনের সাগর-শয়ান নারায়ণকে মুগ্ধ করে প্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা করছে যে, নারায়ণের যদি এতটুকুও সঙ্গীত-জ্ঞান থাকে, তাহলে এতক্ষণ তিনি শ্বশুর-বাড়ি ক্ষীরোদ সাগরের আয়েশ, লক্ষ্মীর পরিচর্যা ইত্যাদি সব কিছু ছেড়ে সোজা আমেরিকা-মুখো হয়ে ছুট দিয়েছেন। লক্ষ্মী সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিনে, কেননা তার সতিন ব্যতীত তাঁর সঙ্গীত-জ্ঞান সম্বন্ধে আমার সঠিক কোনো খবর জানা নেই। নারায়ণ দেখেন যে, দায়ে দৈবে না পড়লে, এই-সব মনু-সন্তানগণ তাঁর প্রতি অতি-ভক্তি দেখিয়ে চোরের লক্ষণ প্রকাশ করে না, বা তাঁর সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায় না, তাই তিনি অনেক সময় সমস্যায় পড়ে যান যে, তাঁর শ্বশুরালয়-সমুদ্রের গভীরতা বেশি, না, এই ভক্তগুলির ভক্তির গভীরতা বেশি ! আর, তাঁর এই রকম সমস্যা সমাধান করতে করতে ততক্ষণে অসহায় মানবকুলের অবস্থা 'গুড়োয় মুড়ি দু'আঙুল' গোছ হয়ে পড়ে এবং তাই তারা খঞ্জনী বাজিয়ে খোল পিটিয়ে ছাগ মোষ বলি দিয়ে জোর চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয় !

যাক, নারায়ণ তো এখন এই রকম কোনো প্রকার লটপটিয়ে এক দিকে ছুট দিয়েছেন, কিন্তু এদিকে 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'র মতো আর এক আপদের আমার নাকের ডগায় অভিনয় হচ্ছে। আমাদের খাকি-গেরুয়া-ধারী অতি ভক্ত সৈনিকবৃন্দ

'হরির কৃপায় দাড়ি গজায়, শীতকালে খায় শাঁখআলু' শীর্ষক ভক্তিরসাপ্লুত কীর্তনগানের সাথে সাথে 'কাছা খুলে বাহু তুলে' যে রকম প্রলয় নৃত্য শুরু করে দিয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে মহাদেবও তাঁর ভূত-প্রেত-বলদাদিসহ কৈলাস-হিমালয় ছেড়ে এতক্ষণে তিব্বত পেরিয়ে পড়েছেন। খোলের প্রচণ্ড চাঁটির মাঝে মাঝে 'গিজাং তাল ভটাভট (গাছের একটা সমস্বর তীক্ষ্ণ ঋষভ চিৎকারের চোটে 'ঐ—নিলে রে' বলে তাঁর ভূত-প্রেত-ডাকিনী-বর্গ যেমন অস্বাভাবিক ছুট ছুটছে, হর-গৌরী-পৃষ্ঠে ঊর্ধ্ব-লাঙ্গুল বৃষভ সিলহও পিট-টান দিয়েচে তেমনি উল্কা বেগে,—এ আমি আমার মনের চোখে বায়স্কোপের মতো সাফ দেখতে পাচ্ছি! আজ হাত-পা নিসপিস করে উঠছে—মনে হচ্ছে এই হাজতখানার লোহার শিকলগুলো ভেঙে ওদের মাঝে গিয়ে খুব এক চোট দড়াম্ দড়াম্ করে উলঙ্গ নাচ নেচে দিয়ে আসি। ...

থাক—বাপ্স্! এসব প্রলয়কাণ্ড এতক্ষণে একটু শান্ত হলো! ...

আজ বুঝি অমাবস্যার রাত্তির। নিবিড়-কালো যামিনী। আকাশের ছায়াপথ দেখে মনে হচ্ছে, ও-ছায়াপথ যেন এই কালো যামিনীর সিঁথিপাটি পরা সিঁথি। অস্তোন্মুখ সন্ধে-তারা সেই সিঁথির মুখে সতীর কপালে সিন্দুর বিন্দুরমতো রক্তরাগে জ্বলছে। তার এলিয়ে-দেওয়া কালো চুলের মাঝে মাঝে তারার ফুল গোঁজা রয়েছে। আকাশ-বেয়ে পড়া ঐ গভীর কালো এলোকেশের কুঞ্চিত রাশ ধরণীর বুকে-মুখে লুটিয়ে পড়েছে। এক একটা তারা খসে পড়ছে আর মনে হচ্ছে অসম্বৃত এই কালো রূপসীর মাথা থেকে অসাবধানে এক আধটি করে কুসুম খসে পড়ছে। ... কোন কান্তের আশায় রজনী রোজ তার এ-কালো রূপ নিয়ে অভিসারে বেরোয়? কেন সে অনন্তকাল ধরে এমন করে ভোরের পাণ্ডুর ক্লান্ত হাসিতে মিলিয়ে যায়? প্রভাতের ভৈরবী-সুর-সিক্ত শীতল বায়ু-হা হা স্বরে যেন তারই না-পাওয়ার নিরাশা-ক্লান্তি আর পাবার আশায় আনন্দ ব্যক্ত করে। যামিনীর যেমন এ-প্রতীক্ষার অন্ত নেই, আমারও তেমনি এ পথ-চলার আর শেষ নেই। ...

আমার এত ইচ্ছে করছে এই যামিনী অভিসারের আশা-নিরাশা নিয়ে একটা সুন্দর কবিতা লিখতে, কিন্তু—আ রে তওবা, আমার কবিতা লেখা যা আসে, তা কতকটা এই রকম,—

নেবুর ফুল আর করম্চা,
লাও এক কাপ গরম চা।

এইবার 'ক্ষেমা দিই, হাতে খা'ড় ধরে গেল। তোরও নিশ্চয় মুখে ব্যথা ধরবে পড়তে। এইবার 'শ্রান্ত বায়ে ক্লান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।'

যদি কষ্ট দিয়ে থাকি ক্ষমা করিস।

স্বেচ্ছাচারী
নূরুল হুদা

[ছ]

সালার
১২ই ফাল্গুন

ভাগ্যবতীসু,

আমার বুক-ভরা স্নেহ-আশিস নাও। তারপর কি গো সব 'কলমি লতা' 'সজ্‌নে ফুল'-এর দল, বলি—তোমরা যে-লতা যে-দলই হও তাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু পথের পাশের এই 'অ্যালোক-লতা' 'ঘল্‌ঘসি ফুল' দু'একটারও তো সেই সঙ্গে খবর নিতে হয়। তাতে তোমার হয়তো কলসিভরা ভালোবাসাতে খাঁকতি পড়বে না। পোড়াকপাল আমাদের ভাই, তাই আমাদের আর কোনো লতা-পাতা ফুল-ফল জুটল না। সে যা-ই হোক, এখন তোমার গুর্বী এই গরিব ভাবিজিকে কি এক-আধখান চিঠি-পত্তর দেবে ? না, তাতে তোমার সখা-সখির মধু-চিন্তায় বাধা পাবে ? এখন তোমাদের সই-এ সই-এ কত কথাই না হবে, আমাদের মতো তৃতীয় ব্যক্তির তাতে শুধু হাঁ হাঁ করে চেয়ে থাকাই সার। এখন 'সজন্ সজন্ মিল গিয়া, ঝুট পড়ে বরিয়াত !' আচ্ছা, দেখা যাবে,—এক মাঘে শীত পালায় না ! যদি তোমায় এই ঘরে আনতে পারি, তা হলে এই এক-চোখোমির হাড়ে-হাড়ে শোধ তুলব। মনে থাকে যেন, আমি এখন এই ঘরের কর্ত্রীঠাকরুন !

... আহা, যাক ও-সব কথা। 'ভাবি'র দাবি নিয়ে ননদের সাথে একটু রঙ্গ-রসিকতা করে নিলাম বলে তুমি রাগবে না হয়তো ? মনে করো না যেন যে, তুমি পত্র দাওনি বলে আমি সত্যি-সত্যিই রেগেছি বা অভিমান করেছি। আমি এখানে সুখে দুটো ভাত গিলছি বলে যে অন্যের বেদনও বুঝব না, খোদা আমায় এমন মন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠাননি। তুমি যে-কষ্ট পাচ্ছ সেখানে, তাতে আমায় পত্র না দিতে পারাটাই স্বাভাবিক। তবে ফিরতি বারে কোনো লোক যদিই আসে আর তুমি সুবিধে করতে পারো, তবে অন্তত গোটাকতক জরুরি কথাও লিখে পাঠিয়ো। সে জরুরি কথা আর কিছু নয়, কেবল নূরুর পল্টনে যাওয়ার আগে বা পরে কোনো চিঠি-পত্তর খবরাদি রাখো কিনা, তাই একবার লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে আমায় জানিয়ো। অবশ্য, এ-রকম অনুরোধ করাটা বেজায় বেহায়াপনা, এর উত্তর দেওয়াটাও তোমার পক্ষে আরো বেশি লজ্জাকর ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু বোন, বড় দায়ে পড়েই এ-রকম বেহুদা অনুরোধ করতে হচ্ছে তোমায়। তুমি আমাদের আর নূরুর সমস্ত অবস্থাটাই বুঝছ, কাজেই এ সময়—এই মরণ-বাঁচনের কথায় লজ্জা করলে চলবে না। এখন নূরুকে ফিরিয়ে বাঁচিয়ে আনার জন্যে আমাদের চেয়ে তোমাদের দায়িত্বটাই বেশি,—কেমন ? যদি পারো একবার একটা চিঠি দিতে পারো তাকে ? ইস, এতক্ষণ বোধ হয় শরমে লাল হয়ে উঠেছিস ? ওগো, এমন 'পেটে খিদে মুখে লাজ' করলে চলবে না। নিজের জিনিসকে যদি নিজে অবহেলা করে হারাও, তাহলে আখেরে পস্তাতে হবে বলে দিচ্ছি। তোমার মনের সত্যিকে বাইরে

প্রকাশ করবার শক্তি যদি থাকে, তাহলে এই লোক-দেখানো লৌকিকতার মুখ রাখতে গিয়ে কি নিজে ভিখারিনি সাজবে? অবশ্য, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখতে বলছিনে, শুধু দু'-চারটি লাইনে সোজা কথা,—'কেমন আছেন, খবর না পেয়ে বড্ডো ছটফট করছি!' ব্যস তাহলে দেখবি, আমি বলে রাখলাম, এতেই সে খুশির চোটে একবারে দশ লাফ মেরে উঠবে।

সব কথা বলবার আগে এইখানে আমার দোষটা আগে প্রকাশ্যে কবুল করে ফেলি, নয়তো তুমি আমার কথার ধরন-ধারা দেখে গোলক-ধাঁধায় পড়ে যাবে। দোষটা আর কিছু নয়, কেবল সোফির বাক্স থেকে তোমার চিঠিটা অতি কষ্টে চোরাই করে পড়ে ফেলেছি! অবশ্য, অন্য কাউকে তা দেখাইনি বা শুনাইনি। এটা পড়বার পরে হয়তো দোষের বলে ভাবতে পারি, কিন্তু অন্তত চিঠিটা গাপ করবার সময় এ-কথাটি মনে হয়নি। পাছে আমার এ-রকম ত্রুটি স্বীকারে 'ঠাকুর ঘরে কে রে,—না, কলা খাইনি'-রূপ হাস্যাস্পদ কৈফিয়তের সন্দেহ তোমার মনটাকে সশঙ্ক চঞ্চল করে তোলে, তাই এই আগে থেকে কৈফিয়ত কাটলাম। তুমি এতে রেগো না বোন। কারণ আমি নিঃসন্দেহে ঘোষণা করতে পারি যে, মেয়েদের এই চুরি স্বভাবটা কিছুতেই যাবে না, তা তাঁরা এটা এড়িয়ে চলবার যতই কেন কসরৎ দেখান না। 'ইল্লৎ যায় ধুলে, আর খসলৎ যায় মলে' এই ডাক-পুরুষে কথাটি একদম খাঁটি সাচ্চা বাত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতিতে যে-সব বাছা-বাছা চিজ চুরি করার অপরাধে অপরাধিনী করা হয় (যেমন কি, মন চুরি, প্রাণ চুরি ইত্যাদি) আমি সে-সব চুরির কথা বলছিনে, কিন্তু মেয়েদের এই চুরি করে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনা, চুরি করে দেখা, চুরি করে অন্যের পত্রটি বে-মালুম গাপ করে নিদেনপক্ষে একবার পড়ে নেওয়া, এই চুরিগুলো যে ভদ্র-মহিলা ঝুটা বলে উঠিয়ে দেবেন তিনি যে সত্য কথা বলছেন না, এ আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি! এ-বিদ্যা যে আমাদের মজ্জাগত, জন্মগত। যাক—।

তোমার চিঠিতে যা সব লিখেছ, তা নিয়ে আর তোমায় লজ্জা-রাঙা করে তুলব না। আমার পক্ষে ও-আলোচনা অন্যায়, কেননা আমি নাকি তোমার মহামাননীয়া ভাবি সাহেবা, পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী অর্থাৎ একাধারে দুটো মস্ত আদব-কায়দা দাবি-দাওয়া-কারিণী। তোমাদের মতো এ-রকম বিশ্রী হলেও কই আমি তো তোমাদের কখনো এ-রকম বিশ্রী শিক্ষা দিই নি। আমি ভালোবাসতে স্নেহ দিতে শিখিয়েছি, কিন্তু ভয় করে ভক্তি করাটা কখনো শিক্ষা দিইনি। অবশ্য আমায় ভালোবাসো না ভক্তি করো জানি না। যদি কোনো দিন ও-রকম পাঠশালার ছেলের গুরুমশাইকে ভক্তি করার মতো আমাকে ভয়-ভক্তি করে থাকো, তবে এখন থেকে আর তা করো না! এটুকু না লিখে পারলাম না বলে তুমি যেন কষ্ট পেয়ো না।

তোমার দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো আমার বুকে তীরের ফলার মতো এসে বিঁধেছে। তুমি কি বুঝবে মাহ্‌বুবা, আমি যখন আসি তুমি তখন ছিলে পাড়াগাঁয়ের সাদাসিধে অশিক্ষিতা সরলা বালিকা, আমিই যে তোমায় এত কষ্ট করে এতদিন ধরে মনের মতোটি করে গড়ে তুলেছি। তোমাদের লেখা-পড়া শিখিয়ে আমার নববধূ কালটা বড্ড

আনন্দেই কেটে গিয়েছে। সোফিটা বড় দুষ্ট, সে তো আর তেমন শিখতে পারলে না, কিন্তু তোমার ঐ বিদ্রোহ-অভিমান-মাধুর্যের সাথে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ আমায় তোমাকে একটু বেশি করেই ভালবাসতে বাধ্য করেছিল। তারপর যখন শুনলাম তুমি আমাদেরই ঘরের বৌ হয়ে থাকবে, তখন সে কি যে আনন্দে আর গর্বে আমার প্রাণ শতধারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে বললে তুমি হয়তো বাড়াবাড়িই মনে করবে। আগে যখনই মনে হতো, আমার-পোষা-পাখি-তুমি হয়তো অন্য কারু সোনার খাঁচায় বন্দিনী হয়ে কোন দূর দেশে চলে যাবে, তখন একটা হিংসুটে বেদনায় যেন আমি বড্ডো অসুস্থতা অনুভব করতাম। এ-ভাবটা কিন্তু আমার মনে জেগেছিল নূরুল হুদা আমাদের বাড়ি আসবার পর থেকে। তোমাদের দু'জনকে দেখলেই আমার মনে মধুর একটা আকাঙ্ক্ষা রঙিন হয়ে দেখা দিত, কিন্তু নূরুর খাম-খেয়ালির ভয়ে, আর বনের পাখি পাছে আবার বনে উড়ে যায় এই শঙ্কায় আমি কোনো দিনই এ কথাটা পাড়তে সাহস করিনি। আমার এ-মন-গুমরানি শেষে যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়াল তখন সবাইকে বলে-কয়ে বুঝিয়ে এক রকম ঠিক করলাম, কিন্তু বনের পাখি পোষ মেনেও মানলে না। সে চলে গেল। মিঠা আর আঠা এই দুটোর লোভকেও সে সামলাতে পারছিল না, কিন্তু শেষে ডানা-কাটার ভয়টাই তার হয়ে উঠলো সবচেয়ে বেশি, তাই সে উড়ে গেল! আমার এই অতিরিক্ত স্নেহের বাড়াবাড়ির জন্যে আজ আমার যা কষ্ট, তা এক আল্লাই জানেন বোন, আর আমিই জানি। এক এক দিন সব কথা আমার মনে হয়, আর বুক যেন ফেটে পড়বার মতন হয়ে যায়! তোদের দুইজনের কাকে যে বেশি স্নেহ করতাম, তা কোনো দিন আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না, তাই তোরা দু'টিতেই আমার চোখের সামনে থাকবি, আমোদ-আহ্লাদ করবি আর আমারও দেখে জান ঠাণ্ডা হবে, চোখ জুড়াবে ভেবেই এমন কাণ্ড করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হয়ে গেল আর এক! এই যে মধ্যে গোলমাল হয়ে এত বড় একটা তাল পাকিয়ে গেল এতেও আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি, আমার যেন আশা হচ্ছে খোদা তোদের দু'-হাত এক করবেন। ... কিন্তু এইখানে একটা মস্ত কথা মনে পড়ে গেল ভাই, সত্যি কথা বলবি বোন আমায়? নূরু পল্টনে চলে যাবার কয়েক দিন আগে থেকে তোকে যেন কেমন মন-মরা দেখাচ্ছিল,—কি যেন চাপা ব্যথা তোর দেহে কাজে-কথায় অলস-ম্লান হয়ে তোকে মুষড়ে দিচ্ছিল,—আচ্ছা, আমার এ ধারণাটা সত্যি নয় কি? আজ এত দিনে এ কথাটা বলছি, তার কারণ তখন আহ্লাদের আবেশে ওটা আমি দেখেও দেখিনি। দেখলেও ভুল মনে হয়েছিল যে, বিয়ের আগে জোয়ান মেয়ের ও-রকম হওয়াটা বিচিত্র নয়। তাই তখন যেন তোর ও-মলিনমূর্তি দেখেও বেশ আলাদা রকমের একটা সুখ অনুভব করতাম। মানুষ কাছে থাকলে তাকে ঠিক বুঝে উঠবার অবসর হয়ে ওঠে না, তার নানান কাজ নানান হাব-ভাব কথা-বার্তা ইত্যাদি বাইরের জিনিসগুলোই মনকে এমন ভুলিয়ে রাখে যে, সে তার ভিতরকার কাজ অন্তরের আসল মূর্তিটার কথা একেবারেই ভেবে দেখতে পায় না। তারপর সে যখন চলে যায়, তখন তারই ঐ কাজের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি অবসর-চিন্তায় এসে বাধা দেয়, আর তখন একে একে বন্ধফুলের হঠাৎ পাপড়ি-খোলার মতন তার অন্ধদৃষ্টিও যেন খুলে যেতে থাকে এবং ক্রমেই সে তার

অন্তরের অন্তরতম ভাবগুলিকেই যেন বুঝতে পারে। তাই আজ তোরা দুজনেই যখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলি তখনই বুঝলাম যে, নাঃ, তোদের দু'জনেরই মাঝে কি যেন একটা বেদনার ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে চলেছিল, সেটার সীমা আজ কেউ দেখতে পাচ্ছিনে। কি সে ব্যবধান? কি হয়েছিল তোদের? বলবি বোন আমায়? বলবি ভাই আমায়?

জানি না বোন তোদের এই বেহেশ্‌তের ফুল দু'টির পবিত্র ভালবাসায় কার অভিশাপ ছিল। তোরা যে উভয় উভয়কে হৃদয়ের নিভৃততম মহান আসনে বসিয়ে বুকের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে অর্ঘ্য বিনিময় করতিস, তা আমার চক্ষু কোনো দিনই এড়ায়নি। তোরা হাজার ছল-ছুতো অসিলা করে খুব মস্ত মাথা নাড়া দিয়ে 'না—না' বললেও—ওরে, তোদের প্রাণের ভাষা যে চোখে-মুখে লাল অক্ষরে লেখা হয়ে ধরা পড়ত! পুরুষদের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু এ জিনিসগুলো মেয়েদের চোখ এড়ায় না, তা তারা যতই উদাসীন ভাসা-ভাসা ভাব দেখাক। তার কারণ বোধ হয়, এদিক দিয়ে অধিকাংশ মেয়েই ভুক্তভোগী। তাছাড়া, মেয়েদের আবার মন নিয়েই বেশির ভাগ কারবার। স্নেহ-ভালবাসা—সোহাগ-যত্ন রাতদিন তাদের ঘিরে রয়েছে, তাদের বুকের ভেতর ঝরনাধারার মতো নানান দিকে পথ কেটে বিচিত্র গতিতে বয়ে চলেছে আর সহস্র ধারায় বিলিয়েও এ অফুরন্ত স্নেহ-দরদ তাদের এতটুকু কমেনি। সে-কোন অনন্ত স্নেহময়ী মহা-নারীর স্নেহ-প্রপাত যেন এ নির্ঝর-ধারার উৎস! আমরা মা বোন স্ত্রী কন্যা বধূ হয়ে সংসার-মরুর আতপতপ্ত পুরুষ-পথিকের পথে মরূদ্যান রচনা করছি, তাদের গদ্যময় জীবনকে স্নেহ-কবিতা সৌন্দর্য-মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলছি, তাদের অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে দিচ্ছি,—ভালবাসা দিয়ে সব গ্লানি সব ক্লান্তি সব নৈরাশ্য দৈন্য আলাই-বালাই মুছে নিচ্ছি,—আমাদের কাছে তাই ফাঁকি চলে না! আমরা সব-জান্তার জাত। ... তাই, আমি তাদের এই চোরের মতো সন্ত্রস্তভাব দেখে (আর, বড় লজ্জার কথা, সেই সঙ্গে তোর বেহায়া ভাইজিও) মুখ টিপে হাসতাম। মানব-প্রাণের এই যে বাবা-আদমের কাল থেকে সৌন্দর্যের প্রতি প্রাণের প্রতি মানুষের টান, প্রাণের টান, গোপন পূজা—একে মানুষ কখনো ঘৃণা করতে পারে না; অবশ্য নীচমনা লোকেদের কথা বলছি না। তাই তোদের দু'জনারই মধ্যে ঐ যে একটা মজার টানা-হেঁচড়ার ভাব লাজ-অরুণ সঙ্কোচ আর সবচেয়ে ঐ ঘটি-বাটি-চুরি-করা ছেঁচ্‌কি চোরের মতো 'এই বুঝি কেউ দেখে ফেললে রে—এই ধরা পড়লামরে' ভাব আমাদের যে কি আনন্দ দিত, তা ঠিক বোঝানো যায় না। বিপুল একটা তৃপ্তির গভীর স্বস্তিতে আমাদের দু'জনারই বুক ভরে উঠত। তোর সদানন্দ ভাইটির তো দু'এক দিন চোখ ছলছল করে উঠত। আর পাছে আমার কাছে ধরা পড়ে অপ্রতিভ হয়ে যান, তাই তাড়তাড়ি 'ধ্যেৎ, চোখে কি ছাই পড়ে গেল' বলে চোখ দুটো কচলাতে থাকতেন, নয় তো এস্রাজটা নিয়ে সুর বাঁধায় গভীর মনোনিবেশ করতেন। আহা, খাপছাড়া আশ্বিনের এক টুকরো শুভ্র সজল চপল মেঘের মতো নুরু, যা কভু জ'মে হয়ে যায় শক্ত তুহিন, আবার গলে ঝরে পড়ে যেন শান্ত বৃষ্টিধারা,—মন্দার-পারিজাতের চেয়েও কোমল, পাহাড়-ছোটা

ঝর্নামুখর চেয়েও মুখর, শিশুর চেয়েও সরল হাসি-ভরা, পবিত্রতা-ভরা প্রাণ, স্নেহ-হারা বাঁধন-হারা নূরু,—সে আবার সংসারি হবে, তোর কিরণ-ছটায় তার সজল মেঘলা জীবনে ইন্দ্রধনুর সুষমা-মহিমা আঁকা যাবে,—ওঃ, সে কি দৃশ্য! বেহেশতে হুর-গেলেমান, বা স্বর্গে অপ্সরী-কিন্নরী বলে কোনো প্রাণী থাকলে এ খোশখবরের 'মোজদা' তারা স্বর্গের দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে এসেছিল, মেওয়ামিষ্টির খাঞ্চা ঘরে ঘরে ভেট দিয়েছিল।

আমরা তোদের এই পূর্বরাগকে কেন প্রশ্রয় দিতাম জানিস? হাজার অন্দরমহলের আড়াল-আবডালে চাপা থাকলেও আমাদের অনেকের জীবনেই এমন একটা দিন-ক্ষণ আসে, যখন একজনকে দেখেই প্রাণের নিভৃত সুরে কোনো অনুরাগের গোলাবি-ছোপের দাগ লেগে যায়। এ অনুরাগ আবার অনেক সময় ভালবাসাতেও পরিণত হতে দেখা যায়, আর সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য তা কারুর হয়তো সফল হয়, কারুর বা সে আশা মুকুলে ঝরে পড়ে, আবার কেউ হয়তো সাপের মানিকের মতন মর্মের মর্মে আমরণ লুকিয়ে রাখে,—তার অন্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে না। আমার কথা তো জানিস। আমার বাবাজান যখন সাবজজ হয়ে বাঁকুড়ায় বদলি হলেন, তখন আমার বয়স পনেরো-ষোলোর বেশি হবে না। তখনো আমি থুবড়ো। তাই মাজানের চাড়ে আমার শাদীর জন্য বাবাজান একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ-কাল বাপ-মা'রা মহাজন-বিদায় বা ঘরের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলার মতোই যেন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চায়, ব্যস্ত হয়ে পড়লেও আমাকে ও-রকম অবহেলা হেনস্থা সইতে হয় নি। বড্ডো আদরেই মানুষ হয়েছিলাম বোন, বাপের একটি মেয়ে,—বাবাজান তো আমায় 'আম্মাজান' 'আম্মাজান' করে আদর-সোহাগ দিয়ে হয়রান করে ফেলতেন। সবচেয়ে তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল আমায় লেখা-পড়া শেখাবার। এর জন্য কত টাকা যে খরচ করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার ঘরই তো একটি জবরদস্ত লাইব্রেরি ছিল, তার ওপর আবার এক ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রী রেখে আমায় নানান বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। লোকে, বিশেষ করে গোঁড়া হিন্দুরা, কেন যে ভাই ব্রাহ্মদের ঠাট্টা করে, আমি বুঝতে পারিনে! আমার বোধ হয় ও শুধু ঈর্ষা আর নীচমনার দরুন। ভাল-মন্দ সব সমাজেই আছে, তাই বলে যে অন্যের বেলায় শুধু মন্দের দিকটাই দেখে ছোটলোকের মতো টিটকারি মারতে হবে এর কোনো মানে নেই। আমার পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী ঐ ব্রাহ্ম মহিলার কথা মনে পড়লে এখনো একটা বুক-ভরা পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এত মহিমান্বিতা মাতৃশ্রী-মণ্ডিত যে ধর্মের নারী, এত অনবদ্য পূত শালীনতা ও সংযমবিশিষ্ট যে সমাজের নারী সে ধর্মকে সে সমাজকে আমি সালাম করি। আমি তাঁকে মায়ের মতোই ভক্তি করতে পেরেছিলাম, ভালবাসতে পেরেছিলাম এমনি স্নেহ-মাধুর্যে পবিত্র স্নিগ্ধতায় ভরা ছিল তাঁর ব্যবহার! মা কত দিন এসে হেসে বলতেন,—'দিদি, তুমি আমার রেবাকে মা ভুলিয়ে দিলে দেখছি।' তিনিও হেসে বলতেন—'তা বোন, আজকালকার মেয়েগুলোই নিমকহারাম, আজ তোমাকে ছেড়ে আমাকে মা বলছে, আবার দু'দিন বাদে শাশুড়ি গতরখাগিকে মা বলবে গিয়ে।

আর তাছাড়া আমার সাহসিকাও তোমার নাম করতে পাগল। সে আবার আফ্‌সোস করে যে, কেন তোমার পেটে সে জন্মায়নি। এখন এক কাজ করি এসো, আমরা মেয়ে বদল করি।' তুই বোধহয় শুনেছিস যে, ওঁর সাহসিকা বলে আমারই বয়সি একটি মেয়ে ছিল। তাতে আমাতে এত গলায় গলায় মিল ছিল, তা যদি শুনিস তো তুই অবাক হয়ে যাবি। আমার সে শিক্ষয়িত্রী-মা আজ আর নেই,—আজ এই কথাটি মনে হতেই দেখেছিস টস্‌টস্‌ করে আমার চোখ দয়িয়ে জল বেয়ে পড়ল ! সাহসিকা বি.এ. পাস করে এখন এক স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে। প্রথম জীবনেই সে বুকে মস্ত এক দাগা পেয়ে বিয়ে-টিয়ে করেনি, চিরকুমারী থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। সে এখনো মাঝে মাঝে আমায় চিঠি দেয়, সে চিঠিগুলোর এক একটা অক্ষর যেন বুকফাটা কান্নার অশ্রু-ফোঁটা। তুই যদি আসিস তাহলে একবার সব চিঠিগুলো তোকে দেখাব। আঃ, সে কত দিন তাতে আমাতে দেখা নেই, তবু তার কথাটা যখনই মনে হয় তখনই যেন জানটা সাতপাক মোচড় খেয়ে ওঠে। আমার বিয়ের সময় তার কি আমোদ ! তাঁরা সবাই আমার বিয়েতে এসেছিলেন। আজ আমার মাও নেই তারও মা নেই, তাঁরা বোধ হয় বেহেশতে গিয়ে আবার এক সঙ্গে মিলেছেন, তাঁদের এই অভাগী মেয়েদের জন্যে সেখানেও জান খাঁ খাঁ করে কিনা, কান্না পায় কি না, তা কে জানে? অন্য কোনো জাতির কোন ধর্মের কোনো সমাজের নারীর মধ্যে কই নারীত্বের এমন পূর্ণ বিকাশ তো দেখিনি। এই সমাজের যত নারী দেখেছি, সবারই ব্যবহার কথাবার্তা এত সুন্দর আর মিষ্টি যে, তাতে বনের পাখিরও ভুলে যাবার কথা, এঁদের বুকে যেন স্নেহের ভরা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে ! যারা একে বাড়াবাড়ি বলে বা মানে না, উল্টো নিন্দা করে, তারা বিশ্বনিন্দুক। আমার বোধ হয় এঁরাই এ দেশে সর্বাগ্রে সামাজিক পারিবারিক যত অহেতুক খামখেয়ালির বন্ধনকে কেটে স্বাধীন উচ্চশির নিয়ে মহিমময়ী রানির মতো দাঁড়িয়েছেন বলেই দেশের অধীনতাপিষ্ট বন্ধন-জর্জরিত লোকের এত বুক-চড়চড়ানি। এঁদের সঙ্গে যে খুব সহজ সরল স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে মিশতে পারা যায়, এইটেই আমাকে আনন্দ দেয় সবচেয়ে বেশি। এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বা ছুঁৎমার্গের ব্যামো নেই, কোনো সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম-বিদ্বেষ, বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আজ বিশ্ব-মানব যা চায়, সেই উদারতা সরলতা সম-প্রাণতা যেন এর বাইরে ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রয়েছে। আমরা বড় বড় হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও মিশেছি, খুব বেশি করেই মিশেছি এবং অনেক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে খুব ভাবও হয়েছিল, কিন্তু এমন দিল-জান খোলাসা করে প্রাণ খুলে সেখানে মিশতে পারিনি। কোথায় যেন কি ব্যবধান থেকে অনবরত একটা অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। আমরা তাঁদের বাড়ি গেলেই, তাঁরা হন আর না হন, আমরাই বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি,—এই বুঝি বা কোথায় কি ছোঁয়া গেল, আর অমনি সেটা অপবিত্র হয়ে গেল। আমরা যেন কুকুর বেড়াল আর কি ! তাঁরাও আমাদের বাড়ি এসে পাঁচ ছয় হাত দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে আসেন, পাছে কোথায় কি অখাদ্য কুখাদ্য মাড়ান। এতে মানুষকে কত ছোট হয়ে যেতে হয়, তার বুকে কত বেশি লাগে। এখনো দেশে পনেরো আনা হিন্দুর সামাজিকতা এই রকম আচার-বিচারে

ভরা। যাঁরা শহরে থেকে বাইরে খুব উদারতার ভান দেখান তাঁদের পুরুষরা যাই হন, মেয়েদের মধ্যে এখনো তেমনি ভাব। ভিতরে এত অসামঞ্জস্য ঘৃণা-বিরক্তি চেপে রেখে বাইরের মুখের মিলন কি কখনো স্থায়ী হয়? এ মিথ্যা আমরা উভয়েই মনে মনে খুব বুঝি কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনে। পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এত বড় ব্যবধান, গরমিল—এ কি কম দুঃখের কথা? আমাদের আত্মসম্মান আর অভিমান এতে দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আমরা আর যাই হই, কিন্তু কেউ হাত বাড়িয়ে দিলে বুক বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করবার উদারতা আমাদের রক্তের সঙ্গে যেন মেশানো। তাই এই অবমাননার মধ্যে হঠাৎ এই ব্রাহ্ম সমাজের এত প্রীতিভরা ব্যবহার যেন এক-বুক অসোয়াস্তির মাঝে স্নিগ্ধ শান্ত স্পর্শের মতো নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে এসেছে। আমাদের ঘরের পাশের হিন্দু ভগিনীগণ যখন এমনি করে মিশতে পারবেন, তখন একটা নতুন যুগ আসবে দেশে, এ আমি জোর করে বলতে পারি, এই ছোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দুসমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই হিন্দু-মুসলমানের একদিন মিল হয়ে যাবে। এইটাই সবচেয়ে মারাত্মক ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে, কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাঙ্ক্ষী বড় বড় রথীরাও এইটা ধরতে পারেননি, তাঁরা অন্য নানান দিক দিয়ে এই মিলনের চেষ্টা করতে গিয়ে শুধু পণ্ডশ্রম করে মরছেন। আদত রোগ যেখানে, সেখানটা দেখতে না পেয়ে কানা ডাক্তারের মতন এঁরা একেবারে মাথায় স্টেথিস্কোপ বসিয়ে গম্ভীরভাবে রোগ ও ওষুধ নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। এই 'ছুঁৎমার্গ' দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বের করতে আমাদের হিন্দু -মা-বোনদেরই চেষ্টা করতে হবে বেশি! কেননা পুরুষদের চেয়ে এঁদেরই এ বদ-রোগটা ভয়ানক মজ্জাগত। আজকাল অনেক হিন্দু ভদ্রলোক বিশেষ করে নব্য সম্প্রদায় (যুবক প্রৌঢ় দুই) খুব প্রাণ খুলে একসঙ্গে আমাদের পুরুষদের সঙ্গে বসে আহার করেন, আলাপ করেন, এতটুকু ছোঁয়া যাবার ভয় নেই। কিন্তু আমাদের হিন্দু ভগিনীরা হাজার শিক্ষিতা হলেও অমনটি পারেন না। এটা তাদের ধর্মের অঙ্গ কি না জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় দুনিয়ার কোনো ধর্মই এত অনুদার হতেই পারে না, এ নিশ্চয়ই সমাজের সৃষ্টি। দেশকালপাত্র ভেদে সমাজের সংস্কার হওয়া উচিত নয় কি?—হায় কপাল! দেখেছিস, কি লিখতে গিয়ে কি সব বাজে বকলাম! আমি এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম যে, তোকে চিঠি লিখছি। এ কথাগুলো লিখবার সময় আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি সাহসিকাকে চিঠি লিখছি, কারণ তাতে আমাতে এই মতো আলোচনাই হয় বেশি। থাক যা লেখা হয়ে গেল ঝোঁকের মাথায়, তাকে অনর্থক ছিঁড়ে ফেলেই বা কি হবে? ভাল লাগে তো পড়িস, নয় তো ও জায়গাটুকু বাদ দিয়েই পড়িস। এখন আমার সেই হারানো কাহিনীটা আবার 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে শুরু করি :

হাঁ, তারপর ঠিক সেই সময় কি সব জমিদারি ব্যাপার নিয়ে না কি-জন্যে আমার শ্বশুর সাহেব মরহুম তখন বাঁকুড়াতেই সপরিবারে বাস করছিলেন। আর তোমার এই গুণধর ভাইজি বাঁকুড়ার কলেজে পড়ছিলেন। আমাদের বাসা একরকম কাছাকাছিই

ছিল, কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে এঁদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়, আর তখনি আমার বিয়ের কথা ওঠে। আমাদের 'ইনি' (বর্তমানে 'খুকির বাপ') অর্থাৎ তোমার ভাইজি তখন কি জানি কেন আমাদের বাড়ি ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। ওঁর নানা অসিলা করে হাজারবার আমাদের বাড়ি আসা আর একবার আড়চোখে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ফস করে চারিদিকে চেয়ে-নেওয়া দেখে আমার খুব হাসিও পেত, আবার বেশ মজাও লাগত। তিনি এক আধ দিন বিশেষ কাজে আসতে না পারলে ক্রমে আমারও মনটা যেন কেমন উড়ু উড়ু উদাসীন ভাব বোধ হতো। দুষ্টু সাহসিকা তো এই নিয়ে আমায় গান শুনিয়ে টিপ্‌নি কেটে একেবারে অস্থির জ্বালাতন করে ফেলত! অবশ্য, তখনো আমাদের দেখা-শোনা হয়নি,—আমাদের বললে ভুল হবে, কেননা আমি নানান রকমে তাঁকে দেখে নিতাম কিন্তু পুরুষদের দুর্ভাগ্যই এই যে, কোনো সুন্দর মুখ আড়াল থেকে তাকে দেখছে কিনা বেচারা ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে না। সাহসিকা দু'-এক দিন দুষ্টুমি করে আমার ঘরে বেশ একটু জোর গলায়, যাতে উনি শুনতে পান, গান জুড়ে দিত—

সখি, প্রতি দিন হায় এসে ফিরে যায় কে?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে

তখন যদি তোমার এই শান্তশিষ্ট ভাইটির ছটফটানি দেখতে। আল্লাহ! হাঁ করে তাকিয়ে এ-দিক ও-দিক দেখছেন, কখনো বা গভীর মনোনিবেশসহকারে চুপ করে বসে গম্ভীর হয়ে পড়ছেন, আবার কখনো বা কবির মতো মাথার চুলগুলো খামচে ধরে মস্ত লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন! আমরা তো দু সইয়ে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে লুটিয়ে পড়তাম! বাবা, এত বেহায়াও হয় পুরুষে? ছিঃ মা! এখন তোর ভাইজিকে সে কথা বললে, তিনি বলেন যে, গানটা বড্ডো বেসুরো শুনাতো বলে তিনি ওরকম করে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন! হায় আল্লাহ্! এত মিথ্যাবাদীও হয় মানুষে। আজ-কাল আমাদের অনেক মিঞা-সাহেবই জোর গলায় বলছেন, অনেকে আবার লিখেও জানাচ্ছেন যে, আমাদের এ হেরেমের পাঁচিল পেরিয়ে পূর্বরাগ এ জানালা-বন্ধ-ঘরে ঢুকতেই পারে না। হায় রে অন্ধ পুরুষের দল! এঁরা ঠিক যেন চোখে ঠুলিপরা কলুর ঘানির বলদ। এঁরা খালি সামনেটাই দেখতে পান, আশেপাশের খবর একদম রাখেন না। এঁদের এই দৃষ্টিহীনতা দেখে আমার মতো অনেকেই লুকিয়ে হাসে। আমি এঁদের লক্ষ্য করে জোর গলায় বলতে পারি,—'ওগো কানা বলদের দল। বিয়ের আগেও হেরেমের বা অসূর্যম্পশ্যা মেয়েদের মনে পূর্বরাগের সৃষ্টি হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়! তোমরা তো আর মেয়ের বা যুবক ছোকরার মন বোঝো না, সোজা খাওদাও আর উপর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে তারা গোনো। তবে তোমাদের ভাগ্যি বলতে হবে যে, অনেক পোড়ারমুখিরই এই পূর্বরাগটা অধিকাংশ সময় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। নইলে এমনি একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হতো যে, পুরুষরা এ-কথার ঠিক উল্টোই বলতেন। কত অভাগীর মনে যে ঐ অঙ্কুর আবার মহীরূহে পরিণত হয়ে ওঠে, আবার কত জনা যে মনের বেদন

মনেই চেপে তুষের আগুনের মতন ধিকি ধিকি করে পুড়ে ছাই হয়, কে তার খবর রাখে। কে তা জানতে চায়? জানলেও কার বুকে তার বেদন বাজে? একটা কাঁচের বাসন ভাঙলেও লোকে 'আহা' করে কিন্তু বুক ভাঙলে, হৃদয় ভাঙলে, জেনেও কেউ জানতে চায় না, 'আহা উহু' করা তো দূরের কথা। কিন্তু কোনো 'মুখপুড়ি' যদি কূলে কালি দিয়ে ভেসে যায়, তখন এদের আস্ফালনে গগন বিদীর্ণ হয়ে যায়। পুরুষরা এত সুবিধে করে উঠতে পেরেছেন, তার কারণ মেয়েরা মুখ থাকতে বোবা, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না!–
–এই নে, ফের কোথায় সরে পড়েছি।—

তারপর বোন, সত্যি বলতে কি, তোর এই সোজা মানুষ ভাইটিকে ক্রমেই আমার বেশ ভাল লাগতে লাগল। বিশেষ করে এঁর কণ্ঠ-ভরা গান আমার কানে বড্ডো মিষ্টি শুনাত। পরে জেনেছি, এই ভাল লাগাটাই হচ্ছে পূর্বরাগ। এখন মনে হয়, পুরোপুরি ভালবাসার চেয়ে এই পূর্বরাগের গোলাবি রাগটারই মাদকতা আর মাধুর্য বেশি, এর পাতলা অরুণ ছোপ বুকে নিবিড় হয়ে না লাগলেও এর তখনকার রঙটা বেশ চমকদার! যদিও আমি থাকতাম অন্তঃপুরের অন্তরতম কোণে অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে, তবুও ওঁর গান শোনবার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম,—কেননা তিনি মনুকে গান শেখানোর অসিলাতেই অন্য সময় ছাড়া সন্ধেটাতে রোজ আসতেন আর শেখানোর চেয়ে নিজে গাওয়াটাই বেশি পছন্দ করতেন; কেননা নিশ্চয়ই তাঁর এ আশা থাকত যে, একটি তরুণ প্রাণী লুকিয়ে থেকে তার গান শুনছে। ... আমার এই উন্মনা ভাবটা অন্তত মায়ের চক্ষু এড়ায়নি, এটাও আমি বুঝতে পারতাম। এইখানে আর একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক,—আমাদের পূর্বরাগটা একতরফা হয়নি অর্থাৎ শুধু আমি নয়, তোমার ভাইজিকেও নাকি ঐ একই রোগটায় বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। কেননা আমাদের বিয়ে হবার পর এই সত্যবাদী ভদ্রলোক মুক্তকণ্ঠে আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, কোনো এক গোধূলি-লগ্নে সদ্যস্নাতা আলুলায়িতা-কেশা আমায় তিনি আমাদের মুক্ত বাতায়নে উদাস আনমনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, তাছাড়া আরো দু'-একদিন—কোনো দিন বা আঁচলের প্রান্ত, কোনো দিন বা চুলের একটি গোছা, কোনোদিন বা ঈষৎ 'আবছা' চোখের চাওয়া, আবার অভাবে কোনোদিন বা চাবির রিং-এর বা রেশমি চুড়ির রিনিঝিনি—এই রকম যত সব ছোটোখাটো পাওয়ার আনন্দই তিনি একেবারে 'রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে' তাঁর হৃদয় হারিয়ে ফেলেছিলেন! তা না হলে তিনি এতদূর নিঃস্বার্থ পরোপকারী হয়ে ওঠেননি যে, পরের বাড়ি গিয়ে এতবার এতক্ষণ ধরে ধন্না দিয়ে আসেন। তাঁর অবস্থা নাকি আবার আমারও চেয়েও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এই বিরহ ভোগের ঠেলায়, আর তারই প্রমাণস্বরূপ এমন ভাল ছেলে হয়েও সেবার তিনি বি.এ. ফেল করলেন। অগ্রেই সত্যিকার বিয়ে পাশ করে ফেলার দরুনেই নাকি তিনি সেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ.টা পাশ করতে পারেননি। সাহসিকাই এই কথাটা ওঁকে লিখে জানিয়েছিল, সে আরো লিখেছিল, যে, আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডবল 'অনার্স' উঠে গিয়েছে কিনা, তাই 'বিয়ে' অনার্সের পর আর একটা অনার্স মঞ্জুর হলো না!—এইখানে আমার কথাটি ফুরাল, নটে গাছটি

মুড়াল! আমাদের অনেক ঘরের কথা তোকে জানিয়ে দিলাম এই জন্যে যে, তোর উপন্যাস আর গল্প পড়ার ভয়ানক সখ। আর এটা নিশ্চয় জানিস যে, গল্প-উপন্যাস সব মনগড়া কথা, তাই আমাদের এই সত্যিকার ঘটনাটা তোকে উপন্যাসের চেয়েও হয়তো বেশি আনন্দ দেবে। এতে আমার লজ্জার কিছুই নেই, আর এ-রকম করে বলা বা লেখাও মেয়েদের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। মেয়েরা যা একটু লজ্জাশীলা থাকে বিয়ের আগেই, তারপর বিয়ে হয়ে গেলেই (তাতে যদি ছেলের মা হলো, তাহলে তো কথাই নেই) তাদের সামনে দিকটার এক হাত ঘোমটা পিছন দিকে দু'-হাত ঝুলে পড়ে। তাছাড়া, এ আমাদের ননদ-ভাজের ঘরোয়া গোপন-চিঠি, এ তো আর অন্য কেউ দেখতে আসছে না।...

এইবার অন্যান্য দরকারি কথা কটা বলে ফেলি। তিন দিন থেকে একটু একটু করে যতই চিঠিটা লিখছি, কথা ততই বেড়েই চলেছে দেখছি।

তুই বোধ হয় শুনেছিস যে, তোর সই সোফিয়ার বিয়ে। কিন্তু তোর চিঠিতে ওর কোন উল্লেখ না দেখে বোঝাও তো যায় না যে, তুই এ-খবর জানিস। আর জানবিই বা কি করে বোন? আমিই জানতাম না এত দিন! তোমার এই সোজা শেওড়া গাছ ভাইটি তো কম নন 'নিম্নমুখো ষষ্টি, ছেলে খান দশটি।' এ মহাশয়-লোকটির কূঠে কূঠে বুদ্ধি। তিনি তলে তলে এ সব মতলব পাকিয়ে 'চুনি বিল্লু'র মতো চুপসে বসেছিলেন, অথচ ঘরের কাউকে এমনকি এ-বান্দাকেও কখনো এতটুকু ইশারায়ও জানতে দেননি।—একদিন গম্ভীরভাবে এসে বললেন কি,—'ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ, এ-বছর বি-এ দেবে, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও জোর 'সার্টিফিকিট' পাওয়া গেছে, তার সম্বন্ধে কোনো খটকা নেই, আর যা' দু-একটু দোষ-ঘাট আছে তা তেমন নয়—নিষ্কলঙ্ক চাঁদই বা আর কোথায় পাওয়া যাবে!' ইত্যাদি। আমি তো বোন প্রথমে ভেবেই পাইনে উনি কি বলছেন। পরে মনে করলাম, হতেও পারে। পরে কত 'নখ্‌রা তিল্লা' করে বলা হলো যে, আমাদের মনুয়রের সঙ্গেই সম্বন্ধ তিনি অনেকদিন থেকে মনে এঁটে রেখেছেন। আমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যেই এত দিন তা বলা হয়নি। ... সে যাই হোক, এইবার কিন্তু দুই বাঁদর-বাঁদরি মিলবে ভাল। মনুটা যেমন বাঁদর বেলেল্লা, সোফিও তেমনি আফলাতুন কাহারবা মেয়ে! ঝ্যাঁটার চোটে বিষ নামিয়ে দেবে সে! বিয়ের পরেই ওদের যদি রোজ হাতাহাতি না হয়, তো আমার নাম আর-কিছু রাখিস! ... এইখানে আর একটা কথা,—এ-বিয়ের কথাবার্তা হবার পর থেকেই সোফি যেন কেমন গুম হয়ে গিয়েছে। সামনা-সামনি হলে কেমন যেন একটা টেনে-আনা হাসির আভা সে তার গম্ভীর মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সেটা সকলের আগে তারই কাছে ধরা পড়ে যায়, আর সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরটাতে গিয়ে শুয়ে পড়ে! তার চোখের নিচে প্রচ্ছন্ন বেদনার একটা স্পষ্ট দাগ যেন দিন দিন কালো হয়ে ফুটে উঠছে! আমি তো হয়রান হয়ে গেছি বোন। ওকে জিগগেস করলে রাগের চোটে ঠোঁট ফুলিয়ে আমার পায়ে মাথা কুটে মরে, নয়তো নিজের চুলগুলোকে নিজে নিজেই ছিঁড়ে পাড়িপাড়ি করে ফেলে। তার চিল্লানি শুনে আর 'তিখানি' দেখে

বোন এখন আমার তার কাছে যেতেও ভয় হয়। মাগো মা! এমন 'টিট' মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। ওর এ-রকম গতিক দেখে তোমার ভাইজিও যেন কেমন ক্ষুণ্ন শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, অথচ যার ব্যথা তার কোথায় যে কি ব্যথা, তা আর বুঝবার কোনো উপায় নেই। আমি নাচার হয়ে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমার মতন মাঝি যার মন-দরিয়ায় কূল-কিনারা পেলে না, সে সহজ পাত্তর নয়। ওর মতলবটা কি, বা কেন যে সে অমন করছে তুই কি কিছু জানিস রে? তোতে ওতে মানিক জোড়ের মতন দিন-রাত্তির এক জায়গায় থাকতিস কিনা, তাই শুধোচ্ছি, যদি তুই ওর মনদরিয়ার কোনো মণি-মুক্তার খবর রাখিস। তোর মতন ডুবুরি যে কিছু তুলতে পারবে, তার আশা নেই; তাই দেখিস মাঝে থেকে যেন কাদা ঘেঁটে জলটাকে ঘোলা করে দিসনে। আমি যে এখন কোন দিক দেখি ছাই, তা আর ভেবে পাচ্ছিনে। এত ঝন্‌ঝাট, বাবা! যা হোক তুই এখানে এলে যেন একটু তবু নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারব মনে করছি। হাজার দিককার হাজার জঞ্জাল-ঝক্কির মাঝে পড়ে জানটা যেন বেরিয়ে যাবার মতোই হয়েছে! শিগগির তোর ভাইজি যাবেন তোদের আনতে। এই কদিন তোদের না দেখে মনে হচ্ছে যেন কত যুগ দেখিনি! দেখিস অভিমান করে আবার 'যাব না' বলে বায়না ধরিসনে যেন।

তোর জন্যে চিন্তা করিনে, তুই কেন তোর ঘাড় আসবে; না এলে ধরে পালকিতে পুরব, বলব, এ আমাদের ঘরের বৌ, এর বিয়ে হয়ে গিয়েছে নূরুর সাথে! ভয় যত তোর আম্মাজানকে নিয়ে! তাঁকেও মা চিঠি দিলেন। তিনি কিছু আপত্তি করলে আমরা সবাই গিয়ে পায়ে ধরে তাঁকে নিয়ে আসব। ... খুকি তো তোর আসবার কথা শুনে এই দু'দিন ধরে ঘণ্টায় হাজারবার করে শুধোচ্ছে,—'মা, লাল ফুপু কখন আসবে?' কত রকম কৈফিয়ত দিয়ে তাকে ফুসলিয়ে রাখতে হয়, নইলে সে কেঁদে চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে বাড়ি মাথায় করে ফেলে। তাকে তোরা যে-রকম ন্যাওতা করে ফেলেছিস তাতে এখন তাকে যে ভুলিয়ে রাখা দায়। একটু কিছু হলেই 'লাল ফুপু গো' বলে ডাক ছেড়ে কাঁদা হয়। মেয়েটা এমন নিমকহারাম, মাকে ছেড়ে তোকেই এত করে চিনলে! এখন তোর মেয়ে তুই সামলে রাখ ভাই এসে! নয়তো সাথে করে নিয়ে যা। এই দু'মাসেই মেয়েটা যেন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। ...

সেখানে আর যতদিন থাকিস, একটু সংযত হয়ে থাকিস বোন। কি করবি পরের বাড়ি দুটো মুখনাড়া সইতেই হবে।

তোর কথামতো গত মাসের সমস্ত মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠিয়ে দিলাম। দেখবি আমাদের মেয়েরাও এবারে বাংলা লিখছেন, যা আমি কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ...

খালাজির পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব দিবি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—তোর ভাবিজান
রাবেয়া

[জ]

সালার
১৩ই ফাল্গুন

বোন আয়েশা !

তুমি আমার হাজার হাজার 'দোয়া' জানবে। মা মাহ্‌বুবাকে আমার বুকভরা স্নেহাশিস দেবে। এখানে খোদার ফজলে সব ভালো। সোফিয়া আর বহুবিবি মা-জানের কাছে তোমাদের সব খবর জানতে পারলাম। আমায় চিঠি দেবে বলে গিয়েছিলে, তা বোধ হয় বাপের বাড়ি গিয়ে ভুলেই গিয়েছ। ... আমি যেন আভাসে বুঝতে পারছি, তোমাদের সেখানে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। তোমার না হলেও আমার মাহ্‌বুবা মায়ের যে খুবই কষ্ট হচ্ছে, এ-কথা কে যেন আমার পোড়া মনে সারাক্ষণই উসকেই দিচ্ছে। আহা, খোদা তোমাদের সহি সালামতে রাখুন বোন। আমার মাহ্‌বুবা মায়ের আলাই-বালাই নিয়ে মরি ! এই কদিন মেয়েটাকে না দেখে আমার জান যে কি রকম ছটফট করছে, তা তুমিও তো মেয়ের মা, সহজেই বুঝতে পারো ! মা-আমার সেই যে কাঁদতে-কাঁদতে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করে বিদায় নিলে অথচ একটা কথাও বলতে পারলে না, তাই আমার দিনে-রাতে হাজার বার করে মনে হচ্ছে ! সোফি আর ও দুইজনে মিলে ঘরটাকে যেন মেছো-হাট করে রাখত, ওর যাবার পর থেকে সোফিটা মনমরা হয়ে শুধু নিজের ঘরটাতে পড়ে থাকে, আর কিছু শুধোলে আমার কোলের ভিতর মুখ গুঁজে কাঁদে। সে কি ডুক্‌রে ডুক্‌রে কান্না বোন ওর, দেখে চোখের পানি সামলানো দায় ! মা আমার যেন দিন দিন শিকড়-কাটা লতার মতন নেতিয়ে পড়ছে। কি হলো ওর, ওই জানে আর ওর খোদাই জানে। হাজার শুধালেও কোন কিছু বলছে না। এমন চাপা মন তো ওর কোনো কালে ছিল না বোন। আমার এত ভয় হচ্ছে ! কাল দিন বাদে ওর বিয়ে, আর এখন থেকেই কিনা এমন হয়ে শুকিয়ে পড়ছে। হায় আমি যে কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে ! মাহ্‌বুবাটা থাক্‌লেও বোধ হয় ও এমন হতো না। যাক, খোদা যা লিখেছেন অদৃষ্টে তাই হবে, আর ভেবে কি ফল।

তার ওপর আবার তোমাদের এই কাণ্ড ! তোমাদের এতটুকু কষ্টের কথা ভাবতেও যে আমি মনে কত কষ্ট পাই, তা বলতে গেলে বলবে যে মায়াকান্না কাঁদছে। কেননা এখন সে দিন আর নেই। কোথা থেকে কি একটা গোলমাল মধ্যে থেকে বেধে গিয়ে আমার না হোক তোমার যে মন একেবারে ভেঙে গিয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মন-ভাঙা-ভাঙির আগে কিন্তু এরই পাশাপাশি বাড়িতে থেকে আমাদের অতকাল কেটে গেল, কিন্তু কোনো দিন কোনো মনান্তর তো দূরের কথা, তেমন কোনো খুঁটিনাটিও হয়নি। ... আজ যদি মাহ্‌বুবার বাপ (আল্লাহ্ তা'কে জিন্নতে জায়গা দেন।) বেঁচে থাকত, তাহলে কি তোমরা তার বাপ-দাদার ভিটে এমন করে ছেড়ে যেতে সাহস করতে। এক দুরসম্পর্কের বোন না হয়ে তুমি যদি আমার মায়ের পেটের 'সোদর' বোন হতে, তাহলে হয় তো আমার এতদিনের এত বড় অধিকারকে পা মাড়িয়ে যেতে পারতে

না। মাহ্‌বুবার বাপ বেচারা তো চিরটাকাল আমার আপন ছোট ভাইটির মতোই আদর আব্দার নিয়ে আসত, ওতে আমার যে কত আনন্দ হতো, আমার বুক যে কি রকম ভরে উঠতো, তা আমি জানি আর আল্লাহ্ জানেন। তুমি হয়তো বলবে যে, সে অন্য সম্পর্কে আমার ছোট দেবরই ছিল, কিন্তু সত্যি বলতে গেলে শুধু তার জন্য নয়, তোমার জন্যেও তার উপর আমার স্নেহমায়াটা এত বেশি করে পড়েছিল। তোমার বিয়ের কথা আমি উঠাই তার সঙ্গে, সে সময় সে হাসতে হাসতে বলেছিল,—'ভাবি সাহেবা, আজকাল বৌ পসন্দ করে নেওয়ার একটা হুজুগ পড়েছে, কিন্তু দেখছি আমার হয়ে আপনিই সমস্ত করে দিলেন ! তবে আমি এই ভরসায় রাজি হচ্ছি যে, আপনার মতো ঝুনো দালালের হাতে ঠক্‌বার কোনো ভয় নেই !' আর সে কি হাসি ! আজো আমার কানে ওর অমনি কত কথা কত হাসি মনে পড়ছে। তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার পর সে আমায় সালাম করতে এসে হেসে কুটিকুটি হয়ে বলেছিল,—'ভাবি সাহেবা, আজ থেকে কিন্তু আপনি আমার 'জেড়শা'স অর্থাৎ কিনা জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা। আর আমাদের হিন্দুদের ঘরে জ্যেষ্ঠা শ্যালিকারা ছোট বোনের স্বামীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করলেও আমাদের সমাজে কিন্তু উল্টো নিয়ম আর সে নিয়ম অনুসারে আপনার আমার সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা, দেখা-শোনাও হতে পারে না।' আজ সে নেই, তার সে হাসিও নেই ! ও আর নূরুটা গিয়ে আমাদের পাড়াটা যেন দিন-দুপুরেই গোরস্থানের মতো সুম্‌শাম হয়ে রয়েছে !

তারই একটি কণা স্মৃতি মরণ-কালে আমার হাতে সঁপে-দেওয়া মাহ্‌বুবা মা-জানকে যে তুমি এমন করে বেদিলের মতন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তা আমি কোনো দিনই ভাবতে পারিনি। তোমার বোধ হয় মনে আছে, ছেলেবেলায় ও তোমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ত এসে আমার কোলে আমার দুধ খেতে, আর সে সময় সোফিতে আর ওতে কি-রকম খামচো-খামচি চুলোচুলি হতো ! তুমি যদি বা ভোলো, সে ভুলবে না ; আমার বুকের রক্ত যে তার রক্তে মিশে রয়েছে ! ... আর তোমার কথাই বলি,—তুমি তো কোনো দিনই আমার মুখের ওপর একটি কথা কইতে সাহস করোনি,—কিন্তু সেই তুমি কি না যেই তোমার ভাই তোমায় নিতে এলেন অমনি আমাদের সবারই ঘরগুষ্টির এত কাঁদন পায়ে-পড়া অনুরোধ উপেক্ষা করে উল্টো আরো পাঁচ কথা শুনিয়ে চলে গেলে ! কোনো দিন তো তোমার কাছ থেকে এমন ব্যভার পাইনি, তাই সেদিনকার কথাগুলো আমার বুকে যেন শেলের মতোই গিয়ে বেজেছে। তুমি যে এমন করে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারবে, তা জানতাম না। তাই আগে থেকে প্রস্তুতও ছিলাম না। তুমি নূরুর ব্যাভারের যে খোঁচা দিয়ে গেলে তা আমি অবশ্য স্বীকার করে নিলেও, ওতে যে আমাদের নিজের কতটা দোষ ছিল, তা নিয়ে তুমিও তো আর কিছু অ-জানা ছিলে না। আমার পেটের ছেলে না হলেও আমার রবুর চেয়েও সে বেশি, সুতরাং তার এই ক্ষ্যাপামো হঠকারিতায় কি তোমার চেয়ে আমি কম কষ্ট পেয়েছি, না, সে কি আমার বুক ভেঙে দিয়ে যায়নি ? তোমার চেয়ে যে সে আমারই অপমান করেছে বেশি। আর মাহ্‌বুবাকে কি আমি কোনো দিন সোফির চেয়ে কম করে দেখেছি ? সে যে এই রকমই কিছু একটা পাগলামি করে বসবে, বিয়ের কথা আরম্ভ হতেই কি-জানি-

কেন আমার মনে কেবলই ঐ শঙ্কা জাগছিল। কেননা এই পাগলা ছেলে কতবার বিয়ের কথা শুনেই এক দু'-মাস করে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়িয়েছে। শুধু রবুর আর বৌমার জিদের আর উৎসাহের জন্যে আমি কিছু বলে উঠতে পারিনি, পাছে তারা মনে করে যে আমার মনটা, শুধু অলক্ষুণে কথাই ভাবে।মা ছেলেকে যেমন বোঝে তেমন আর কেউ বোঝে না। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনেছিলাম যে, ও আমার বাউল উদাসীন ছেলে। তাই আমি কোনো দিনই তার বিয়ের জন্যে এতটুকু চিন্তিত হইনি বা আশাও করিনি। মনে করতাম, আহা থাক আমার ও কোল-মোছা খ্যাপা ছেলে হয়ে! দু'দিন বাদে সোফিয়া শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। রবু সংসারী হয়ে ছেলে-মেয়েদের পেয়ে হয়তো বুড়ো মাকে আর মনে করবে না, কিন্তু চিরদিন থাকবে আমার কোল ঠাণ্ডা করে, এই চির-শিশু নূরু—এই ঘর-ছাড়া উদাস ছেলে আমার! হায়, মানুষ ভাবে এক, আর খোদা করেন আর এক! একটা হুজুগের মাতামাতিতেই ছেলে আমার এমন করে মালিক-উল-মউতের হাতে গিয়ে জানটা সঁপে দিল—এই রাক্ষসী লড়াইয়ে চলে গেল। আর আমি কিছু চাইনে বোন এখন, খোদার রহমে আর তোমাদের পাঁচ জনের দোওয়াতে ছেলে আমার বেঁচে বাড়ি ফিরে আসুক—সে না হয় চিরটা দিন থুবড়োই থাকবে। বৌ-মার যেমন অনাসিষ্টি ঝোঁক, কি করতে গিয়ে শেষে কি হয়ে গেল। কেন, আমার মাহবুবা মায়েরই কি বিয়ে হতো না, যে এমন অকাল-হুড়োর মতন কাড়াকাড়ি? আমি বি.এ.-এম.এ. পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলে এনে তার বিয়ে দিতাম। তাতে যত টাকাই খরচ হোক। জমি-জায়গা টাকা-কড়ি কাদের জন্যে? ছেলে-মেয়েদের সুখী করে তাদের মুখে হাসি দেখে তো আমরা চোখ মুদি, তারপর খোদা তাদের নসিবে যা লিখেছেন হবে! তখন তো আমরা আর কবর থেকে উঠে, তা দেখতে আসব না। কথায় বলে—'চোখ মুদ্‌লে কেবা কার!' ... যাক, যা হয়ে গেছে, তা গিয়েছে; নসিবের উপর চারা নাই। তা নিয়ে অনুতাপ করেও কোনো ফল হবে না। কি করি, মন বালাই—কোনো মানা মানে না, তাই দুটো কথা না বলেও পারি না! দু'-একবার মনে হয়, দূর ছাই। পরের ছেলেকে আপনার করতে গিয়েও যখন আর হলো না, তখন আর কেঁদেই কি হবে—মন খারাপ করেই বা কি পাব? হায় বোন, কিন্তু মন সে কথা বুঝতে চায় না! রাত্তির-দিন রোজা নামাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি, আল্লার নাম নিয়ে দুনিয়ার মায়া কাটাতে চাচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের বিশেষ করে মা'দের মনে যে খোদা কি দুর্বলতা দিয়ে দিয়েছেন যার জন্যে বেহেশ্‌তে গিয়েও আমাদের জান চায়েন হয় না। শুধু বাচ্চা-হারা বাঘিনীর মতো অশান্ত মন কেঁদে বিকিয়ে মরে! আমারও হয়েছে তাই মুশকিল। জিন্দেগির বাকি কালটা যে আল্লার নাম নিয়ে কাটিয়ে দেবো, তাই বুঝি তিনি কপালে লেখেননি!

যাক বোন, এখন আসল কথা হচ্ছে তোমরা ফিরে এসো। বেশ হলো, বুকে এত বড় 'দেরেগে' শোক পাওয়ার পর দু'দিন বাপ-মায়ের বাড়িতে বেড়িয়ে মন বাহালিয়ে নিলে, এখন আবার ঘরের বৌ ঘরে ফিরে এসো। বাপ-মায়ের বাড়িতে বেশি দিন থাকা 'আয়েব'ও বটে, আর তাতে মান-ইজ্জতও থাকে না। এখন তোমাকে তোমার শ্বশুর-কুলের আর মৃত স্বামীরই সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে। যে ঘরের বৌ তুমি, সে ঘরের

মাথা উঁচু রাখতে তুমি সব দিক দিয়ে বাধ্য। রবুকে পাঠিয়ে দেবো পাল্কি নিয়ে তোমাদের আনবার জন্যে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তাহলে ঘর দেখবে কে? বৌ-বেটি ছেড়ে কি আমার কোথাও যাওয়ার জো আছে। আর রাগ অভিমান করিসনে বোন। তোরা সবাই মিলে যদি আমার মনে এমন করে কষ্ট দিস তাহলে দেখছি কোন দিন বিষ খেয়ে আমাকে হারামি মউত মরতে হয়। আর তা নইলে তো তোমাদের এই হাড়-জ্বালানো স্বভাব থামবে না। আমার মাহ্‌বুবা মাকে নিয়ে আর বেশি দিন সেখানে থাকা মস্ত বড় দোষের কথা। আইবুড়ো মেয়ে—হোক না মামার বাড়ি, লোকে তো দশটা কথা বলতে কসুর করবে না ; আর তা শুনে শুনে তুমিও অতিষ্ঠ, তেতো-বেরক্ত হয়ে উঠবে। তোমরা যে দিন আসতে চাও, সেই দিনই শ্রীমান রবিয়ল বাবাজীবন সেখানে পাল্কি নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। তোমরা এর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। পত্র পাঠ উত্তর দিতে ভুলো না যেন, একথা আমি তোমার কান কামড়ে বলে দিচ্ছি।

খুকি যে তোর জন্যে 'থোত দাদি দাবো—থোত দাদি দাবো' বলে মাথা খুঁড়ছে এখানে ! মাবুর জন্যেও কত কাঁদে। হায় রে কপাল, এমন বে-দরদ ছোট দাদি যে একটা চিঠি দিয়েও পুতিনের খবর নেয় না ! আর সেই পুতিনের আবার ছোট দাদির জন্য এমন মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে কান্না !

হাঁ, আর একটা মস্ত বড় জরুরি কথা,—ছাই ভুলেও যাচ্ছিলাম ! আমার কি কিছু মনের ঠিক-ঠাক আছে বোন ! এখন মরণ হলেই বাঁচি ! ... বলছিলাম কি, আমাদের সোফিয়ার বিয়ে বৌমার ছোট ভাই মনুয়রের সঙ্গেই ঠিক করেছি। রবু বোধ হয় চিঠি দিয়ে আগেই সে কথা জানিয়েছে। তুই এবার এসে সব কাজ দেখে শুনে গুছো এসে ; সোফি তোর তো মেয়ে। আর, মাহ্‌বুবা মা না এলে সোফি বোধ হয় বিয়েই করবে না। আমি বোন এ-সব ঝামেলা সইতে পারব না এ-মন নিয়ে। সেখানকার সকলকে দর্জামতো সালাম দোওয়া দেবে। হাঁ, আর একবার তোর হাত ধরে বলছি বোন আমার দেখিস, আমার নূরুকে কোনো আহা-দিল বদ-দোওয়া দিসনে যেন, বাছা আমার কোথায় কোন দেশে পড়ে রয়েছে, হয়তো এতে তার অকল্যাণ হবে। ইতি—

তোমার বড় বোন
রকিয়া

শাহ্‌পুর,
১লা চৈত্র

বুবু সাহেবা !

তোমার চিঠি পেয়েছি। নানান কারণে উত্তর দেওয়া হয়নি।

মাহ্‌বুবাটাও বোধ হয় বৌমার কিংবা সোফিয়ার চিঠি পেয়েছে, তাই এই কদিন ধরে শুধু তার কাঁদো-কাঁদো ভাব দেখা যাচ্ছে।

আজ-কালকার ছেলে-মেয়েরা এমনি বেইমান! আমারই মেয়ে কিনা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলতে চায়। মাহ্‌বুবা এখন আমাকে দেখলেই এক পাশে সরে যায়, চোখ মুখে তার কান্না থমথম করে ওঠে! বাপরে বাপ, এ কলিকালে আরো কত দেখব বুবুজান,—দশ-মাস-দশ-দিন-গর্ভে-ধরা বুকের লোহু দিয়ে মানুষ করা একমাত্র মেয়ে সেও কিনা দুঃখিনী মায়ের বিদ্রোহী হয়? গরিবের মেয়ে—যার দিন-দুনিয়ায় আপনার বলতে কেউ নেই, তার আবার এত গরব কিসের! এ-সব দেখে আমার বোন দুঃখও হয়, হাসিও পায়!

তোমরা আমাদের খুবই উপকার করেছ বুবুজান, আমরা গরিব হলেও সে উপকার ভুলে যাবার মতন বেইমানি আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে তোমাদের পায়ের জুতো বানিয়ে দিলেও সে ধার শোধ হয় না। তবে কথা কি জানো, আমরা গরিব, তাই হয়তো লোকের ভালো কথাও এসে অপমানের মতন আমাদের বুকে বাজে। আর বোধ হয়, সেই জন্যেই মনে করছি তোমরা উপকার করে মায়া-মমতা দেখিয়ে আজ আবার তারই খোঁটা দিচ্ছ। বড় দুঃখেই লোকে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নেয়। আমি যদি সমান দরের লোক হতাম তা হলে হয়তো খুব সহজেই তোমার ও উপকার, অত স্নেহ-মায়া অসঙ্কোচে নিতে পারতাম; কিন্তু আমি গরিব বলেই মনে করি, ও তোমাদের বড় মনের অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি আর দয়া ভিন্ন কিছুই নয়। আর, ও নিতে আমার মন তাই চিরটা দিনই লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে এতটুকু হয়ে যেত। মাহ্‌বুবার বাপ যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন আমি ও কথা তোমায় বলি-বলি করেও বলতে পারিনি, আর বলতে গেলেও উনি বলতে দিতেন না। এতে হয়তো তুমি মনে বড় কষ্ট পাবে বুবুজান, কিন্তু আর সত্যি কথাটা লুকিয়ে নিজের মনের দংশন-জ্বালা সইতে পারছিনে বলেই বড় কঠিন হয়েই এ কথাটা জানাতে হলো। আমার এত আত্মসম্মান থাকাটা কিছু আশ্চর্য নয়, কেননা আমি গরিবের ঘরে বৌ হলেও আমার বাপ মস্ত শরিফ। এইসব অপ্রিয় কথাগুলো বলে তোমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছি বুঝি, কিন্তু কত দুঃখে যে আমার মুখ দিয়ে এ-সব নির্মম কথাগুলো বোরোচ্ছে তা এক আল্লাই জানেন। উনি তো বেহেশ্‌তে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন কিন্তু এ-অভাগিকে তুষের আগুনে একটু একটু করে পুড়ে মরতে রেখে গেলেন! এখন এই যে আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে বুকের ওপরে, এ তো মেয়ে নয়—আমার বুকের ওপর যে কুল-কাঠের আগুনের খাপরা। ওকে নিয়েই আমার যত ভাবনা; তা নইলে আমার আজ চিন্তা কি? উনি যে দিন চলে গেলেন, সেই দিনই এ পোড়া জানের ল্যাঠা চুকিয়ে দিতাম।

আমাদের এখানে কোনো কষ্টই নেই। ঐ হতভাগি মেয়ে বোধ হয় লিখে জানিয়েছে সব দরদি বন্ধুদের, না? ও মেয়ে দেখছি দিন দিন আমারই দুশমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হাড় কালি করে ছাড়লে হতচ্ছাড়ি পোড়ারমুখি, তবু তার আর আশ মিটল না। এখন আমার কল্‌জেটা বের করে খেলেই ওর সোয়াস্তি আসে। এই ঢিবি বেয়াড়া মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া, হাত-নাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। য়্যা বড়-মানষি চাল, যেন কোন নবাবের মেয়ে! সত্যি বোন, তোমরাই ওকে অমন

আমিরজাদির মতন শাহানশাহি মেজাজের করে তুলেছ। এখন আমার সর্বদাই পাহারা দিয়ে থাকতে হয় তাকে, পাছে কখন কোন অনাসিষ্টি করে বসে থাকে বা কারুর মুখের ওপর চোপা করে একটা ঝগড়া–ঝাঁটির পত্তন করে বসে। খোদা আর কোনো দিকে সুখ দিলেন না।

ওঁর মরবার আগে আমি মুখরা ছিলাম না বলে যে তুমি আমাকে দোষ দিয়েছ বুবুজান, সে তোমার বুঝবার ভুল। আমি চিরদিনই এমনি কাঠচোটা কথা কয়ে এসেছি, তবে তখন ছিল একদিন আর আজ এক দিন। তখন আমাদের এ মন ভাঙাভাঙিও হয়নি আর তোমার ভালোবাসাটাও হয়তো সত্যিকারই ছিল, তাই আমার ও ঝাঁজানো কথা শুনেও শুনতে না। আজ যেই মনের মিথ্যা দিকটা ধরা পড়েছে, অমনি তোমারও চোখে পড়ে গিয়েছে যে মাগি চশমখোর মুখরা ! এবার আরো কত শুনব।

খামকা রবিয়ল বাবাজিকে কষ্ট করে এখানে পাঠিয়ো না বোন, আমি এখন যাব না। আইবুড়ো জোয়ান মেয়েকে যদি এমনি করে নালতে শাকের মতন হাট–বাজারে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তাহলে সবারই বদনাম। তাছাড়া, এখন মাহ্‌বুবাকে এখান থেকে নিয়ে গেলে আমার বাপ–মায়ের বা ভাইদের অপমান করা হয় না কি? তাঁরা কি এতই ছোটলোক যে, তাঁদের ঘরের আবরু এমন করে নষ্ট হতে দেখে বসে বসে হুঁকো টানবেন ? আরো একটা সত্যি কথা বলছি বুবু, রেগো না যেন। আমরা গরিব হলেও মানুষ, আমাদেরও মান–অপমান জ্ঞান আছে। এত অপমানের পরও আমরা কোন মুখে সেখানে আবার মুখ দেখাব গিয়ে ? এখানে যদি কুকুর বিড়ালের মতোও অবহেলা হেনস্থা হয় তাও স্বীকার, তবু আর' খোদা যেন ও সালার–মুখো না করেন। আমি দূর থেকেই সালারকে হাজার হাজার সালাম করছি বোন। তুমি শুধু নিজের দিকটা দিয়েই ঐ কুকুর–কুণ্ডলি কাণ্ডটা নিয়ে বিচার করেছ, কিন্তু এ গরিবদের বেদনাটুকু বুঝতে হয় বোন সেই সঙ্গে। কথায় বলে,—তাঁতি তাঁত বোনে, আপনার দিকে ভাঁড় টানে ! তোমরা দেখছি তাই। আচ্ছা, এই যে মাহ্‌বুবার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন, এটা কার দোষে, কোন বেদনার ঘা সামলাতে না পেরে ? তা কি জানো ? আমি তখ্‌খুনই বলেছিলাম, দড়াতে দড়িতে গিঁঠ খায় না, তা তোমাদের ঝোঁকে উনি সোজা মানুষ আমার কথাই কানে উঠালেন না। তার পর সত্যি সত্যিই 'তেলি, না, হাত পিছলে গেলি' করে নূরু আপনার এক দিকে পালিয়ে গেল— পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু মাঝে পড়ে সর্বস্বান্ত হলাম আমরা–গরিবরা। মাহ্‌বুবার বাপ সে–আঘাত সে–অপমান সহ্য করতে না পেরে দুনিয়া থেকে সরেই পড়লেন,মেয়েরও আমার বুক ভেঙে গেল ! মা আমি, আমার কাছে তো আর মেয়ে মন লুকিয়ে চলতে পারে না। মাহ্‌বুবা যতই চেষ্টা করুক, আমার আজ এটা বুঝতে বাকি নেই যে হতভাগি মরেছে। কিন্তু এও আমি বলে রাখলাম যে, আমি বেঁচে থাকতে যদি আমার এই মেয়ের ফের নূরুর সঙ্গে বিয়ে হতে দিই, তবে আমার জন্ম শাহ্‌জাদ মিয়া দেননি ! মাহ্‌বুবার বাবার উঁচু মন, তিনি মরণকালে তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে গিয়েছেন, কিন্তু আমি আজো তোমাদের কাউকে ক্ষমা করতে পারিওনি আর পারব না। এ সত্যি কথা আজ মুখ ফুটে বলে দিলাম। নূরুকে আমি বদ দোওয়া করব না, সে যুদ্ধ থেকে সহি–সালামতে ফিরে

আসুক আমিও প্রার্থনা করছি, কিন্তু তাকে ক্ষমা করতে পারব না তাই বলে। যে অপমান, যে আঘাতটা আমাদের সইতে হয়েছে তা অন্য কেউ হলে এতদিন তার হাজার গুণ বদলা নিয়ে তবে ছাড়ত ! ... যাক সে সব কথা, এ-ভাঙা মন আর জুড়বেও না, আমিও সেখানে যেতে পারব না, 'ও মন কাঁচের বাসন, ভাঙলে ও-মন আর জোড়ে না !' সালারেরও দানা-পানি আমার কপালে আর নেই বোন ; তা সেই দিনই ফুরিয়েছে যেদিন মাহ্‌বুবার বাপ মারা গিয়েছেন। আমি সব ভুলতে পারি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুটা আমি ভুলতে পারি না—শুধু এ-কথাটা মনে রাখবে।

আমার ভায়েরা বীরভূম জেলার শেঙানের এক খুব বড় জমিদারের সঙ্গে মাহ্‌বুবার বিয়ের সব ঠিক-ঠাক করেছেন ! তিনি এক মস্ত হোমরাচোমরা বুনিয়াদি খান্দানের, তবে বয়েসটা চল্লিশ পেরিয়ে পড়েছে এই যা। কিন্তু তাঁর আগের তরফের বিবির এক মেয়ে, আর কেউ নেই। তারো আবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তারো ঘরে ছেলে মেয়ে। বরের বয়েসটা একটু বেশি, তাহলে আর কি করব ! গরিবের মেয়ের জন্য কোন নওয়াবজাদা বসে আছে বলো ! এই মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে। মাহ্‌বুবাও মত দিয়েছে ; —এ শুনে তোমরা তো আশ্চর্য হবেই, আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। ... আল্লাহ্ এত দুঃখও লিখেছিল অভাগির কপালে ! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে বুবু সাহেবা, বুক ফেটে যাচ্ছে !

যাক, তোমাদেরও দাওয়াত করলাম, এসে এই দুঃখীর বিয়ে দিয়ে যেয়ো—মায়ের আমার বিসর্জন দেখে যেয়ো বোন ! যদি না আসতে পারো, তবে সবাই মিলে দোওয়া করো যেন পোড়ামুখি সুখি হয়।

মা সোফিয়ার বিয়েতে যেতে পারব তা আর মনে হয় না বুবুজান। তাহলে আমার ঘরের এ-কাজ দেখবে কে? আমি আমার জান-দিল থেকে দোওয়া করছি, খোদা আমার সোফি মাকে রাজ-রানি করুন। তার মাথার সিঁদুর হাতের পঁইচ অক্ষয় হোক ! বেশ সুন্দর হবে, মনুয়রের সাথে ওকে মানাবেও মানিক-জোড়ের মতন। আমি এ-দৃশ্য দেখতে পারলাম না বলে ছটফট করছি।

আবার লিখছি বোন, খামখা রবু বাবাজিকে আমাদের নিতে পাঠিয়ো না, পাঠিয়ো না ! অনর্থক হালাক হয়ে ফিরে যাবে। আমি জান থাকতে সেখানে যেতেও পারব না, আর মাহ্‌বুবার এ-বিয়েও বন্ধ করতে পারব না।

বহুমাকে আর সোফিয়াকে আমার বুক-ভরা স্নেহ-আশিস দেবে ! খুকিকে আমার চুমো দেবে, আমি বাস্তবিকই তার বে-দরদ দাদি !

আসি বুবুজান, মাথাটা ঘুরে আসছে ! আবার আমার পুরোনো ভিরমি রোগটা কদ্দিন থেকে কষ্ট দিচ্ছে !—

তোমার ভাগ্যহীনা ছোট বোন
আয়শা

সালার
২৭শে চৈত্র, রাত্তির

দুষ্টু সাহসিকা !

তোর সাথে এবার দেখছি সত্যিকার আড়ি দিতে হবে। বাহা রে দুষ্টু ছুঁড়ি ! আমি না হয় সংসারে ঝন্‌ঝাটে পড়ে তোকে কিছুদিন চিঠি দিতে পারিনি, তাই বলে তুইও যে গুমোট মেঘের মতো অভিমানে মুখ ভারি করে বসে থাকবি—হায়রে কপাল তা কি আর জানতাম? ... আজ আমাদের সেই ছেলেবেলা, সে অভিমানে অভিমানে 'কান্না-হাসির পৌষ-ফাগুনের পালা' সেই মা'দের সোহাগ,—সব কথা মনে পড়ছে রে বোন, সব কথা আজ যেন চোখের জলে ভিজে বেরিয়ে আসতে চাইছে! দুনিয়ায় কেমন করে কার সাথে সহসা যে চেনা-শুনা হয়ে যায়, দুইটি হিয়াই কেমন করে কপোত-কপোতীর মতো সারাক্ষণ অন্তরের নিভৃততম কোণে মুখোমুখি বসে গোপন কূজনে হিয়ার গগন ভরিয়ে তোলে, তা সবচেয়ে সেই সময় চোখের জলে লেখা হয়ে দেখা দেয়, যখন তাদের এক ব্যথিত অজানা দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

দ্যাখ সই, আজ যখন আমার বড় কষ্ট বড় দুঃখ, সেই সময় একটি ব্যথা-পাওয়া সখিকে কাছে পেতে যেন আমার আশা দিকে দিকে ঘুরে মরছে। আমার বুকে যে আজ কথার ব্যথা জমে জমে পাহাড়-পারা হয়ে উঠেছে বোন,কেননা, আমার খেলার সাথীটিও মূক হয়ে গিয়েছে। পরের বেদনায় নিজের বুক ভরে আমরা দুটি চির-পরিচিত জনও কেমন যেন পরস্পরকে হারিয়ে ফেলেছি। এই হঠাৎ-পাওয়া বেদনার বিপুলত্ব আমাদেরই দু'জনকেই কেমন স্তম্ভিত করে ফেলেছে, যাতে করে এ-নিবিড় বেদনার অতলতা আর কিছুতেই আমাদের সহজ হতে দিচ্ছে না। কি হয়েছে, সব কথা বলি শোন।

তোর পথিক-ভাই নূরুটার সব কাণ্ড-কারখানা তো জানিস।—আজ কিন্তু তোর ওপরেও আমার কম রাগটা হচ্ছে না রে 'সাহসী' ! তুই তাকে রাতদিন 'পাগল-ভাই আমার' 'পথিক-ভাই আমার' বলে বলে যেন আরো খেপিয়ে তুলেছিলি, দোলা দিয়ে দিয়ে তার জীবন-স্রোতকে আরো চল-চঞ্চল করে তাতে হিন্দোলের উদ্দাম দোল এনে দিয়েছিলি। আমি তার বেদনায় এতটুকু নাড়াছোঁয়া না দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে শান্ত করবার মতলব আঁটছি, এমন সময় তুই তোর বুক-ভরা বেদনা-ঝন্‌ঝা এনে তার ব্যথার প্রশান্ত মহাসাগরে দুরন্ত কল্লোল জাগিয়ে গেলি। সেই ঝনঝার ঝাঁকানি আর ঢেউ-এর হিন্দোল উচ্ছ্বাসই তাকে ঘর-ছাড়া ডাক ডেকে শেষে আগুনের মাঝে গলা জড়াজড়ি করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই চির-বঞ্চিতের জীবন-যাত্রা, বড় দুর্বিষহ রে বোন, বড় দুর্বিষহ ! এই বিড়ম্বিত হতভাগ্যেরা যেমন রাক্ষসের মতো স্নেহ-বুভুক্ষু, তেমনি অস্বাভাবিক অভিমানী।

এই খ্যাপার শিরায় শিরায় রক্ত যেমন টগবগ করে ফুটছে, স্পর্শালুতাও তেমনি তীব্র তীক্ষ্ণতা নিয়ে ওত পেতে রয়েছে। সকল দুঃখ-বেদনা-আঘাতকে হাসি মুখে সহ্য

করবার বিপুল শক্তি এদের আছে, এদের নাই শুধু স্নেহ সহ্য করবার ক্ষমতা। স্নেহ-সোহাগের একটু ছোঁওয়ার আবছায়াতেই এদের অভিমানমথিত বুকে বিরাট ক্রন্দন জাগে। এইখানেই এরা সাধারণ মানুষের চেয়েও দুর্বল।

নূরুর ব্যথার সরসীতে যেই শৈবালের সর পড়ে আসছিল, অমনি তুই এসে একেবারে তার বেদন-ঘায়ে পরশ বুলিয়ে তাকে ক্ষিপ্ত করে তুললি। তার ঘুম-পাড়ানো চিতাকে সজাগ করে দিলি। নিজে তো গৃহবাসিনী হলিনে সাথে সাথে আর এক মুগ্ধ হরিণকে তার মনের কথা মনে করিয়ে দিলি। ... তোর ও দুরন্তপনা দেখে দেখে তাই আমার ভয় পাচ্ছে, পাছে তুইও না মাথায় পাগড়ি বেঁধে যুদ্ধে চলে যাস। যেমন দুষ্টু সরস্বতী মেয়ে, তেমনি নামও হয়েছে—সাহসিকা।

কিন্তু বিয়ের বেলায় তো সাহস হয় না লো ! ইস ! গা'টা হেলফিলিয়ে উঠছে,—না ?

হাঁ, কি হয়েছে শোন।

নূরুর সাথে মাহ্বুবার সেই বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্তের পর তো নূরুটা যুদ্ধে চলে গেল—বনের চিড়িয়া বনে উঠে গেল, কিন্তু তার শূন্য পিঞ্জরটি বুকে নিয়ে একটি বালিকা নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল। এ-হতভাগী আর কেউ নয় বোন, এ হচ্ছে তোর বাচ্চা-সই মাহ্বুবা।

মাহ্বুবার বাবাজান হঠাৎ মারা পড়লেন দেখে তার মামারা এসে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, অনেক কাঁদা-কাটি করে পায়ে ধরেও রাখতে পারলাম না। মাহ্বুবার মা-জান যে এমন বে-রহম তা আগে জানতাম না ভাই।

এই রাক্ষুসি-মায়ের পরের কাণ্ডটা শোন। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে মাহ্বুবাকে ধরে-বেঁধে এক চল্লিশ বছরের বুড়ো জমিদারের সাথে তিনি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। খবর পেয়ে আমরা সকলে সেখানে গিয়ে কেঁদে পড়ি, তাঁর পায়ে আমরা ঘর-গুষ্টি মিলে মাথা কুটে-কুটেও তাঁর মত ফেরাতে পারিনি। জোর করে বিয়ে থামাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাতেও কোনো কিছু হয়নি ; মারামারি করতে গিয়ে তোর সয়া হাতে খুব জখম হয়েছেন। তবে একেবারে ঘায়েল নয়। ঘায়েল হয়েছে ঐ মন্দভাগি মাহ্বুবাটা। সে এখন শ্বশুরবাড়িতে--শেঙানে। আহ্—আহ্, বিয়ের দিনে সে কি ডুকরে ডুকরে তার কান্না রে সাহসী, তা দেখে পাষাণও ফেটে যায় ! তবু ঐ বে-দিল্ মায়ের জানে একটু রহম হলো না। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর আবার কান্না কত ! ... এই গোলমালে সোফির আর মনুর চার হাত এক হতে দেরি হয়ে গেল।

এ-বিয়েতে তোকে আমরা ধরে আনব গিয়ে। আসতেই হবে কিন্তু কোনো মানা শুনছিনে, বুঝলেন শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া !

তোর পথিক-ভাই পাগলা নূরুটাও আসতে পারে এই বিয়েতে। তুই এলে এবার বনবে ভালো। জানিনে হতভাগা এ-আঘাত সইতে পারবে কি না !... আচ্ছা হয়েছে—খুব হয়েছে—যেমন অন্হেলা, তেমনি মজা ! এখন মতির মালা বানরে নিয়ে গেল ! কথায় বলে,—'কপালে নেই ঘি, ঠক্-ঠকালে হবে কি ?'

নূরুটা ক্রমেই স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে দেখছি, আবার এ-খবর শুনলে তো সে বিধাতা পুরুষের সপ্ত-পুরুষ উদ্ধার করবে। আমাদের বুক কাঁপে রে ভাই ভয়ে দুরু দুরু করে পাছে কোনো অমঙ্গল হয়। তার চিঠির যদি ঝাঁজ দেখতিস। উঃ, যেন একটা বিপুল ঘূর্ণিবায়ু হু-হু-হু-হু করে ধুলো উড়িয়ে সারা দুনিয়াটাকে আঁধার করে তুলতে চাইছে। ... আমি তার চিঠির এক বর্ণও বুঝে উঠতে পারিনে বোন, এক বর্ণও না। শুধু বুঝি, একটা তিক্ত কান্নার তীব্রতা যেন তাকে ক্রমেই শুষ্ক তীক্ষ্ণ করে ফেলছে। ... খোদা ওকে শান্তি দিন।

চারিদিককার এই গোলমালে আমার মনের শান্তি একেবারে উবে গিয়েছে। আমার এই সাজানো ঘর যেন আজ আমাকেই মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।

মা আর সোফিও আলাদা জীব হয়ে উঠেছেন আজকাল। মায়ের দুঃখ অনেক, কিন্তু এই কচি মেয়ে সোফিটা? তুই এলে তবে একবার ওর গুমোর ভাঙে। মাগো মা, রাত-দিন মুখ যেন ভার হয়েই আছে। ছুঁতে গেলেই নাকি কান্না। এমন ছিঁচ-কাঁদুনে ছুঁড়ি তো আমি আর জন্মে দেখিনি, যেন রাঙতার টেকো আর কি!

আর লজ্জার কথা শুনেছিস রে 'সাহসী'? আজকাল সে তোর ভয়ানক ভক্ত হয়ে উঠেছে। এখন কথায় কথায় তোর নজির দেওয়া হয়, 'সাহসীদিই তো ভাল কাজ করেছেন—বিয়ে করা একেবারে বিশ্রী কাজ, আমিও চিরকুমারী থাকব' ইত্যাদি ইত্যাদি! আমার তো চক্ষুস্থির! ওরে বাপরে,—এখন তুই এসে একে তোর কাছে নিয়ে গিয়ে এক-আধটা শিক্ষয়িত্রীর পদ-টদ খালি থাকে তো দিয়ে দে! বেশ চেলা জোটাচ্ছিস কিন্তু ভাই। আমি বলি কি, তোরা যত সব চিরকুমারী আর চির-কুমারের দল মিলে একটা নেড়ানেড়ির দল বের কর। কেমন লো,—কি বলিস?

তোর বর না হয় তোর রূপ-গুণের জৌলুস দেখে ভয়েই পিঠটান দিল, কিন্তু আমাদের এই শ্রীমতি সোফিয়া খাতুনের ঝগড়া করা আর নাকে-কাঁদা ছাড়া অন্য কি গুণ আছে, যাতে করে তাঁর 'অচিন-প্রিয়তম' তাঁকে ত্যাগ করে গেলেন? কিন্তু এইখানে কথা হচ্ছে যে, এই ঝগড়াটে ছুঁড়ির আবার 'প্রিয়তম'-ই বা কে? সে কি কোন পরিস্থানের শাহ্‌জাদা উজিরজাদাকে খোয়াবে-টোয়াবে দেখেছে নাকি? এ-সব কথা তুই-ই এসে জিজ্ঞেস করবি ভাই, আমি বলতে গেলে এখন আমায় সে লাঠি নিয়ে তাড়া করে আসে। জানি না, ওঁর 'পীতম' কোন্ গোকুলে বাড়ছে। কিন্তু দেখিস ভাই, এসে ওকে যেন আবার চেলা বানিয়ে নিসনে।

আর, তুই নিজে কি এমনি সন্ন্যাসিনীই রইবি? হায় রে শ্বেতবসনা সুন্দরী, তোর বসন্ত বৃথাই গেল! চোরের সঙ্গে ঝগড়া করে ভুঁইএ ভাত খাবি না কি? আয় তো এখানে একবার, তারপর মনে করেছি কি, তোকেও একটা বুড়ো হাবড়া বর জুটিয়ে দিয়ে 'নেকা' দিয়ে দেব। কি বলিস, বিবি হতে পারবি তো? তবে আজ এখন আসি। ইতি—

তোর ভুলে-যাওয়া সই
রাবেয়া

বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা

প্রথম বৈশাখ (সকাল)

ভাই রেবা !

আজ যে নতুন বছরের প্রথম দিনের প্রথম সকালে তোর নামটিই সর্বপ্রথমে আমার মনের কোণে উঁকি মারল, আমার এ-বিপুল আনন্দে নিবিড় মাধুরী তুই হয়তো বুঝবিনে ; কেননা, তুই এখন ঘরের লক্ষ্মী, তোর ভালোবাসা পাবার আর দেবার অনেক লোক আছে, কিন্তু আমাদের তো আর পোড়াকপালে সে সব কিছু জুটল না। আমার বন্ধু আছে অনেক, কিন্তু সে সব মামুলি ; তাঁদের সঙ্গে শুধু লৌকিকতার খাতিরটুকু মাত্র, প্রাণের সঙ্গে কারুর কোথাও এতটুকু মিল নেই। তোকে যেমন অসঙ্কোচে একেবারে সেই ছেলেবেলাটির মতন সহজ হয়ে আমার অন্তরের বাইরের সব-কিছু জানাতে পারব, এমনটি তো আর কাউকে পারব না ভাই ! আমার ভেতরটা এই নীরস সামাজিকতার আর লোক দেখানো প্রীতির চাপে যখন ক্রমেই শুকনো কাঠ হয়ে উঠছিল, তখন তোর এই হঠাৎ-পাওয়া ছোট্ট চিঠিখানি যে কত অন্তরতম বন্ধুর মতন সেই শুকনো হিয়ায় পরশ বুলিয়ে তাকে আবার ফুলে-ফসলে ভরিয়ে তুললে, তা আমার এই ভাবাবেগময়ী লিপি-দূতীর চেহারা দেখেই বুঝতে পারবি।

এত দিন তোর 'সাহসী' সই 'পুয়াল-চাপা' ছিল, তার কাঠামোটা নিয়ে যিনি এত দিন এই কলকাতা শহরের মহিলাদের পর্দাপার্কে, মাঝে মাঝে রাস্তায়, বোর্ডিং-এ স্কুলে গম্ভীরা হয়ে বেড়াতেন, তিনি হচ্ছেন মিস্ সাহসিকা বোস ! বুঝলি ? শুধু কি তাই ! এক প্রখ্যাত ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হোমরা-চোমরা গ্রাজুয়েট, তদুপরি অনুপমা সুন্দরী, বিদূষী, কলা-সরস্বতী ! আমার আরো অনেকগুলো বিশেষণ আছে, সেগুলো আর চিঠিতে লিখে জানাচ্ছিনে, তোকে একবার আমার এই কুঞ্জ-কুটিরে এনে হাতে-কলমেই দেখানো যাবে ! তুই এতক্ষণ বোধ হয় তোর দুষ্ট হাড়-জ্বালানো ননদিনী সোফিকে ডেকে এনে খুব কুটি-কুটি হয়ে হাসছিস, নয় ? সত্যি বলছি ভাই রেবা, এ আর আমি কি বললাম, আমার সব মহিলা বন্ধুরা আমাকে কোনো নতুন-দেখা সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এই রকম যে কত পাঁয়তারা কসরৎ করে যে অহম্ সুর-সুন্দরীর গুণ-ব্যাখ্যাও কীর্তন করেন, তা শুনে শুনে আমারও অনেক সময় মনে হয়,—নাঃ, আমি আর এখন কেউ-কেটা নই। যেই ভাবা, আর যায় কোথা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাবৃট-মেঘের মতন গুরু-গম্ভীর হয়ে পড়া। প্রথম প্রথম দিন কতক একটু অসোয়াস্তি বোধ হতো, কিন্তু এখন দিব্যি সয়ে গিয়েছে ; শুধু সয়ে গিয়েছে বললে ভুল হবে, এখন বরং কোনো জায়গায় ঐ রকম বিশেষণে-বিশেষিত অভ্যর্থনা না পেলে মনে একটু রীতিমতোই লাগে ! দেখেছিস এই সব মিথ্যা বাজে জিনিসের ওপরও আমাদের মায়া কত বেশি !

আজ যে আমি তবে হালকা বা খেলো হয়ে পড়েছি তোর কাছে, তার কারণ, আমি দৈর্ঘে-প্রস্থে যে দিকে যতই বাড়ি, তোর কাছে ঐ বাঁদরি ছুঁড়ি, লো, টে, খুব জোর 'সাহসী'র বেশি বিশেষণে তো আর জীবনে কখনো বিশেষিত হলামও না, আর ভবিষ্যতে

যে হবও না তার প্রমাণ তোর এই এতদিন পরের চিঠিটা ! তাই আমার অতগুলো মর্দানি লেবাস সত্ত্বেও এবং এক মস্ত ধিঙ্গি আইবুড়ো মাগি হয়েও আজ শুধু মনে হচ্ছে আমাদের সেই বাঁকুড়ার ছেলেবেলাকার কথাটা ! এখন আর আমাতে আমি নেই, এখন বাঁকুড়ার চুলবুলে সাহসী ছুঁড়ি এসে আমার মনের আসনে জোর জড় গেড়ে বসেছে ! এখন আমার কি মনে হচ্ছে বুঝলি লো 'খুকির-মা'? এখন বড্ড সাধ যাচ্ছে যে, সেই আমাদের কিশোরী জীবনের মতন দুই সই-পা ছড়িয়ে চুল এলিয়ে পাশাপাশি বসি আর খামচা-খামচি নুচোনুচি খুনসুড়ি মস্তানি করি এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব পেট ভরে মা-দের গা'ল খাই ! নয় তো তোর ঐ এক বোঝা চুল নিয়ে বেণী গাঁথতে তেম্নি মশগুল হয়ে যত সব রাজ্যের ছিষ্টি-ছাড়া গপ্‌পো করি। এখন আমি এই চিঠি লিখছি তোকে আর আপনাতে আপনিই বিভোর হয়ে গিয়েছি ! আঃ, কেমন করে মানুষের কতো পরিবর্তন হয় বোন। আমার এত আনন্দের বাজার কে ভাঙলে, আর কেমন করেই বা ভাঙল তাই ভাবতে গিয়ে অনেক দিন পরে আমার চোখের পাতা ভিজে এল !

দ্যাখ, ভাই রেবা, নারীর নারীত্ব কিছুতেই মরবার নয়, এ কথাটা আজ আমি খুবই বুঝতে পারছি। তার কারণ বলছি তোকে, শোন ! ... নানান দিক থেকে নানান রকমের ঘা আর আঘাত খেয়ে খেয়ে যখন আমার ভিতরের নারীর মাধুরী, সমস্ত পেলবতা— নমনীয়তা ক্রমেই হিম জমাট হয়ে আসতে লাগল, তার ওপর রাত-দিন মর্দানি কায়দা-কানুনের চাপে চাপে অন্তরের নারী আমার অহল্যার মতোই পাষাণ হয়ে গেল, তখন আমি সব বুঝতে পারলাম মাত্র, কিন্তু না পারলাম কাঁদতে, না পারলাম তেমন কিছু বেদনা অনুভব করতে। হায় রে বোন, তখন যে আমি পাষাণী ! আমার কি আর তখন কোনো কোমল অনুভূতি জমে পাথর হতে বাকি আছে, যে তার সাড়া পেয়ে বাকি অনুভূতিগুলো একটু নড়া-চড়া করেও উঠবে ! ঐ পাষাণ-বুক নিয়ে শুধু শুকনো অশ্রুহীন কাঁদন কেঁদেছি যে, হায়, আমার আর মুক্তি নেই—মুক্তি নেই ! অহল্যারও মুক্তি হয়েছিল, তখন তার মাঝে যে আমিও ছিলাম। আজ আবার এই আমার মাঝে সেই অহল্যা তার পাষাণী মূর্তি নিয়ে এসেছে, কিন্তু এবার যেন মুক্তিটাকে বাদ দিয়ে। এই আমির মাঝে আমার সেই বহুযুগ আগের আমি তো নেই, তার যে মৃত্যু হয়েছে ! এত দুঃখ আমার বোন, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারিনি ! জীবনের যত দুর্ঘটনা যতরকম সম্ভব করুণ করে মনে করে কাঁদতে চেষ্টা করেছি ; মা'র, বাবার ফটোগুলো, তাঁদের হাতের লেখা ইত্যাদি সামনে ধরে, আমার জীবন-ভরা হারানো প্রিয় মুখগুলি মনে করে করে যতই কাঁদতে গিয়েছি, ততই খালি কাপাস-হিম-হাসি ঠোঁটের কোণে এক রেখা ম্লানিমার মতো মাত্র ফুটে উঠেছে। ভাবো দেখি একবার এই দুর্বিষহ যাতনার বিড়ম্বনা ! নারী, বিশ্বের সব কিছু কোমলতা আর মাধুর্য সুষমা দিয়ে গড়া নারী, হাজার কষ্টেও তার বুকে কান্না জাগে না, বেদনাও আঘাত দিতে পারে না ! এর যাতনা আর ছটফটানি বুঝিয়ে বলবার নয় রে বোন, এ-কষ্টে যার হৃদয় কখনো এমনি শুকিয়ে ঠন্‌ঠনে পাথর হয়ে গিয়েছে সেই বুঝবে !... বৈশাখের কান্না দেখেছিস? তার ঐ হু-হু-হু-হু রোদ্দুরে, ধু-ধু-ধু-ধু গোবি-সাহারায় ধুলো-বালি, শন্‌-শন্‌-শন্‌-শন্‌ শুকনো

ঝড়-ঝন্‌ঝা, পাহাড়-ফাটা শুষ্কতার বিপুল চড়চড়ানি, দীর্ণ-বিদীর্ণ রুক্ষ খোঁচা-খোঁচা উলঙ্গ মূর্তির রুদ্র বীভৎসতা আর খাঁ খাঁ নগ্নতার হাহাকার ক্রন্দন শুনেছিস? তার ঐ কঠোর কাঠচোটা অট্টহাসির খনখনে কাংস্য আওয়াজের মাঝে সারা বিশ্বের বিধবার অশ্রুহারা সকরুণ কান্নার নীরব ধ্বনি শুনেছিস? এ-বিষাক্ত তিক্ত কাঁদন বুঝিয়ে বলবার নয় রে বোন, এর লক্ষ ভাগের এক ভাগও বাইরে প্রকাশ করে দেখানোর ক্ষমতা আমার নেই! এ-শাস্তি যেন অতি বড় দুশমনেরও না-হয়! এই তো সবচেয়ে বড় নরক-যন্ত্রণা! এই তোদের 'হাবিয়া দোজখ'! এতে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু এই কূট হলাহল-যন্ত্রণা তাকে নিশিদিন জবাই-করা অসহায় প্রাণীর মতন ছটফটিয়ে কাৎরিয়ে কাৎরিয়ে মারে! শিব নাকি সমুদ্র-মন্থনের সমস্ত বিষ পান করে নীলকণ্ঠ নাম নিয়েছেন, কিন্তু তিনি যত বড় দেবতাই হন, তাঁর শক্তি যত বেশি অনির্বচনীয় হোক, আমি জোর করে বলতে পারি যে, এই অশ্রুহীন কান্নার তিক্ত বিষ এক ফোঁটা গলাধঃকরণ করলেই তাঁর কণ্ঠ ফেটে খানখান হয়ে যেত! তবে আমরা যে এখনো বেঁচে আছি? হায় রে বোন! আমরা যে মানুষ-রক্তমাংসের মানুষ! আমাদের শরীরে যা সয়, তা যদি দেবতার শরীরেও সইত, তবে তাঁরা এত দিন দেবতা না থেকে মানুষ হয়ে জন্মে মুক্তিলাভ করতেন! কেননা দেবতাদের চেয়ে মানুষ ঢের ঢের, অনেক-অনেক উঁচু! তাঁদের যে একটা অমানুষিক শক্তিই রয়েছে সমস্ত সহ্য করবার! কিন্তু মানুষের এই ক্ষুদ্র বুকের ক্ষুদ্র শক্তির সহ্যগুণ ক্ষমতা যতটুকু তার চেয়ে অনেক বিপুল বহু বিরাট দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনা আঘাত-ঘা যে সহ্য করতে হয়! এত কষ্টেও কিন্তু সে সহজে মরে না! মরণ এ-দুঃখীদের প্রতি বাম! তার রথ এ-সব আর্তদের পথ দিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এ-বিড়ম্বিত হতভাগ্যদের কর্ণে তার দূরাগত চাকার ধ্বনিও শ্রুত হয় না। বৃথাই সে হাঁক-ডাক মারে, ... 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' কিন্তু শ্যাম ততক্ষণে অন্ধকার পথ দিয়ে মরণ-ভিতুদের কানে তাঁর মৃত্যু-বাঁশির বেলাশেষের তান শুনান।...

হ্যাঁ, কি জন্যে তোকে এত কথা জানিয়ে বা বাজে বকে বিরক্ত করলাম তা পরে জানাচ্ছি! এখন, কি কথা থেকে এত সব প্রাণের কথা এসে পড়লো ... আমি বলছিলাম যে, নারীর নারীত্ব কিছুতেই মরবার নয়। সত্যি-সত্যিই বোধ হয় অহল্যা নারী চিরকাল পাষাণী থাকতে পারে না! নারীই যদি পাষাণী হয়ে যায়, তবে যে বিশ্ব-সংসার থেকে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তিই উবে যায়, আর বিশ্বও তখন কল্যাণ-হারা হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মতোই এক নিমিষে নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যায়! এই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ! এ-'নারী' হিম হয়ে গেলে বিশ্ব-প্রাণের স্পন্দনও এক মুহূর্তে থেমে যাবে! ... আমি যখন নিজেকে নারীত্ব-বিবর্জিতা এক পাষাণী প্রতিমা মনে করে অমনি অশ্রুবিহীন মৌন ক্রন্দনে আমার মর্মর পাষাণ মর্ম-কন্দরের আকাশ-বাতাস নিয়ত বিষাক্ত তিক্ত আর অতিষ্ঠ ভারি করে তুলেছিলাম, তখন তোর ঐ চিঠির লেখার গোটা কয়েক মাত্র আঁচড় কি করে বুকের একদিককার এত ভারি পাষাণ তুলে ফেলে অশ্রুর একটি ক্ষীণ ঝর্নাধারা বইয়ে দিলে? কি করে আজ আমার অনেক-দিনের বাঞ্ছিত কান্না তার মধুর গুঞ্জনে আমার মূক মন-সারীর মুখে বাক ফুটালে? তাই ভাবছি আর বড় প্রাণ

ভরেই এই কান্নার মেদুর মধুর বুদ্বুদ–ভাষা প্রিয়তমের বাঁশির পাতলা গিটকিরির মতই আবেশ–বিহ্বল প্রাণে শুনছি! তোর চিঠিটা এতদিন পরে এমনি না-চাওয়ার পথ দিয়ে হঠাৎ আমার পাষাণ–দেউলের খিড়কিতে এসে আচমকা ঘা না দিলে তা এত সহজে খুলত না, তা আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি। এ যেন দোর–বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রিয়জনের মুখে ডাকনাম ধরে আহ্বান শুনে চমকে দোর খুলে দিয়ে পুলকলাজে অপ্রতিভ হওয়া! কিন্তু এখন আবার ভয় হচ্ছে বোন যে, এ–দ্বার অভিমানে আবার বন্ধ হতেও তো দেরি না হতে পারে! অনেক কালের পরে ফিরে–পাওয়া প্রিয়জনকে দেখে বুকে হরষণ যেমনি জাগে, তার পিছু–পিছু অভিমান–ক্রন্দনও তেমনি জলভরা চোখ নিয়ে এসে যে দাঁড়ায়! তাই বলি কি, তুই এমনি অপ্রত্যাশিত পথ দিয়ে এমনি করে আচম্কা কুক্ দিয়ে দিয়ে আমার মর্মর–মন্দিরের পাষাণ অর্গল খুলে ফেলিস! এখন আমার যা মনের অবস্থা, তাতে যদি তুই রোজ এসে এমনি করে দেখা দিস তাহলে হয়তো আবার আমার মনের খিড়কি বন্ধ হয়ে যাবে। কি বলিস ভাই? লক্ষ্মীটি, এতে যেন অভিমানে তোর পাতলা অধর ফুলে না ওঠে! তোর সেই হারিয়ে–যাওয়া 'সাহসী' সইটিকে আগে এই গম্ভীরা শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার মাঝে জাগিয়ে তোল, তাহলে আবার নয় তো শিঙ ভেঙে বকন হওয়া যাবে! উপমাটা নেহাৎ ওঁচা হয়ে পড়ল, না লো? সে যাই হোক, তোর সেই চির–কিশোরী সাহসীটা যে মরেছে, একদম মরেছে লো। তাকে বাঁচাতে হলে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় রস আনতে হবে! বুঝলি? পারবি তো? দেখিস বেহায়া ছুঁড়ি, তুই যেন এই অবসরে আমার–জন্যে–বরাদ্দ–করা চোখে–চাল্‌সে–লাগা বুড়ো–হাবড়া বলদ বরের দোহাই পাড়িসনে! হ্যাঁ লো! আমার এখনো বিয়েই হলো না, আর এরই মধ্যে নিকের জন্যে কোন হাবড়া–বুড়োকে মোতায়েন করলি? তা ভাই, তোর যদি কোন নানাজি বা দাদাজি থাকেন তাহলে খবর দিস, এক দিন বর পসন্দ করতে না হয় যাওয়া যাবে! তাঁকে এখন থেকে চুলে কলপ দাড়িতে খেজাব আর চোখে সুর্মা লাগানো অভ্যেস করতে বলবি কিন্তু। কন্যা–পক্ষের কিন্তু একটা কথা ভাই, দেখিস, সে নানা–বরের যেন ঐ সেই বাঁকুড়ার শুকলাল বুড়োর মতো (মনে আছে তাকে?) য়্যা এক–কুলো দাড়ি না থাকে! মা গো মা! সে যে আমার মাথার চুলের চেয়েও বড় রে! বুড়ো চলেছে তো চলেছে, যেন রাজ–সভার বন্দিনী চামর ঢুলোতে ঢুলোতে চলেছে! এত যে বলছি তার কারণ দাড়ির ঐ জটিল জটিলতার মধ্যে হাত মুখ জড়িয়ে গেলে একেবারে জবরজং আর কি, নড়ন–চড়ন নাস্তি।

দাঁড়া, আগে আমার নিজের রামপটের আরো একটু না বললে আর মনের উৎপুতোনি মিটছে না। এইটে বলে বাকি দরকারি কথা কটা সেরে ফেলতে হবে। কেননা, এরই মধ্যে প্রায় ন'টা বেজে গেল। যদিও আমি গল্প–উপন্যাস লিখে থাকি, কিন্তু আমার এই প্রিয়জনদের চিঠি লেখবার সময় আর কিছুতেই সবকথা বেশ গোছালো করে লিখতে পারিনে। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়! কিন্তু তা যেন অন্তত আমার কাছে ভাই বেশ মিষ্টি লাগে। এতে কেরদানি করে লেখবার চেয়ে

যে আসল প্রাণটুকুর—সত্যের সত্য-মিথ্যা ধরা পড়ে যায়! এই জন্যে খুব বেশি ভাবাবেগ থাকা আমার বিবেচনায় খারাপের চেয়ে ভালোই বেশি। তাছাড়া, এতে লাগাম-ছাড়া ঘোড়ার (যেমন তোদের নূরুল হুদা বাঁধন-হারা) মতন একটা বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ বেশ গাঢ় করে উপভোগ করা যায়। এ-আনন্দ কিন্তু বন্ধন-দশাপ্রাপ্ত বেচারিদের কাছে একটা অনাসৃষ্টি চক্ষুশূলের মতোই বাজবে। আহা, এ-বেচারাদের প্রাণে যে আনন্দই নেই, তা তারা আনন্দের মুক্তির মাধুর্য বুঝবে কি করে? একটু সাংসারিক সামান্য মামুলি সুখের মায়াতেই এরা মনে ভাবে, কেমন এই তো আনন্দ! সেই দাড়িওয়ালা রাজার দাড়িতে তেঁতুল-গুড় লাগিয়ে সেই দাড়ি চুষে আম খাওয়ার স্বাদ বোঝা আর কি! ... যাক সে সব কথা, আমরা তো আর জোর করে মরা লোককে বাঁচাতে পারব না! যার প্রাণে আনন্দই নেই তাকে বুঝাবো কি—দু-চুলোর ছাই আর পাঁশ?

দেখলি? কি বলতে গিয়ে ছাই ভুলেই গেলাম! যাক গে! ...

আমার পরম স্নেহের পাগল পথিক-ভাই নূরুকে নিয়ে যখন আমায় খোঁচাই দিয়েছিস রেবা, তখন তার দিক হয়ে আমায় রীতিমতো ওকালতি বাক্‌যুদ্ধ (দরকার হলে মল্লযুদ্ধও অসম্ভব নয়!) করতে হবে দেখছি তোর সঙ্গে। কেননা, আমিই এখন এ-স্নেহ-হারার বড় বোন, আর সে হিসাবে তুই আমার ভাই-এর ভাবী অর্থাৎ কি-না আমার ভাজ! অতএব আমি তোর ননদিনী! তবে আয় একবার ননদ-ভাজে বেশ করে একটা কাজিয়া-কোঁদল পাকানো যাক, একেবারে কাহারবা বাজার মতো জোর! আমি এই আমার আঁচলপ্রান্ত কোমরে জড়ালাম! তুইও তবে তোর মালসা-খ্যাঙরা নিয়ে বস।

সর্বপ্রথম পাগল নূরুর কাণ্ড-কারখানা নিয়ে তোর এত রাগ হওয়া ভয়ানক অন্যায়। যে বাঁধন নেবে না, তাকে জোর করে বাঁধতে গিয়েছিলে, সে কখনো সম্ভব হয় রে বোন? পাগলা হাতি আর উদমো ষাঁড়কে জিঞ্জির বা দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলে হয় তারা বাঁধন ছিঁড়বে, নয় আছাড় খেয়ে খেয়ে মরে বন্ধনমুক্ত হবেই হবে। আর যদিই ব্যতিক্রম স্বরূপ বেঁচে যায়, তবে সে বাঁচা নয়, সে হচ্ছে জীয়ন্তে-মরা। মুক্ত আকাশের পাখিকে সোনার শিকল, মণি-মাণিক্যের দাঁড়, দুধ-ছোলা দেখিয়ে হয়তো প্রলুব্ধ করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ বেঁধে রাখতে তো পারবে না। সেও অমনি করে বন্ধনমুক্ত হবেই! যার রক্তে-রক্তে বাঁধন-হারার ব্যাকুল ছায়ানটের নৃত্য-চপলতা নাচছে, শিরায়-শিরায় পূর্ণ তেজে নট-নারায়ণ রাগের ছন্দ-মাতন হিন্দোল-দোল দিচ্ছে, তাকে থামাতে যাওয়া মানেই হচ্ছে, তার ঐ নৃত্য-চপলতা আর হিন্দোল-দোলে আরো আকুল চঞ্চলতা জাগিয়ে দেওয়া, আরো বিপুল দোল-উন্মাদনা দুলিয়ে দেওয়া! তুই ওকে ঘুম পাড়িয়ে শান্ত করতিস? হাসি পায় তোর ছেলে-মানুষি কথা শুনে। আগ্নেয় পর্বত দু-চার দিন শান্ত থাকলেও তার বুকের আগুন-দরিয়া যাবে কোথায়। আমরা বাইরে থেকে তাকে শান্ত ভেবে খুব চাল চালতে পারি তার ওপরে, কিন্তু এটা যে আমরা ভুলে যাই যে, তার বুকের অগ্নি-সিন্ধুতে অনবরত ঊর্মি-লীলার তাণ্ডব-নাচ চলেছে; ঐ তুঙ্গ তরঙ্গ গতির

সমস্ত শক্তি জমে জমে এক এক বার যখন হু-হু করে আগুনের প্রতাপ-ফোয়ারা ছোটে, তখন আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবি,—ইস হলো কি !... নয়? আমি তো তোকে হাজার বার মানা করেছিলাম যে, মিছে বোন এ খ্যাপাকে গারদে পুরবার চেষ্টা, এ হচ্ছে বিশ্ব-মাঠে ছেড়ে-দেওয়া চিরমুক্তের দাগা উদ্‌মো ষাঁড় ! গরিবের কথা বাসি হলে ফলে ! ... আমার বুক-ভরা বেদনা-ঝন্‌ঝা এনে এই বাঁধন-হারার ব্যথার প্রশান্ত মহাসাগরে দূরন্ত তরঙ্গ-সংঘাত আর কল-কল্লোল জাগিয়ে দেওয়ার যে বদনাম তুই আমার ওপর দিয়েছিস, তাতে সত্য হলে আমি সগৌরবে সায় দিতাম। কিন্তু আদতে যে সেটা ভুল বোন। এ ঘর-ছাড়া পাগলের দলকে কে যে কোন চিরব্যথার বনে থেকে ঘর-ছাড়া ডাক ডাকছে, তা আমিও বলতে পারব না, তুইও পারবিনে, এমনকি ঐ ঘর-ছাড়া পাগল নিজেই বলতে পারবে না ! সে তো আজকের গৃহ-হারা নয় রে রেবা, সে যে চিরউদাসী, চিরবৈরাগী ! সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধল না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভিতু চখা হরিণের মতন চমকে ওঠে। এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা পড়বার বিজুলি-গতিতে ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে ! এরা সদাই কান খাড়া করে আছে, কোথায় কোন গহন-পারের বাঁশি যেন এরা শুনছে আর শুনছে ! যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দ-রাগ, এরা তখন শোনে বিদায়ী-বাঁশির করুণ গুঞ্জরণ ! এরা ঘরে বারেবারে কাঁদন নিয়ে আসছে, আবার বারেবারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে ! ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধরেও রাখতে পারে না। এরা এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর করে নেবে ! এরা বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের বাউল-গায়ক চারণ-কবি যে এরা ! এদের যাকে আমরা ব্যথা বলে ভাবি, হয়তো তা ভুল ! এ-খ্যাপার কোনটা যে আনন্দ, কোনটা যে ব্যথা তাই যে চেনা দায় ! এরা সারা বিশ্বকে ভালবাসছে, কিন্তু হায়, তবু ভালবেসে আর তৃপ্ত হচ্ছে না ! এদের ভালবাসার ক্ষুধা বেড়েই চলেছে, তাই এরা অতি সহজেই স্নেহের ডাকে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু স্নেহকে আজো বিশ্বাস করতে পারল না এরা ! তার কারণ ঐ বন্ধন-ভয়। এদের ভালবাসা এত বিপুল আর এত বিরাট যে, হয়তো তোমরা তাকে উন্মাদের লক্ষণ বলেই ভাবো। ... আর অগ্নির কথা? আগুন যদি না থাকবে, তবে এদের চলায় এমন দুর্বার গতি এল কি করে? এরাই পতঙ্গ, এরাই আগুন। এরাই আগুন জ্বালে, এরাই পুড়ে মরে। আগুন তো এদের খেলার জিনিস। আগুনে এ যে কত বার ঝাঁপ দেবে, কত বার পুড়বে, কত বার বেরিয়ে আসবে, তা তুই তো জানিসনে, আমিও জানিনে !

তোর সহজ বুদ্ধি দিয়ে তুই সহজভাবে নূরুকে যেরকমভাবে বুঝে আমায় চিঠিতে লিখেছিস, তো দু-এক জায়গা ছাড়া সবই সত্যি। হয়তো আমার ভুল হতে পারে বুঝবার, তবে কিনা, তোদের সংসারী লোকের চেয়ে সংসারের বাইরে থেকে নানান ব্যথা-বেদনার মধ্যে দিয়ে আমরা মানব-চরিত্র বা মানুষের মন বেশি করে বুঝি আর সেই হিসেবেই আমি এই বাঁধনহারাদের সম্বন্ধে এত কিছু মনস্তত্ত্ব বা দর্শন লিখে জানালাম তোকে।

নূরুকে স্রষ্টার বিদ্রোহী বলে তোর ভয় হয়েছে বা দুঃখ হয়েছে দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে লো ! নূরুটাও স্রষ্টার বিদ্রোহী হলো, আর অমনি স্রষ্টার সৃষ্টিটাও তার হাতে এসে পড়ল আর কি ! ... এখন ওর কাঁচা বয়েস, গায়ের আর মনের দুই-এরই শক্তিও যথেষ্ট, তার শরীরে উদ্দাম উন্মাদ যৌবনের রক্তহিল্লোল বা খুন-জোশি তীব্র উষ্ণ গতিতে ছোটাছুটি করছে, তার ওপর আবার এই স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল বাঁধন-হারা সে,—অতএব এখন রক্তের তেজে আর গরমে সে কত আরো অসম্ভব সৃষ্টি-ছাড়া কথাই বলবে ! এখন সে হয়তো অনেক কথা বুঝেই বলে, আবার অনেক কথা না বুঝেই শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসেই বলে ফেলে। একটা বলবান জোয়ান ষাঁড় যখন রাস্তা দিয়ে চলে, তখন খামখাই সে কত দেওয়ালকে কত গাছকে ঢুঁস দিয়ে বেড়ায় দেখেছিস তো ? এটা ভুলিসনে যেন রেবা যে, এ-ছেলে বাংলাতে জন্ম নিলেও বেদুঈনদের দুরন্ত মুক্তি-পাগলামি, আরবিদের মস্ত গোর্দা, আর তুর্কিদের রক্ত-তৃষ্ণা ভীম স্রোতোবেগের মতো ছুটছে এর ধমনীতে-ধমনীতে। অতএব এ-সব ছেলেকে বুঝতে হলে এদের আদত সত্য কোনখানে, সেইটেই সকলের আগে খুঁজে বের করতে হবে। এত বড় যে ধর্ম, তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য ইত্যাদি-ইত্যাদি কত রকমের না বাইরের খোলস-মুখোশ রয়েছে, তাই বলে কি এইসব অনিত্য সত্যকে ধর্মের চিরন্তন সত্য বলে ধরতে হবে ? অবিশ্যি সত্য কখনো অনিত্য বা নৈমিত্তিক হতে পারে না, শুধু কথাটা বোঝবার জন্যে আমাকে ও-রকম করে বলতে হলো। প্রত্যেক ধর্মই সত্য—শাশ্বত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো ধর্মকে বিচার করতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান শৃঙ্খলা দিয়ে কখনো বিচার করবে না ; আর তা করতে গেলে কানার হাতি দেখার মতোই ঠকতে হবে ; তেমনি মানুষকে—তার চির-অমর আত্মাকে—তার সত্যকে বুঝতে হলে তার অন্তর-দেউলে প্রবেশ করতে হবে ভাই ! তার বাইরের মিথ্যা আচার-ব্যবহারকে সত্য বলে ধরব কেন ?

হয়তো আমি কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলতে পারছিনে, আর পারবও না, কেননা, আমার মনের সে-শান্ত স্থৈর্য নেই। মন শুধু বাইরে বাইরে ছুটে বেড়াচ্ছে। তবে এরই মধ্যে আমার বলবার আদত সত্যটুকু খুঁজে বের করে নিয়ো। ... হাঁ, আদত মানুষটাকে বুঝতে হলে অবিশ্যি তার এই আচার-ব্যবহারগুলোকেই প্রথমে ঘেঁটে দেখতে হবে। কিন্তু এ ঘেঁটে সব সময় মুক্তি পাওয়া যায় না, অনেক সময় কাদা-ঘাঁটাই সার হয়। যাক, তাহলে মানুষ মাত্রেরই নানান ভুল-ভ্রান্তি আছে, দোষ-গুণ নিয়েই মানুষ। যারা এই সব 'স্রষ্টার বিদ্রোহী' তরুণদের গালি দেয় তারাই বা 'স্রষ্টার রাজভক্ত' প্রজা হয়ে সে স্রষ্টা-রাজা সম্বন্ধে কোনো খবরাখবর রাখে কি ? আর পাঁচজনের মতন শুধু চোখ বুজে অন্ধবিশ্বাসে অন্ধের মতন হাতড়িয়ে বেড়ানোতেই কি সে অনাদি অনন্ত সত্যকে তারা পাবে ? যারা এই রকম বিদ্রোহীদের নাস্তিক ইত্যাদি বলে দাঁত-মুখ খিচিয়ে তাড়া করে, তাঁরা আস্তিক হয়েই সে পরম পুরুষের কতটুকু খবর রাখে ? তাঁর খবর রাখা তাঁকে ভাবা তো অন্য কথা, তাঁকে—সত্যকে যে অহরহ এই আস্তিকের দল প্রতারণা করছে, এ ভণ্ডামি কি তারা নিজেও বোঝে না ? মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়ে

নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য? এগুলো তো বাইরের বিধি। কিন্তু এগুলোকেই কি তারা ভাল করে মেনে চলতে পারে? মন্দিরে গিয়ে দেবতার মুখস্থ মন্ত্র আওড়ায়, কিন্তু মন থাকে তার লোকের সর্বনাশের দিকে! মসজিদে গিয়ে নামাজের 'নিয়ম' করে ভাবে যত সব সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা! এই ভণ্ডামি এই প্রতারণাই তো এদের সত্য! অতএব এদের মতো এমনি করে আত্মাকে বিনাশ না করে তাদেরই একজন যদি সত্যকে পাবার জন্যে নিজের নতুন পথ কেটে নেয়, তবে এটা লাঠি-সোঁটা নিয়ে যে তাকে তাড়া করবেই—কিন্তু নির্বীর্যের মতো! একজন সত্যান্বেষী বিদ্রোহীকে তাড়া করবার মতো শক্তি এ-মিথ্যুক ভণ্ডদের যে বিলকুল নাস্তি। ও কেবল ভীত সারমেয়ের দাঁত-খিচুনি মাত্র। এরা যে মিথ্যাকে, প্রতারণাকে কেন্দ্র করেই আত্মাকে ক্রমেই নিচের দিকে ঠেলছে, তা এরা বুঝলে কিছুতেই স্বীকার করবে না! সত্যকে স্বীকার করবার মতো সাহসই যদি থাকবে, তবে এদের এমন দুর্দশাই বা হবে কেন? মনসুর যখন বিশ্বের ভণ্ড-মিথ্যুকদের মাথায় পা রেখে বলেছিল,—'আনাল হক'—আমিই সত্য—সোঽহম, তখন যে-সব বক-ধার্মিক তাঁকে মারবার জন্যে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে ছুটেছিল, এ লোকগুলো যে তাদেরই বংশধর! এ-মিথ্যা ধার্মিকের দলই তো সেদিনে ঐ মহর্ষি মনসুরের কথা, তাঁর সত্য বুঝতে পারেনি, আজও পারছে না, আর পরেও পারবে না; এদের এই রকম একটা দল থাকবেই! কিন্তু যারা সত্যকে পেতে চলেছে, যাদের লক্ষ্য সত্য, যারা সত্যের হাতছানি দেখছে তাদের এই সব শক্তিহীন হীনবীর্য লোক কি থামাতে পারে? সত্য যে চির-বিজয়ের মন্দারমালা গলায় পরে শান্ত-সুন্দর হাসি হাসবে।... তাছাড়া, বিদ্রোহী হওয়াও তো একটা মস্ত শক্তির কথা। লক্ষ লক্ষ লোক যে-জিনিসটাকে সত্য বলে ধরে রেখে দিয়েছে, চিরদিন তারা যে-পথ ধরে চলেছে তাকে মিথ্যা বলে ভুল বলে তাদের মুখের সামনে বুক ফুলিয়ে যে দাঁড়াতে পারে, তার সত্য নিশ্চয়ই এই গতানুগতিক পথের পথিকদের চেয়ে বড়। এই বিদ্রোহীর মনে এমন কোন শক্তি মাথা তুলে প্রদীপ্ত চাওয়া চাইছে যার সঙ্কেতে সে যুগ-যুগান্তেরের সমাজ, ধর্ম, শৃঙ্খলা, সব-কিছুকে গা-ধাক্কা দিয়ে নিজের জন্যে আলাদা পথ তৈরি করে নিচ্ছে! কই, হাজারের মধ্যে আর নয়শো নিরানব্বই জন তো এমন করে দাঁড়াতে পারে না? তুমি কি বলো, এই নয়শো নিরানব্বই জনই তাহলে সত্য পেয়ে বসে আছে। যে মরণকে ধ্বংসকে পরোয়া না করে না-চলার পথ দিয়ে চলে, কত বড় দুর্জয় সাহস তার? আর সত্যের শক্তি অন্তরে না থাকলে তো সাহস আসে না।... তাছাড়া, প্রত্যেকের আত্মারও তো একটা স্বতন্ত্র গতি আছে! আর সকলের মতো একজন গড্ডলিকা-প্রবাহে যদি না চলে, তা বলে কি তার পথ ভুল? বিশেষ করে বিদ্রোহী হবার যেমন শক্তি থাকা চাই, তেমনি অধিকারও থাকা চাই। কই, আমি তো বিদ্রোহী হতে পারিনে, তুমি তো হতে পারো না; আমাদের মাঝে যে সে বিপুল সহ্য-শক্তি নেই।... বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর। ছেলে যদি রেগে বাপকে বাপ না বলে, বা মা'কে মা না বলে, কিংবা বলে যে এরা তার বাপ-মা নয়, তাহলে কি সত্যি-সত্যিই তার পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব মিথ্যা হয়ে যায়? যে-ক্ষুব্ধ অভিমান তার বুকে জাগে, তার শেষ হলেই মায়ের খ্যাপা ছেলে ফের মায়ের

কোলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! কিন্তু এই যে অভিমান, এই যে আক্রোশের অস্বীকার, তা দিয়ে হয় কি?—না, সে তার বাপ-মাকে আরো বড় করে চেনে, বড় করে পায়। এই রকম করে হঠাৎ একদিন চিরন্তনী মাকেও হয়তো তার পক্ষে পাওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া তার যে অধিকার আছে এই অভিমান করবার এই বিদ্রোহী হবার, কেননা, সে তার মায়ের স্নেহটাকে এত নিবিড় করে পেয়েছে যা দিয়ে সে জানে যে, তার সমস্ত বিদ্রোহ সমস্ত অপরাধ মা ক্ষমা করবেনই। যে-স্নেহে যে-ভালবাসায় অভিমান জাগতে পারে—রাগ জন্মাতে পারে, সে-স্নেহ-ভালবাসা কত বড় কত উচ্চ একবার ভাবো দেখি! এতে মা'র অপমান না হয়ে তাঁকে যে আরো বড় করে দেওয়া হয় রে! তাই মা ঝোঁক-নেওয়া খ্যাপা ছেলের ঝোঁক নেওয়া দেখে ছেলের হাতের মার খেয়েও গভীর স্নেহে চেয়ে চেয়ে হাসেন! এ-দৃশ্য বলে বোঝাবার নয়! ছেলের হাতের এ-মার খাওয়াতেও যে মায়ের কত আনন্দ কত মাধুরী তা তো বাইরের লোকে বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, কি বদমায়েশ দুরন্ত ছেলে বাবা! কিন্তু যে-ছেলে মায়ের এত স্নেহ পায়নি, এমন অধিকার পায়নি, সে মা'কে মারা তো দূরের কথা, তাঁর কাছে ভাল করে কাছ ঘেঁষে একটা আবদারও করতে পারে না! ... তাই প্রথমে বলেছিলাম যে, এই বাঁধন-হারা নূরু যেন বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের দুলাল—ঠিক 'কোল-পোঁছা' ছেলের মতন আবদেরে একজিদ্দে একরোখা—আর তোদের কথায় বিদ্রোহী! অনেক ছেলে মরে মরে যাবার পর যে এই খ্যাপাই মায়ের মড়াচে ঝোঁকদার ছেলে! দেখবি, এ-শিশু আবার হাসতে-হাসতে মায়ের স্তন্য-ক্ষীর পান করছে আর আপন মনেই খেলছে!... মা যখন তাঁর দুষ্টু ছেলেকে স্নান করাবার সময় সাবান দিয়ে তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেন, তখন তার কান্না আর রাগ দেখেছিস তো? সে তখন হাতে-দাঁতে মায়ের চুল ছিঁড়তে থাকে, কিল-চাপড় বর্ষণ করতে থাকে আর চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে ফেলে। মা কিন্তু হাসতে হাসতে তাঁর কাজ করে যান। তাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে নীলাম্বরী ধুতিটি পরিয়ে দিয়ে চোখে কাজল কপালে টিপটি দিয়ে যখন মুখে ঘন ঘন চুমো খান তখন আবার সেই দুরন্ত ছেলের প্রাণ-ভরা হাসি দেখেছিস?—নূরুটারও এখন হয়েছে তাই। বিশ্ব-মাতা এখন তাকে ধুয়ে-মুছে রগ্‌ড়ে সাফ করে নিচ্ছেন, আর সেও তাই হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে। মা যেদিন কোলে নিয়ে চুমো খাবেন, সেদিন কোথায় থাকবে ওর এই ভূতোমি আর কোথায় থাকবে এই কান্না আর লাফালাফি। তখন সব সুন্দর-সুন্দর! এ-শুভ দিন তার জীবনে জাগবেই ভাই, দেখে নিস তুই। তবে তার হয়তো এখনো অনেক দেরি। তার জীবনে সত্য রয়েছে, তবে রুদ্র মূর্তিতে। এর পরেই যখন কল্যাণ জাগবে জীবনে, তখন দেখবি সব সুন্দর হয়ে গিয়েছে। ছেড়ে দে বোন, ওকে ছেড়ে দে! চলুক ও নিজের একরোখা পথ দিয়ে—কল্যাণকে আপনিই ও খুঁজে নেবে। কল্যাণ নিজেই ওর পিছু পিছু মালা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সময় বুঝলেই সে এই পাগলার গলায় মালা দিয়ে ওকে ভুজ-বন্ধনে বেঁধে ফেলবে। তুই লাল কালিতে ডগডগে করে লিখে রেখে দে এই কথা। আমি জানি, আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী ফলবেই ফলবে, যদিও আমি পয়গম্বর নই।

হ্যাঁ, ধর্ম সম্বন্ধে আমার আর একটু বলবার আছে। আমি তো পূর্বেই বলেছি যে, সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের 'পর—যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনো রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম। আমি তো কোনো ধর্মের বাইরের (সাময়িক সত্যরূপ) খোলসটাকে ধরে নেই। গোঁড়া ধার্মিকদের ভুল তো ঐখানেই। ধর্মের আদত সত্যটা না ধরে এঁরা ধরে আছেন যত সব নৈমিত্তিক বিধি-বিধান। এরা নিজের ধর্মের উপর এমনি অন্ধ অনুরক্ত যে, কেউ এতটুকু নাড়াচাড়া করতে গেলেও ফোঁস করে ছোঁবল মারতে ছোটেন। কিন্তু একটু বোঝেন না তাঁরা যে, তাঁদের 'ঈমান' বা বিশ্বাস, তাঁদের ধর্ম কত ছোট কত নীচ কত হীন যে, তা একটা সামান্য লোকের এতটুকু আঁচড়ের ঘা সইতে পারে না। ধর্ম কি কাঁচের ঠুন্‌কো গ্লাস যে, একটুতেই ভেঙে যাবে? ধর্ম যে বর্মেরই মতন সহ্যশীল, কিন্তু এ-সব বিড়ালতপস্বীদের কাণ্ড দেখে তো তা কিছুতেই মনে করতে পারিনে। তাঁদের বিশ্বাস তো ঐ এতটুকু বা সত্যের জোরও অমনি ক্ষুদ্র যে, তার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্যে তোমায় আলাদা পথে যেতে দেওয়া তো দূরের কথা, তা নিয়ে একটা প্রশ্নও করতে দেবেন না। ... এই সব কারণেই, ভাই, আমি এই রকম ভণ্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশি ভক্ত, বেশি পক্ষপাতী। তারা সত্যকে পায়নি বলে সোজা সেটা স্বীকার করে ফেলে বলে বেচারাদের হয়েছে ঘাট। অথচ তারা এই সত্যের স্বরূপ বুঝতে, এই সত্যকে চিনতে এবং সত্যকে পেতে দিবারাত্তির প্রাণপণ চেষ্টা করছে—এই তো সাধনা—এই তো পূজা, এই তো আরতি। এই জ্ঞানপুষ্পের নৈবেদ্য চন্দন দিয়ে এরা পূজা করবে আর করছে, তবু দেবতাকে অন্তরে পায়নি বলে মুক্তকণ্ঠে আবার স্বীকারও করছে যে, কই দেবতা? কাকে পূজা করছি? আহা! কি সুন্দর সরল সহজ সত্য! এদের ওপর ভক্তিতে আপনিই যে মাথা নুয়ে পড়ে। এরা যাই হোক, এরা তো মিথ্যুক নয়, এরা বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে না—এরা যে সত্যবাদী। অতএব এরা সত্যকে পাবেই পাবে; আজ না হয় কাল পাবে! আর এই বেচারারা অন্ধ বিশ্বাসীর দল? বেচারারা কিছু না পেয়েই পাওয়ার ভান করে চোখ বুঁজে বসে আছে। অথচ এদের শুধোও, দেখবে দিব্যি নাকি-কান্না কেঁদে লোক-দেখানো ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলবে,—'আঁ হাঁ হাঁ!—মঁরি মঁরি। ঐ ঐ ঐ দেখঁ তিনি!' মিথ্যার কি জঘন্য অভিনয় ধর্মের নামে—সত্যের নামে! ঘৃণায় আপনিই আমার নাক কুঁচকে আসে। তাই তো আমি বলি যে, এই পথ-হারানোটা পথ খুঁজে পাওয়ারই রূপান্তর। তবে যা-কিছু বুঝবার ভুল। গুরুদেব সত্যি-সত্যিই গেয়েছেন,—

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম পথের মধ্যখানে!

—কোটি কোটি নমস্কার করছি এই মহাঋষির শ্রীচরণারবিন্দে এইখানে! যাক, এ-সব আলোচনা আপাতত এইখানেই ধামা-চাপা দিলাম। এই কেঁচো উসকাতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয়েই বোন আমি মনে করি এ-সব আলোচনা আর করব না; কিন্তু স্বভাব যায় না মলে! বাপ-মায়ে বুঝেই যে আমার সাহসিকা নাম দিয়েছিলেন, তা

আমিও আজ যেন বুঝতে পারছি। তোর চিঠি পেয়ে আমার মনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস বা সৃষ্টির বেদনা জেগেছিল, তার দরুনেই হয়তো এত কথা লিখে ফেললাম। যতক্ষণ এই ভাবাবেগ আছে ততক্ষণই লিখতে পারব, তারপর আর নয়। তাই 'এই বেলা নে ঘর ছেয়ে' কথাটার উপদেশ স্মরণ করেই যত পারছি লিখে চলেছি।

আমার বাচ্চা-সই মাহ্‌বুবা সম্বন্ধে যে ভয় করেছিস তুই, তার কোনো কারণ নেই। আমি তাকে খুব ভাল করেই বুঝেছিলাম যে-কয়দিন ছিলাম তার সঙ্গে। সে সহজিয়া। সে সহজেই ঐ খ্যাপাটাকেই ভালবেসেছিল, আর এমনি সহজ হয়েই সে তাকে চির-জনম ভালবাসবে। তার বুকে যদি কখনো যৌবনের জল-তরঙ্গ ওঠে, তবে সে খুব ক্ষণস্থায়ী। সে সহজিয়া অতি সহজেই তার প্রিয়তমকে ভালবাসতে পারে, তার মতো সুখী দুনিয়ার আর কেউ নেই রে বোন তার শান্তি তার আনন্দ অনাবিল, পূত, অনবদ্য,—একেবারে শিশির-ধোওয়া শিউলির মতো। যে তার সমস্ত কিছু নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে সেই যে এক মুহূর্তেই তার পীতমের পায়ে শেষ একরেখা দীর্ঘশ্বাস আর আধ-ফোঁটা নয়ন-জলের সঙ্গে অঞ্জলি করে ঢেলে দিয়েছে, তার পরে তার আর কোনো দুঃখই নেই! সে জেনেছে যে, সে সব পেয়েছে। সে জেনেছে যে, সে প্রাণ ভরে দিয়েছে আর সে-দান দেবতাও বুক পেতে নিয়েছেন। সে জানে—খুব সহজভাবেই জানে—তার এত বুক-ভরা পবিত্র ফুলের দান, তার এমন সহজ পূজা ব্যর্থ হবার নয়। সহজভাবে দিতে জানলে যে অতি-বড় পাষাণ-দেবতাও সেখানে গলে যান, নিজেকে রিক্ত করে সমস্ত কিছু ঐ সহজ পূজারীকে দান করে ফেলেন। গুরুদেবের 'কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে' শীর্ষক কবিতাটা পড়েছিস তো? তাতে তিনি দিন-রাত তাঁর পসরা হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছেন,—ওগো আমায় কে কিনে নেবে? কত লোকই এল,—রাজা এল, বীর এল, সুন্দরী এল, কিন্তু হায়, সকলেই 'ধীরে ধীরে ফিরে গেল বন-ছায়ার দেশে।' সকলেরই 'চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে!' কিন্তু ধুলো নিয়ে খেলা-নিরত একটি ছোট্ট ন্যাংটা শিশু যখন তুড়ং করে লাফিয়ে উঠে তার কচি ছোট্ট দুটি হাত ভরিয়ে ধুলো-বালি নিয়ে বললে,—'আমি তোমায় অমনি নেব কিনে!' তখন কবিও তাঁর পসরা ঐখানে ঐ সহজিয়ার সহজ চাওয়ার কাছে বিনামূল্যে বিকিয়ে দিয়ে মুক্তি পেলেন। আমাদেরও নয়ন-পাতা তখন এই সহজের আনন্দে আপনিই ভিজে ওঠে! এমনি সহজ করে চাওয়া চাই, এমনি সহজ হয়ে দেওয়া চাই রে বোন, আর তবেই যে পায় সেও বুক ভরে নেয়, যে দেয় তারও বুক ভরে যায়! ... এই সহজ আনন্দে তার সমস্ত কিছু দিতে পেরেছে বলেই তো মাহ্‌বুবা আজ ছোট্ট মেয়ে হয়েও নিখিল সন্ন্যাসিনীর চেয়েও বড়। তাই সে বৈরাগিণীও হল না, সন্ন্যাসিনীও হল না; ক্রুদ্ধা জননী যখন তাকে এক বুড়ো বরের হাতে সঁপে দিল, তখনো সে সহজেই তাতে সম্মতি দিল। এই সহজিয়ার কিন্তু এতে কোনো দুঃখই নেই, সে যে জানে যে, তার যা দেবার তা অনেক আগেই যে নিবেদিত হয়ে গিয়েছে। অর্ঘ্য নিবেদিত হয়ে যাওয়ার পর শূন্য সাজি বা থালাটা যে ইচ্ছা নিয়ে যাক, তাতে আর আসে যায় না। ... এই সহজিয়া পূজারিণীর দল যে আমাদের ঘরে-ঘরে রয়েছে বোন, তবে আমাদের চোখ নেই,—আমরা দেখেও দেখি না

এই নীরব পূজারিণীদের। এই সহজিয়া তপস্বিনীদের পায়ে আমি তাই হাজার হাজার সালাম করছি এইখানে! আমাদের কিন্তু এই মূক মৌন সহজিয়াদের ব্যথাটাই চোখে পড়ে, আর বুকে বেদনার মতোই এসে বাজে। বাস্তববিকই বোন, কি করে এই হতভাগিনী (না, ভাগ্যবতী)–দের বুক এমন সহজ সুখের নেশায় ভরে যায়? এমন সর্বহারা হয়েও কি করে এত জান–ঠাণ্ডা–করা তৃপ্তির হাসি হাসে? আমরা তা হাজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারব না; কেননা, আগে যে অমনি সহজ হতে হবে ও বুঝতে হবে। ... সেই জন্যেই বলছিলাম যে, মাহ্‌বুবার জন্যে কোনো চিন্তা করিসনে। সে আনন্দকে পেয়েছে, সে কল্যাণকে পেয়েছে,—সে মুক্তিও পেয়েছে এইখানে। কিন্তু সে এত বড় বড় কথা হয়তো বুঝবেও না। আমরা যেটা বুঝি চেষ্টা–চরিত্তির করে সে সেটা সহজেই বুঝে নিয়েছে, এইখানেই তো সহজিয়ারা সহজ আনন্দে মুক্ত।

এই সহজিয়া মাহ্‌বুবা হয়তো সহজেই বন্ধনের মাঝে মুক্তি দিতে পারতো। কিন্তু কেন যে তা হলো না, সে একটা মস্ত প্রহেলিকা। আমি এখনো এর কিছুই বুঝতে পারছিনে। এইখানটাতেই নূরুটাতে আর মাহ্‌বুবাটাতে যে একটা কোনো গুপ্ত জটিলতা আছে, যেটার খেই আমি আজো পাচ্ছিনে। আর, আমার মতন ওস্তাদ যেখানে হার মানলে সেখানে তোর মতন চুনো–পুঁটির তো কর্মই নয়! তবে এর নিগূঢ় মর্ম আমি বের করবই করব, এই বলে রাখলাম তোকে!

আমার বিশ্বাস, মাহ্‌বুবাটা এই বাঁধন–হারাকে সইতে পারবে না বলে মিথ্যা ভয়ে তাকে মুক্তির নামে ধ্বংসের পথে ফেলে দিয়েছে। অবশ্য এটা আমার আন্দাজ মাত্র। এটা না হওয়াই সম্ভব, কারণ যে মেয়ে সহজিয়া, তার তো এ ভয় হবার কারণ নেই! ... দেখি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

একা মাহ্‌বুবার মা বেচারিই রাক্ষুসি হবে কেন, রেবা? এ–রকম রাক্ষুসি মা—যারা জেনেশুনে মেয়ের সর্বনাশ করে—তোদের সমাজে, হিন্দুর সমাজে, এমনকি, আমাদের স্বাধীন সমাজেও তো কিছু আশ্চর্য নয় আর কমও নয়। এই তো সতীত্বনাশ! অবিশ্যি, সতীত্ব বলতে মনের না দেহের বোঝেন এঁরা, তা জানিনে; কিন্তু আমার কথায় সতীত্ব তো মনে। মনে মনে যাকে স্বামীত্বে বরণ করলে মেয়ে, তা জেনে–শুনেও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে দুটো মন্ত্র আউড়িয়ে জোর করে এই বোবা মেয়েদের যে কসাই–মা–বাপ হত্যা করে! তাহলে প্রকারান্তরে মা–বাপেই মেয়ের সর্বনাশ করলে না কি? উল্টো আবার সম্প্রদানের সময় মেয়েকে সীতাসাবিত্রী হতে বলা হয়? কি ভণ্ডামি দেখছিস!

তোর শাশুড়ি সম্বন্ধে অভিমান করে যে অভিযোগ করেছিস তা নেহাৎ অন্যায় হয়নি তোর পক্ষে। কেননা, সংসারের গিন্নির এ–রকম ঝাল ছাড়তে হয় মাঝে মাঝে। তবে যখন ঘরের গিন্নিও হয়েছিস লো, তখন ঘর–গেরস্থালির একটু ঝাঁজ সইতে হবে বই কি! এখনো তোর 'যৌবন' বয়েস কিনা (অর্থাৎ ভোগের সময়!) তাই মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে। তবে এও সয়ে যাবে। জানিস তো, কাঁচা লঙ্কা গিন্নিদের বড্ডো প্রিয়! এ–ঝাল না থাকলে সংসার মিষ্টিও লাগে না আর তাতে রুচিও হয় না।

তোর শাশুড়ি বেচারির একেবারে সাদা সরল মন। সারা মনঃপ্রাণ তাঁর মায়ের স্নেহে ভেজা। এসব লোক সংসারে থেকেও চিরদিন একটু উদাসীন গোছের। সংসারের বাজে ঝক্কি এঁরা নিমের-রস গেলা করেই গেলেন। যেই দেখেন,অ ার একজনের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে একটু আরামে নিশ্বাস ফেলতে পারবেন অমনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তাই তো তোর হাতে সব কিছুর ভার সঁপে দিয়ে তিনি নিরিবিলি অত্যন্ত শান্তিতে ডুবতে চাইছেন। ওঁর খেলার সাথী এখন তোর কচি মেয়ে আনারকলি, কেননা, উনিও যে এখন তোর আর একটি নেহাৎ ঠাণ্ডা মেজাজের লক্ষ্মী মেয়ে আর সেই জন্যই তো তুই তাঁর লক্ষ্মী-মা। আহা, ওঁর এ-শান্তিতে বাধা দিসনে বোন ! এ তপশ্চারিণীর নীরব পূত তপোবনে গিয়ে গোলমাল করে আর তাঁর শান্তি ভাঙিসনে। জানি ওঁর দুঃখ অনেক, আর তাইতেই তো তিনি এখন শান্তির ছায়া খুঁজছেন। বাড়িতে থেকেও এসব লোকের অস্তিত্ব বোঝা যায় না, কিন্তু বাড়ির সমস্ত শান্তিটুকুকে ঘিরে রয়েছেন এঁরাই, বিহগ-মাতার ডানার মতো করে।

এঁরা যখন চলে যান, তখনই বুঝতে পারি যে, কি এক শূন্যতায় সারা সংসার ভরে উঠেছে।

হাঁরে, ভালো কথা ! তুই এ-চিঠিতে খুকির কথা লিখিসনে যে বড্ডো ? প্রথমে এটা আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু শেষে জানতে পেরে হাজারবার তন্ন-তন্ন করে তোর চিঠি খুঁজেও আমার 'আনারকলি' মা'র নাম-গন্ধও পেলাম না, আমার এতে কান্না পেয়ে গেল রাগে ! আচ্ছা ভোলা মেয়ে তুই যা হোক লো ! বোধ হয় মেয়েটাকে চিরদিন এমনি অনহেলাই করবি, না ? জানি, তুই তোর হাজার কাজের ওজর করবি ! চুলোয় যাক তোর কাজ, এমন আনারকলির মতোই এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে,—হায়, তাকে কখনো তোকে বুক ভরে সোহাগ করতে দেখলাম না। এ আমাদের বুকে বড় লাগে বোন ! অমন মা হতে গিয়েছিলি কেন লো তবে মুখপুড়ি ? 'মা' আসবার আগেই হয় তো এই মা-কাঙালি 'মেয়ে' এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এখনো কি তোর মাঝে 'মা' জাগল না ? না, হাতের কাছে পেয়েই এত অনহেলা ? দেখ, তোর নাড়ির মাঝে যে মা এখনো সুপ্ত। খুকির বাবা রবিয়ল সাহেব পুরুষ হলেও তাঁর মাঝে সেই মা কি স্নেহময়ী মূর্তিতে জাগ্রত। কিন্তু এই ছেলের জাত কি নিমকহারাম, সে যা পায় তাকে ছেড়ে দিয়ে যেটা পায় না সেইটাকেই পাবার জন্যে হাঁকুচ-পাঁকুচ করে। বাপের এত স্নেহ পেয়েও তাই সে যে বেশি করেই তোর কোলের—মায়ের কোলের কাঙাল, তা তো আমি নিজে দেখেছি।

সত্যি ভাই, এ কচি মেয়েটাকে পেলে আমি যেন এখন বেঁচে যাই। আমি ওকে এখনই চাইতাম, কিন্তু দুষ্টু তুই হয়তো একটা বদমায়েসি বিদ্রূপ করে বসবি বলে থেমে গেলাম। খুকি বড় হলে কিন্তু আমার কাছে এসে থাকবে আর লেখা-পড়া শিখবে বলে কথা দিয়েছিস, মনে থাকে যেন।

সোফিটার অত্যাচারে তুই নাজেহাল হয়ে গিয়েছিস শুনে আমি আর হেসে বাঁচিনে। আচ্ছা জব্দ, না ? ও জন্ম হতেই বড্ডো বেশি আদর-সোহাগ পেয়ে মানুষ হয়েছে কি-না, তাই এত দুরন্ত ! তাহলে তোদের হারেমের আইবুড়ো থুবড়ো মেয়ে কি

বলতে পারত 'আমি বিয়ে করব না, থুব্‌ড়ো থাকব ?' ও এখনো একেবারে ছেলেমানুষ। তবে বিয়ে হবার পর বরের হাতে পড়ে হয়তো বাগ মানলেও মানতে পারে। ওর আদত ইচ্ছে কি জানিস? ও নূরুটাকে বিয়ে করতে চায়। আমায় একদিন কানে কানে বলে ফেলে আমার হাসি দেখে সে কি ভাই রাগ আর লজ্জা তার! কেঁদে-কেটে তো একাকার—অথচ খামখাই! আমি আর হেসে বাঁচিনে। তারপর তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছি যে, এ কথাটা কি আমি আর সবাইকে বলতে পারি রে, যে, আমার ছোট বোন ভালবাসায় পড়েছে! যতই হোক, আমি তো তার সাহসী দিদি, তবে তখন সে চুপ করে। দেখিস ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই যেন এ-কথা আবার বলে দিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিসনে। এ-পাগলা ছুঁড়িটার যৌবন কিন্তু বয়েসের অনেক পেছনে পড়ে; হয়তো বিশ বছর বয়সে গিয়ে তবে কখনো ওর যুবতীর লজ্জা আসবে। তবে বিয়ে হয়ে গেলে আলাদা কথা। কেননা, তখন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো হবে কিনা।

তোর খেলার সাথী বেচারার দুঃখে আমি এতটুকুও সহানুভূতি দেখাতে পাচ্ছিনে, কেননা তিনি এমন মূক না হয়ে গেলে কি আর তোর আমায় এখন মনে পড়ত রে ছুঁড়ি!

হাঁ, সোফিয়ার বিয়েতে যাব বই কি! তা না হলে ওকে বাগ মানাবে কে? হয়তো বিয়ের সময়ই রেগে দোর দিয়েই বসে থাকবে! ওকে বলে দিস বোন যে, সে বিয়ে যদি নেহাৎই না করে, তবে আমার স্কুলের মেয়ে-দফতরি করে দেওয়া যাবে। দেখিস, সে যেন ঠাট্টা মনে না করে। তাহলেই আমি হাবাৎ আর কি?

আমার বরের ভাবনা নিয়ে তোকে আর ভাবতে হবে না লো, তুই নিজের চরকায় তেল দে! 'যার বিয়ে তার ধুম নেই, পাড়া-পড়শির ঘুম নেই!' যত দিন না আমার সন্ন্যাসী-ঠাকুর আসবেন ততদিন আমায় সন্ন্যাসিনীই থাকতে হবে বই কি। সংসার না ডাকলে তো আর সংসারী হতে পারিনে নিজে সেধে! থাক, আরো অনেক বলবার রইল! খুকিকে চুমু দিস্। ইতি—

তোর সাহসী সই
সাহসিকা

শেওান
১লা আষাঢ়
দুপুর রাত্তির

শ্রীচরণসরোজেসু!

সাহসিকা-দি! বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে গেল। ঝড়ঝন্‌ঝা যত বইবার, বয়ে গেল আমার জীবনের ওপর দিয়ে। কিন্তু আজো বৃষ্টি থামেনি। আজ পয়লা আষাঢ়। আমার জীবনের এ-আষাঢ় বুঝি আর ফুরোবে না। আশীর্বাদ করো দিদি, সত্যিই এ-আষাঢ়ের যেন আর শেষ না হয়।

বিয়ের পর আর কাউকে চিঠি দিইনি। আমার এত শ্রদ্ধার মা, দাদাভাই রবিয়ল সাহেব, এত ভালোবাসার ভাবি সাহেবা, সোফি—সকলের মাঝে যেন একটা মস্ত আড়াল পড়ে গেছে। আমি যেন কাউকেই আর ভাল করে দেখতে পাচ্ছিনে। সব মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসছে—আমার মনের মুকুরে দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়া লেগে ! আজ আমার মনে হচ্ছে দিদি, যেন তুমি ছাড়া আর আমার আপনার বলতে কেউ নেই। শুধু তুমি আমার মনে আজো ঝাপসা হয়ে ওঠো নি। তাই আজ আমার মনের সকল দ্বন্দ্ব-গ্লানি কাটিয়ে উঠে তোমার পানে সহজ চোখে চাইতে পারছি। তাই আবার বলছি, সাহসিকা-দি, আজ তুমিই,—একমাত্র তুমিই আমার গুরু, আমার বন্ধু, আমার সখি—সব ! আজ আমি মনের কথা যেন মন খুলে বলতে পারি তোমার কাছে। আজ যেন আমি আত্মপ্রবঞ্চনা না করি !

আর আপনাকে ফাঁকি দিতে পারিনে দিদি ! আজ আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘের সাথে সাথে আমারও মন যেন ভেঙে পড়ছে ! মনে হচ্ছে মাটির মতো করে আমায় কেউ চা'ক, আমিও আষাঢ় মেঘের মতো নিঃশেষে নিজেকে ঝরিয়ে দিই তার বুকে। নিজেকে জমিয়ে জমিয়ে যে-ভার বিপুল করে তুলেছি নিজেরই জীবনে, আজ আমি মুক্তি চাই সে-ভার হতে। বিলিয়ে দেওয়ার সাধনা কেমন করে আয়ত্ত করি বলে দিতে পারো, দিদি ?

এই তো দুটো চোখ, ক ফোঁটাই-বা জল ধরে ওতে ! তবু মনে হচ্ছে আজ যেন আমি আষাঢ়ের মেঘকেই হার মানিয়ে দিতে পারি কেঁদে কেঁদে।

কত ঝন্‌ঝা, কত বজ্র, কত বিদ্যুতের পরিণতি এই বৃষ্টিধারা, এই চোখের জল !

তুমি হয়তো মনে করছ, আমি পাগল হয়েছি। তাও যদি হতে পারতাম তাহলে নিজেকে ভোলার একটু অবসর মিলত। অবসরের চেয়েও বড় কথা দিদি, এই স্ত্রীজাতির বড় কর্তব্যটা থেকে রেহাই মিলত একটু ! তুমি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছ এইবার, কিন্তু দশ আঙুলের ক্ষুদ্র মুষ্টির চাপে এক মুঠো ফুলের দুর্দশা দেখেছ? শুকিয়ে মরতে আমি রাজি আছি দিদি, কিন্তু এমন করে কর্তব্যের মুঠিতলে পিষ্ট হয়ে মরে নাম কিনবার সাধ আমার নেই। নারীজীবনের ফুলহার নাকি বিধাতা প্রেমের গলায় দেবার জন্যই গেঁথেছিলেন, কবিরা তাই বলেন ; কিন্তু তাকে মুঠি-তলে পিষবার আদেশ যে শাস্ত্রকার দিয়েছিলেন, তাঁকে যদি এই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরবার সময় শ্রদ্ধা করতে না-ই পারি—সেটা কি এতই দোষের !

বাঁচবার সাধ আমার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এমন করে জাঁতা-পেষা হয়ে মরবার প্রবৃত্তিও নেই আমার। মরতেই যদি হয় দিদি, তাহলে সে-সময় কাছে আমার চাওয়ার ধনকে না-ই পাই, অন্তত আমার চারপাশের দুয়ার-জানালাগুলো যেন খোলা থাকে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবার মতো বায়ুর যেন সেদিন অভাব না হয়, এই ধরণী-মা'র মুখের পানে চেয়ে প্রাণ ভরে কেঁদে নেবার মতো অবকাশ যেন সেদিন পাই দিদি, এইটুকু প্রার্থনা করো-শুধু আমার জন্য নয়—আমারই মতো বাংলার সকল কুলবধূর জন্য !

দেখেছ, নিজের দুঃখটাকেই ফেনাচ্ছি এতক্ষণ ধরে ; সুখের তলানিটার পরিমাপ করতে যেন ভুলে গেছি। আমার জীবনের পাত্র উপচে যেটা পড়ছে নিরন্তর—সেইটাই দেখলাম শুধু নিচে জমা হয়ে রইল যা তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হলো না—এ যে শুধু তুমিই ভাবছ তা নয়—আমিও ভেবেছি বহুদিন, আজও ভাবি। কিন্তু দিদি, তলানিটাকে যখন দেখি একটা চোখে যতটুকু জল ধরে তার চেয়েও কম, তখন সেটার ক্ষতিপূরণ করতে এই পোড়া চোখের জল ছাড়া আর কি থাকতে পারে—বলতে পারো ?

আমার স্বামী দেবতামানুষ। অর্থাৎ দেবতার যেমন ঐশ্বর্যের অভাব নাই আবার লোভেরও ঘাটতি দেখিনে তেমনি। তাঁর সম্বন্ধে অপবাদ আমি দেবো না, দিলে তোমরা ক্ষমা করবে না। ঐশ্বর্যে তাঁর আকর্ষণ যত বেশিই থাক, অমৃতে তার অরুচি নেই এবং ওটার জন্য আবদার হয়তো একটু অতিরিক্ত রকমেই করেন। আহা বেচারা ! দেখে দয়া হয় ! ছেলেবেলায় পড়েছিলাম,—সমুদ্র মন্থন চলেছে, ভাল ভাল জিনিস সব দেবতারা ভাগবাঁটোয়ারা করে নিচ্ছেন, বেচারা দানব-দৈত্যের দল বানরের পিঠে ভাগ করার সময় বেড়ালের মুখ যেমন হয়েছিল তেমনি মুখ করে দাঁড়িয়ে,—ক্রমে উঠলেন লক্ষ্মী, সুধার ভাঁড় হাতে নিয়ে এবং তাঁকে অধিকার করে বসলেন বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটি। এতক্ষণ যদিই বা সয়েছিল—এইবার দেবতা দানব কারুরই সইল না ! লাগল একটা গণ্ডগোল—এবং এই গণ্ডগোলের অবকাশে বৈকুণ্ঠের চতুর ঠাকুরটি লক্ষ্মী-ঠাকুরুনকে নিয়ে একবারে পগারপার ! দ্বন্দ্ব যখন মিটল, তখন সুধার অংশ হয়তো সব দেবতাই পেলেন, কিন্তু জিতে গেলেন যে ঠাকুরটি তিনি যে সুধাসমেত সুধাময়ীকে পেলেন—এ ব্যথা আমরা ভুললেও দেবতারা ভুললে না। তা আমার স্বামীদেবতাকে দেখেই অনুভব করছি। উনি যা বলেন, তার মানে ঐ রকমেরই কতকটা। ওঁর মাঝে আবার একটা দুষ্ট দানবও প্রবেশ করেছে—জানিনে কোন পথ দিয়ে। ওঁর মাঝের দেবতা যখন অমৃতের জন্য অভিযোগ করেন নিরুদ্দেশ ঠাকুরটির উদ্দেশে, তখন দৈত্যটাও মুষ্টি পাকায় ক্রুদ্ধ রোষে, বোধ হয় বলে, পেতাম একবার এই হাতের কাছে ! আমার স্বামী রসিক মানুষ, এই কথাটা তিনিও একদিন আমায় বলছিলেন—আফিমের নেশার ঝোঁকে। অবশ্য, তাঁর বলার ধরনটা ছিল অন্য ধরনের, মোদ্দা মানে তার ঐ এক যে, সুধায় তিনি বঞ্চিত হলেন, তাঁর সুধাময়কে চোরে নিয়ে গেল !

সেদিন আমার মনটা হয়তো ভাল ছিল না, আমি বলেছিলাম কি, দিদি জানো ? বলেছিলাম, সেই চোরটি যদি বৈকুণ্ঠের ঠাকুরটির কাছে একটু চতুরালি শিখতই, তাহলে তাকে আজ জীবনে এত বড় ঠকতে হতো না। সে তাহলে সুধাময়ীকেও চাইত সুধার সাথে। স্বামী আফিমের নেশায় ঝিমুচ্ছিলেন, বোধ হয় বুঝতে পারেননি ভাল করে আমার হেঁয়ালি। বুঝলে আমার ভাগ্যে হয়তো এ দেব-লোক অক্ষয় না হতেও পারত।

স্বামী আফিম খেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে গেছেন, আমারও এক একবার লোভ হয় দিদি, যে, ঐ আফিমের অংশ নিয়ে আমিও চিরজনমের মতো বেঁচে যাই? যে-লোভটা

ঐ উৎকট দিকটায় এত করে আকর্ষণ করে আমায়—সেই লোভটাই আবার মিষ্টি কোন ভবিষ্যতের পানে ইশারা হেনে বলে,—ওরে হতভাগি, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক তুই, সারা জীবনের ক্ষতি তোর এক মুহূর্তের কল্যাণে পুষ্পিত হয়ে উঠবে। তোর প্রতীক্ষার ধন ফিরে পাবি ! তোর মৃত্যুক্ষণ হাসির রঙে রেঙে উঠবে !—আমিও তার সাথে সাথে বলি, আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।—যাকে আমি বাম হস্তের বারণ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি, দক্ষিণ হস্তের বরণমালা দিয়ে যদি তার প্রায়শ্চিত্ত না করি, তাহলে আমার আর মুক্তি নেই ইহকালে।

আমার স্বামী আমার রূপকে চেয়েছিলেন রূপার দরে যাচাই করতে। শুনে খুশি হবে যে, এ সওদায় তিনি ঠকেননি। কিন্তু এর জন্য স্বামীকে খোঁচা দিয়ে লাভ নেই। এই তো আমাদের বাংলার—অন্তত শরীফ মুসলমান মেয়েদের—চিরকেলে একঘেয়ে কাহিনী। আমাদের সমাজের স্ত্রী-শিকারী অর্থাৎ স্বামীরা শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে শিকার করেন আমাদের। তাঁরা আমাদের দেখতে পান না বটে, কিন্তু শুনতে পান। রূপের একটা অভিশাপ আছে, হেরেমের দেয়াল ডিঙাতে তার বিশেষ বেগ পেতে হয় না। প্রভাত-আলোর মতো, ফুলের গন্ধের মতো তার খ্যাতি ঘরে-ঘরে দেশে-দেশে পুরুষের কানে গিয়ে পৌঁছে। কোথাও ভাল শিকার আছে শুনলেই পুরুষ ছোটেন সেখানে, সেই শব্দভেদী বাণের কল্যাণে তাঁদের হয়ে যায় শাপে-বর—কিন্তু এই হতভাগিনীদের বর-ই হয়ে ওঠে শাপ।

আমার স্বামী শিকার করে করে প্রধান হয়েছেন, হাত তাঁর পাকা, লক্ষ্যও অব্যর্থ। কাজেই আমার রূপের খ্যাতি তাঁর কাছে পৌঁছবার পরেও তিনি চুপ করে বসে থাকবেন—তাঁর বীর চরিত্রে এত বড় অপবাদ দেবার সুযোগ তিনি দেননি। ছুঁড়লেন শব্দ লক্ষ্য করে বাণ, বাণের রৌপ্যফলকে বিঁধে আমার বক্ষের অবস্থা যা-ই হোক, তাঁর মুখে হাসি যা ফুটল তা খাঁটি সোনার। এইখানে শুনে খুশি হবে দিদি, তাঁর দাঁত সব সোনার ! খোদার দেওয়া হাড়ের দাঁতের লজ্জা তিনি দূর করেছেন ও-দাঁত খসে পড়তেই। এখন তিনি সোনার দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছেন। তাঁর গোশ্‌ত খাওয়া এবং বিবাহ করা দুই শখই অক্ষয় হয়ে গেল ! বিজ্ঞানের জয়জয়কার হোক, আমাদের মতো বহু হতভাগিনীর স্বামীর যৌবন এই বিজ্ঞানের কৃপায় অটুট হয়ে রইল। আমার স্বামী জমিদার এ শুনে আমারই জাতের অনেক হতভাগিরই বুক চচ্চড় করবে—সতীনের মতো। কিন্তু আমার কপাল এমনই মন্দ দিদি, যে, এই জমিদারির পক্ষিরাজে চড়েও আমার দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আর জাগল না কোনো দিন।

স্বামী নব নব অলঙ্কারে আমার বন্দনা করেন। কিন্তু প্রসন্ন যে হতে পারি না—এর ওষুধ কি !

অলঙ্কারে কাব্যদেবীর সুষমালক্ষ্মীর দাম বাড়ে, কিন্তু মাটির মানুষের দাম ওতে বাড়ে না কমে—বলে দিতে পারো দিদি ? হাটে যে বিকাল মাটির দরে, তাকে নিয়ে এ বিদ্রূপ কেন ? হায় রে হতভাগিনী নারী, প্রাণের ডালা তার শূন্য রইল বলে দেহের ডালা সাজিয়ে সে হেসে বেড়ায় ! অলঙ্কার সুন্দর, কিন্তু ও কঠিন বস্তু দিয়ে প্রাণের পিপাসা মেটে না।

তাছাড়া, পাষাণবেদি বুকে থাকতে হয় যাকে পরে—তার গায়ে অলঙ্কার বড় বাজে দিদি। অলঙ্কার দিয়ে রূপ আমার খুলল কিন্তু মন কিছুতেই খুলল না, তাই বলেন আমার স্বামী।

অদ্ভুত এই মানুষের মন। যে মানুষ মানুষ খেয়ে খেয়ে এতটা মোটা হলো, আজ সেই মানুষই মানুষের একটুখানি করুণার জন্য কত কাঙাল হয়ে উঠেছে! দেখলে দুঃখ হয়! আমার স্বামী জমিদার, এটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। জমিদার নামের পেছনে একটা কৌতূহল আছে। রাজার ওরা পাড়াগেঁয়ে সংস্করণ, তাই লোকের বিশ্বাস—কত না জানি রূপকথার সৃষ্টি হয়েছে ওখানে। হয়তো বা হচ্ছেও! আমার স্বামী জমিদার একথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভুলেন না। তাঁর প্রতাপে দেশে যে ইংরেজ বলে এখনো কোনো শাসনকর্তা আছে, একথা ভুলে গেছে তাঁর জমিদারির লোক! আর, টাকাকড়ি? ইচ্ছা করলে আমায় বনবাস দিয়ে স্বর্ণসীতা গড়ে পাশে বসাতে পারেন! কত নারী তাঁকে আত্মদান করে ধন্য হয়ে বেহেশ্‌তে চলে গেছে হাসতে হাসতে! যাবার বেলায় তাদের এই সালঙ্কার জমিদার স্বামীর জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে, এই ভেবে, যে, কোন মুখপুড়ি আবার তাঁর এই ঐশ্বর্যের ওপর বসে তার প্রভুত্ব চালাবে! গয়না ও টাকা ছাড়া যে মেয়েলোক আরও কিছু চায়, এই নতুন জিনিসটির সঙ্গে যখন পরিচয় হলো তাঁর আমার কৃপায়, তখন এই হতভাগ্যের দুঃখ দেখে আমার মতো পাষাণীরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। বলতে সে পারে না ঠিক প্রকাশ করে, কিন্তু তার মুখ দেখে আমার বুঝতে বাকি থাকে না—কি যন্ত্রণাই তার আজ হচ্ছে! আজ সে যেন বুঝেছে, জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া যেটা, সেইটে থেকেই সে বঞ্চিত রয়ে গেল! অন্যের ভালবাসার যে কত দাম, তা বুঝেছে বেচারা—যখন তার জীবন-প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। সে আবার চায় যৌবনভিক্ষা—হয়তো সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও, সে তার সারা জীবনের ক্ষতিকে একদিনে আত্মদানে ভুলতে চায়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে-ই জানে যে, তা আর হয় না! তবু সে আমার পায়ে-পায়ে ঘুরে মরে! আমার রূপ তার গায়ে যে কখন কঠিন হয়ে বাজল জানি না, কিন্তু এ আমার বেশ স্মরণ আছে যে, সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না—এমনি একটা ভাব নিয়ে আমার দিকে পাগলের মতো করে সে এতদিন চেয়েই ছিল। মনের জাদুস্পর্শে কোমল না হলে রূপ যে স্ত্রীশিকারের বাণের রৌপ্য-ফলকের চেয়েও কঠিন হয়ে বাজে এ-শিক্ষা তার সেদিন নতুন হলো। রূপা দিয়ে মানুষ যাচাই করেও যে সবচেয়ে বড় ঠকা ঠকতে হয়, এ-শিক্ষা হলো তার আমায় দিয়ে প্রথম। অলঙ্কার দিয়ে আমার ওজন করতে পারল না বলে—তার ঐশ্বর্যের স্বল্পতা ধরা পড়ল তার চোখে!

এখন সে ঐশ্বর্যকে পিছনে ফেলে নিজেকে অঞ্জলি করে এনেছে আমার চরণতলে অর্পণ করতে, এইটাই আমার মনকে মাধুর্যে-বেদনায় অভিভূত করে ফেলেছে। একটা দুর্দান্ত পশুকে জয় করার গৌরব কি কম! আমার যদি দেবার থাকত রূপ, দেহ ছাড়া আর কিছু পুঁজি, সব দিতাম—এ বেচারার মৃত্যুপাণ্ডুর অধরে নিঙড়ে! কিন্তু এ যা চায় তা আমি পাই কোথা দিদি? রাবণ রামের সীতাকে হরণ করেছিল এইটেই লোকে শিখে

রেখেছে, কিন্তু সীতা রামকে নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে এমনি একটা মহাকাব্য লিখবার বাল্মীকি কেউ নেই?

থাক, সোজা কথায় খেয়ে-দেয়ে আমি দিব্বি মোটা হচ্ছি। দুটো বাঘে খেয়ে উঠতে পারে না—এমনি গতর হয়ে উঠেছে আমার। আমার কপাল ভাল, স্বামীর আমার কোনো পক্ষের কোনো ছেলেপিলে নেই। অতএব আমি মুক্তপক্ষ। সেবা, আদর যা-কিছু, স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দেবার নেই।

তোমাদের খবর জানবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি, এই বুঝে যা হয় একটা বিহিত করো।

আমার বোধ হয় আর বেশি চিঠি দেওয়া হবে না দিদি। মন একটা বিস্বাদ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ছে দিন দিন, আর কিছু করতে—এমনকি চিঠি লিখতেও মন চায় না। রাতদিন রাজ্যের বই আনিয়ে পড়ি। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ি, মন আমার আরব-সাগরের উপকূলে তরঙ্গের মতো মাথা খুঁড়ে মরতে চায়।

আশীর্বাদ করো দিদি, এই মাথাটা যেন কল্যাণের চরণতলে এইবার নোয়াতে পারি।

ইতি—
হতভাগিনী
মাহ্বুবা

বোগদাদ
২৩শে চৈত্র

শ্রীচরণারবিন্দেসু!

সাহসিকা-দি! এই হয়তো আমার শেষ। কিন্তু এই শেষ চিঠিটা লিখতেই একটা বছর পেরিয়ে গেল। ফুল জমে পাথর হয়ে গেছে, দেখেছ? আমি কিন্তু দেখেছি। ... যাক, ওসব কথা বলতে আসিনি আমি। কয়েকটা খবর আছে দেবার, তাই দিই। অবসর যে নেই, তা নয়—এখন বরং অবসরটা চাওয়ার চেয়ে বেশিই হয়ে উঠেছে। আর সেটা এত বেশি হাতে জমেছে বলেই হয়তো খরচ করতে এত কার্পণ্য। এখন আমার মনে হয়, চিঠি লিখে সময় নষ্ট করার চেয়ে বসে বসে আমার অতীতকে—আপনাদের সকলকে নিয়ে চিন্তার অতলতায় ডুব দেওয়ায় ঢের শান্তি! আমার জীবনে যারা ছিল মানুষ, ধ্যানের মন্দিরে তারা আজ দেবতা। তারা আজ শুধু পূজা গ্রহণ করে, কথা কয় না, নির্বাক নিশ্চুপ। পাছে কথা কয়ে আমার ধ্যান ভঙ্গ করে, তাই দেবতাকে করেছি পাথর—জমানো অশ্রুর শ্রেতমর্মরের দেবতা।

এই একটা বৎসরে কত অঘটনই না ঘটল। শুধু আমার জীবনেই নয়, সারা সৃষ্টিটা জুড়ে। মন্থন শেষে সৃষ্টি আজ নিস্পন্দ—সাড়া-শব্দহীন। সে যেন আজ তার লাভ-ক্ষতির হিসাব খতিয়ে দেখছে অন্ধকার নির্জনে বসে প্রকৃতির খাতা খুলে! খরচের লাল কালি আজ তার জমার সবুজ কালিকে লজ্জা দিচ্ছে।

যুদ্ধ থেমে গেছে! আর্মিস্‌টিস্! শান্তি! মহাপ্লাবনের পর পিতা নূহ্, যেন ধ্যানে বসেছেন। সারা সৃষ্টি উন্মুখ প্রতীক্ষায় তাঁর কুটিরদ্বারে দাঁড়িয়ে। তার সকল অনুশোচনা. সকল গ্লানি এই মহামৌনীর আঁখির প্রসাদে ফুল হয়ে ফুটে উঠুক এই আশিস আজ সে চাইতে এসেছে! ঐশ্বর্য-মদ-মত্ত দাম্ভিক আজ ভিখারির কুটিরদ্বারে ভিক্ষার্থী। এ দৃশ্য অভিনব, অদ্ভুত, না দিদি?

এই একটা বৎসর ধরে আমার কেটেছে ইরাকের মরু প্রান্তরে, ফোরাতের কূলে কূলে, শুকনো পর্বতের অস্থিশ্মশানে। ইচ্ছা করলে যে চিঠি লিখতে পারতাম না, তা নয়। ইচ্ছা করেই লিখিনি। এই একটা বৎসর ধরে আমার কেবলি ভয় হয়েছে, এই বুঝি কারুর চিঠি এসে পড়ল! একেবারে যে আসেনি, তা নয়! এবং সে সব চিঠি আপনাদেরই। তার অনেকগুলো আজও পড়িনি—কেন যে এ দুর্বলতা আমার তা নিজেই জানিনে। ভয় হয়, ওগুলোতে কত যেন দুঃসংবাদ, কত যেন অভিশাপ লুকিয়ে আছে। অথচ ফেলেও দিইনি। মনে করেছি যেদিন আমি ধ্যান-শান্ত হতে পারব—বাইরের কোনো দুঃসংবাদই আমার মনে দোলা দিতে পারবে না—এইরূপ বিশ্বাস হবে আমার নিজের উপর, সেই দিন খুলব ওগুলো।

যেগুলো খুলে পড়েছি, তাতেই যা সব জেনেছি তার বেশি জানবার আমার বর্তমান জীবনে প্রয়োজন দেখিনে। মনে হয় আমার জানাশোনার হিসাব-নিকাশ চুকে গিয়ে এবারের মতো কৈফিয়ত কাটা হয়ে গেছে। এবারের মতো আমার বেচাকেনা বন্ধ।

আচ্ছা সাহসিকা-দি, পুরুষগুলো মেয়েদের চেয়ে একটু চোখে খাটো না? অন্তত, ওদের প্রত্যেকেরই শর্ট-সাইট—কাছের দৃষ্টিটা খারাপ কাছের জিনিসকে এরা উপচক্ষু ছাড়া দেখতে পায় না। কিন্তু দূরের জিনিস দিব্যি সাদা চোখে দেখতে পায়। সোফিটাকে দেখেছি—মাহ্‌বুবার চেয়েও কাছে করে, কিন্তু পাতার আড়ালে যে বেদনার কুঁড়ি ধরেছিল—তা আমার এই হাজার মাইল দূরে চলে আসার আগে আর চোখে পড়েনি, কিন্তু দূরের এ-দৃষ্টিটা হয়ে উঠেছে আমার বরে শাপ।

আজ যখন একান্ত চিত্তে মনের তলা হাতড়িয়ে দেখি, তখন ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠি। মনে হয়, কে যেন আমায় দেখে ফেললে। চিরকাল এ মনে শুধু একটি মুখেরই প্রতিচ্ছবি পড়েছে—এই ছিল আমার ধ্রুব বিশ্বাস। চিত্ত যেদিন আর একজন দেখিয়ে দিলে মনটাকে নাড়া দিয়ে যে, পিছনে হলেও সেও আছে সেখানে—তখন স্তব্ধ হয়ে গেলাম ভয়ে-বিস্ময়ে-বেদনায়। আমার কেবল মনে হতে লাগল, এইবার একটা প্রলয় না হয়ে যায় না। আকাশে যদি কোনোদিন দুটো সূর্য ওঠে, তাহলে সেদিন ভীষণ কিছু একটা হবে, একথা পাঁজিতে না লিখলেও আমি বিশ্বাস করি।

সেই প্রলয় হয়তো ঘনিয়ে এসেছে সাহসিকা-দি আমার জীবনে। এক সূর্য আলো দেয়, কিন্তু দুটো সূর্য দগ্ধ করে। আমার মন পুড়ে যাচ্ছে—তাই বিষের ওষুধ বিষ মনে করে এই দগ্ধীভূত মরুভূমিতে এসে পড়েছি। মনে করেছি, এই পোড়া দেশের মরুভূমি দেখে সান্ত্বনা খুঁজব। আমি আজ এই মনের অগ্নিকুণ্ডে আত্মস্থ হয়ে তপস্যা করবার চেষ্টা করছি। প্রার্থনা করো যেন বিফল না হই।

আমি আর কোথাও চিঠি দেবো না, কাউকে না, তোমায়ও না। আর আমার খোঁজ করবার চেষ্টা করো না। মনে করো ধূমকেতু দেখার মতো দু'দিন একটা অমঙ্গলকে দেখে স্নেহ করেছিলে, ভালোবেসেছিলে। আজ সে অকস্মাৎ এসে আবার অকস্মাৎ হারিয়ে গেল, তখন ওকে আবার দেখতে চাওয়া পণ্ডশ্রম। ধূমকেতুর একটা নিয়ম আছে—সেই নিয়মাধীন যদি হই, তবে আবার দেখা দেবো, আপনারা দেখতে না চাইলেও।

খবর পেয়েছি সোফির বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ের পরই তার ভীষণ অসুখ, হয়তো বা বাঁচবে না। আমার চেয়ে সে খবর আপনিই বেশি জানেন। আর একটা ভীষণ খবর পেয়েছি, মাহ্‌বুবা হতভাগি বিধবা হয়েছে, তার বৃদ্ধ স্বামী মারা গেছেন। মাহ্‌বুবা নিজে লিখেছে চিঠি। সে লিখেছে, সে-ই এখন সমস্ত জমিদারির মালিক। সংসারে আর তার মন নাই; সে নাকি শিগগিরই পবিত্র স্থানসমূহ পর্যটন করতে বেরোবে, মক্কা-মদিনাও আসবে এবং আরো লিখেছে বোগদাদ শরিফেও আসতে পারে। আমি বারণ করিনি। আর আমার ভয় নেই তাকে।

যে মাহ্‌বুবা একদিন স্বেচ্ছায় আমাকে পাওয়ার লোভ দু'হাতে ঠেলে দিয়েছিল; আমার মহৎ জীবন পাছে বিবাহের জন্য নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই আমাকে নিজে হাতে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিলে—তাকে যদি আজ অযথা সন্দেহ করি, তাহলে আমার ইহকালে পরকালে কোথাও মুক্তি হবে না, সাহসিকা-দি।

আমাদের পল্টন শিগগির ফিরে যাচ্ছে। শিগগির সব ভাইরা আমার দেশে ফিরবে। আমিই আর ফিরব না।

আমি আবার তিন বছরের জন্য অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিয়ে যুদ্ধ-আফিসে নতুন কাজ নিয়েছি। ইচ্ছা করলেও আর যেতে পারব না এ-তিন বছরের মধ্যে।

আমার বাঁধন-হারা জীবন-নাট্যের একটা অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। এর পর কি আছে, তা আমার জীবনের পাগলা নটরাজই জানেন।

আশীর্বাদ করো তোমরা সকলে, আবার যখন আসব রঙ্গমঞ্চে—তখন যেন আমার চোখের জলে আমার সকল গ্লানি, সকল দ্বন্দ্ব-দ্বিধা কেটে যায়—আমি যেন পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে তোমাদের সকলের চোখে চোখে তাকাতে পারি। ইতি—

অভিশপ্ত
নূরুল হুদা

যুগবাণী

উৎসর্গ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীচরণেষু

রাঙাদা'!

তোমার চোখা লেখার জন্য নয়, তোমার মোহন রূপের জন্য নয়, তোমার বুক-ভরা স্নেহের জন্য নয়; তোমার উদার উন্মুক্ত বিরাট প্রাণ-শক্তির জন্য নয়, তোমার বেদনা-রক্ত ব্যর্থতার জন্যও নয়,—তোমার ভালোবাসার বিপুল সাহসিক শক্তির জন্য, কোনো কিছুকে না-মানার জন্য, বিদ্রোহের জন্য, তোমায় আমি রক্ত-প্রণাম জানাচ্ছি।

তোমার আদর-সিক্ত
ছোটভাই
নুরু

নবযুগ

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন। আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো ইস্‌রাফিলের[১] শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে। সাগ্নিক ঋষির ঋক্ মন্ত্র আজ বাণীলাভ করিয়াছে অগ্নি-পাথারের অগ্নি-কল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পর্দা তীব্র বহ্নি-ঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতি বিস্ফারিত। আজ নূতন করিয়া—মহা গগনতলে দাঁড়াইয়া ঐ অনাদি অসীম মুক্ত শূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া দেখিয়াছে, কোথায় সে-অনন্ত-মুক্তি, আর কোথায় তাহারা পড়িয়া আছে বন্ধন-জর্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশি। সে বাঁশির সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু-পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে—'পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি!' এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে, আয়র্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান,—জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারত-বর্ষ।

ভারত যেদিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সেদিন সর্বাপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। কত শত বর্ষের কত সহস্র শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে—তাহার অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্মেরও মর্মস্থলে! কত গোলা, কত গুলি, কত বল্লম, কত তলোয়ারই না তাহার বুক ঝাঁজরা করিয়া দিয়াছে! পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা-ঘা। গর্দানে তাহার নির্দয়

---

১. ইস্‌রাফিল—প্রলয়-শিঙ্গা-মুখে অপেক্ষমান স্বর্গীয় দূত।

খামখেয়ালি পশুশক্তির বিপুল জগদ্দল শিলা। চক্ষে তাহার সাতপুরু করিয়া কাপড় বাঁধা। সেই যে গা মোড়া দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আগেকার কাঁচা ঘায়ে সপাৎ সপাৎ করিয়া জল্লাদের লৌহ-হস্তের কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্মম অপমানে, সে যখন ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া গর্দানের বোঝা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল, তখন কশাইয়ের ভোঁতা ছোরা দিয়া কচ্‌লাইয়া কচ্‌লাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহারই বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা হা করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত শিশুর কলিজা-মথিত রক্তের বিপুল ঝাপ্‌টা তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। সেই সন্তানের রক্ত-মাখানো দৃষ্টি দিয়া সে জল-ভরা চোখে দেখিল, পূর্বতোরণে অগ্নি-রাগে লেখা রহিয়াছে 'নবযুগ'। নয়ন দিয়া তাহার হু হু করিয়া অশ্রুর শত পাগল-ঝোরা ছুটিল। সে তাহার কোলের কাটা সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া দুই ব্যগ্র বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল, 'তুমি এস !' নবযুগ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, 'আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিয়ো।'

আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল, 'মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির ! ভাঙো দাসত্বের নিগড় ! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে?' এই 'খোদার উপর খোদকারি' শক্তিকে দলিত করো। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন করো !' 'আল্লাহু আকবর'[২] বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। তাহার শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের[৩] রক্ত-রাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্টির ভূলুণ্ঠিত রবাব আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।' এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল 'আবিরাবির্ম এধি[৪] ! আবির্ভাব হও ! আবির্ভাব হও ! ! সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্লোল শুনিল। যুগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়নপাতে সারা বিশ্বের আর্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আজ দুঃখী জনগণ দেশ জাতি সমাজের বহির্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায়

---

২. আল্লাহু আকবর—ঈশ্বর মহান।

৩. ফেজ—তুর্কি-সৈনিকের রক্ত-শিরস্ত্রাণ।

৪. আবিরাবির্ম এধি—আবির্ভাব হও !

ব্যথিত, নিপীড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বন্ধনবেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে। তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে—ঐ দেখো—বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল, হস্তমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।

ঐ শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। ঐ শোনো তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী, —আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য-অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত-সমাধির পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড়-ছোট ভাই বলিয়া যেন করুণাধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনে যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। এই মহামানবের সাগরতীরে শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক, শাশ্বত হউক।

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার ! একবার দাঁড়াও ! ! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত, মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসঙ্কোচ-দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁজরাপারা বক্ষ, সুত-শোণিত-লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না ! তোমার পুত্র-শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠে না, মা ! সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগর-পার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীরপুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সেদিন তাহাকেই হয়তো তোমার বেশি করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সেদিন আর চোখের জল ফেলিয়ো না, মা ! বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সেদিন কোলের সন্তানদের দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো।

এস ভাই হিন্দু ! এস মুসলমান ! এস বৌদ্ধ ! এস ক্রিশ্চিয়ান ! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান—ঐ শ্মশানভূমিতে—শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ-পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ[৫] ভাইদের মুখ মনে করো, আর গভীর

---

৫. শহীদ—Martyr ('শহীদ' শব্দের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নাই। দেশের জন্য, ধর্মের জন্য যে প্রাণ দেয়, সে-ই শহীদ)।

বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে করো, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না, ভুলিয়ো না! আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বোনে বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।

'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!'

স্বাধীনতা হারাইয়া আমরা যখন আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলাম এবং আকাশ-মুখো হইয়া কোন অজানা পাষাণ-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম, তখন কবির কণ্ঠে আশার বাণী দৈব-বাণীর মতোই দিকে দিকে বিঘোষিত হইল, 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!' বাস্তবিক আজ আমরা অধীন হইয়াছি বলিয়া চিরকালই যে অধীন হইয়া থাকিব, এরূপ কোনো কথা নাই। কাহাকেও কেহ কখনো চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেহ কখনো জয়ী হইতে পারে না। আজ যাহারা স্বাধীন হইয়া নিজের অধীনতার কথা ভুলিয়া অন্যকেও আবার অধীনতার জাঁতায় পিষ্ট করিতেছে, কে জানে প্রকৃতি তাহাদের এই অপরাধের পরিণাম কত নির্মম হইয়া লিখিয়া রাখিয়াছে! 'এয়সা দিন নেহি রহেগা', চিরদিন কারুর সমান যায় না। আজ যে কপর্দকহীন ফকির, কাল তাহার পক্ষে বাদশাহ্ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অত্যাচারীকে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে। আজ আমি যাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহার প্রকৃতি-দত্ত স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব ও সম্মানকে হনন করিতেছি, কাল যে সে-ই আমারই মাথায় পদাঘাত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? শক্তি সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারেই বৃদ্ধি, অন্যায় অপচয়ে তাহার লয়।

অন্যকে কষ্ট দিয়া তাহার 'আহ্-দিল্'[৬] নিতে নাই, বেদনাতুরের আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লার আরশ[৭] টলিয়া যায়। শক্তির অপব্যবহারের জন্য রোম-সাম্রাজ্য গেল, জার্মানির মতো মহাশক্তিরও পরাজয় হইল। কত উত্থান, কত পতন এই ভারত দেখিয়াছে, দেখিতেছে এবং দেখিবে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিবেক সর্বদাই মানবের পশুশক্তিকে সতর্ক করিতেছে। বিবেকের ক্ষমতা অসীম। যাহারা পশুশক্তির ব্যবহার করিয়া বাহিরে এত দুর্বার দুর্জয়, অন্তরে তাহারা বিবেকের দংশনে তেমনি ক্ষত-বিক্ষত, অতি দীন। তাহারা তাহাদের অন্তরের নীচতায় নিজেই মরিয়া যাইতেছে, শুধু লোক-লজ্জায় তাহাকে দাম্ভিকতার মুখোশ পরাইয়া রাখিয়াছে। সিংহের চামড়ার মধ্য হইতে লুকানো গর্দভ-মূর্তি বাহির হইয়া পড়িবেই। নীল শৃগালের ধূর্তামি বেশি দিন টিকিবে না। তাই বলিতেছিলাম, বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন

---

৬. আহ্-দিল্—যন্ত্রণা পেয়ে ব্যথিত নিশ্বাস আর নীরব-অভিযোগ।

৭. আরশ—ভগবানের সিংহাসন।

বিসর্জন না দিই। আজ যখন সমস্ত বিশ্ব মুক্তির জন্য, শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মাদের মতো সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোমানলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি, 'মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি'। হস্তে তাহাদের মুক্তির নিশান—মুখে তাহাদের মুক্তির বিষাণ, শিয়রে তাহাদের মুক্তির তৃপ্তি-ভরা মহা-গৌরবময় মৃত্যু।—তখনও মুক্তির সেই যুগান্তরের নবযুগেও আমরা কিনা পলে পলে দাসত্বের, মনুষ্যত্বহীন আত্মসম্মানশূন্য ঘৃণ্য কাপুরুষের মতো অধোদিকেই গড়াইয়া চলিতেছি! এতদূর নীচ হইয়া গিয়াছি আমরা যে, কেহ এই কথা বলিলে উল্টো আবার কোমর বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিই। আমাদের এই তর্কের সবচেয়ে সাধারণ সূত্র হইতেছে, দাসত্ব—গোলামি ছাড়িয়া দিলে খাইব কি করিয়া? কি নীচ প্রশ্ন! যেন আমাদের শুধু কুকুর-বিড়ালের মতো উদর-পূর্তির জন্যই জন্ম! এমন নীচ অন্তঃকরণ লইয়া যাহারা বেহায়ার মতো বেহুদা[৮] তর্ক করিতে আসে, তাহাদের উপর খোদার বজ্র কেন যে ভাঙিয়া পড়ে না, তাহা বলিতে পারি না! আজ সারা বিশ্ব যখন ও-রকম মরার মতো বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া মুক্তিলাভের জন্য প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, তখনও আমাদের এইরকম হৃদয়হীনতার, গোলামি মনের পরিচয় দিতে এতটুকু লজ্জা হয় না! বড়ই দুঃখে তাই বলিতে হয়, 'এ অভাগা দেশের বুকে বজ্র হানো প্রভু, যদ্দিনে না ভাঙছে মোহ-ভার!' আমাদের এ মোহ-ভার ভাঙিবে কে? এ-শৃঙ্খল মোচন করিবে কে? আছে, উত্তর আছে, এবং তাহা, 'আমরাই!' নির্বোধ মেষ-যূথের মতো এক স্থানে জড়ো হইয়া শুধু মাথাটা লুকাইয়া থাকিলে নেকড়ে বাঘের হিংস্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইব না, তাহা হইলে আমাদের ঐ নেকড়ে বাঘের মতো করিয়া কান ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবে।

দেশের পক্ষ হইতে আহ্বান আসিতেছে, কিন্তু কাজে আমরা কেহই সাড়া দিতে পারিতেছি না। অনেকে আবার বলেন যে, অন্যে কে কি করিতেছে আগে দেখাও, তারপর আমাদিগকে বলিও। এই প্রশ্ন ফাঁকিবাজের প্রশ্ন। দেশমাতা সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, যাহার বিবেক আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সে-ই বুক বাড়াইয়া আগাইয়া যাইবে। তোমার কি নিজের ব্যক্তিত্ব নাই যে, কে কি করিল আগে দেখিয়া তবে তুমি তার পিছু পিছু পোঁ ধরিবে? নেতা কে? বিবেকই তো তোমার নেতা, তোমার কর্তব্য-জ্ঞানই তো তোমার নেতা! দেশনায়ক যাঁহারা, তাঁহারা তো তোমার বিবেকেরই প্রতিধ্বনি করেন। কর্তব্য-জ্ঞানের কাছে, ত্যাগের কাছে সম্ভব-অসম্ভব কিছুই নাই। সুতরাং 'ইহা সম্ভব, উহা অসম্ভব' বলিয়া, ছেলেমানুষি করাও আর এক বোকামি। যাহা সম্ভব তাহা করিবার জন্য তোমার ডাক পড়িত কি জন্য? অসম্ভব বলিয়াই তো দেশ তোমার বলিদান চাহিয়াছে। স্বার্থের গণ্ডি না পারাইয়া ভিক্ষা দেওয়া যায়, ত্যাগ বা বলিদান দেওয়া যায় না। তোমার যতটুকু শক্তি আছে প্রয়োগ করো, দেশের কাছে,

৮. বেহুদা—বাজে।

খোদার কাছে অসঙ্কোচে দাঁড়াইবার পাথেয় সঞ্চয় করো, তোমার বিবেকের কাছে তুমি অগাধ শান্তি পাইবে ! ইহাই তোমার পুরস্কার। অন্যে জাহান্নামে যাইবে বলিয়া কি তুমিও তার পিছু-পিছু সেখানে যাইবে ?

আজ আমাদের শুধু ক্লান্তি,—শুধু শ্রান্তি কেন ? 'এমন করে কদ্দিন খাবি,' না 'গোলেমালে যদ্দিন যায়' করে আর কতদিন চলিবে ? আমরা আমাদের দেশের জন্য, মুক্তির জন্য কি দুঃখদৈন্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিব না ? ত্যাগ, বিসর্জন, উৎসর্গ, বলিদান ছাড়া কি কখনো কোনো দেশ উদ্ধার হইয়াছে, না হইতে পারে ? স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেই হইবে, ত্যাগ কখনো আরাম-কেদারায় শুইয়া হয় না। কিন্তু এই দুঃখকষ্ট, ইহা তো বাহিরের ; একটা সত্য মহান্ পবিত্র কার্য করিতে গেলে যে-আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়, অন্তরে যে-ভাস্বর স্নিগ্ধ দীপ্তির উদয় হইয়া সকল দেহমন আলোয় আলোকময় করিয়া দেয়, সারা দেশের ভাইদের বোনদের যে প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি ও সারা মুক্ত বিশ্বের সাবাসি পাওয়া যায়, তাহা এই বাহিরের দুঃখকষ্টকে কি ঢাকিয়া দিতে পারে না ? কার মূল্য বেশি ? বাহিরের এই নগণ্য দুঃখ-কষ্টের, না অন্তরের স্বর্গীয় তৃপ্তির ? তুমি কি চাও ?—কুকুর-বিড়ালের মতো ঘৃণ্য-মরা মরিতে, না মানুষের মতো মরিয়া অমর হইতে ? তুমি কি চাও ?—শৃঙ্খল, না স্বাধীনতা ? তুমি কি চাও ?—তোমাকে লোকে মানুষের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করুক, না পা-চাটা কুকুরের মতো মুখে লাথি মারুক ? তুমি কি চাও ? —উষ্ণীষ-মস্তকে উন্নত-শীর্ষ হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষের মতো গৌরব-দৃষ্টিতে অসঙ্কোচে তাকাইতে, না নাঙ্গা শিরে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কুব্জপৃষ্ঠে গোলামের মতো অবনত হইয়া হুজুরির মতলবে শরমে চক্ষু নত করিয়া থাকিতে ? যদি এই শেষের দিকটাই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তুমি জাহান্নামে যাও ! তোমার সারমেয় গোষ্ঠী লইয়া খাও-দাও আর পা চাটো। আর, যাহারা ত্যাগকে বরণ করিয়া লইতে পারিবে, যাহারা ঘরে মুখ মলিন দেখিয়া গলিয়া যাইবে না, যাহাদের জান দিবার মতো গোর্দা[৯] আছে, আঘাত সহিবার মতো বুকের পাটা আছে, তাহারা বাহির হইয়া আইস ! দেশমাতার দক্ষিণ হস্ত, আর কল্যাণ-মন্ত্রপূত অশ্রু-পুষ্প তোমাদেরই মাথায় ঝরিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা চাই লাঞ্ছনার চন্দনে আমাদের উলঙ্গ-অঙ্গ অনুলিপ্ত করিতে। কল্যাণের মৃত্যুঞ্জয় কবচ আমাদের বাহুতে-উষ্ণীষে বাঁধা, ভয় কি ? মনে পড়ে, সে-দিন দেশমাতার আহ্বান নিয়া মাতা সরলা দেবী বাংলার কন্যারূপে পাঞ্জাব হইতে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলেন। কে কে সাড়া দিলে এ-জাগ্রত মহা-আহ্বানে ? এমন ডাকেও যদি সাড়া না দাও, তবে জানিব তোমরা মরিয়াছ। বৃথাই এ-আহ্বান এ-ক্রন্দন তোমার, মা ! যদি পারো, সঞ্জীবনী সুধা লইয়া আইস তোমার এ মরা সন্তান বাঁচাইতে। যদি তাহা না পারো, তবে ইহাদিগকে ধুতুরার বীজ খাওয়াইয়া

৯. গোর্দা—হৃৎপিণ্ড, অর্থাৎ অসম সাহস।

পাগলা করিয়া দাও। ইহাতে তাহারা 'মানুষের মতো' জাগিবে না, কিন্তু তবু জাগিবে! জানি, কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা কখনো নয়, কিন্তু আর এমন করিয়া স্নেহের প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, মা, এখন তোমাকে কু-মাতা হইতে হইবে, তোমাকেই আঘাত দিয়া আমাদের জাগাইতে হইবে। আমরা পরের আঘাত চোখ বুজিয়া সহ্য করি, কিন্তু স্বজনের আঘাত সইতে পারি না। তাই আর শুধু ডাকাডাকিতে কোনো ফল হইবে না। তোমার রুদ্র মূর্তি দিকে দিকে প্রকটিত হউক। যদিই এই রুদ্র ভীষণতার মধ্যে, রণ-চণ্ডীর মহামারীর মধ্যে, আমাদের মনুষ্যত্ব জাগে, যদি আঘাত খাইয়া খাইয়া অপমানিত হইয়া আবার আমরা জাগি। তাই আবার বলিতেছি, তোমরাও সাথে সাথে বলো,

গেছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ!

ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ

আমাদের হিন্দুস্থান যেমন কীর্তির শ্মশান, বীরত্বের গোরস্থান, তেমনি আবার তাহার বুক অত্যাচারীর আততায়ীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন। সেই সব আঘাতের কীর্তিস্তম্ভ বুকে ধরিয়া স্তম্ভিতা এই ভারতবর্ষ দুনিয়ার মুক্তবুকে দাঁড়াইয়া আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে। অত্যাচারীরা যুগে যুগে যত কিছু কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে, এইখানে তাহাদের সব কিছুরই স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের চোখে শূলের মতো বাজিতেছে। কিন্তু এই সে-দিন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, যেখানে আমাদের ভাইরা নিজের বুকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়া গেল, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নিহত সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনা-শেলের মতো আমাদের সামনে জাগিয়া থাক, ইহা খুব ভাল কথা, —কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদেরই দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে, তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে-কোনো প্রান্তর হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে। এ-ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ-কশাই-এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়। ইহার জন্য আমাদেরই সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব। এই যে আজ আমাদের নূতন করিয়া জাগরণ, এই যে আঘাত দিয়া সুপ্ত চেতনা, আত্মসম্মানকে জাগাইয়া তোলা, ইহার মূল কে? —ডায়ার।

মানুষের, জাতির, দেশের যখন চরম অবনতি হয়, তখনই এইরূপ নরপিশাচ জালিমের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। মানুষ যখন নিজের প্রকৃতিদত্ত অধিকারের কথা ভুলিয়া যায়, শত বন্ধনের মধ্যে তাহার জীবনের গতি-চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার আর মান-অপমান জ্ঞান থাকে না, প্রভুর দেওয়া দয়ার দানকে গোলামের মতো সে মহাদান বলিয়া মাথায় তুলিয়া বরণ করিয়া লয় এবং তাহার ভৃত্য-জীবন সার্থক হইল মনে করে। তাহার মন এত ছোট হইয়া যায়, তাহার আশা এত হেয় ও হীন হইয়া পড়ে যে, সে ভাবিতেও পারে না—যে-দান মাথায় করিয়া আজ সে গৌরব অনুভব করিতেছে, যে-দানকে সে শিরোপা[১০] করিয়া (অভিরুচি অনুসারে কখনো পেছনে লেজুড়ের মতো জুড়িয়া) মুক্ত-স্বাধীন বিশ্বের কাছে বক্ষস্ফীত করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দাম এক কথায় 'পাঁচ জুতি'!

---

১০. শিরোপা—শিরোভূষণ, পুরস্কার।

মনুষ্যত্বের এ অবমাননা ও লাঞ্ছনা শুধু ভিক্ষুকের জাতিই হাসিমুখে নিজেদের গৌরব বলিয়া মানিয়া লইতে পারে। অন্তরে যাহারা ঘৃণ্য নীচ আর ছোট হইয়া গিয়াছে, আত্মসম্মান-জ্ঞান যাহাদের এত অসাড়-হিম হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে চাই—এই ডায়ারের দেওয়া অপমানের মতো বজ্র বেদন।

এই ডায়ারের মতো দুর্দান্ত কশাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মতো করিয়া না মারিত, তাহা হইলে কি আজিকার মতো আমাদের এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত—না, আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মতো গর্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনোই না। আজ আমাদের সত্যিকার শোচনীয় অবস্থা সাদা চোখে দেখিতে পারিয়াছি এই ডায়ারেরই জন্য। ডায়ারের প্রচণ্ড পদাঘাত, পৈশাচিক খুন-খারাবি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া আমাদের ঘৃণ্য হীন অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। আরো জানাইয়া দিয়াছে যে,—যে-নিষ্ঠীবন মাথায় করিয়া প্রভুর দেওয়া যে চাপ্‌রাশ পরিয়া, যে ছিন্ন জুতার মালা গলায় দুলাইয়া আমরা আহমকের মতো দুনিয়ার স্বাধীন জাতিদের সামনে দাঁড়াইয়া—গোলামির ঝুটা গৌরব দেখাইতে গিয়া শুধু হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম, তাহাতে কেহ আমাদের প্রশংসা তো করেই নাই, উল্টো আরো, 'হট্ যাও গোলাম কা জাত্' বলিয়া অবলীলাক্রমে লাঠির গুঁতো, বুটের টক্কর লাগাইয়াছে। তাহারা স্বাধীন—আজাদ ; তাহারা আমাদের এ-হীন নীচতা, এত হেয় ভীরুতা, এমন ঘৃণ্য কাপুরুষতাকে পা দিয়া মাড়াইয়া যাইবে না তো কি মাথায় তুলিয়া লইবে? অন্ধ আমরা, আমাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেছিলাম না, —সে অন্ধত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে এই ডায়ার ! আমাদের এই নির্লজ্জ কাপুরুষতাকে ভীম পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে এই জেনারেল ডায়ার। গোলামের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ কিরকম তাহাই সে নির্মম কঠোরভাবে জানাইয়া দিয়াছে। অন্য প্রতারকদের মতো গলায় পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া আদর দেখাইতে যায় নাই সে—সে নারীর সাম্‌নে উলঙ্গ করিয়া মেথরের হাতে বেত্র দিয়া তোমার পিঠের চামড়া তুলিয়াছে ! গর্দানে পাথর চাপা দিয়া বুকের উপর হাঁটাইয়াছে, তাহাদের পায়ে তোমাদিগকে সিজ্‌দা[১১] করাইয়া ছাড়িয়াছে। —আর, তবে তোমরা জাগিতে পারিয়াছ ! তোমাদিগকে জাগাইতে চাই এমনি প্রচণ্ড নির্মম কশাই-শক্তি ! এত নির্মমভাবে, এমন পিশাচের মতো বেত্রাঘাত না করিলে তোমরা জাগিতে না, তোমার মা-বোনদের সামনে উলঙ্গ করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া পশুর মতো না পিটাইলে তোমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না ! ডায়ারের বুট এমন করিয়া তোমাদের কলিজা মথিত না করিয়া গেলে তোমাদের চেতনা হইত না। তোমাদের মুখের সামনে তোমাদের আত্মীয়-আত্মীয়ার মুখে এমনি করিয়া থুথু না দিলে তোমাদের মানব-শক্তি খেপিয়া উঠিত না ! —তাই আজ আমরা ডায়ারকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন !' তুমি যে মঙ্গল দিয়া গিয়াছ আমাদের সারা ভারতবাসীকে, তাহা আমরা কখনো ভুলিব না, আমরা নিমকহারামের জাতি নই। নিশ্চয়ই তুলিব

---

১১. সিজ্‌দা—সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।

তোমার স্মৃতিস্তম্ভ, মহৎ প্রতিহিংসারূপে নয়, প্রতিদান স্বরূপে। আজ আমাদের এ-মিলনের দিনে তোমাকে ভুলিতে তো পারিব না ভাই! এই মহামানবের সাগরতীরে ভারতবাসী জাগিয়াছে—বড় সুন্দর মোহন মূর্তিতে জাগিয়াছে! সেই তোমার আনন্দের হত্যার দিনে, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হতভাগাদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াছে। দুঃখের দিনেই প্রাণের মিলন সত্যিকার মিলন হয়। আজ আমাদের এ-মিলন যে স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া নয় ভাই, আজ আমরা পরস্পর পরস্পরকে সমান ব্যথায় ব্যথী, একই মায়ের পেটের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। কাঁদিয়াছি—গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়াছি!—আমাদের ভাইদের খুন-মাখানো সমাধির উপর দাঁড়াইয়া আমরা এক ভাই অন্য ভাইকে চিনিয়াছি, আর বড় প্রাণ ভরিয়াই গাহিয়াছি—

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
এমন ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।'

আজ এস ডায়ার, আমাদের এই মহামিলনের পবিত্র দৃশ্য দেখিতে তোমাকেও নিমন্ত্রণ করিতেছি। আজ ঈর্ষা-দ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছি ভাই, তোমারও জন্য আমাদের বুকের আসন পাতা রহিল।

এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই। যদি এতটুকু ঘুমের খোমার[১২] আসে, তবে যেন এই ডায়ারকে স্মরণ করিয়া আবার আমরা হুঙ্কার দিয়া খাড়া হইতে পারি, ডায়ার-স্মৃতিস্তম্ভের ঐ আকাশের মর্ম-ভেদী চূড়া দেখিয়া যেন মনুষ্যত্বের শক্তির সাড়া আমাদের মাঝে গর্জন করিয়া উঠে। আমাদের এ-মিলন যদি মিথ্যা হয়, তবে যেন আমাদিগকে সচেতন করিতে যুগে যুগে এই ডায়ারের বজ্র বেদনার আবির্ভাব হয়।—আমাদের প্রীতি-বন্ধন অক্ষয় হোক। আমাদের এ-মহামিলন চিরন্তন হোক। আমরা আজ সব সঙ্কীর্ণতা, অতীতের সকল দুঃখ-ক্লেশ ভুলিয়া ভাইকে ভাই এর কোল বাড়াইয়া দিই। এস ভাই, আর একবার হাত ধরাধরি করিয়া এই খোলা আকাশে মুক্ত মাঠে দাঁড়াই।

---

১২. খোমার—তন্দ্রা।

ধর্মঘট

দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'যে এল চষে সে রইল বসে, নাড়া-কাটাকে ভাত দাও এক থালা কষে।' হুলের দংশন-জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বয়ং 'নাড়া-কাটা' প্রভুরাও এ-কথাটা ভাল করিয়াই বোঝেন, কি বুঝিয়াও যে না বুঝিবার ভান করেন বা প্রতিকারের জন্য নিজেদের দারাজ-দস্ত[১৩] সামলান না, ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমাদের মনুষ্যত্বে, বিবেকে আঘাত লাগে এবং তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা তুলিলেই হইল 'ধর্মঘট'। চাষি সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না ; হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা তেনা বা নেঙট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা-জীবনেও ঘটিয়া উঠে না, ছেলেমেয়ের সাধ-আরমান[১৪] মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বেশি বাঁচে না ; তাহারা দিবারাত্রি খনির নিচে পাতালপুরীতে আলো-বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানি তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ-হতভাগাদের স্বাস্থ্য, আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনো চিনিতে পারিবেন না যে, ইহারা মানুষ কি প্রেত-লোক-ফেরতা বীভৎস নর-কঙ্কাল। দোষ কাহাদের? কর্তাদের মতে দোষ অবশ্য এই হতভাগাদেরই। কারণ পেট বড় 'মুদ্দই'[১৫] এবং পেটের জন্যই ইহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা করে !

আমরা মাত্র এই দুই-একটি নজির দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। দেশের সমস্ত কল-কারখানায়, আড়তে গুদামে 'ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ হত্যার' এইরূপ শত শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন। আমাদের ক্ষমতা নাই যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলি। যাঁহারা ঐ সব কল-কারখানায় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এতটুকুও সংশ্লিষ্ট আছেন, বা একদিনের জন্যও ওদিক মাড়াইয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের এই বর্ণনার চেয়ে এর সত্যতা কতগুণ বেশি বুঝিতে পারিবেন। আজকাল বিশ্ব-মানবের মধ্যে larger

---

১৩. দারাজ দস্ত—বিপুল হস্ত।

১৪. সাধ-আরমান—সাধ-ইচ্ছা।

১৫. মুদ্দই—শত্রু।

humanity বলিয়া যে একটা মহত্তর মানবতার স্বর্গীয় ভাব জাগিয়াছে, এই কল-কারখানার অধিকাংশ কর্তা বা কর্তৃপক্ষেরই সে-দিকটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চোখের সাম্‌নে রাত্রিদিন মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত কত অমানুষিক পাশবতা তাঁহাদেরই এই সব কারখানায় আড়তে অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা নির্বাক নিশ্চল! নিজেরা 'মজাসে' আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া কুলি-মজুরদের আবেদন, নিবেদনকে বুটের ঠোক্কর লাগাইতেছেন! সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্করণরূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁচা খাইয়া খাইয়া জর্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। কিন্তু ইহাতে এই মনুষ্যত্ব-বিহীন ভোগ-বিলাসী কর্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হইয়া উঠেন, তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন না যে, এ-অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাৎ অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ-বিদ্রোহের মাথা-ঝাঁকানি। উন্নত আমেরিকা-ইউরোপেই ইহার প্রথম প্রচলন। সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত, এই গণতন্ত্র বা ডিমোক্রাসিই সেদেশে সর্বেসর্বা; তাই শ্রমজীবীদলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম। তাহারা যে রকম মজুরি পায়, তাহাদের স্বাস্থ্য-শিক্ষা, আহার-বিহার প্রভৃতির যে রকম সুখ-সুবিধা, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের শ্রমজীবীগণের অবস্থা কশাইখানার পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাই এতদিন নির্বিচারে মৌন থাকিয়া মাথা পাতিয়া সমস্ত অত্যাচার-অবিচার সহিয়া সহিয়া শেষে যখন আজ রক্তমাংসের শরীরে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এই বুরোক্রাসি বা আম্‌লাতন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত ছিন্নভিন্ন অন্তরের এমন বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল, তখন যাঁহার অন্তঃকরণ বা sentiment বলিয়া জিনিস আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কত বেশি অসহনীয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউদাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেননা, ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, এ-দেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবীদলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমোক্র্যাসির জাগরণও এ-দেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং করিবে। এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ-কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য

[স্মৃতি]

আজ মনে পড়ে সেই দিন আর সেই ক্ষণ—বিকাল আড়াইটা যখন কলিকাতার সারা বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ টাউনহলের খিলাফৎ-আন্দোলন সভায় তাহাদের বুকভরা বেদনা লইয়া সম্রাটের সম্রাট বিশ্বপিতার দরবারে তাহাদের আর্ত-প্রার্থনা নিবেদন করিতেছিল, আর পুত্রহীনা জননীর মতো সারা আকাশ জুড়িয়া কাহার আকুল-ধারা ব্যাকুলবেগে ঝরিতেছিল। সহসা নিদারুণ অশনিপাতের মতো আকাশ-বাতাস মন্থন করিয়া গভীর আর্তনাদ উঠিল,—'তিলক আর নাই!' আমাদের জননী জন্মভূমির বীরবাহু, বড় স্নেহের সন্তান—'তিলক আর নাই!' হিন্দুস্থান কাঁপিয়া উঠিল—কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ওরে, আজ যে তাহার বুকে তাহারই হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ধসিয়া পড়িল! হিন্দুস্থানের আকাশে-বাতাসে কোন্ প্রিয়তম-পুত্রহারা অভাগী মাতার মর্ম-বিদারী কাৎরানি আর বুকচাপড়ানি রণিয়া রণিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল, 'হায় মেরি ফরজন্দ (হায় আমার সন্তান)—আহ্ মেরি বেটা!' এই আর্ত কান্নার রেশ যখন কলিকাতায় আসিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এত মর্মভেদী কান্না প্রকাশের ভাষা নাই—ভাষা নাই! মহাবাহু মহাপুরুষ অগ্রজের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যেমন প্রাণ ভরিয়া গলা-ধরাধরি করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে, সেদিন দিন-শেষে ব্যাকুল বৃষ্টিধারার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা তেমনি করিয়া কাঁদিয়াছি। হিন্দু-মুসলমান, —মাড়োয়ারি, বাঙালি, হিন্দুস্থানি কোনো ভেদাভেদ ছিল না, কোনো জাতবিচার ছিল না, —তখন শুধু মনে হইতেছিল, আজ এই মহাগগনতলে দাঁড়াইয়া আমরা একই ব্যথায় ব্যথিত বেদনাতুর মানবাত্মা, দুটি স্নেহ-হারা ছোট ভাই! এখানে ভেদ নাই!—ভেদ নাই! সেদিন আমাদের সে-কান্না দেখিয়া মহাশূন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—ঝাঁঝরা আকাশের ঝরা থামিয়া গিয়াছে, —শুধু সে-কার মেঘ-ভরা বেদনাপ্লুত অপলক দৃষ্টি আমাদের নাঙ্গা শিরে স্তব্ধ আনত হইয়া চাহিয়া থাকিয়াছে! তাই মনে হইতেছিল, বুঝি সারা বিশ্বের বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! এই স্তম্ভিত নিস্তব্ধতাকে ব্যথা দিয়া সহসা লক্ষ কণ্ঠের ছিন্ন-ক্রন্দন কারবালা-মাতমের (কারবালার শোকোচ্ছ্বাস) মতো মোচড় খাইয়া উঠিল, 'হায় তিলক!' ওরে, এ কোন্ অসহনীয় ক্রন্দন? হায়, কাহার এ-রুক্ষ কণ্ঠের শ্রান্ত রোদন? —মনে পড়ে সমস্ত বড়বাজার ছাপাইয়া হ্যারিসন রোডের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রোরুদ্যমান লক্ষ লক্ষ লোক—মাড়োয়ারি, বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, কন্যা—শুধু বুক চাপড়াইতেছে, 'হায় তিলকজি! আহ্

তিলকজি !' মৃত্যুর অমা-ভরা শত শত কৃষ্ণ পতাকা পশ্চিমা-ঝন্‌ঝায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, আর তাহারই নিম্নে মাল্য-চন্দন বিভূষিত বিগত তিলকের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ! তাহাই কাঁধে করিয়া অযুত লোক চলিয়াছে জাহ্নবীর জলে বিসর্জন দিতে ! বাড়ির বারান্দায় জানালায় থাকিয়া আমাদের মাতা-ভগিনীগণ এই পুণ্যাত্মার আলেখ্যের উপর তাঁহাদের পূত অশ্রুরাশি ঢালিয়া ভাসাইয়া দিতেছিলেন। বলিলাম, ধন্য ভাই তুমি ! এম্‌নি মরণ, সুখের মরণ, সার্থক মরণ যেন আমরা সবাই মরিতে পারি ! তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই শেষ আশিস্-বাণী করিয়া যাও ভাই, এমনি প্রার্থিত মহামৃত্যু যেন এই দুর্ভাগা ভারতবাসীর প্রত্যেকেরই হয় ! ... ওরে ভাই, আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িল। এ পড়ো-পড়ো ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই, আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁধ দিই ! নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই ! আজ বড় ভাইকে হারাইয়া, এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি ! মনে রাখিও ভাই, আজ মশানে দাঁড়াইয়া এ স্বার্থের মিলন নয়, এ-মিলন পবিত্র, স্বর্গীয় ! ঐ দেখো, এ-মিলনে দেবদূতরা তোমাদের নাঙ্গা-শিরে পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন। মায়ের চোখের জলেও হাসি ছলছল করিতেছে !

মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?

আমরা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লার হত্যা–বীভৎসতা। আজো মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিশের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁচাগাড়ি নামক স্থানে মুহাজিরিনদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। একদল ভারতীয় সৈন্য তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করে, তাহাতে মাত্র একজন নিহত ও একজন আহত হয়! কোন্ মূর্খ বিশ্বাস করিবে একথা?

আমরা বলি, একটি আঘাতের বদলেই তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করা, এ কোন্ সভ্য দেশের রীতি? তোমাদের তো সিপাহি-সৈন্যের অভাব নাই—বিশেষ করিয়া সেই সীমান্ত দেশে। চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই তো গেরেফতার করিয়া লইতে পারিতে। তাহা না করিয়া তোমরা চালাইয়াছিলে গুলি! আর কাহাদের উপর? যাহারা স্বদেশের, স্বজনের মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চলিয়াছিল!

কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন করো, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের, স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনো সহ্য করিতে পারে কি? এই যে সেদিন হতভাগারা হাজার বছরের পরিচিত, সারা জীবনের সুখ-দুঃখ-স্মৃতি-বিজড়িত, বাপদাদার ভিটাবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন, জননী-জন্মভূমির মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া, বড় দুঃখে বড় কষ্টে জীবনের সঙ্গে জড়ানো এইসব স্নেহ-স্মৃতির বন্ধন জোর করিয়া ছিঁড়িয়া এক মুক্ত স্বাধীন অজানার দিকে পাড়ি দিতেছিল, ইহাদের বেদনা বুঝিবার অন্তর তোমাদের আছে কি? মনুষ্যত্বের এই যে মস্ত বড় একটা দিক, পরের বেদনাকে আপন করিয়া নেওয়া,—ইহা কি আর তোমাদের আছে? স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্মমভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কতদিন? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বুনিয়াদে খাড়া করা তোমাদের ঘর—মনে করো কি, চিরদিন খাড়া থাকিবে? এইসব অপকর্মের, এইসব অমার্জনীয় পাপের, এইসব নির্মম উৎপীড়নের জন্যে বিবেকের যে দংশন তাহা হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে কে? এ-মহাশাস্তির ভীষণতা আজো কি তোমার চক্ষে পড়ে নাই? তোমাদের অত্যাচারে, জুলুমে নিপীড়িত হইয়া, মানবাত্মার-মনুষ্যত্বের এত পাশবিক অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষের মতো যাহারা স্পষ্ট

করিয়া বলিয়া দিতে পারিল যে, এখানে আর ধর্মকর্ম চলিবে না, এবং চিরদিনের মতো তোমাদের সংস্রব ছাড়িয়া তোমাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল, —সেই বিদায়ের দিনেও তাহাদের উপর সামান্য পশুর মতো ব্যবহার করিতে তোমাদের লজ্জা হইল না, দ্বিধা হইল না? সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া ছল করিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাদের সাথে গোলমাল বাধাইলে, হত্যা করিলে? আবার হত্যা করিলে আমাদেরই ভারতীয় সৈন্য দ্বারা? যাহাকে হত্যা করিলে, তাহাকে হত্যা করিয়াও ছাড়ো নাই, তাহার লাশ তিন দিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া পচাইয়া গলাইয়া ছাড়িয়াছ! মৃতের প্রতিও এত আক্রোশ, এত অসম্মান কেবল তোমাদের সভ্য জাতিই একা দেখাইতে পারিতেছে! তোমাদেরি কিচনার—লর্ড কিচনার মেহেদির কবর হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া ঘোড়ার পায়ে বাঁধিয়া ঘোড়দৌড় করিয়াছে, তোমাদের এই সৈন্যদল যে তাহারই শিষ্য। না জানি আরো কত বাছাদের, আমাদের কত মা-বোনদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জানো। আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌঁছিতে পারে না। সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল! মনে রাখিও, সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ (বিচার) মাগিতেছে! দাও, উত্তর দাও! বলো তোমার কি বলিবার আছে!

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান

আমাদের বাংলার মুসলমান সমাজ যে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আশাতীতভাবে উন্নতি দেখাইয়াছেন, ইহা সকলেই বলিবেন, এবং আমাদের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণ অসাধারণ প্রায় সকল বাঙালি মুসলমানই এখন বাংলা পড়িতেছেন, বাংলা শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের কথা। বাংলা সাহিত্যে পাকা আসন দখল করিবার জন্য সকলেরই মনে যে একটা তীব্র বাসনা জাগিয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদের এই নতুন পথের পথিকগণ যে বেশ তোড়জোড় করিয়া লাগিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই সাহিত্যে আমাদের জীবনের লক্ষণ। ইহারই মধ্যে আমাদের কয়েকজন তরুণ লেখকের লেখা দেখিয়া আমাদের খুবই আশা হইতেছে যে, ইঁহারা সাহিত্যে বহু উচ্চ আসন পাইবেন।

এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্নার মতো ঢেউভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব–সাহিত্য দিয়া আমাদের কোনো উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়। হইবে কোথা হইতে? সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখার প্রাণ দিবে কোথা হইতে? যাহার নিজের বুকে রঙের আলিপনা ফুটে না, সে চিত্রে রঙ ফুটাইবে কেমন করিয়া? আমাদের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছে জড়, কেননা আমাদের জীবন ভয়ানক একঘেয়ে; তাহাতে না আছে কোনো বৈচিত্র্য, না আছে কোনো সৌন্দর্য। তাছাড়া, 'বোঝার উপর শাকের আঁটির' মতো আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কুড়ি পার না হইতেই আমরা গম্ভীর হইয়া পড়ি অস্বাভাবিক রকমের। আর, গম্ভীর হইলেই অম্‌নি নির্জীব অচেতন প্রাণীর মতো হাত–পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড়ভরতের মতো বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিতে টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউয়ের কল–গান ও চঞ্চলতা।

আমাদিগকে, বিশেষ করিয়া আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক যুবকের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন কোনো এক জরাগ্রস্ত বুড়োর লেখা; তাহাতে না আছে প্রাণ, না আছে চিন্তাশক্তি, না আছে ভাব,—শুধু

আবর্জনা, কঙ্কাল আর জড়তা। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার যে জাদু-শক্তি, ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে আপনি একটা বিমল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে। দেখিবেন, যে-সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য যত ভাল, যিনি যত বেশি প্রফুল্লচিত্ত, তাঁর লেখা তত বেশি স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, তত বেশি কলমুখর। নবীন সাহিত্যিকগণ সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবার জন্য যদি এক-আধটু করিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাহাদের লেখার মধ্যে এই সঙ্গীত, সুরের এই ঝঙ্কার উন্মুক্ত প্রফুল্লচিত্তের এই মোহন-বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের লেখার মধ্যে এক নূতন মাদকতা, অভিনব শক্তি দান করিতেছে। অধিকাংশ 'পুঁয়ে মারা' পিলে-রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ (morbid) ; ইহাই সাহিত্যের স্বচ্ছ ধারায় আবিলতা আনে। যাঁহার চিত্ত যত নিরাবিল, নির্মল, হাস্য-মুখর, তাঁহার লেখাও তত নূতন নূতন সম্পদে ভরা (rich)। ইউরোপের লোকেরা যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, খেলাধূলা, দৌড়-ঝাঁপ, মারামারি, হাসি-খুশি যেমন তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তাহাদের লেখার মধ্যেও ঠিক তাহাদের জীবনের ঐসব গুণ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।

অপর পক্ষে, উহারই বিপরীত সমস্ত দোষসম্পন্ন বলিয়া আমাদের লেখা, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টি আবার তেমনি সঙ্কীর্ণ, ভণ্ডামি, অসত্য, রোগের বীজাণু প্রভৃতিতে ভরা। লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতেও সে-সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে ; যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না। সাধারণের চক্ষে যদি না পড়ে তবে জহুরির চক্ষে তাহা পড়িবেই পড়িবে। সাহিত্যে এই প্রাণ, এই উদ্দাম-চঞ্চলতা, এই উদার মুক্তি আনয়নের চেষ্টা আপাতত আমাদের মাত্র দুই-একজন তরুণ সাহিত্যিক ভিন্ন অন্য কারুর লেখায় দেখিতে পাইতেছি না। সেই গড্ডলিকা প্রবাহ। সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক নূতন লেখক এখনো অন্ধ। এই সব কারণে সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মতো উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোনো ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মতো যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্যসাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। কারণ, সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোনো লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা ; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতে ছিল না। এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা।

এই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ রবীন্দ্রনাথ এমন জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দু'দিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সর্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া। যিনি যে দেশেরই হউন, সকলেরই অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান ; সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ভিতরের এইসব সূক্ষ্মদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, —এই মহাশক্তি আমাদের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে অর্জন করিতে হইবে। সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই করিবে। অন্যের ঠিক প্রাণে গিয়া আঘাত করিবার মতো শক্তি পাইতে নিজের প্রাণ থাকা চাই। এসব কথা আমরা শুধু কোনো বিশেষ লেখক-সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া বলিতেছি না ; ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোটগল্পলেখক সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য। এই তিন রকমের লেখকের মধ্যে কেহই ছোট নন, কারণ প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য—সৃষ্টি। তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে ; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের নবীন তরুণ আর্টিস্ট সাহিত্যিক ও কবিগণ এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির দিকে চেষ্টা ও প্রাণ প্রয়োগ করিবেন, ইহাই আমাদের বাসনা। আমাদের এ আশা পূর্ণ হউক !

ছুঁৎমার্গ

একবার এক ব্যঙ্গচিত্রে দেখিয়াছিলাম, ডাক্তারবাবু রোগীর টিকি-মূলে স্টেথিস্কোপ বসাইয়া জোর গ্রাম্ভারি চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন। আমাদের রাজনীতির দণ্ডমুণ্ড হর্তাকর্তা বিধাতার দলও আমাদের হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিল না হওয়ার কারণ ধরিতে গিয়া ঠিক ঐ ডাক্তারবাবুর মতোই ভুল করিতেছেন। আদত স্পন্দন যেখানে, যেখান হইতে প্রাণের গতি-রাগ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে স্টেথিস্কোপ না লাগাইয়া টিকি-মূলে যদি ব্যামো নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহা যেমন হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ, রাজনীতির দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিলনের চেষ্টা করাও তেমনি হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ। সত্যিকার মিলন আর স্বার্থের মিলনে আসমান-জমিন তফাৎ। প্রাণে প্রাণে পরিচয় হইয়া যখন দুইটি প্রাণ মানুষের গড়া সমস্ত বাজে বন্ধনের ভয়-ভীতি দূরে সরাইয়া সহজ সঙ্কোচে মিশিতে পারে, তখনই সে মিলন সত্যিকার হয় ; আর যে-মিলন সত্যিকার, তাহাই চিরস্থায়ী, চিরন্তন। কোনো একটা বিশেষ কার্য উদ্ধারের জন্য চির-পোষিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া বাহিরে প্রাণ-ভরা বন্ধুত্বের ভান করিলে সে-বন্ধুত্ব স্থায়ী তো হইবেই না, উপরন্তু সে-স্বার্থও সিদ্ধি না হইতে পারে, কেননা মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কখনো কোনো কার্যে পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় না।

এখন কথা হইতেছে, আদত রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়াছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোনো ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোনো ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোনো ধর্ম শুধু কোনো এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুঁৎমার্গ যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারি। মানুষের সৃষ্টি-শৃঙ্খলা বা সমাজ-বন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাশ্বত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই 'সম্ভবামি যুগে যুগে' রূপ মহাবাণীর উৎপত্তি। আমাদেরও হাদিসে সেই জন্য প্রতি শতবর্ষে একজন করিয়া 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। 'বেদাৎ' বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার করাই এই সংস্কারকদের মহান লক্ষ্য।

হিন্দু-ধর্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মতো একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ

ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে তাঁহাদের সমস্ত সামাজিক শাসনবিধি একদিনেই উল্টাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সত্য হয়তো একদিন সামাজিক শাসনের জন্যই শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তাহার কি আর মুক্তি হইবে না? বাংলার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়! মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কি মহান্ পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মতো হেয় জঘন্য এই ছুঁৎমার্গ বিধি! কি ভীষণ অসামঞ্জস্য! আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহনপূত কালাপাহাড়ের দলকে সেই জন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি; এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে, 'আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!' আমরা যে ধর্মটাকেই একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি, ইহা মনে করিলে আমাদের ভুল বুঝা হইবে। আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে, আমাদিগকে সীমার মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। নিজের ধর্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকারভাবে স্বধর্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপন হইতেই আসে। যত ছোঁয়াছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বকধার্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদিন আমরা এক ট্রেনে গিয়া উঠিলাম। আমাদের কামরায় মালা-চন্দনধারী অনেকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্থাৎ আমাদের মাথায় টুপি ও পাগড়ি দেখিয়াই ছোঁওয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা তটস্থ হইয়া অন্য দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বেঞ্চেরই এক প্রান্তে বসিয়া এক পণ্ডিতজি বেদ বা ঐরূপ শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঐ ভদ্রলোকদের শুনাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই এবং আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া হাসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ভদ্রলোকদের চক্ষু ততক্ষণে কাণ্ড দেখিয়া চড়কগাছ! আমরাও তখন সহজ হইয়া পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি পণ্ডিত ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকূলতিলক হইয়াও কি করিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, অথচ এই ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে দেখিয়া কেন একেবারে দশ হাত লাফাইয়া উঠিলেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'দেখ বাবা, আমি হিন্দু ধর্মকে ভালোবাসি ও সত্য বলিয়া জানি বলিয়া বিশ্বের সকলকে, সকল ধর্মকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। আমার নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই অন্য সকলকে বিশ্বাস করিবার ও প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি আমার আছে। যাহারা অন্য ধর্মকে ও

অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোনো ধর্ম নাই। তবে ধর্মের যে ঘটাটা দেখো, তাহা অন্তরের দীনতা–হীনতা ঢাকিবারই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র!' ইহা বানানো গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর–বিড়ালের মতো এত ঘৃণা করা—মনুষ্যত্বের ও আত্মার অবমাননা করা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা একই কথা। সেদিন নারায়ণের পূজারী বলিয়াছিলেন, 'ভাই, তোমার সে–পরম দিশারী তো হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, —সে যে মানুষ!' কি সুন্দর বুক–ভরা বাণী! এ যে নিখিল কণ্ঠের সত্য–বাণীর মূর্ত প্রতিধ্বনি! যাঁহার অন্তর হইতে এই উদ্বোধনী–বাণী নির্গত হইয়া বিশ্বের পিষ্ট ঘৃণাহত ব্যথিতদের রক্তে রক্তে পরম শান্তির সুধা–ধারা ছড়াইয়া দেয়, তিনি মহা–ঋষি, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! যদি সত্যিকার মিলন আনিতে চাও ভাই, তবে ডাকো—ডাকো, এমনি করিয়া প্রাণের ডাকে ডাকো। দেখিবে দিকে দিকে অবহেলিত জন–সঙ্ঘ তোমার এই জাগ্রত মহা–আহ্বানে বিপুল সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা মাথা কুটিয়া মরিলেও তো প্রাণের সাড়া কোথাও পাইবে না, যাহাকে পাইয়া তাহারা উল্লাসে নৃত্য করিবে তাহা বাহিরের লৌকিক 'ডিটো' দিয়া মাত্র। অন্তরের ডাক মহা–ডাক। ডাকিতে হইলে প্রথমে বেদনায়—একেবারে প্রাণের আর্ত তারে গিয়া এমনি করিয়া ছোঁওয়া দিতে হইবে। আর তবেই ভারতে আবার নূতন সৃষ্টি জাগিয়া উঠিবে।

হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা–হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া—মানব! —তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বলো দেখি, 'আমার মানুষ–ধর্ম।' দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন–সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কি বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে! এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা–যুগে একবার গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলো যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ—তুমি সত্য।

মহাত্মা গান্ধিজি ধরিয়াছেন এই মহাসত্যকে, তাই আজ বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন আনন্দের নাচ নাচিতেছে। তোমরা রাজনীতিক যুক্তি–তর্কের চটক দেখাইয়া লেখাপড়া–শেখা ভণ্ডদের মুগ্ধ করিতে পারো, কিন্তু অমন ডাকটি আর ডাকিতে পারিবে না। আমরা বলি কি, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর করো দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিন সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সে–স্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে, —মনুষ্যত্বের

কি বিপুল অবমাননা ! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ বপন করিতেছ তোমরা ! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, 'ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই !' কি ভীষণ প্রতারণা ! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল ! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে ? শুনিয়া শুধু হাসি পায়। এস, যদি পারো, তোমার স্বধর্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা রাখিয়া আকাশের মতো উদার অসীম প্রাণ লইয়া এস। এস তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু'পায়ে দলিয়া মানুষের মতো উচ্চ শিরে তোমার মুক্তবিথার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এস, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষ লইয়া। সে মহা-আহ্বানে দেখিবে আমরা হিন্দু-মুসলমান ভুলিয়া যাইব। আমাদের এই তরুণের দল লইয়া আমরা আজ কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিব। আমরাই ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিব। যে-রক্ষণশীল বৃদ্ধ এতটুকু 'টুঁ' করিবে, তাহার গর্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে তাহার টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলো। শুধু মানুষ বাঁচিয়া থাক ভাই, —ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক !

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'
—রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নূতন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না—যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সে হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত 'ছোটলোক' সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণীর লোকের অন্তর যদি দেখিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত 'ছোটলোক'-এর অন্তর কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ঐ আভিজাত্যগর্বিত তোমাদের 'ভদ্রলোকের' অন্তর মসীময় অন্ধকার। এই 'ছোটলোক' এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোট মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও-যে আমাদেরই মতো মানুষ—সেও যে সেই এক আল্লাহ্-এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে,—তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে—আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন। তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। হইবে কিরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের এই আভিজাত্য-গর্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা—(যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের জাতির প্রতি সত্যিকার ভালবাসা নাই) মনে করো কি দেশ-উদ্ধার হইবে, জাতিগঠন হইবে? তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা, জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে

উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারো, তাহাদিগকেও মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু এই সেদিনকার সত্যাগ্রহ, হরতালের কথা মনে করো দেখি, —একবার মহাত্মা গান্ধির কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি আজ ভারতে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এমনি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? তাঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই 'ছোটলোক'কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন, —সে-আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই, —সে যে ডাকার মতো ডাকো, —তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাঁহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্র বাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনো এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পারো, এমনি করিয়া ডাকো, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো—দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি, —ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমরা ভারতবাসীরাই শুধু আত্মার এত অবমাননা করিতে সাহস করি, আর তাই আমারে এই শোচনীয় অধঃপতন, —তাই বিশ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আমাদের স্থান নাই। এই আত্মার অপমানে যে সেই অনাদি অনন্ত মহা-আত্মারই অপমান করা হয়। ভয়ে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে না কি? খোদার সৃষ্টি—তাহার আনন্দের বিকাশ-স্বরূপ এই মানুষকে ঘৃণা করিবার অধিকার তোমায় কে দিয়াছে? তোমাকেই বা বড় হইবার অধিকার কে দিয়াছে, তুমি কিসের জন্য ভদ্র বলিয়া মনে করো? এসব যে তোমারই সৃষ্টি, —খোদার উপর খোদকারি। এই মহা-অপরাধের মহাশাস্তি

হইতে তোমার রক্ষা নাই, —রক্ষা নাই। মানুষের প্রতি এই যে হিংসা, দ্বেষ, তোমার দেশের, গাঁয়ের প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি এই যে অকারণ ঘৃণা, আক্রোশ, ইহাই তোমার মুখের বর্ণ কালো করিয়া দিয়াছে—তোমার চেহারায় কালি ছড়াইয়া দিয়াছে। মরিতে তো বসিয়াছ, —যদি এখনো এই মৃত হতভাগ্যদের হাত ধরিয়া না উঠিয়া একা উঠিতে যাও, তবে আরো মার খাইয়া মরিবে। কিসের পতিত ইহারা? ইহাদের প্রাণ যত উন্মুক্ত—ইহাদের অন্তর যেমন সরল, —তুমি কি সে রকম হইতে পারো? হইতে পারে অশিক্ষিত সে, কিন্তু ইহার প্রাণ তোমার চেয়ে অনেক বড়, সে প্রাণে বিরাট বিপুল শক্তি-সিংহ সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে—যদি পারো সেই শক্তিকে জাগাও।

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ ভারত-বেদীর সামনে দাঁড়াইয়া বোধন-বাঁশিতে সুর দিই—

'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!'

মুখবন্ধ

খুব সোজা করিয়া বলিতে গেলে নন-কো-অপারেশন হইতেছে বিছুটি বা আলকুশি, এবং আমলাতন্ত্র হইতেছে ছাগল! ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, এই আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা-বিছুটির জ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিছুতেই যখন জ্বলন ঠাণ্ডা হয় না, তখন ছাগ বেচারি জলে গিয়ে লাফাইয়া পড়ে, দেওয়ালে গা ঘষিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্বালা না কমিয়া আরো বাড়িতেই থাকে, উল্টো ঘষাঘষির চোটে তাহার চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম করার মতোই লোমশূন্য হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটি লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনো জলে নামিতেছেন, কখনো ডাঙায় ছুটিতেছেন, আর কখনো বা দেওয়ালে গা ঘেঁসড়াইয়া খামখা নিজেরই নুনছাল তুলিতেছেন। তবু কিন্তু জ্বলন আর থামিতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন এই আমলাতন্ত্রের ল্যাজের ডগা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত কিছুই এত অস্বাভাবিক রকমের বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে। ইহা যেন বহরমপুর বা কসৌলি প্রেরণের পূর্ব লক্ষণ। একটা গান আছে, 'ও যার কপালে আগুন ধরে, তার নাইকো কোথাও সুখ, ব্রহ্মাণ্ড বিমুখ দুখের উপর দুখ দাও তারে।' বাস্তবিক এখন এই রাজতন্ত্র ওরফে আমলাতন্ত্র মশাইয়ের 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!' কেননা অদৃষ্টের ফেরে যাহা কিছু ভাল বুঝিয়া করিতে যাইতেছেন, তাহাই মন্দ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমরা বলি কি, এ-সমস্ত নিজেরই কর্মদোষ। কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া গা চুলকাইয়া আলকুশি লাগায়, তাহার জন্য দায়ী সে নিজে—দেশের লোক এখন তাহাদের ঘরের অবস্থা সাদা চোখে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছে। ঘরে যে সিঁদেল-চোর ঢুকিয়াছে, এতদিনে তাহারা তাহা টের পাইয়া চোরের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে। এখন তাহার অপহৃত জিনিস ছাড়িয়া না দিলে সে কিছুতেই আর টুঁটি ছাড়িবে না। চোরে-গৃহস্থে দস্তুরমতো এখন এই ধস্তাধস্তি চলিতেছে! তবে চোরের সুবিধাটা এই যে, সে বেশি জোরালো, তার হাতে হাতিয়ারও আছে, আর গৃহস্থ বেচারা একেবারে নিরস্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তো প্রাণ থাকিতে ঘরের জিনিস পরকে লইয়া যাইতে দিবে না। যাক্ সেসব কথা। আমরা বলিতেছিলাম, এই আমলা বাবাজিরা এমন করিয়া আর কতদিন ছেলেমানুষি দেখাইবেন? তাঁহারা যেসব বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহার সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটি সপ্তকাণ্ড 'আমলায়ন' লিখিতে হয়। তবে সবচেয়ে

ঝাঁজালো বুদ্ধিটা দেখাইতেছেন তাঁহারা, —যাহার-তাহার যে-কোন সময়ে স্টান মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া। আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক, এই মুখবন্ধ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত?

ধরুন, দুইজন লোকের মধ্যে তর্ক হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে একজন বেশি বলবান ; কিন্তু দুর্বল বেচারার গায়ে জোর না থাকিলেও সে মনের জোর লইয়া সত্যের জোর লইয়া বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্রমেই ঘায়েল করিয়া ফেলিতেছে ; ঠিক এই সময়েই অনন্যোপায় হইয়া বলবান রাগিয়া বলিয়া উঠে, 'চুপ রও!' অর্থাৎ কিনা তোমার মুখ বন্ধ, তুমি কোনো কথাই বলিতে পাইবে না। যাহার মনের জোর নাই—সত্যের জোর নাই, সে-ই এমন করিয়া গায়ের জোরে দুর্বলকে থামাইতে চেষ্টা পায়। যদি তাহার যুক্তিযুক্তরূপে বুঝাইবার বা মনে সত্য-দাবির জোর থাকিত, তাহা হইলে গায়ের জোর দিয়া বুঝাইবার দরকার হইত না। যাহাদের মনে পাপ, তাহারা বাহিরে যতই গদাই-লশকরি চাল দেখাক, অন্তরে তাহারা খ্যাঁকশিয়ালির চেয়েও ভীরু। যেই তাহারা দেখে যে, অন্য কেউ তাহাদের আঁতে ঘা দিতেছে বা মনের পাপটাকে বাহিরে দিনের আলোতে খুলিয়া দিতেছে, অমনি তাহারা 'ঐ রে চিচিং ফাঁক হলো বলিয়া চেঁচাইয়া চিল্লাইয়া হুমকি দেখাইয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা পায়। কিছুতেই না পারিলে তখন আইনের সিল-মোহর! আজকাল ছোট দারোগা সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই এই উপায়টাকেই 'বিপদভঞ্জন মধুসূদন' রূপে জাপটিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহারা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন! কেননা ইহাতে উক্ত শ্রীমধুসূদন প্রসন্ন হইয়া ক্রমেই ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া পড়িতেছেন ; কি গেরো! 'সখি হে, কি মোর করমে লিখি?' মনে করিয়াছিলেন, এ-জলে আগুন না নিভিয়া যায় না ; কিন্তু তাহা না হইয়া আগুন ক্রমেই শিখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। ইহারা এই সোজা কথাটা বুঝিতেছেন না যে, জোর করিয়া একজনকে চুপ করাইয়া দিলে তাহার ঐ না কওয়াটাই বেশি কথা কয়। কারণ, তখন তাহার একার মুখ বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহার হইয়া—সত্যকে, ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য—আরো লক্ষ লোকের জবান খুলিয়া যায়। বালির বাঁধ দিয়া কি দামোদরের স্রোত আটকানো যায়?

সেদিন চিত্তরঞ্জনকে বলিলে, 'এখানে আমার এলাকায় টুঁ-টি করিতে পারিবে না, এমনকি এখানে 'হাঁদাইতেই' পারিবে না।' কিন্তু যেই দেখিলে অবস্থা বড় বে-গতিক, অমনি সে হুকুম বাতিল ও না-মঞ্জুর করিয়া ফেলিলে। আবার মিঃ আলী শেরওয়ানিকে আগ্রায় বক্তৃতা দিতে মানা করিয়াছ। এমন করিয়া খ্যাপা কুকুরের মতন করিয়া যেখানে-সেখানে হাবসাইলে কি হইবে? উল্টো জনসঙ্ঘ আরো খেপিয়া পাগল হইয়া উঠিবে। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, সুশীল সুবোধ বালক হও, সাধারণকে সে কথা বুঝাইয়া দাও। তাহা না হইলে অন্যায়কে ঢাকা দিয়া রাখিতে পারিবে না—পারিবে না।

জোর-জবরদস্তি করিয়া কি কখনো সচেতন জাগ্রত জনসঙ্ঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়াছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে; এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ও রকম ছেলে মানুষি চলিবে মনে করো? আমাদের বড় ভয় হয়, এ-মুখবন্ধ আমাদের নয়, তোমাদের। আশা করি আমাদের এ-ভয় মিথ্যা হইবে না!

রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন

একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবী ধ্বংস (প্রলয় বা রোজ-কেয়ামত) হইবার দিন যত দূর মনে করি, বাস্তবিক তত দূর নয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে-সব আলোচনা হইয়াছে, সেইসব লইয়াই আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইহা লক্ষ্য হইতেছে যে, দক্ষিণ পোলার প্রদেশে ভাসমান তুষারের স্তূপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এডমন্টের ক্যাপ্টেন স্মিথার্থ সর্বপ্রথম ৫৮০ ফুট উচ্চ এক তুষার-স্তূপ দেখিতে পান। অতঃপর স্কট সাহেব ৬০০ ফুটেরও উঁচু এক বরফের পাহাড় দেখিতে পান। কিন্তু এজনেটার একজন নাবিক সমুদ্রের উপরেও হাজার ফুটের বেশি উচ্চ এক পর্বত-প্রমাণ বরফ স্তূপ আবিষ্কার করেন এবং তাহাতে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়া যায়। পরে নির্ধারিত হয় যে, এই তুষার পর্বত ৯৬১২ ফুট পুরু অর্থাৎ পৌনে দুই মাইলেরও বেশি চওড়া।

দক্ষিণ বিষুবরেখায় অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-পর্বতসমূহের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। আর এই জন্যই দক্ষিণ-পোলার প্রদেশসমূহ ভয়ানক উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। উত্তর দিকস্থ বহু দূরের ভাসমান তুষারস্তূপসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অত্যধিক শীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেই শৈত্যের সঙ্গে অন্য স্থানের তুলনাই হয় না। বুইনস এরিস নামক স্থানে সম্প্রতি এক তুষার-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই দেশে আর কখনও তুষার-বৃষ্টি হয় নাই।

এসবের মানে কি? প্রফেসর লুইস ও অন্যান্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমাদের পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাপ্লাবন বা মহাধ্বংস অতি আসন্ন। যদি সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একাংশ যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাস্তি।

দক্ষিণ মেরুতে যে গগন-চুম্বী বরফের মহা আচ্ছাদন রহিয়াছে, তাহা লম্বাতে চৌদ্দ শত মাইল এবং কত শত মাইল যে পুরু তাহার ইয়ত্তাই নাই! এখন এই যে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া এই রকমে ক্রমেই অসহ্য উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহার পরিণাম কি? সকলেই জানেন বরফ গরম হইলে গলিয়া যায়। সুতরাং এখন দক্ষিণ মেরুর এই অত্যধিক উষ্ণতার দরুন সেখানের ঐ সহস্র সহস্র যোজন-ব্যাপী তুষারের মহাপর্বতসমূহ ভাঙিয়া গলিয়া যাইবে, এবং আকাশ-সমান সচল হিমালয়ের মতো তরঙ্গের রাশি চতুর্দিক ধুইয়া-মুছিয়া লইয়া যাইবে। প্রথমে এই মহা-প্লাবনে আক্রান্ত হইবে পৃথিবীর ঢালু দিক অর্থাৎ দক্ষিণ মহাদেশসমূহ।

পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধূমকেতুকে ভয়ানক ভয় করিতেন, কেননা তাঁহারা জানিতেন না যে, ধূমকেতু কি? আমাদের পরবর্তী পিতাগণ এ-সম্বন্ধে বেশি জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ধূমকেতুকে অত্যন্ত ভয় করিতেন ও অলক্ষুণে মনে করিতেন। কারণ, তাঁহারা মনে করিতেন এইসব ধূমকেতুর মস্তক নিরেট, সুতরাং পৃথিবীর এত নিকটে আসার দরুন যদি তাহার সহিত দৈবক্রমে পৃথিবীর সংঘর্ষ হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে!

এখন আমরা জানিতে পারি, ধূমকেতু নিরেট শক্ত নয়, উহা কুয়াশার মতো নীহারময়। সুতরাং যদি দৈবক্রমে এক-আধটা ধূমকেতুর পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষও হইয়া যাইত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা পৃথিবীর কোনো অংশ গভীর গর্তও হইয়া যাইত না, বা ইহা আমাদিগকে পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে ছুঁড়িয়া দিতেও সক্ষম হইত না।

কিন্তু ফ্রান্সের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মঁসিয়ে ক্যামিল্লি ফ্লামারিয়ন সাহেব এক বিভীষিকাময় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহা এই যে, ধূমকেতুর ঐ যে নীহারময় পুচ্ছ তাহা বিষাক্ত গ্যাসে ভরপুর। সেই জন্য ধূমকেতু যদি একবার পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিতে পারে, তাহা হইলে ঐ বিষাক্ত গ্যাসে সমস্ত পৃথিবী এক নিমেষে প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে, তাহার রূপ-রস-গন্ধ চিরদিনের তরে ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইয়া যাইবে!

ধূমকেতুর সৃষ্টির রাসায়নিক ব্যাখ্যা এখনও সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় নাই, কিন্তু ইহা সহজে সকলে বুঝিতে পারেন যে, ধূমকেতু ইহার পুচ্ছে নিশ্চয়ই গ্যাস ভরিয়া রাখে। এই গ্যাস অনায়াসে আমাদের পৃথিবীর বাতাস হইতে যবক্ষারজান শুষিয়া লইতে পারে; এবং তাহা হইলে যেদিকে যাও সেই দিকেই মরণ আর কি! সাধে কি আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই জিনিসটাকে এত অপছন্দ করিতেন! কথায় বলে, 'ধূমকেতুর মতো সে এসে আমার অদৃষ্টে উদয় হলো!' পৃথিবীর অদৃষ্টেও ধূমকেতু বাস্তবিকই অলক্ষুণে বা অমঙ্গলজনক।

যাক, যদি ইহা যবক্ষারজান বাতাস হইতে শুষিয়া লয়, তাহা হইলে আমরা শুধু অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্পই পাইব। সত্য বটে যে, অম্লজান বাষ্প রক্তসঞ্চালন এবং মানসিক ও শারীরিক কর্মপটুতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাই বলিয়া শুধু অম্লজান বাষ্প আবার ভয়ানক মারাত্মক। সুতরাং নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু উত্তেজক অম্লজান বাষ্প পাইয়া আমাদের শরীর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং ক্রমে আমরা জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইব।

কয়লা-যুগের সময় এই পৃথিবীর বাতাস কার্বনিক এসিডের দরুন ভারি ছিল। সে-সময় সে-বাতাস মানুষে সহ্য করিতে পারিত না। কেবল মৎস্য ও সরীসৃপ জাতীয় জীববৃন্দ স্রোতময় জলাভূমিতে ও নিশ্চল বাতাসে বাঁচিয়া ছিল। ক্রমশ উদ্ভিদ ও গাছ-গাছড়ার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষাক্ত নিশ্চল বাতাস দূর হইয়া যাইতে লাগিল, আকাশ পরিষ্কার হইল এবং এইরূপে এই বাতাস উষ্ণ রক্তময় জীবের উপযোগী হইয়া উঠিল।

বর্তমানে মানবজাতি কয়লা খনন কার্যে ও তাহার সাহায্য গ্রহণে বিষম ব্যস্ত। এই কয়লা কখনকার জানেন কি? ইহা ঐ বহু লক্ষ যুগ পূর্বের কার্বনিক এসিড-ভরা বাতাসের কালের এবং এই কয়লা সেই সময়কার গাছ-গাছড়ারই পরিণতি হইতে পারে, কেননা বনের গাছ-গাছড়াই এখনো ঐ কার্বনিক এসিড শোষণ করিতে ওস্তাদ।

প্রত্যেক কয়লার চাপ ও প্রত্যেকটি দেশলাই যাহা জ্বালানো হয়, তাহা প্রত্যহ আমাদের দরকারি অম্লজান বাষ্প নিঃশেষ করিতেছে।

একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, জগতের অম্লজান ক্রমশই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, এবং বাতাসও সেই জন্য ক্রমেই কলুষিত হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং সেদিন আগতপ্রায়—যেদিন পৃথিবীর সমস্ত কিছু কার্বনিক এসিডময় যুগের জীবে পরিণত হইয়া যাইবে।

মানুষ ক্রমেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইতে হইতে শেষে লিলিপুটিয়ানদের মতো হইয়া পড়িবে, তারপর একেবারেই নেস্তনাবুদ! তারপর আদির মতোই অন্ত! অর্থাৎ প্রথমে যেমন মৎস্য আর সরীসৃপ জাতিই ছিল, পরেও তেমনি য়্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহা-মৎস্য আর মহা-সরীসৃপ অবতারগণ বহাল খোশ-তবিয়তে বিরাজ করিবেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খুব সরু লম্বা ঘৃণ্য সরীসৃপ জাতিও—যেমন কি কেঁচো সাপ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আবার আমাদের টিপেয় রাজত্ব করিবে।

যদি মানবজাতি বর্তমানের এই অনিষ্টকারী কয়লার মহা-খরচা ছাড়িয়া দেয় (শুধু কয়লা জ্বালানোর জন্যই বৎসরে ১৬০০ মিলিয়ন টন অম্লজান বাষ্প নষ্ট হইতেছে!) এবং তৎপরিবর্তে ইলেকট্রিক দিয়া কয়লার কাজ চালাইয়া লয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার আর এক নূতন বিপদের মুখ-গহ্বরে পড়িতে হইবে! অর্থাৎ যেদিকেই যাও, নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ!

আগে হইতে আবহাওয়ার ক্রম-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। বজ্রাঘাত—বিশেষ করিয়া শীতকালে বজ্রপতন—ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর ইহার একদম সোজা কারণ রহিয়াছে যে, পৃথিবীর আর বাতাসের ইলেকট্রিসিটি ঠোকা-ঠুকির দরুনই এই বজ্র উৎপাতের সৃষ্টি! তাহা হইলে কঃ পন্থা? সেই জন্যই বুঝি পান্নাময়ী আগে হইতেই গাহিয়া রাখিয়াছে, 'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয়ই মরিব!!'

আচ্ছা ধরুন, যদি বায়বীয় ইলেকট্রিসিটির উপরে বর্তমান অপেক্ষা শত বা সহস্র গুণ ভার চাপানো হয় তাহা হইলে আর কি বসন্তে ফুল ফুটিবে—কচি পাতা গজাইবে? আর কি তবে বর্ষার ব্যাকুল বরিষণ পৃথিবীর বক্ষ সিক্ত করিবে? না গো না! তার বদলে বজ্র-পতনই হইবে আমাদের পৃথিবীতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রোজ শত শত বজ্রপাতে পৃথিবী ছিন্নাভিন্না হইয়া যাইবে। একজন ধুরন্ধর উল্কাতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হাঁ, হাঁ, তাহাই হইবে অবশেষে! কি ভয়ানক! আমাদের এখন উচিত যে, আমরা সবাই মিলিয়া প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া বিশ্বাস করি, ও-ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা এবং তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। ঐ যে আমাদের আলোকদাতা সবিতা সূয্যিমামা, —উনি শুধু যে আলো আর উষ্ণতারই সৃষ্টি করেন তা নয়, তিনি ইলেকট্রিক শক্তিরও জনক। আর এই

আমাদের একমাত্র মামা যিনি প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় অজানা শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সব দিক সমঝাইয়া চলিবেন। মামা জীবতু !

বর্তমান সূয্যিমামার ক্ষমতা এত উগ্র প্রচণ্ড যে, যদি এঁর সমস্ত রশ্মি আর উগ্রতা শুধু আমাদের এই গরিব পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে মাত্র দেড় মিনিটের মধ্যেই ঐ যে আগে মহামহা বরফ-পর্বতের কথা বলিয়াছি, সে সমস্তই গলিয়া টগবগ করিয়া ফুটিত ; এবং আর এগারো সেকেন্ড থাকিলে দুনিয়ার এত বড় সমুদ্র, সমস্ত শুকাইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া হাঁ করিয়া থাকিত।

কিন্তু সূয্যিমামাও দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া চলিয়াছেন। দৈনিক কতটুকু করিয়া যে তাঁহার বর-বপুর সঙ্কোচন হইতেছে তাহা এখনো জানা যায় নাই। প্রফেসর বার্নস জোরের সঙ্গে বলেন যে, সূয্যিমামার এই সঙ্কোচন বড় জোরেই চলিতেছে। এত জোরে যে আমরা তাহার একটা মোটামুটি ধারণাও করিতে পারি না। অতি অল্প কালের মধ্যেই সূর্যের উত্তাপের কম্‌তি দেখিয়া বুঝিতে পারিব যে, সত্যি-সত্যিই সূর্য ছোট হইয়া যাইতেছে কি-না।

এই রকম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে যখন সূয্যিমামা পটল তুলিবেন, অর্থাৎ তাঁহার আর অস্তিত্বই থাকিবে না, তখন যে দুর্দশা হইবে পৃথিবীর, তাহার চিন্তাও মহা-ভয়ানক ! যত জল জমিয়া একেবারে পাথরের চেয়েও শক্ত হইয়া উঠিবে, কিন্তু দেখিতে হইবে খাসা—একেবারে হীরের টুকরোর মতন জ্বলজ্বলে ! এই যে বাতাস যাহাকে এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা তখন বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটার মতো হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। এই সব আবার গহ্বরে গহ্বরে জমিয়া কাঁচের চেয়েও স্বচ্ছ সরোবরে পরিণত হইবে, কিন্তু তাহাতে ঢেউ খেলিবে না, শুধু নির্বিকার, প্রশান্ত ! কেননা তখন বাতাসই যে বহিবে না। সমস্ত পৃথিবী তখন নির্দয় শীতের প্রকোপে জমিয়া স্থির নিশ্চল হইয়া যাইবে। শুধু নীহারিকা আর অস্পষ্ট কুয়াশা।

সূর্য আস্তে আস্তে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, আবার সারাদিন অম্‌নি রক্তবর্ণ থাকিবে। ঠিক যেন আধো-নির্বাপিত একটা জ্বলন্ত গলিত লৌহপিণ্ড ! দিনেই তখন সমস্ত আকাশ আরো উজ্জ্বল তারায় ভরিয়া উঠিবে ! আল্লাহু আকবর !

বাঙালির ব্যবসাদারি

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কথাটা যেমন দিনের মতো সত্য, 'বাণিজ্যে বসতে মিথ্যা' কথাটা তেমনি রাতের মতোই অন্ধকার। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না করিতে পারিলে জাতির পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, সত্যের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিলে বাণিজ্যের পতনও আবার তেমনি অবশ্যম্ভাবী। মদকে মদ বলিয়া খাওয়ানো তত দোষের নয়, যত দোষ হয় মদকে দুধ বলিয়া খাওয়ানোতে। দুধের সঙ্গে জল মিশাইয়া বিক্রি করিলে লাভ হয় যত, প্রবঞ্চনা করার পাপটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। একটা জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা যত বড় হয় হউক, কিন্তু প্রবঞ্চনা বা মিথ্যার বিনিময়ে যেন তাহার জাতীয় বিশ্বস্ততা আর সুনাম বিক্রি করিয়া সে ছোট না হইয়া বসে। ভণ্ড লক্ষপতি অপেক্ষা দরিদ্র তপস্বী ঢের ভালো। হাঁ, এখন কথা হইতেছে—বাণিজ্য দ্বারা আমরা স্বজাতির নাম করিব, স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিব, না—অন্য বড় জাতির নাম দিয়া নিজের নাম ভাঁড়াইয়া বড় হইয়া বড় জাতিরই তেলা মাথায় তেল ঢালিব? কথাটা একটু খোলাসা করিয়া বলি।

আমাদের বাঙালিদের হিন্দু-মুসলমান অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বেশ একটু ঝোঁক দিয়াছেন, সেটা খুব মঙ্গলের কথা। তবে ইহার মধ্যে অমঙ্গলের কথা হইতেছে এই যে, ইহাদের অনেকেই নিজের বা স্ব-জাতির নাম ভাঁড়াইয়া ইংরাজি নামে নিজের নূতন নামকরণ করিতেছেন! কি সুন্দর মৌলিকতা! যিনি অতটা না করেন তিনি আবার নিজের পৈতৃক নামটাকে বিপুল গবেষণার সহিত বহু কসরৎ করিবার পর এমন একটি অস্বাভাবিক অশ্বডিম্বে পরিণত করিয়া বসেন, যাহা আমাদের পূর্ব বা পরপুরুষের কোনো ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন না, ইনি কিনি? এইরূপে কৃষ্ণকে ক্রিস্টো রূপে বাজারে বসাইয়া কতটা সুবিধা হয় জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে অসুবিধাটাই হয় বেশি। শুনিয়াছি, এই রকম কালা চামড়ায় সাদা পালিশ বুলাইলে নাকি দুই একজন শ্বেতদ্বীপবাসী বা বাসিনী ভুলক্রমে ঐ দোকানে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আসল ব্যাপার বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তেই সওদা করিয়া চলিয়া যান; কিন্তু এই প্রতারণা ধরা পড়িলে যে আবার অনেকে মুখের উপরেই দোকানদারকে প্রবঞ্চক ভণ্ড বলিয়া মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন, এটাও সত্য! অনেকে ভদ্রতার খাতিরে বাহিরে কিছু না বলিলেও মনে মনে দেশীয় দোকানদারের এই ক্ষুদ্রত্বের নিন্দা না করিয়া পারেন না। আর নাম ভাঁড়াইয়া কোনো কাজ করিবার পর আসল নামটা প্রকাশ হইয়া গেলে কেহ যদি মুখের উপরেও গালাগালি করে, তাহা নির্বিকার চিত্তে হজম করা ভিন্ন কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু, দ্বারে আসল নামটা

লেখা থাকিলে অন্তরের বাহিরের এ-সব কোনো বিড়ম্বনাই আর সহ্য করিতে হয় না। তাছাড়া, এই রকম কালার গায়ে সাদার দাগ লাগাইয়া লাভও যে খুব বেশি হয় তাহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ ইহাতে এই রকম দোকানদারগণ যেমন দু-একটি বিদেশি খরিদ্দার পান, তেমনি আবার অনেকগুলি স্বদেশি খরিদ্দারও হারান। কেননা আমাদের দেশের শহরের সোজা বা পাড়াগাঁয়ের ভদ্র মাঝারি লোকে সহজে সাহেবের দোকান মাড়াইতে চান না। ইঁহাদের কেহ বা ওসব বিজাতীয় হাঙ্গামের মধ্যে যাইতে চান না, কেহ বা স্বদেশি দোকানেই জিনিস কিনিতে ভালবাসেন, আবার কেহ বা নানান দিক দিয়া নিজের দীনতা ধরা পড়িবার ভয়েই ওসব দোকানে যান না।

আমাদের অনেক দেশীয় লোকের আবার একটা ধারণা এই যে, সাহেবের দোকানের জিনিসের দাম দেশীয় দোকানের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই বেশি দামে দুই চারিটা জিনিস সাহেবদের বিক্রি করিতে পারিলেও অন্য দিক দিয়া এসব দোকানের অনেক ক্ষতি। সাহেব খরিদ্দারগণ বেশি দামে দামি জিনিস কিনিলেও তাঁহারা সংখ্যায় কম। সে অনুপাতে কম-দামি জিনিসের ক্রেতা বহু দেশীয় লোকের অপেক্ষা বেশি টাকার জিনিসও দোকানে বিক্রি হয় না। অথচ, যদি দেশীয় দোকানদার বাণিজ্যে পসার করিয়া একবার সুনাম অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে বহু বিদেশি বা সাহেব-খরিদ্দার আপনিই জুটিয়া যাইবে। এই ধরুন, আমাদের বটকৃষ্ণ পালের কথা। ইনি অনায়াসেই নিজের পৈতৃক নাম কাটছাঁট করিয়া অন্তত 'মন্টোক্রিস্টো পল' হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ে যদিই বা পসার হইত, কিন্তু সকলের নিকট এত নাম হইত না, এবং আমরা গর্বের সহিত একজন বাঙালি ব্যবসায়াভিজ্ঞ লোকের নাম যেখানে-সেখানে উদাহরণস্বরূপ পেশ করিতেও পারিতাম না। বে-নামিতে যে দু-একজন বাঙালি ব্যবসাদার বেশ একটু পসার করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা বাঙালি বলিতে সঙ্কোচ করি, লজ্জা হয়। কেননা তাঁহারা নিজেই সর্বপ্রথমে নিজের বাঙালিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ইহারা হইয়া পড়িয়াছেন বাদুড়ের মতন—না পাখি, না পশু!

তাহা ছাড়া, ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা নয় কি? ইহাতে নিজেকে, দেশকে, জাতিকে ছোট করিয়া দেখা হয় না কি? নিজের কৃতিত্বে দেশের লোকের সুনামে, জাতির আত্ম-বিশ্বাসে আমাদের নিজের লোকেরাই কত বেশি হেয় ক্ষুদ্র ধারণা পোষণ করে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেন, আমরা কি জগতের এতই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জীব যে, আমাদিগকে আমাদের নিজ সত্যিকার পরিচয় লুকাইতে হইবে? আমরা কি এতই অমানুষ, এবং যাহাদের নামের দৌলতে এই জঘন্য অর্থ-লাভ তাহারাই কি এত মস্ত মানুষ? দেখিয়াছি, অনেকে তথাকথিত নীচ বংশে জন্ম বলিয়া নিজের পিতৃপুরুষের পরিচয় গোপন করে, কিন্তু তবু সে শান্তি পায় কি? লোকে তাহার এই মিথ্যা মুখোশে বরং আরো টিটকারি দেয় না কি? সে নিজের অন্তরেই নিজে লজ্জাতুর ছোট হইয়া যায় না কি? তাহার চেয়ে তাহার গৌরব করিবার ছিল, যদি সে বুক ফুলাইয়া তাঁহার পিতৃ-পুরুষের পরিচয় দিয়া নিজের কৃতিত্বে আপন মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারিত যে, জন্মটা কিছুই নয়—পুরুষকারই হইতেছে আসল জিনিস। তাহাতে তাহার নিজের

অন্তরেও সে বল পাইত, আনন্দ পাইত এবং অন্যেও তাহার নির্ভীকতার, মনুষ্যত্বের কাছে সসম্মানে মাথা নত করিত। আমরা আজ ভারতে এক অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিতে চলিতেছি, আর আজো যদি আমাদের আত্মসম্মান না জাগে—আজো যদি আমরা আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের জোরে মাথা উঁচু করিয়া বিশ্বের মুক্ত-পথে চলিতে না পারি, তবে আমাদের জাতি-গঠন তো দূরের কথা, মুক্ত-দেশের অন্যে এ-কথা শুনিলে মাথায় টোক্কর লাগাইয়া বলিয়া দিবে যে, আগে মাথা উঁচু করে চলতে শেখো।

যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা এখন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু যাঁহাদের সাহস আছে, আত্মসম্মান আছে, জাতিকে যিনি বড় করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার উচিত এখ্খুনই এ-মিথ্যা মুখোশটাকে দূর করিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া নিজের বিশ্বাসে নিজের কৃতিত্ব কর্মকুশলতা ও পৌরুষের পুঁজি লইয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে দাঁড়ানো। তাহাতে তাঁহার নাম, তাঁহার দেশের নাম, তাঁহার জাতির নাম। আর সবচেয়ে বড় জিনিস তাঁহার নিজের অন্তরের শান্ত পূত মহাতৃপ্তির, অপূর্ব আত্মপ্রসাদের বিপুল গৌরব।

এই জাতীয়তার যুগে, এই নিজেকে সত্য বলিয়া জানার সাহসী কালেও ঐ পুরানো বিশ্রী অভিনয়ের হেয় অনুকরণ বলিয়া আমরা এত কথা বলিলাম। ডোম যদি ডোম বলিয়া সসঙ্কোচে পথ ছাড়িয়া আমাকে দীর্ঘ গোলামি সালাম ঠুকে, তাহা হইলে স্বতই তাহার প্রতি আমার একটা উঁচু-নিচুর ভাব আসে, কিন্তু সে যদি ডোম বলিয়া পরিচয় দিয়া সহজ হইয়া আমার পথে মানুষের মতো দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে বাহিরে আমি অভ্যাসবশত যতই ক্ষুব্ধ হই, অন্তরে তাহার আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্বজ্ঞানকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি না। সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচু-নিচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব-মানবতার যুগে যিনি এমনই করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি—তাঁহাকে নমস্কার করি।

হাঁ, —ব্যক্তিত্বের দিক ব্যতীত দেশীয় লিমিটেড কোম্পানিগণও তাহাদের ম্যানেজিং এজেন্টের কল্পিত ইংরেজি নাম রাখিয়া লোকের চক্ষু ধুলা দিতেছেন। কি বিশ্রী প্রতারণা ! কি ঘৃণ্য অধঃপতন !

আজ আমরা তাঁহাকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, তাঁহারই পায়ের ধুলা মাথায় লইব, —তিনি মুচি, ডোম, হাড়ি, যেই হউন—যিনি মহাবীর কর্ণের মতো উচ্চশিরে সর্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন, 'আমি সূতপুত্রই হই, আর যেই হই, আমার পুরুষকারই আমার গৌরব, আমার মনুষ্যত্বই আমার ভূষণ !'

আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন ?

এ-প্রশ্নের সর্বপ্রথম উত্তর, আমরা চাকরিজীবী। মানুষ প্রথম জন্মে তাহার প্রকৃতিদত্ত চঞ্চলতা, স্বাধীনতা ও পবিত্র সরলতা লইয়া। সে-চঞ্চলতা চির-মুক্ত, সে-স্বাধীনতা অবাধ-গতি; সে-সরলতা উন্মুক্ত উদার। মানুষ ক্রমে যতই পরিবারের গণ্ডি, সমাজের সঙ্কীর্ণতা, জাতির—দেশের ভ্রান্ত গোঁড়ামি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহার জন্মগত মুক্ত প্রবাহের ধারা সে হারাইতে থাকে, ততই তাহার স্বচ্ছপ্রাণ এইসব বেড়ির বাঁধনে পড়িয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিতে থাকে। এ-সব অত্যাচার সহিয়াও অন্তরের দীপ্ত স্বাধীনতা ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু পরাধীনতার মতো জীবন-হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই। অধীনতা মানুষের জীবনী-শক্তিকে কাঁচা-বাঁশে ঘুণ ধরার মতো ভুয়া করিয়ে দেয়। ইহার আবার বিশেষ বিশেষত্ব আছে, ইহা আমাদিগকে একদমে হত্যা করিয়া ফেলে না, তিল তিল করিয়া আমাদের জীবনী-শক্তি, রক্ত-মাংস-মজ্জা, মনুষ্যত্ব বিবেক, সমস্ত কিছু জোঁকের মতো শোষণ করিতে থাকে। আখের কল আখকে নিঙড়াইয়া পিষিয়া যেমন শুধু তাহার শুষ্ক ছ্যাবা বাহির করিয়া দিতে থাকে, এ-অধীনতা মানুষকে—তেমনি করিয়া পিষিয়া তাহার সমস্ত মনুষ্যত্ব নিঙড়াইয়া লইয়া তাহাকে ঐ আখের ছ্যাবা হইতেও ভুয়া করিয়া ফেলে। তখন তাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও ভালমন্দ বুঝাইতে পারা যায় না। আমাদেরই হইয়াছে তাহাই। আমাদিগকে কোনো স্বাধীন-চিত্ত লোক এই কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেই তাই আমরা সাফ বলিয়া দিই, 'এ-লোকটার মাথা গরম !'

সারা বিশ্বে বাঙালির এই যে সকল দিকেই সুনাম, কিন্তু তবুও আমরা কেন এমন দিন-দিন মনুষ্যত্ব বর্জিত হইয়া পড়িতেছি? কেন ভণ্ডামি, অসত্য, ভীরুতা, আমাদের পেশা হইয়া পড়িয়াছে? কেন আমরা কাপুরুষের মতো এমন দাঁড়াইয়া মার খাই? ইহার মূলে ঐ এক কথা, আমরা অধীন—আমরা চাকরিজীবী। দেখাইতে পারো কি, কোন জাতি চাকরি করিয়া বড় হইয়াছে? আমরা দশ-পনর টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব, তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্বই আমাদিগকে এমন ছোট হীন করিয়া তুলিতেছে। যে দশ টাকা পায়, সে যদি পাড়াগাঁয়ে গিয়া অন্তত মুদি, ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে, তাহা হইলেও সে বিশ-পঁচিশ টাকা অনায়াসে উপার্জন করিতে পারে। ইচ্ছা থাকিলেও উপায় হয়, আদতে আমরা ইচ্ছাই করিব না, চেষ্টাই করিব না, হইবে কোথা হইতে? যে-জাতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প যত বেশি, সে-জাতির মধ্যে স্বাধীন-চিত্ত লোকের সংখ্যা তত বেশি, আর কাজেই যে-

জাতির জনসঙ্ঘের অধিকাংশেরই চিত্ত স্বাধীন, সে জাতি বড় না হইয়া পারে না। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি।

আমরা আজ অনেকটা জাগ্রত হইয়াছি, আমরা মনুষ্যত্বকে একআধটুকু বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের এ মনুষ্যত্ব-বোধ, এ-শক্তি স্থায়ী হইতেছে না, শুধু ঐ চাকরি-প্রিয়তার জন্য। সোডা-ওয়াটারের মতো আমাদের শক্তি, আমাদের সাধনা, আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমিষে উঠিয়াই থামিয়া যায়, শোলার আগুনের মতো জ্বলিয়াই নিভিয়া ছাই হইয়া যায়। আমরা যদি বিশ্বে মানুষ বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, তবে আমাদের এ-শক্তিকে, এ সাধনাকে স্থায়ী করিতে হইবে, নতুবা 'যে তিমিরে সে-তিমিরে।' এবং তাহা করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদিগকে চাকরি ছাড়িয়া পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেখিয়াছ কি চাকরিজীবীকে কখনও স্বাধীন-চিত্ত সাহসী ব্যক্তির মতো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে? তাহার অন্তরের শক্তিকে যেন নির্মমভাবে কচলাইয়া দিয়াছে, ঐ চাকরি, অধীনতা, দাসত্ব। আসল কথা, যতক্ষণ না আমরা বাহিরে স্বাধীন হইব, ততক্ষণ অন্তরের স্বাধীন-শক্তি আসিতেই পারে না।

কালা আদমিকে গুলি মারা

একটা কুকুরকে গুলি মারিবার সময়ও এক আধটু ভয় হয়, যদিই কুকুরটা আসিয়া কোনো গতিকে গাঁক করিয়া কামড়াইয়া দেয়! কিন্তু আমাদের এই কালা আদমিকে গুলি করিবার সময় সাদা বাবাজিদের সে-ভয় আদৌ পাইতে হয় না। কেননা তাহারা জানে যে আমরা পশুর চেয়েও অধম। একবার এক সাহেবের গুলির চোটে আমাদের স্বগোত্র এক কালা আদমি মারা যায়, তাহাতে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'কৌন্ মারা গিয়া?' একজন আসিয়া বলিল, 'এক দেহাতি আদমি হুজুর!' সাহেব দিব্যি পা ফাঁক করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওঃ হাম সম্‌ঝা থা, কোই আড্‌মি!' অর্থাৎ ঐ গ্রাম্য বেচারা সাহেবের বিড়াল-চোখে মানুষই নয়। মনুষ্যকে এত বড় ঘৃণা করিতে আর কেহ কোথাও পারে কি-না, জানি না। ইহার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে জালিয়ানওয়ালাবাগে ও অন্যান্য স্থানে। আবার এই সেদিনও তাহারই পুনরাভিনয় হইল কালীকটে। নিরস্ত্র জনসঙ্ঘ—যাহাদের হাতে একটু বে-মানানসই বংশখণ্ড দেখিলেও অস্ত্র-আইনের কব্জায় আসে, তাহাদিগের প্রতি গুলি চালাইয়া কি ঘৃণ্য কাপুরুষতাই না দেখাইতেছে এই গোরার দল! কিন্তু এ-সব বর্বরতার জন্য দায়ী কে?

খোদ কর্তাই নন কি? এই 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়' নীতিকে কি গবর্নমেন্টই প্রশ্রয় দিতেছে না? এই সব মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত খুন-খারাবি যে যত করিতে পারিবে, তার তত পদোন্নতি, তত চাপরাশ বৃদ্ধি সরকারের দরবারে। অথচ সাধারণকে বলা যাইতেছে, দোষ আমাদের নয় ইত্যাদি। যদি তাই হয় তবে এই অবাধ হত্যা—নিরস্ত্র নির্দোষ জনসঙ্ঘের উপর হাসিতে খেলিতে গুলি চালানো ব্যাপারটাকে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে গবর্নমেন্ট তাহাতে বাধা দেয় কেন? বা সাধারণের কথায় কর্ণপাতই বা করে না কেন? এই একগুঁয়েমির জন্যই তো আজ এমন করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত একটা বিপুল কম্পন শুরু হইয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পনকে চাপা দিয়া রাখিবার ক্ষমতা আর স্বেচ্ছাতন্ত্রের নাই। তেত্রিশ কোটি মানুষকে অবহেলা করিয়া, ঘৃণা করিয়া তিন শত লোক তাহাদিগকে চাবুক মারিবে এবং তাহারা তাহা সহিয়া থাকিবে, সে দিন আর নাই। নেহাৎ অসহ্য না হইয়া পড়িলে মানুষ বিদ্রোহী হয় না। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ যে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণায় তবে অশান্তিকে বরণ করিয়া লয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না। এখন মনুষ্যত্ব না জাগুক, অন্তত এই পশুত্বটুকুও আমাদের মনে জাগিয়াছে যে মনুষ্যত্বের অপমান সহার মতো পাপ আর নাই। এ-শিক্ষাও আমাদের ঠেকিয়া শিখিতে হইতেছে।

আমাদের সব কথাই ভুয়ো—কর্তাদের নিমক-হালাল ছেলেগুলির কাছে। এই সেদিন মিঃ শাস্ত্রী একটা সোজা কথা লাট-দরবারে পেশ করিয়াছিলেন যে, লোকগুলোকে মারিবার সময় একটু বুঝিয়া-শুঝিয়া মারিও। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী! বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আরজি বাতিল ও না-মঞ্জুর হইয়া গেল। কালা আদমিকে মারিবে, তাহার আবার বুঝিয়া-শুঝিয়া কি? ইচ্ছা হইল, না,—বাস্, চালাও গুলি! মিঃ শাস্ত্রী সাতটি কথা পেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার যে-কোনোটি সম্বন্ধে সরকারের অতি বড় নিমক-হালালেরও কোন কিছু বলিবার ছিল না। অন্তত আমরা তাহাই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু 'লোকদিগকে আগে সাবধান করিয়া দিয়া তবে গুলি ছুঁড়িবে'—উপদেশটি ব্যতীত আর প্রায় সব ক'টিই নাকচ হইয়া গিয়াছে। মিঃ শাস্ত্রীর পাণ্ডুলিপিতে মোটামুটি এই কথা ক'টি ছিল : প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে লিখিত হুকুম লইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেট না থাকিলে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হুকুম দিবেন, কিন্তু সকল দায়িত্ব তাঁহার এবং তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, গুলি না চালাইলে বহু প্রাণহানি ও ক্ষতি হইত ইত্যাদি। আরো কয়েকটি এই রকম সহজ কথা। কিন্তু কালা আদমি মারিতে এত সব বাঁধাবাঁধি নিয়ম-কানুন! বাপ! বলে কি? অতএব মিঃ শাস্ত্রীর কথা এক ফুঁয়ে উড়িয়া গেল!

আর, শুধু এ সাদাকেই দোষ দেওয়া বৃথা। দোষ আমাদেরই। কিন্তু সে সব বলিতে গেলে সাদা দাদারা ভয়ানক রকমের চটিতং হইয়া যাইবেন এবং ক্রমান্বয়ে আমাদের মুখ বন্ধ, (হাত বন্ধ তো আছেই!) পা বন্ধ—শেষকালে কাঁচা মুণ্ডটাও খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন! 'হক কথায় আহম্মক রুষ্ট'—তাই আমাদের অতি সোজা কথাটাও আইন বাঁচাইয়া বাঁকা-টেরা করিয়া বলিতে হয়। আজো সাদাদের এই গুলি মারা লইয়া কিছু বলিবার দরকার নাই। তবে, আমাদের ক্রন্দন ব্যর্থ হইতেছে না। এই যে মানুষের ব্যথিত মনের অভিশাপ, ইহা অন্তরে অন্তরে তোমাদিগকে পিষিয়া মারিতেছে। তোমাদের বিবেককে, মনুষ্যত্বকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই গুলির সমস্ত গুলিই তোমাদেরই হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়া তোমাদিগকে পচাইয়া মারিবে। আমরা জাগিতেছি—আমরা বাঁচিতেছি,—তোমরা মরিতেছ, তোমরাই ধ্বংসের পথে চলিয়াছ!

শ্যাম রাখি না কুল রাখি

বিহারের শাসনকর্তা লর্ড সিংহ বাহাদুর ভয়ানক মুশকিলে পড়িয়া গিয়াছেন। ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা গোছ। ছাড়িতেও পারেন না, গিলিতেও পারেন না। সহযোগিতাবর্জন আন্দোলন বিহারে যে রকম জোরে চলিতেছে, সেরূপ আর কোথাও নয়। মহাত্মা গান্ধিও এই লইয়া সেদিন 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' বিহারের জোর প্রশংসা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বিহার গবর্নমেন্ট দস্তুরমতো বে-সামাল হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা ইহার ছোট শাসন-কর্তারা রাগের বা ভয়ের চোটে যখন তখন যা-তা করিয়া বসিতেছেন। সেদিন পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার উকিলদিগকে ধমকাইতে গিয়া অপ্রতিভের এক-শেষ হইয়াছেন। তারপর মহকুমায়-মহকুমায়, জেলায়-জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে রকম সৃষ্টিছাড়া হুকুম জারি করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, বাস্তবিকই এবার তাঁহারা চটিয়াছেন। মদের উপকারিতা লইয়া যে সরকারি ইস্তাহার জারি হইয়াছিল, তাহার কেলেঙ্কারি আর বলিলাম না। লর্ড সিংহ বাহাদুর বড় অসময়ে লাট ও শাসনকর্তা হইয়াছেন। এখন তিনি দেশের লোকের মন যোগাইয়া চলিতে পারেন না, আবার তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিয়া বসেন! দেশের লোক এখন যাহা চায়, তাহাও যদি আবার তিনি বিনা বাধায় চলিতে দেন, তাহা হইলে তো আবার তাঁহাকে একদিনেই পাততাড়ি গুটাইতে হয়।

আর তাহা ছাড়া দেশের লোকের বর্তমান দাবি-দাওয়া পূর্ণ করাও তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে। একটা প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে আমরা যতটা স্বাধীন মনে করি, আসলে তিনি ততটা স্বাধীন নন। তিনিও প্রকারান্তরে শুধু তাঁহার উপরওয়ালারই হুকুম তামিল করেন, বলা যাইতে পারে। কাজেই বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, দেশের লোকে তাঁহার উপর বিষম চটিয়া উঠিতেছে এবং নানান রকমের টীকাটিপ্পনীও কাটিতেছে! এ-হুলের বিষ-জ্বালা তাঁহাকে অতি কষ্টে নীরবেই সহ্য করিতে হইতেছে। কেননা আমরা ছেলেবেলায় পদ্য পাঠে পড়িয়াছি, 'অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়, সাপের মাথায় যেন ব্যাঙে প্রহারয়!' কিন্তু ইহাতে তাঁহার দুঃখ-কষ্ট অনুভব করা উচিত নয়। কেননা সর্বপ্রথম দেশীয় শাসনকর্তা বলিয়া দেশের লোক তাঁহার নিকট অনেক কিছু আশা করিয়াছিল। কিন্তু কর্মের বা গ্রহের ফেরে সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। এখন তিনি দেশের লোককে সন্তুষ্টও করিতে পারেন না এবং খুব কষিয়া কড়া শাসন চালাইয়া তাহাদিগের মুখবন্ধ বা তাহাদের দোরস্ত করিতেও পারেন না। কেননা বেশি জোর-জবরদস্তি করিলে দেশের লোক

আরো বেশি ক্ষেপিয়া উঠিবে। মানুষের চামড়া কিছু গণ্ডারের চামড়া নয়, অতএব দেশ–ভাই–এর এ–আঘাত হয়তো তাঁহার গায়ে দারুণ বাজিবে। আজ যদি বিহারের শাসনকর্তা কোনো ইংরেজ হইতেন, তাহা হইলে হয়তো দেশবাসী বিহার লইয়া এত বেশি আলোচনা করিত না। অথবা তিনি যে প্রদেশেরই লাট হইতেন, সেই প্রদেশের শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে দেশের লোক বেশি করিয়া চোখ রাখিত। দেশীয় শাসনকর্তার নিকট দেশ–ভাই–এর একটু বেশি অধিকারের দাবি বাড়াবাড়ি বোধ হইলেও অন্তত অন্যায় নয়।

এ তো গেল এদিককার কথা। অন্য পিঠ—অর্থাৎ তাঁহার অধীন ইংরেজ শাসনকর্তারা যত বেশি প্রভুভক্তি ও কর্মকুশলতাই দেখান না কেন, এদেশী 'নেটিভ' শাসনকর্তার অধীন হইয়া থাকিতে তাঁহাদের মর্মস্থলে বেশ একটু বাজে এবং হিংসাও হয়। ইউরোপীয় গবর্নর থাকিলে তাঁহারা (বিশেষ করিয়া বিহার প্রদেশ বলিয়া) অনায়াসে দেশি লোককে নেটিভ, নিগার ইত্যাদি বলিয়া এ–গোলমালে খুব একচোট গালি–গালাজ করিয়া গায়ের ঝাল আর রসনার চুলকানি মিটাইতেন। কিন্তু এখন আর ও–রকম গালি–গালাজ দিতে পারিবেন না, কেননা তাহা হইলে প্রকারান্তরে লর্ড সিংহকেই গাল দেওয়া হইবে। অথচ তাঁহারা এটুকুও বুঝিয়াছেন যে, ইউরোপীয় শাসনকর্তার আমল অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর স্বাধীনভাবে এখন দেশকে শাসাইতে পারিবেন। কেননা, যতই হোক দেশীয় গবর্নর তো! তিনি কিছুতেই ইহাদের এই নীতিকে একদম বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন না। কেননা তখন এই ইউরোপীয় 'ডিমিনিউটিভ' শাসনকর্তারা দল বাঁধিয়া ইহার বিরুদ্ধে হৈ রৈ মার লাগাইয়া উপরওয়ালার কানে ঝালাপালা লাগাইয়া দিবে। এই সব এবং এই রকম আরো নানান গতিকে লর্ড সিংহ বাহাদুর চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি!' তিনি এখনো প্রাণপণে দু' নৌকায় পা দিয়া আছেন বলিলেই হয়। কেননা, এখন তিনি হতাশ হইয়া বলিতেছেন, প্রকারান্তরে আমি গান্ধিজিকে সমর্থন করিতেছি। তাঁহার মতো তোমাদের দুঃখ–দুর্দশা দূর করাই আমার কাজ।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই যে রকম বিগড়াইয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার আর এ 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব চলিবে না।

আমরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছি না, বরং তাঁহার এ–ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। দোষ তাঁহারও নয়, আমাদেরও নয়, এ–দোষ বুরোক্রাসির বা স্বেচ্ছাতন্ত্রের।

যতক্ষণ দেশের আদত শাসনকর্তা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক, যতক্ষণ দেশ পরাধীন থাকে, ততক্ষণ দেশীয় ছোটখাট শাসনকর্তারা কিছুতেই লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আজ যদি লর্ড সিংহ ভারতের বড়লাটও হন, তাহা হইলেও তিনি দেশের জন্য তেমন কিছু করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে অধিকাংশ সময়েই তাঁহার বিবেক–বিরুদ্ধ কার্য করিতে হইবে। দেশীয় লোক যত বড় পদই পান, তবু তিনি যে দেশীয় বা 'নেটিভ' একথা

ইংরেজ কর্তারাও ভুলিবেন না, আর তিনি নিজেও ভুলিতে পারিবেন না। আজ যদি লর্ড সিংহ একটু দেশের লোকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, তাহা হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, ইংরেজ মন্ত্রীর দল কিরকম আপিস-তাপিস করিয়া উঠেন। তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—'এক যাত্রায় পৃথক ফল!' এ-দোষ কাহারও নয় ভাই—দোষ আমাদের এই কালো চামড়ার।

লাট-প্রেমিক আলি ইমাম

হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রধানমন্ত্রী সার সৈয়দ আলি ইমাম বিলাতে গত ১১ই মার্চ রাত্রে লর্ড এবং লেডি রিডিং-এর সম্মানার্থে এক ভোজ দিয়াছিলেন। সেই ভোজ-সভায় বক্তৃতা দিবার সময় তিনি মিঃ মন্টেগুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, মিঃ মন্টেগু ভারতের কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ভীষণ যুদ্ধ (অবশ্য বাক্‌যুদ্ধ) করিয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ আশ্চর্য তৎপরতার সহিত গত ১৯১৪ সালের মহাবিপদের সময় ভারতীয় সৈন্যদিগকে চটপট আসরে নামাইয়া ভারতীয়দিগের ভীষণ রাজভক্তির কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। লর্ড রিডিং ভারতের লাটগিরি করিতে স্বীকৃত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বলিদানে ভারত কৃতার্থ হইয়া যাইবে ! ভারতের বর্তমানে যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তাহাতে এই রকম একজন গুণসম্পন্ন প্রতিভান্বিত ইংরাজ রাজপুরুষের ভয়ানক দরকার ছিল। তিনি লর্ড রিডিংকে ভরসা দিয়া আরো বলেন যে, ভারতের জন্য বা সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহাতেই তিনি (না ডাকিতেই) গিয়া হাত লাগাইতে পিছ-পা নন। ...লর্ড রিডিং প্রত্যুত্তরে বলেন, 'আমি সার আলি ইমামের সব কথা মানিয়া লইতেছি, তবে তিনি আমার যে স্বার্থত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য নয়, (অ্যাঁ, —যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর !) যে কোনো মহাপুরুষই হউন, ত্রিশ কোটি লোকের উপর হর্তাকর্তা বিধাতা হওয়াটা তাঁহার পক্ষে বড় সোজা কথা নয়। পরম করুণাময় চরম প্রসন্ন না হইলে কোনো ভায়ার এ (গয়াসুরের) পাদপদ্ম লাভ হয় না। (অত্যধিক আনন্দে 'মনে মনে' ঈশ্বরকে নমস্কার !) মস্ত বড় একটা বিরাট রকমের মহাপদ-প্রাপ্তির জন্য আমি লাটের মলাটে নিজের নাম লিখাইতে রাজি হই নাই, আমাকে ঐ পদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক ভাবিয়া লাট নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আমার এই স্বার্থত্যাগ !' লর্ড রিডিং এইখানেই না থামিয়া হুড়হুড় করিয়া আরো বলিতে থাকেন যে, তিনি যে এত বিস্তৃততর একটা স্থান ও কাজ দেখাইবার সুযোগ পাইলেন, ইহার জন্য তিনি গর্বিত। এইবার তিনি দেখাইয়া দিবেন যে, তাঁহার কার্য-ক্ষমতা কত বেশি। এতদিন তাঁহাকে আইন অনুসারে বিচার-নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছে, কিন্তু এইবার তিনি বিবেক দিয়া বিচার করিতে পারিবেন। তাই এই ভারতত্রাতার পদমঞ্জুরি। তিনি 'বহু আশা করিয়া' ভারত-যাত্রা করিতেছেন যে, ভারত পৌঁছিয়াই তিনি দেশব্যাপী এমন এক জলবায়ুর সৃষ্টি

করিয়া ফেলিবেন, যাহাতে গবর্নমেন্ট আর ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরে একটা সহানুভূতিপূর্ণ বোঝাপড়া বা লেখাপড়া হইয়া যাইবে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন বলিয়া তিনি মহৎ আশা করেন! আশ্চর্য কথাই কি না শুনিলাম! তাঁহার স্কন্ধে কত বড় দায়িত্বের জোয়াল চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রতিদিন সকাল–সন্ধ্যায় কাতর মিনতি জানাইবেন, যেন তিনি তাঁহার ঐ গর্দানের জোয়ালোপযুক্ত হন!

মিঃ মন্টেগু তখন উঠিয়া নিজামের, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সার আলি ইমাম সাহেবের ও তাঁহার বেগম সাহেবার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া .. নিজাম যে গত যুদ্ধের সময় লোক–লশ্‌কর গোলাগুলি দিয়া ইংরাজের ইজ্জৎ রক্ষা করেন, তজ্জন্য খুব গরমাগরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যদিও ভারতের অবস্থা এখন জটপাকানো জটার মতোই জটিলতাপূর্ণ, তবুও তাঁহার আশা আছে, এ–সব জট খুলিয়া যাইবে, এবং ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে একটা নূতন যুগের নব প্রেরণার আজানুলম্বিত বাহুর আবির্ভাব হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় প্রেমে জড়াজড়ি করিয়া কষিয়া বাঁধিবে!

ইহার উপরে আর আমাদের কথা নাই! এ যেন একেবারে 'দুধকে দুধ, জলকে জল!'

সবাই তো নিজের নিজের মনের মতন কথাগুলি দিব্যি আওড়াইয়া গেলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য এত নাড়ির টান ইঁহাদের, তাহাদের কেমন লাগিল বা লাগিবে সেটা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র বা আমলাতন্ত্রের মজাই হইতেছে এই যে, কর্তারা কেবল নিজের দিকটাই দেখেন। নিজেদের সুখ–সুবিধাটাই তাঁহাদের লক্ষ্য—বাকি সব চুলোয় যাক, তাঁহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই!

সার আলি ইমাম এখন লাট হইবার আশায় কত রকম ঢলানই ঢলাইবেন এবং কর্তাদের মনস্তুষ্টির জন্য কত রকমেই না পুচ্ছ নাড়িয়া নিজের কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি জানাইবেন, কিন্তু সে–আশা কি সফল হইবে শেষ পর্যন্ত? ভারতের বিনা–জবাবদিহির লাট–মসনদে বসা লইয়াও তিনি যাঁহার নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া বিনাইয়া–বিনাইয়া গুণ ব্যাখ্যা করিলেন বা খোত্‌বা পড়িলেন, তিনিই কি–না তাঁহার মুখের উপর এমন অপমানটা করিয়া বসিলেন, 'না ভাই না, এতে আমার স্বার্থত্যাগের কোনো সুগন্ধই নাই––আমি বুদ্ধদেব নই; ত্রিশ কোটি মানুষ–মেষের রাখাল, পঞ্চাশটি হাজার করে' টাকা মাসহারা (যা দিয়ে ইংলন্ডে দু–পাঁচটা লয়েড জর্জ কিনতে পাওয়া যায়), 'এ কি ভাই সবই ফাঁকি, সে–লভ্য কি গেছ ভুলে'?' লর্ড রিডিং সাংঘাতিক লোক, তাই খাঁটি সত্য কথা (তা যত বড়ই অপ্রিয় হউক না) একেবারে মুখের উপর চাঁচাছোলা ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন! এদের কাছে বাবা ঢাক–ঢাক গুড়–গুড় নাই। সোজা কথা সোজাসুজি বলিয়া দেওয়া, —বাস! ইহাতে তুমি রাগো, তো ঘরে বেশি করিয়া ভাত খাইবে। এ তো আর এ–দেশি রাজা–মহারাজা নন যে, দুটো চাটুবাক্যের আঁচ দিয়াই তাঁহাদিগকে ননীর মতন গলাইয়া ফেলিবে।

সার আলি ইমামকে শুধু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের গায়ের দাগগুলো কি এমন করিয়া মাখন ডলিলেই এত শীঘ্র মিলাইয়া যাইবে ?—

'সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,
তারই যে স্রোতে আঁকাবাঁকা চোখা বাণী,
এখনো গুঁতোর রেখা আছে লেখা পিঠের কূলে।—
আজই কি সব ফাঁকি, সে-কথা কি গেছ ভুলে ?'

ভাব ও কাজ

ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ-জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাৎ।

ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে ; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো। মানুষকে কব্জায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁওয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোন কাজ করানো যায় না, বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মস্ত বদ-খেয়াল। এই 'ভাব'কে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোন সার্থকতাই থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমা-গরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ-কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মত সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদা-ঢাকা পড়িয়া যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-ঘুম ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ-কথাটা যে একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়হুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্কল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া 'স্পিরিট'কে কি বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুনিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কাল এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া ঢুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে! হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—বাহিরে যতই কেন লা-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এইরূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের 'স্পিরিট'টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমত বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কিরূপে বা এমন কাপুরুষের মত ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদেরই দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুরমত সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য-সাধনার অভাবে তাঁহারা কোন ভাল কাজে আর কোন অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজী নন। কি করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কত লোকের কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী—সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এইসব কর্মীদের কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারার এখন ভালো বলিতে গেলেও এইসব মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাারণের সরল মন এসব না ধরিতে পারার দরুন তাহাদের মন অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। 'দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটা মস্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কি? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া

কাণ্ডাকাণ্ড ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। ভাব জিনিসটা মদের নেশার চেয়েও গাঢ়। পাঁড়-মাতালরা বলে, 'মদ খাও, কিন্তু তোমায় যেন মদে না খায়।' আমরাও বলিব, ভাবের সুরা পান কর ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন ! ভাবের দাস হইও না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর। 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোল, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মকে হারাইও না। অন্ধের মত কিছু না বুঝিয়া, না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এসব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভাল করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কি। শুধু হোড়ের মত বা উদ্‌মো ষাঁড়ের মত দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁসড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙ্গিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও, তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। তাই পাপ—মহাপাপ !

সত্য-শিক্ষা

তোরণে তোরণে ভৈরব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে—'জাগো পুরবাসি !' দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে। এই যে আমাদের জীবনের উন্মাদ নট-নৃত্য, এ শুধু বিশ্বের কল্যাণ-মুক্তিতে নয়, এই মুক্তি-যুগে আমরাও আমাদের ভাবী সিংহ-দ্বারের পূর্বতোরণে নহবতের বাঁশি শুনিয়াছি বলিয়া। তাই আর আমরা শুধু দার্শনিকের ভিতরের যুক্তিতে সন্তুষ্ট নই, এখন চাই বাইরের ব্যবহারিক জীবনে মুক্তি। এই 'আজাদি'র সাড়া না পাইলে আমাদের জীবনে আজ এমন তরুণের উচ্ছৃঙ্খলতা, সবুজের স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিত না। রক্তনিশান লইয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা শুরু ; এই শোভাযাত্রার দুর্মদ অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল, সর্বাগ্রে তাহাদিগেরই অন্তরে বাহিরে 'আজাদি'র নেশা জমাইয়া তুলিতে হইবে। কারণ, ইহাদেরই নৃত্যবিদ্রোহে অলস ভীরু জীবন-পথ-যাত্রীর বুকে সাহস সঞ্চার হইবে। আমরা কিন্তু আমাদের এই উন্মুক্ত উদার প্রাণগুলির চারিপাশে নিত্য বন্ধন-বাধা সৃজন করিয়া তাহাদিগের উচ্ছল গতিকে অচল করিতেছি। তাই বিজাতির বিভিন্ন শৃঙ্খল কাটিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমরা আজ এত আনন্দধ্বনি করিতেছি। যাহাতে এই জাগরণ-যুগের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাহিরে না হইয়া অন্তরে হয়, সেই জন্যই আমরা এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন-তেন-প্রকারণে দুই-একটা ঠাটকবাজি-গোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয় ; অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। তাই, এই সহযোগিতা বর্জনের দিনে 'খোশখবর কা ঝুটা ভি আচ্ছা' স্বরূপ আমাদের দীর্ঘ পরিপোষিত আশার কার্যে পরিণত হইবার কথা শুনিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাহাদের মুঞ্জরিত

জীবন-পুষ্প শুকাইয়া যাইবে না, বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশে-অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী অলস অকেজো করিয়া তোলা হইবে না, —ইহা কি কম সুখের কথা ! তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য—দেশের ভাইয়ের কাছ হইতে, তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া, —ইহা কি কম আনন্দের কথা ! তাই আবার বলিতেছি, শুধু হুজুগে মাতিলে চলিবে না, গলাবাজির চোটে স্টেজ ফাটাইয়া তুলিলে হইবে না, —আমরা দেখিতে চাই কোন্ নেতার চেষ্টায় কোন্ দেশ-সেবকের ত্যাগে কতটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। আমরা দেখিতে চাই, আমাদের কতগুলি তরুণের বুকে এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল ! আমরা দেশ-সেবক চিনিব ত্যাগে, বক্তৃতায় নয়। আমরা দেখিতে চাই কবির ভবিষ্যদ্বাণী—'আসিবে সে দিন আসিবে' গান দিকে দিকে বৈতালিক-কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে, —'দিন আগত ঐ !'

জাতীয় শিক্ষা

কথায় বলে, 'ঢকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলে বাসা।' আজকাল 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা' বলিয়া যে একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে দেশে, ইহার প্রতিও উক্ত ব্যঙ্গোক্তি দিব্যি খাটে ! সরকারি বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয় হয় বলিয়াই যদি আমরা তাহাকে তালাক দিই, তাহা হইলে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিপুষ্টির জন্য বা মনের মতো শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যাপীঠ খাড়া করিয়াছি বা করিব, তাহা কিছুতেই ঐ সরকারি বিদ্যালয়েরই নামান্তর বা রূপান্তর হইবে না। তাহা হইলে ঢকের ভয়ে আমরা বৃথাই বাঁধা বাসা ফেলিয়া পলাইয়া আসিলাম, কেননা আবার আমাদের আর এক রকম 'ঢকবৃক্ষ'-এরই ছায়াতলে আশ্রয় লইতে হইল।

শুনিয়াছি, 'বন্দে মাতরমের' যুগে যখন স্বদেশি জিনিসের সওদা লইয়া দেশময় একটা হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল, তখন অনেক দোকানদার বা ব্যবসায়িগণ বিলাতি জিনিসের ট্রেডমার্ক বা চিহ্ন দিব্যি চাঁচিয়া-ছুলিয়া উঠাইয়া দিয়া তাহাতে একটা স্বদেশি মার্কা মারিয়া লোকের নিকট বিক্রয় করিতেন। এখন যে-পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাও ঠিক ঐ রকম বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া 'স্বদেশী' মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মতো। শিক্ষায় যা একটু মৌলিকতা দেখা যাইতেছে, তাহা কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়। ও-রকম এক-আধটু নূতনত্ব যে-কেহ একটা নূতন জিনিসে লাগাইতে পারে। যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ঐ সরকারি বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না। যাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যাহা অন্যের ভুল দাগে দাগা-বুলানো মাত্র, তাহাকে কি বলিয়া কোন্ লজ্জায় 'হামারা' বলিয়া বুক ঠুকিয়া তাহাদেরই সামনে দাঁড়াইব—যাহাদিগকে মুখ ভেঙচাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি আবার তাহাদেরই হুবহু 'হনুকরণ' করিতেছি। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতিও শিক্ষাদাতা কর্তাদের সম্বন্ধে আমরা আজ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা খারাপ বলিতে আমাদেরই বক্ষে বাজিতেছে। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভণ্ডামি দিয়া কখনও মঙ্গল-উৎসবের কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলিবে না। শুধু চরকা দিয়া সূতা কাটানো ছাড়া এ-ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলেদের মনের বা এ-দেশের আবহাওয়ার উপযোগী। এসবই ইংরেজি কায়দা-কানুনকে যেন মাথায় পগ্‌গ ও পায়ে নাগরা জুতা পরাইয়া এদেশি করা ; অথবা সাহেবকে ধুতি ও

মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গোছ। এর পূর্বে স্বদেশি যুগে যখন আর একবার এই রকম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখনো এই ব্যাপার ঘটিয়া সব কিছু পণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

এ-সব দোষ তো আছেই, তাহা ছাড়া একটা এমন ব্যাপার এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহা কিছুতেই মার্জনা করা যায় না। যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রফেসর বা অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই কি নিজ নিজ পদের উপযুক্ত? কত উপযুক্ত লোককে ঠকাইয়া শুধু দুটো বক্তৃতা ঝাড়ার দরুন ইঁহারা অনেকেই নিজের রুটির যোগাড় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। আজ আমরা তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি এখনো এই রকম ব্যাপার চলিতে থাকে, তবে বাধ্য হইয়া আরো অনেক অপ্রিয় সত্যকথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। পবিত্রতার নামে মঙ্গলের নামে এমন জুয়াচুরিকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ একদম ফর্সা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা দেশের লোক কতকগুলি ভূতের বাথান ও আখড়া পাকাইবার জন্য বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন নাই। তাঁহারা টাকা ঢালিয়া দিয়াছেন ইংরেজি মেম-ভারতীয় জুতো-পরা পায়ে নয়, বাগ্‌দেবী ভারতী-বীণাপাণির কমল পায়ে। এর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া 'খোঁড়া ওজর' দেখাইলে চলিবে না, তাঁহারা ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কি?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় (ন্যাশনাল) বিদ্যালয় লইয়া একটু খোঁচা দিয়াছি, তাহা অন্য কোনো ভাব-প্রণোদিত হইয়া নয়। জাতীয় জিনিস লইয়া জাতির প্রত্যেকেরই ভালো-মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার আছে। তাহা ছাড়া, 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম', ভুল সকলেরই হয় ; নিজের ভুল নিজে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আমাদেরই জাতীয় বিদ্যালয়ের যে ভুল আমাদের চোখে পড়িবে, তাহা আমাদের শোধরাইয়া লইতে হইবে। প্রথম কোনো বড় কাজ করিতে গেলে অনেক রকম ভ্রম-প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক জানি, এবং তাহাকে ক্ষমা করিতেও পারা যায়—যদি জানি যে তাঁহারা জানিয়া ভুল করিতেছেন না। কিন্তু যদি দেখি যে, এই সব হোমযজ্ঞের হোতারা জানিয়া-শুনিয়া ভুল করিতেছেন বা জাতীয়-শিক্ষা-রূপ পবিত্র জিনিসের নামেও নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিতেছেন, তাহা হইলে হাজার অপ্রিয় হইলেও আমাদিগকে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। পবিত্র কোনো জিনিসে কীট প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকাও অপরাধ। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে কাঁচা কাঁচা অধ্যাপক নিয়োগ লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা হাজার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না ; 'মাছ দিয়া শাক ঢাকা যায় না'। 'কাঁচা অধ্যাপক মানে বয়সে কাঁচা নয়, বিদ্যায় কাঁচা। আমাদের আর সবই ভালো, কেবল বে-বন্দোবস্তিই হইতেছে 'গুণ-রাশিনাশী।' গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো তদুপরি আবার আমাদের একগুঁয়েমিও আছে। দোষ করিতেছি, জানিয়া-শুনিয়াও তাহা শুধরাইব না। যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য সকল স্বার্থ বলিদান দিয়া গোলামখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন মনে করিয়াছিলাম, আজ যদি কর্মগতিকে দেখিতে পাই বা বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা অন্য এক স্বার্থের লোভে বা বেশি লাভের সম্ভাবনায় ও-রকম লোক-দেখানো ত্যাগ দেখাইয়াছেন, তাহা হইলে বড় কষ্ট বোধ হয়। এখন কিন্তু অনেকেরই কার্য দেখিয়া সেই রকম বোধ হইতেছে। যে-সব অধ্যাপক গোলামখানা ছাড়িয়া আমাদের বাহবা লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই যে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কেননা তাঁহারা কখনো এই ত্যাগের বদলে আর একটা বড় রকম লাভের আশায় এ ত্যাগ দেখান নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আরো অনেকে লাফাইয়া উঠিয়া এই রকম মিথ্যা ভণ্ডামির ত্যাগ দেখাইতে ছুটিতে পারে। কেননা, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি তো হইলই না, উল্টো দেশময় একটা বাহবা পড়িয়া গেল যে, অমুক লোকটা একেবারে ত্যাগের চূড়ান্ত করিয়াছে—একেবারে বুদ্ধদেব ! কিন্তু এ-মিথ্যাকে আর যেই প্রশ্রয় দেন, আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মঙ্গল-উৎসবে

মিথ্যার অমঙ্গল কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিব না। আমরা অন্তর হইতে বলিতেছি, সত্যকে এড়াইয়া চলিও না, ইচ্ছা করিয়া বা স্বার্থান্ধ হইয়া এমন মহৎ অনাবিল অনবদ্য জিনিসকে পঙ্কিল-কলঙ্কিত করিও না, —যদি বুঝি তুমি বুঝিবার দোষে তাহা করিতেছ ; ভণ্ডামি করিতেছ না, তবে তোমায় প্রাণ হইতে দেশবাসী ক্ষমা করিবে, স্নেহের দাবি লইয়া তোমার ভুল শুধরাইয়া দিবে, এবং তোমার গায়ে কাঁটাটিও ফুটিতে দিবে না। যে সত্যিকার ত্যাগী তাঁহার পায়ে কাঁটা ফুটিলে আমরা দাঁত দিয়া তুলিয়া দিতে রাজি আছি। দোষ রাজতন্ত্রের নয়, দোষ আমাদেরই। আমরাই নিত্য-নিতুই মঙ্গলের নামে দেশের নামে নিজের স্বার্থ বাগাইয়া তো লইতেছি। এই ভণ্ডামি আর মোনাফেকিই তো সর্বনাশের মূল। প্রথমে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে,. স্বার্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সত্যকে বড় করিয়া দেখিতে শিখিতে হইবে, তাহার পর যেন বড় কাজে হাত দিই। সে-বার জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এবারও যদি ঐ রকম হয়, তাহা হইলে লজ্জায় আর মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। যাঁহারা সত্যিকার কর্মী, তাঁহারাও কি অসত্যের জঞ্জাল হইতে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবেন না? মিথ্যাকে সহ্য করার মতো কাপুরুষতা আর পাপ নাই। মহান কোনো কাজে অতি প্রিয়জনের দোষ দেখিলেও তাহা লুকাইলে চলিবে না। লোকলজ্জা বা মুখচোরা জিনিসটাই আমাদিগকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। বন্ধুর মর্যাদার চেয়ে সত্যের মর্যাদা অনেক উপরে।

তাহা ছাড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম কি? স্ট্যান্ডার্ডেরই বা কোনো একটা নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রাম আদি আছে কি? হইবে কখন? সকলেই তো দেখি, বসিয়া বসিয়া মাছি মারিতেছেন। অথচ কাঁদুনি গাহিতেছেন, 'ছেলে জুটিতেছে না, আবার গোলামখানায় গিয়া ঢুকিতেছে,' ইত্যাদি! কিন্তু এই সব কাণ্ড দেখিয়া কয়জন বদ-সাহসী ছেলে ইহাতে আসিতে পারে? ভাল করিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও তো, দেখিবে তোমায় তখন ডাকিতে হইবে না—আপনিই তোমার অঙ্গন-ভরা লক্ষ তরুণ কণ্ঠে 'হাজির' 'হাজির' রব উত্থিত হইবে। তোমার মন্ত্রে যদি ভূত না ছাড়ে, তবে সে তোমার দোষ বা ক্ষমতার অভাব, তাহা মন্ত্রের দোষ নয়। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা বলিয়া আক্ষেপ করা—ধৃষ্টতা আর বোকামি মাত্র।

আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। 'মেদা-মারা' ছেলের চেয়ে সে হিসাবে 'ডানপিটে' ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের 'জান' থাকে না ; আর যাহার জান নাই, সে-'মোর্দা' দিয়া কোনো কাজই হয় নাই, আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে—প্রাণ-শক্তি আর কর্ম-শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। শত্রুরে যেন ইহাকে গোলামখানা বই তেলাম-খানা না বলিতে পারে।

জাগরণী

বকুল ! জা-গো ! জাগো বকুল, এই পল্লিমাঠের পথের পাশে মেঠো গানের সহজ সুরে জাগো। জাগো তারই রেশের ছোঁয়ায় ! জাগো বেদন নিয়ে, পল্লি-শিশুর মুক্ত-বিথার প্রাণ নিয়ে, পল্লি-তরুণের তাজা খুনের তীব্র কাঁপুনি নিয়ে ! জাগো, —জাগো বকুল, —জাগো ! শরম-রাঙা পাপ্ড়ি ক'টি তোমার খুলে দাও—ছড়িয়ে দাও এই নবীন আষাঢ়ের কালো মেঘের জোলো ঝাপ্টায় ! সঙ্কুচিতা, ভীতা, ত্রস্তা বকুল ! জাগো ! জাগো পরাগ-মাখা পবিত্র তোমার ধৌত-করুণ চাউনি নিয়ে, —এই বাদর-রাগিণী-আহত বাদল-প্রাতে। তোমার পরিমলের উদাস সুরভি নিয়ে এসে আমেজ দাও রাজার যত গুল-ভরা বাগিচায়। অনাদৃতা তুমি, তাই বলে তোমার ওই এক নিশ্বাসের সুরভিটুকু নিয়ে গর্বিতার মতো এসো না। এসো তুমি আধ-মুকুলিত-যৌবনা নববধূর মতো ধীর-মন্থর চরণে—পায়ের মুখর পায়জোর সাম্‌লে ! লাজ-জড়িমা-জড়িত তোমার বুক ভরে থাকে যেন পূত শালীনতা সংযম আর প্রশান্ত প্রীতির স্নিগ্ধ শান্তি ! জাগো বকুল, জাগো ! তুমি যেখানে ফোটো, সেই পল্লিতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাঙলা, —বাঙালির আসল প্রাণ।

আমাদের এই শাশ্বত বাঙালির সুষুপ্ত, ঘুমে-ভরা অলস-প্রাণ জাগিয়ে তোলো তোমার জাগরণের সোনার কাঠি দিয়ে ! তাদের ফুলের প্রাণে দাগ বসিয়ে দিয়ো তোমার মদির বাসের উন্মাদনার ছুরি হেনে ! জাগো বকুল, জাগো ! ওই রাজবাগানের ফুলবালাদের সালাম করো, আর তোমার অশ্রু-ভরা অভিনন্দন জানাও। ছোট্ট তুমি, এই পল্লি-বাটের পায়ে-চলার-পথে থেকে তাদিগে তোমার বুকভরা ভক্তি-ভালোবাসা নিবেদন করো। তোমার ঐ পরাগালক্ত নিবেদিত অর্ঘ্য নিয়ে সে গুলবাহার-পরা সুন্দরীদের বলো, —'ওগো, আমি ছোট্ট বকুল—নেহাৎ ছোট্ট ! আমি জেগেছি, তাও সে অনেক দূরে পল্লির অচিন পথে ! তোমরা আমায় ঘৃণা করো না ! আমি আনব শুধু আমার পল্লি-দুলালদের বুকের বেদন, তাদের খাপ-ছাড়া আকুল আবদার, আর যুগ-যুগ-ধরে-পিষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণের ব্যথা-বিজড়িত সহজ চিন্তার স্মৃতি। এ-বাছাদেরও ঘৃণা করো না, —অবহেলা এদের প্রাণে বড়ো বাজবে ! শিশু এরা—কুঁড়ি এরা, এখনও ফোটেনি। এরা তোমাদের দেশের হাওয়ায় উড়িয়ে-দেওয়া রেণুকা।

'দিয়ো গো দিয়ো, তোমাদের ঐ রানির স্নেহের শুধু একটি রেণু উড়িয়ে দিয়ো দখিন বায়ে এদের পানে ! আহা, অনাদৃতা বিড়ম্বিত হতভাগা এরা, ঘৃণা করো না

এদের।' ... জাগো বকুল, জাগো ! ঝোড়ো হাওয়ায় আর জোলো মেঘে তোমায় ডাক দিয়েছে। জাগো—জাগো, পল্লিবুকের বেদন নিয়ে পল্লি-শিশুর ঝর্না-হাসি নিয়ে, আর তরুণদের সবুজ বুকের অরুণ খুনের উষ্ণগতি নিয়ে ! জাগো, বকুল জাগো ! ! জাগো যৌবনের জয়টিকা নিয়ে ! ! !

রাজবন্দীর জবানবন্দী

রাজবন্দীর জবানবন্দী

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী ! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

এক ধারে রাজার মুকুট ; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড ; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ-মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন—ন্যায়, ধর্ম। সে-আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই। সে-আইন বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট ; সে-আইন সর্বজনীন সত্যের, সে-আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে—পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি ; আমার পক্ষে—আদিঅন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ ; আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য-স্বরূপ।

সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজ-দণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা, যে-বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণী রুদ্ধ করছে, সত্যের বাণীকে মূক করতে চাচ্ছে, সেও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তাঁরই ইঙ্গিত-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই ; সে যাহার সৃষ্টি তাহাকেই সে বন্দী

করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়! কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে!

যাক, আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে-যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে ; কিন্তু সে-যন্ত্র যিনি বাজান, সে-বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোনো কালে কোনো কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি—তার বাণী মরেনি। সে আজো তেমনি করে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না ; কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয়, দোষ আমার, যে বাজায় ; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয় ; দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই ; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মতো রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দী করবার মতো পুলিশ বা কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তার প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা ; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি—আজ এই আদালতে আসামির কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজনিযুক্ত বিচারক সত্য-বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার-প্রহসন করে যেদিন খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো, গান্ধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি, তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু হয়তো সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিচারাসন—এ কার? রাজার, না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? রাজা না ভগবান? অর্থ না আত্মপ্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ-খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায়-শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী। এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংল্যান্ডই ভারতের অধীন হতো এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংল্যান্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতোই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তাহলে সে সময় এই বিচারক আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, —কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, —আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার

সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, —তার জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা ; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তাহলে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কী? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তূর্য বেজে উঠেছিল ; আমার হাতের ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলো। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন ... প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কারাগার-মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা-চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে—অমৃতের পুত্র আমি—হাসিগানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলবে। চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই ; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ, ভয় নাই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কি-না জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুত্রঃ'। আমি জানি—

'ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয় ;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।'

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা।
৭ই জানুয়ারি ১৯২৩।
রবিবার—দুপুর।

গ্রন্থ-পরিচয়

[নজরুল-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশ-কাল ও কতকগুলি রচনা-সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হইল।]

[পুনশ্চ শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত।]
'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হলো।

অগ্নি-বীণা

'অগ্নি-বীণা' ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মুতাবিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'উৎসর্গ' গানটি 'অগ্নি-ঋষি' শিরোনামে ১৩২৮ শ্রাবণের 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে লেখা ছিল : "তিলক-কামোদ—ঝাঁপতাল"। "সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী" চরণের 'প্রাণ' স্থানে 'উপাসনা'য় ছাপা হইয়াছিল 'জান্'। 'উৎসর্গ'-গানটিতে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের বাঁশী' নামক আন্দামানে অবস্থান-কালে লেখা বইখানির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী" সম্বন্ধে ১৩২৭ শ্রাবণের 'প্রবাসী' বলেন : "কৃষ্ণের বাঁশীর রূপক বেশ সুসঙ্গত হয় নাই।"

'প্রলয়োল্লাস', ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'প্রবাসী' হইতে ১৩২৯ আষাঢ়ের 'নারায়ণ'-এ সংকলিত হইয়াছিল। 'নজরুল-গীতিকা'য় অন্তর্ভুক্ত এই গীতি-কবিতাটির ষষ্ঠ স্তবকের শেষাংশের পাঠ নিম্নরূপ—

এই তো রে তাঁর আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ! !

এবং সপ্তম স্তবকের পরে আছে এরূপ—

তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে !
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !

'বিদ্রোহী' ১৩২৮ কার্তিকে ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যক 'মোসলেম ভারত'-এ বাহির হইয়াছিল। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে এবং ১৩২৮ মাঘের 'প্রবাসী'তে উহা সংকলিত হইয়াছিল। 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'বিদ্রোহী'র ৯১-৯৪ সংখ্যক চরণগুলি ছিল নিম্নরূপ—

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
হাসি হা-হা হা-হা হি-হি হি-হি,
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হাঁকে চিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ চিঁ-হিঁ হিঁ-হিঁ।

'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'বিদ্রোহী'তে "আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার" পংক্তিটির পূর্বে ছিল এই পাঁচটি পংক্তি—

আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,
আমি বিবসন, আজ ধরাতল নভ ছেয়েছে আমারি জটাজাল।
আমি ধন্য। আমি ধন্য ! !
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীর, বিদ্রোহী সৈন্য !
আমি ধন্য ! আমি ধন্য ! !

১৩৩০ আশ্বিনে কলিকাতার আর্য পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় সংস্করণেও এই পাঁচটি পংক্তি ছিল ; কিন্তু পরবর্তীকালে এই পংক্তিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'বিদ্রোহী' পাঠে কবি গোলাম মোস্তফা ১৩২৮ মাঘের 'সওগাতে' লেখেন 'নিয়ন্ত্রিত'। ১৩২৯ বৈশাখের 'সাধনা'-য় 'বিদ্রোহী' ও 'নিয়ন্ত্রিত' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'রক্তাম্বরধারিণী মা' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র তারিখে ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'আগমনী' ১৩২৮ আশ্বিনের 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সম্পর্কে 'উপাসনা'-সম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :

> "নজরুলের এক বিশিষ্ট দিকের কবিতা 'শাতিল আরব' যখন 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশ হয়, প্রায় ঠিক সেই সময়ে হিন্দুর দেব-দেবী নিয়ে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'উপাসনা'য়—
>
> এ কি রণ-বাজা বাজে ঝনঝন।"
>
> — কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১]

'আগমনী' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৯ই আশ্বিন তারিখের 'ধূমকেতু'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'ধূমকেতু' শীর্ষক কবিতাটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে শ্রাবণ মুতাবিক ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট শুক্রবার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' [সারথি ও স্বত্বাধিকারী : কাজী নজরুল ইসলাম] পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কামাল পাশা' ১৩২৮ কার্তিকের 'মোসলেম ভারতে' বাহির হইয়াছিল। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে ভাদ্র তারিখের 'ধূমকেতু'তে কবিতাটির কিয়দংশ সংকলিত হইয়াছিল।

'শাত্-ইল্-আরব' ছাপা হইয়াছিল ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম ভারতে'। সে সংখ্যার Frontispiece-রূপে শোভিত হইয়াছিল 'শাতিল-আরবে'র চিত্র ; তাহার নীচে caption-রূপে ছাপা হইয়াছিল কবিতাটির প্রথম দুই চরণ। 'একজন সৈনিক' লেখেন এই 'চিত্র-পরিচয়'—

> "টাইগ্রীস (দিজ্‌লা) আর ইউফ্রেটিস (ফোরাত) বসরার অদূরে একজোট হয়ে 'সাতিল আরব' নাম নিয়েছে। তার পর, বসরার পাশ দিয়ে বয়ে পারস্য-উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে দু' তিন মাইল করে চওড়া খর্জুর-কুঞ্জ ; তাতে ছোট্ট নহর, তারই কূলে আঙুরলতার বিতান, বেদানা-নাশপাতির কেয়ারী। এখানে এলেই অনেক পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপনিই গাইতে ইচ্ছা করে—
>
> সাতিল্-আরব ! সাতিল্-আরব ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
> শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।"

'খেয়া-পারের তরণী" ছাপা হইয়াছিল ১৩২৭ শ্রাবণের 'মোসলেম ভারতে'। সে সংখ্যার গোড়ায় শোভিত হইয়াছিল একখানি চিত্র। তাহার caption-রূপে ছাপা হইয়াছিল :

> "বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
> ঐ হলো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া-পার।"

'চিত্র-পরিচয়' প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়—

> "চিত্রশিল্পী নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম সাহেবা ঢাকার পরলোকগত স্যার নওয়াব আহ্‌সানউল্লাহ্ বাহাদুরের কন্যা এবং স্যার নওয়াব সলিমুল্লাহ্ বাহাদুরের ভগিনী। ইহার স্বামী খানবাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম সাহেবও বঙ্গে সুপরিচিত।"

'খেয়া-পারের তরণী' সম্বন্ধে ১৩২৭ ভাদ্রের 'মোসলেম ভারতে' কবি মোহিতলাল মজুমদার 'একখানি পত্রে' লেখেন—

> ..."খেয়া-পারের তরণী" শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে ; ছন্দকে রক্ষা

করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই ; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ-গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

আবুবকর উস্‌মান উমর আলী-হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর !
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি-গান—'লা-শরীক আল্লাহ্ !'

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে ; বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য 'লা-শরীক আল্লাহ্'—যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙলা কবিতায় কি অভিনব-ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

'কোরবানী' ছাপা হইয়াছিল ১৩২৭ ভাদ্রের 'মোসলেম ভারতে'। এ কবিতাটি সম্পর্কে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খান লিখিয়াছেন :

"তরীকুল আলম ব'লে একজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট 'কোরবানী'কে বর্বর-যুগের চিহ্ন ব'লে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধ প'ড়ে নজরুল ইসলামের কলম গর্জে উঠল। নব্য তুর্কীরা তখন স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জান কোরবান করছিল। সেই ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে তিনি লিখলেন :

ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন !"

১৩২৭ শ্রাবণের 'সবুজপত্রে' তরিকুল আলম 'আজ ঈদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"...আজ এই আনন্দ-উৎসবে আনন্দের চেয়ে বিষাদের ভাগই মনের উপর চাপ দিচ্ছে বেশী ক'রে। যেদিকে তাকাচ্ছি, সেই দিকে কেবল নিষ্ঠুরতার অভিনয়। অতীত এবং বর্তমানের ইতিহাস চোখের সামনে অগণিত জীবের রক্তে ভিজে লাল হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই লাল রঙ্ আকাশে-বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—যেন সমস্ত প্রকৃতি তার রক্তনেত্রের ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পৃথিবী বিভীষিকা ক'রে তুলেছে। প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠছে।"

'কোরবানী' কবিতার ছন্দ সম্পর্কে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন :

> "শুধু ঘন ঘন যুক্তাক্ষর-বিন্যাসই নয়—পর্বান্ত হসন্তবর্ণ যতদূর সম্ভব বর্জন করিতে পারিলে, স্বর-প্রসারণের কোন অবকাশ আর থাকে না বলিয়া, এই বাংলা ছন্দেও প্রবল আঘাতমূলক ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি করা যায়, যথা—
>
> ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
>
> ইহা পড়িতে হইবে এইরূপ—
>
> ওরে হ্‌ত্যা-ন্‌য়াজ ০ স্‌ত্যাগ্‌রহ ০ শক্তি-র্‌দ্বো ০ ধ্‌ন
>
> ইহার কোনখানে স্বর-প্রসারণের অবকাশ মাত্র নাই।"
>
> — বাংলা কবিতার ছন্দ, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা।]

'মোহর্‌রম' ছাপা হইয়াছিল ১৩২৭ আশ্বিনের 'মোসলেম ভারতে'। সে সংখ্যার গোড়ায় ছিল একটি ছবি ; তাহার উপরে লেখা ছিল 'কারবালা-প্রান্তরে ইমাম হোসেনের সমাধি'। ছবিটির নীচে লেখা ছিল :

"মোহর্‌রম ! কারবালা ! কাঁদো 'হায় হোসেনা !'
দেখো মরু-সূর্যে এ খুন যেন শোষে না ! !"

'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'মোহর্‌রম' কবিতাটির শেষে ছিল এই শ্লোকটি—

দুনিয়াতে খুনিয়ারা দুর্মদ ইসলাম,
লোহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।

কিন্তু গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সময় এই অগ্নিক্ষরা শ্লোকটি বর্জিত হইয়াছে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই ভাদ্র তারিখের বিশেষ মোহর্‌রম সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

অগ্নি-বীণা প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিকে (অক্টোবর ১৯২২) ; প্রকাশক : গ্রন্থকার, ৭ প্রতাপ চাটুজ্যে লেন, কলিকাতা ; প্রকাশকরূপে অনেক ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছেন শরচ্চন্দ্র গুহ, আর্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। পৃ ২ × ৬৬ ; দাম এক টাকা। এই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৩ এর অগ্রহায়ণে এবং চতুর্থ সংস্করণ এর শ্রাবণে। কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত *অগ্নি-বীণার* যে-কটি সংস্করণ দেখার সুযোগ আমাদের হয়, তার মধ্যে চতুর্থ সংস্করণই সর্বশেষ। এর প্রকাশক ছিলেন ডি. এম.

লাইব্রেরির পক্ষে গোপালদাস মজুমদার, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ + ৫৮, মূল্য পাঁচ সিকা, মুদ্রণসংখ্যা ২২০০। *নজরুল-রচনাবলীর* এই নতুন সংস্করণে আমরা *অগ্নি-বীণার* চতুর্থ সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি।

চতুর্থ সংস্করণের যে-কপি অনুসরণ করে বর্তমান পাঠ নির্ণীত হয়েছে, তা সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। তাতে 'বিদ্রোহী' কবিতার পাতাগুলো ছেঁড়া থাকায় *সঞ্চিতা* কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে (কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৫২) সংকলিত 'বিদ্রোহী'র পাঠ অনুসৃত হয়েছে। "আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস"—এই চরণের আগে প্রথম সংস্করণে দুটি চরণ ছিল :

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশে ম্লান গৈরিক।

এই চরণদুটি *সঞ্চিতার* অন্তর্ভুক্ত 'বিদ্রোহী' কবিতায় বর্জিত, *অগ্নি-বীণার* দ্বাদশ সংস্করণেও (কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫) নেই।

প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন কবিতার কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় চতুর্থ সংস্করণে। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় "এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর" চরণটির পরে একটি অতিরিক্ত চরণ পাওয়া যায় : "শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর"।

মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশকালে এবং প্রথম সংস্করণে 'সাত-ইল-আরব' কবিতার শিরোনামে ও পাঠে সাত-ইল-আরব বা সাতিল আরব মুদ্রিত হয় দন্ত্য স দিয়ে। চতুর্থ সংস্করণে সেখানে তালব্য শ ব্যবহৃত হয়েছে : শাত-ইল-আরব বা শাতিল আরব।

"খেয়াপারের তরণী"-প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-প্রদত্ত নিম্নলিখিত তথ্য উদ্‌ধৃতিযোগ্য :

> কি কারণে জানিনা, আফ্‌জালুল হক সাহেব ঢাকা গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর "মোসলেম ভারতে" ছাপানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার বেগম মুহম্মদ আজম সাহেবার (খান বাহাদুর মুহম্মদ আজমের স্ত্রী) আঁকা একখানা নৌকার ছবি সঙ্গে নিয়ে আসেন। পত্রিকায় ছাপানোর আগে ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তার জন্যে ছবিখানা একদিন বিকালবেলা নজরুল ইসলামের নিকটে আফ্‌জালুল হক সাহেব রেখে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, নজরুল ইসলাম গদ্যে এই আধ্যাত্মিক ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে দিবে। কিন্তু নজরুল তা করল না। সে রাত্রিবেলা প্রথমে মনোযোগ সহকারে ছবিখানা অধ্যয়ন করল এবং তারপরে লিখল এই ছবির বিষয়ে তার বিখ্যাত কবিতা "খেয়াপারের তরণী"।
>
> (*কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা,* দ্বিতীয় বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ ৫৩-৫৪।)

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুল-রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণে *অগ্নি-বীণা* কাব্যের তৃতীয় মুদ্রণ (নূর লাইব্রেরি সংস্করণ), অগ্রহায়ণ ১৩৩১, অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকাশক মঈনউদ্দীন হোসায়ন বি. এ., নূর লাইব্রেরি, ১০ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা, বাসন্তি প্রেস ৭১ নং নেবুতলা লেন, কলিকাতা, এন মুখার্জী কর্তৃক মুদ্রিত।

আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণে (২৫ মে ১৯৬৬/জুন ১৯৮৩) 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রতিক্রিয়ায় রচিত কবি গোলাম মোস্তফার 'নিয়ন্ত্রিত' এবং সজনীকান্ত দাসের প্যারডি 'ব্যাঙ' গ্রন্থ-পরিচয় অংশে ছিল না, কবিতা দুটি নজরুল-রচনাবলীর ১৯৯৩ সালের নতুন সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতা দুটি ছিল না, সেই কারণে বর্তমান সংস্করণে কবিতা দুটি বাদ দেওয়া হলো। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কার্তিক ১৩২৮ সংখ্যায়। 'মোসলেম ভারত'-এর এই সংখ্যার সমালোচনা সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২২শে পৌষ ১৩২৮ সংখ্যায় 'মোসলেম ভারত'-এর সমালোচনা সূত্রে 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

নজরুল-রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণে 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য মুখবন্ধটি সংযোজিত হলো।

দোলন-চাঁপা

১৩৩০ আশ্বিনে 'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবি তখন রাজবন্দী। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা-রূপে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 'দু'টি কথা' লিখিয়াছিলেন। তাহা এই...

এই কাব্যের মুখবন্ধ-রূপে লেখা কবিতাটি 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' শিরোনামে ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠে ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যক 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দোদুল দুল' ১৩২৮ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'প্রবাসী' হইতে ১৩২৯ মাঘের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'পউষ' রচিত হইয়াছিল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। কবি তখন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে বিচারাধীন বন্দী। 'পউষ' ১৩২৯ মাঘের এবং 'পথহারা' ১৩২৯ ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ব্যথা-গরব' ১৩২৯ চৈত্রের মাসিক 'বসুমতী'তে এবং 'সমর্পণ' ১৩২৯ চৈত্রের 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল।

'অবেলার ডাক' ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'অভিশাপ' ১৩৩০ শ্রাবণের এবং 'আশান্বিতা' ১৩৩০ আশ্বিনের 'কল্লোল'-এ ছাপা হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

দোলন-চাঁপা প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (অক্টোবর ১৯২৩) ; প্রকাশক : শরচ্চন্দ্র গুহ, আর্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬+৫৪ ; মূল্য এক টাকা চার আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ এর আগে, আনুমানিক ১৯২৯এ। এর প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার, ডি.এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮+৫৪, মূল্য পাঁচ সিকা। *নজরুল-রচনাবলীর* নতুন সংস্করণে কাব্যগ্রন্থটির উভয় সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে দেখা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন নেই।

আবদুল কাদির গ্রন্থ-পরিচয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "দুটি কথা" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছিলেন। বর্তমান সংস্করণে সেটি মূল গ্রন্থের সঙ্গে যথাযথ স্থানে মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থ-পরিচয়ে বর্জিত হয়েছে এবং অবলোপ-চিহ্ন (...) দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে।

বিষের বাঁশী

'বিষের বাঁশী' ১৩৩১ সালের ১৬ই শ্রাবণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সরকার বইখানি বাজেয়াফত করেন।

'উৎসর্গ' কবিতাটি মিসেস্ এম. রহমান [মুসাম্মাৎ মাসুদা খাতুন : জন্ম ১৮৮৪ খ্রিঃ, মৃত্যু ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৬ খ্রিঃ] সাহেবার উদ্দেশে রচিত। মিসেস্ এম. রহমান এদেশে নারী-অধিকার-আন্দোলনের একজন অগ্রনায়িকা ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, সওগাত, সহচর, সাম্যবাদী, ধূমকেতু, লাঙল, অভিযান প্রভৃতি সাময়িকপত্রে বহু প্রবন্ধ ও ছোট গল্প লেখেন। তাঁহার 'মা ও মেয়ে' নামক অসমাপ্ত উপন্যাসখানি ১৩২৯ আষাঢ় হইতে ধারাবাহিকরূপে মাসিক 'সহচর'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'চানাচুর' পুস্তকের 'আমাদের দাবী', 'পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা', 'নারীর বন্ধন' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি তৎকালে পাঠকমহলে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।

'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম : আবির্ভাব' ১৩২৭ অগ্রহায়ণে এবং 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম : তিরোভাব" ১৩২৮ অগ্রহায়ণে 'মোসলেম ভারতে' বাহির হইয়াছিল।

'জাগৃহি' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৩০শে শ্রাবণ ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে 'জাগরণী' শিরোনাম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'তূর্য-নিনাদ' ১৩২৯ বৈশাখে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যক মাসিক 'বসুমতী'তে বাহির হইয়াছিল।

'বোধন' ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : "সুর—যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।" তার পাদটীকায় লেখা ছিল : "হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্ গশ্‌তা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিনান গম্ মখোর' গজল অবলম্বনে।" কবিতাটির প্রথম (এবং পরবর্তী চারিটি স্তবকের প্রত্যেকটির শেষে পুনরাবৃত্ত) শ্লোকটি ছিল এরূপ—

> দুঃখ কি ভাই ! হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে ;
> দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

'উদ্বোধন' গানটি ১৩২৭ বৈশাখে ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যক 'সওগাতে' ছাপা হইয়াছিল।

'মরণ-বরণ' গানটি ১৩২৮ কার্তিকে ৪র্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বন্দী-বন্দনা' গানটি ১৩২৮ মাঘে ৮ম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যক 'নারায়ণে' এবং ৪র্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় রচনা-স্থান ছাপা আছে : "কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।" 'নারায়ণে' শিরোনামের নীচে লেখা ছিল 'মল্লার—তেওরা'। তাহাতে শেষাংশ ছিল এইরূপ :

> আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
> গগনে কা'রা যেন চাঁহিয়া অনিমিখে
> ঐ ভারত হোমশিখা জ্বলিল জয়টিকা
> পরাতে ও কপালে।
> সে কারা মুক্তি-কারা যেখানে ভৈরব-রুদ্র-শিখা জ্বলে।
> কোরাস ; জয় হে বন্ধন-মৃত্যু শঙ্কাজয়ী।
> মুক্তি-কামী জয়।
> স্বাধীন-চিত জয়। জয় হে॥

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় পঞ্চম স্তবকের শেষ চরণটি ছিল এরূপ—

> 'সে কারা নহে কারা যেখানে ভগবান-রুদ্র-শিখা জ্বলে॥'

'বন্দনা-গান' ১৩২৮ অগ্রহায়ণের 'সাধনা' পত্রিকায় 'বিজয়-গান' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনা-স্থান : "কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।"

'শিকল-পরার গান' ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'খাম্বাজ—দাদ্‌রা'। তাহাতে কবির কৃত 'স্বরলিপি'-ও ছাপা হইয়াছি।

'চরকার গান' ১৩৩১ বৈশাখের 'ভারতী'তে ছাপা হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'খাম্বাজ-কীর্তন—দাদ্‌রা'। সে সংখ্যাতেই 'চরকার গানে'র স্বরলিপি-ও ছাপা হইয়াছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে নজরুল ইসলাম 'চরকার গান' গাহিয়া-ছিলেন।

'জাতের বজ্জাতি' গানটি 'জাত-জালিয়াত' শিরোনামে 'বিজলী'তে ছাপা হইয়াছিল। পাদটীকায় লেখা ছিল : "মাদারীপুর শান্তি-সেনা চারণ-দলের জন্য লিখিত অপ্রকাশিত নাটক থেকে।" 'বিজলী' হইতে উহা ১৩৩০ শ্রাবণের 'উপাসনা'য় 'উদ্ধৃত' হইয়াছিল। ১৩৩০ শ্রাবণে ৬ষ্ঠ বর্ষের ২য় সংখ্যক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'ও গানটি 'জাত-জালিয়াত' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বিজয়-গান' ১৩২৮ শ্রাবণের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনা-স্থান : "কান্দিরপাড়, কুমিল্লা"।

'পাগল পথিক' ১৩২৮ ভাদ্রের 'মোসলেম ভারতে 'গান' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'সুর—মেঘ-ছায়ানট ; তাল—দাদ্‌রা'।

'বিদ্রোহীর বাণী' ১৩৩১ বৈশাখের 'ভারতী'তে 'এবার তোরা সত্য বল্‌' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ঝড়' [পশ্চিম তরঙ্গ] ১৩৩১ আষাঢ়ে ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যক 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুনশ্চ

বিষের বাঁশী কবি নিজেই প্রকাশ করেন হুগলি থেকে, ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (আগস্ট ১৯২৪)। নামপৃষ্ঠায় এর মুদ্রণসংখ্যা ২২০০ বলে উল্লিখিত ছিল এবং লেখা ছিল, "গ্রন্থাকার কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত"। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪+৬০, মূল্য এক টাকা ছয় আনা এবং "সোল এজেন্ট ও প্রাপ্তিস্থান"—ডি.এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা।

বিষের বাঁশীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নূর লাইব্রেরি, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা থেকে, ১৩৫২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে। *নজরুল-রচনাবলী*তে আবদুল কাদির এই সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করেছিলেন। রচনাবলীর নতুন সংস্করণে আমরা কাব্যগ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে দেখেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি।

প্রথম সংস্করণে উৎসর্গপত্রটি ছিল গ্রন্থের শুরুতে, দ্বিতীয় সংস্করণে তা কৈফিয়ৎ-এর পরে আনা হয়। প্রথম সংস্করণের 'জাগৃহী' কবিতার শিরোনাম

সংশোধিত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে হয় 'জাগৃহি'—আমরা তা গ্রহণ করেছি। কৈফিয়ৎ-এ মূলে ডি. এম. লাইব্রেরির 'গোপাল-দা'-প্রসঙ্গে যে বাক্যটি ছিল, তা দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়।

প্রকাশের অব্যবহিত পরে ২২ অক্টোবর ১৯২৪এ বঙ্গীয় সরকার বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ২৭ এপ্রিল ১৯৪৫এ।

ভাঙার গান

'ভাঙার গান' ১৩৩১ শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার গ্রন্থখানি বাজেয়াফত করেন।

'ভাঙার গান' শীর্ষক গানটি সম্বন্ধে জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখিয়াছেন :

> "আমার সামনেই দাশ-পরিবারের শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ 'বাঙ্গলার কথা'র জন্যে একটি কবিতা চাইতে এসেছিলেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁকে কবিতার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন জেলে। ... অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নজরুল তখনই কবিতা লেখা শুরু ক'রে দিল। সুকুমাররঞ্জন আর আমি আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে নজরুল আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার সেই মুহূর্তে রচিত কবিতাটি আমাদের পড়ে শোনাতে লাগল। ... নজরুল 'ভাঙার-গান' লিখেছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে। 'ভাঙার গান' 'বাঙ্গলার কথা'য় ছাপা হয়েছিল।"
>
> — [কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা]

'জাগরণী' শীর্ষক কোরাস গানটি সম্পর্কে জনাব আফতাব-উল ইসলাম লিখিয়াছেন :

> "১৯২১ সনে শ্রীযুত বীরেন সেন (কাজীর এবং আমাদের সকলের 'রাঙা দা') তখন কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কাজী নজরুল কান্দিরপাড় তাঁরই বাড়ীতে থাকেন। প্রিন্স্ অব ওয়েল্সের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে কংগ্রেস-ঘোষিত হরতাল-পালনের জন্য (২১শে নভেম্বর) একটি গান লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়েই প্রথম তাঁর সাথে দেখা করি 'রাঙা দা'র বাড়ীতে। তিনি তা তো দিলেনই, অধিকন্তু কাঁধে হারমোনিয়াম বেঁধে মিছিলের সঙ্গে তিনি নিজেও গাইলেন :
>
> ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা দাও
> ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
> সন্তান দ্বারে উপবাসী,
> দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।"
>
> — [গুলিস্তাঁ, নজরুল-সংখ্যা]

মোহান্তের মোহ-অন্তের গান' সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত বলেন :

> "অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার পর তারকেশ্বরের দুর্নীতিপরায়ণ অসচ্চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী মোহান্তকে তাড়াবার নিমিত্ত একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। নজরুল এই সময় 'মোহান্তের মোহঅন্তের গান' লিখে এই আন্দোলনকে সমর্থন ও শক্তিশালী করেন।"
>
> — [নজরুল-চরিত-মানস, ১৫৭ পৃষ্ঠা]

'আশু-প্রয়াণ-গীতি' ১৩৩১ আষাঢ়ে ৩য় বর্ষের ৫ম সংখ্যক 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইয়াছিল।

'দুঃশাসনের রক্তপান' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১০ই কার্তিক শুক্রবার ১ম বর্ষের ১৭শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে 'দুঃশাসনের রক্ত' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'শহিদী ঈদ' সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে ছাপা হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

ভাঙার গান প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (আগস্ট ১৯২৪)। ১১ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ব্রিটিশ সরকার কখনো এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি। *ভাঙার গানে*র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৯৪৯এ। প্রকাশ : সুরেন দত্ত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। পৃ ৪+৩৬ ; দাম এক টাকা। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রবার স্ট্যাম্পের লেখা : "সম্পূর্ণ লভ্যাংশ কবির সাহায্যে দেওয়া হইবে।" বর্তমান গ্রন্থে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ ও ক্রম অনুসৃত হয়েছে।

ব্যথার দান

'ব্যথার দান' ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মুতাবিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'ব্যথার দান' গল্পটি ১৩২৬ মাঘের, 'হেনা' ১৩২৬ কার্তিকের এবং 'অতৃপ্ত কামনা' ১৩২৭ শ্রাবণের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বাদল-বরিষণে' ১৩২৭ শ্রাবণের 'মোসলেম ভারতে' এবং 'ঘুমের ঘোরে' ১৩২৬ ফাল্গুন-চৈত্রের 'নূর'-এ বাহির হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

ব্যথার দান নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রকাশক : এম. আফজাল-উল-হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪৮ ; মূল্য দেড় টাকা। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রকাশকাল ১লা মার্চ ১৯২২ বলে উল্লিখিত হয়েছে।

'ব্যথার দান' গল্পটি প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্‌মদের নিম্নলিখিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ; পুস্তকে ছাপানোর সময়ে 'ব্যথার দান' গল্পটিকে নজরুল শুধু যে ছোট করেছে তা নয়, তার চরিত্রের নামও বদলে দিয়েছে। পুস্তকে যে-চরিত্রটির নাম দারা, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় তারই নাম নূরন্নবী। এই চরিত্রটির নাম প্রথমে নূরন্নবী কেন নজরুল করেছিল, তারপরে নূরন্নবীর জায়গায় দারাই বা সে কেন করল, তার কারণ আমি জানিনে। সাহিত্য পত্রিকায় নূরন্নবীকে তার মা সংক্ষেপে নূরু নামে ডাকছেন। পরে 'বাঁধনহারাতেও নূরু নাম পাওয়া যায়। পরে দেখেছি এই নূরু নামের জন্যে তার কিছু দুর্বলতা আছে। সে চিঠিপত্রে কোনো কোনো সময়ে নিজের নূরু নাম স্বাক্ষর করেছে। শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও বিরজাসুন্দরী দেবী তাকে নূরু ডাকতেন। শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে নজরুলের পারসী শিক্ষকের নাম ছিল হাফিজ নূরন্নবী। প্রথম গল্প লেখার সময়ে এই নামটিই কি তার মনে পড়েছিল? কে জানে? আবার দারা নামটিও তার প্রিয়। আমার নাতির (মেয়ের ছেলের) নাম সে রেখেছে দারা। এও হতে পারে যে নূরন্নবী নামটি বেলুচিস্তানে খাপ খায় না, কিন্তু দারা নামটি সে-দেশের পক্ষে দিব্যি মানান-সই। ...

[ব্যথার দান গল্পে] সয়ফুল-মুল্ক ও দারা দু'জনেই যোগ দিল লালফৌজে। অথচ 'ব্যথার দান' পুস্তকে আছে যে তারা মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিয়েছিল। এখানে আমার কিছু বলার আছে। নজরুল ইসলাম যখন 'ব্যথার দান' গল্পটি আমাদের নিকটে পাঠিয়েছিল তখন তাতে এই দু'জনের লালফৌজে যোগ দেওয়ার কথাই অর্থাৎ আমি ওপরে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি ঠিক সেইরকমই ছিল। আমিই তা থেকে 'লালফৌজ' কেটে দিয়ে তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' বসিয়ে দিয়েছিলেম। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে 'লালফৌজ' কথা উচ্চারণ করাও দোষের ছিল। সেই 'লালফৌজে' ব্রিটিশ ভারতের লোকেরা যে যোগ দেবে, তা যদি গল্পের হয়, তা পুলিশের পক্ষে হজম করা মোটেই সহজ হতো না। ... আমার পরিবর্তনে সে [নজরুল ইসলাম] খুব খুশি হয়ে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছিল। তারপরে, সে যখন কলকাতায় ছুটিতে এসেছিল তখনও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে আবারও সে আমার 'লালফৌজ' কথার পরিবর্তনের জন্যে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

(কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ১৫৯-৬৪)

বাঁধনহারা

'বাঁধনহারা' ১৩৩৪ শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের বৈশাখ ১ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 'মোসলেম-ভারতে' ইহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বাঁধনহারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। ইহাতে সাহসিকার পত্রে যে বিদ্রোহিতার আভাস আছে, তাহাই পরবর্তীকালে 'বিদ্রোহী' কবিতায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

পুনশ্চ

বাঁধন-হারা প্রকাশ করেন গোপালদাস মজুমদার, ডি.এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট কলিকাতা থেকে। মূল্য দুই টাকা।

যুগবাণী

'যুগবাণী' ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মুতাবিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে নজরুল ইসলাম সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এ যে-সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন, তাহারই কতকগুলি ইহাতে গ্রন্থবদ্ধ হয়। তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার গ্রন্থখানি বাজেয়াফত করেন। ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬। তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৬৪।

'যুগবাণী'র শেষ প্রবন্ধ 'জাগরণী' ১৩২৭ আষাঢ়ের 'বকুল'-এ 'উদ্বোধন' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুল-রচনাবলীর পূর্ববর্তী কোনো সংস্করণে 'যুগবাণী' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণে সেটি সংযোজিত হলো।

পুনশ্চ

যুগবাণী প্রকাশ করেন লেখক স্বয়ং, ৭ প্রতাপ চাটুজ্যে লেন, কলিকাতা থেকে। পৃষ্ঠা ৯২, মূল্য এক টাকা। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই (২৩ নভেম্বর ১৯২২) বইটি নিষিদ্ধ

ঘোষিত হয়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ১৯৭৭ সালে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। প্রকাশক : মঈনউদ্‌দীন হোসয়ন, বি.এ., নূর লাইব্রেরি, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। পৃ. ৮ + ১২২ ; মূল্য আড়াই টাকা। নজরুল-রচনাবলীর নতুন সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

রাজবন্দীর জবানবন্দী

১৩২৯ সালের ১২ই মাঘ তারিখের 'ধূমকেতু', ১৩২৯ মাঘের 'প্রবর্তক', ১৩২৯ ফাল্গুনের 'উপাসনা' এবং ১৩২৯ ফাল্গুনের 'সহচর' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু'র মামলায় এই 'জবানবন্দী' আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল। পুস্তিকাকারে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ; কবির নূতনতম প্রতিকৃতি-সম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণের দাম ছিল দুই আনা।

নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ্। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীরসিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত, করাচিতে গন্জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার পদে উন্নতি, সাহিত্যচর্চা; কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নং কলেজ স্ট্রিটস্থ দফতরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন, মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ৮-এ টার্ণার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতের' সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা গমন, কান্দির পাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা গমন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকুরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'

প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নিবীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, শনিবারের চিঠিতে নজরুল–বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙ্গল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙ্গল'–এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙ্গল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু–মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল',

'ধ্বংস পথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' ইত্যাদি রচনা। 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণ-বাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের প্রবন্ধ 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ', 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইব্রাহীম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হোসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার

হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মিস্ ফজিলতিন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমামৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্তের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহি সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল–বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন এবং প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ জানুয়ারিতে এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়শিখা' প্রকাশ ও কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে মুক্তি। কবির প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ–জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।
'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৩ গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

১৯৩৪ গ্রামোফান রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্তরাগ রাগিণীর উদ্ধার ও নব রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডক্টর সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

তুষারকান্তি ঘোষ
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
সৈয়দ বদরুদ্দোজা
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে কবি ও কবিপত্নীকে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন প্রেরণ। মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই.এ. বেটন, ম্যাকসিক্ ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক স্যারিব্রেল অ্যানজিওগ্রাফি পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের মৃত্যু যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির অসুস্থতার সপ্তবিংশ বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্‌শান এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে কবির জাতীয় পতাকা শোভিত মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮–২০০০ সাল বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প, ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২, উৎসর্গ—মানসী আমার ! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি; তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।
অগ্নি-বীণা	কবিতা, কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২, উৎসর্গ—ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ, কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২, বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ, ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান, আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান, শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪, উৎসর্গ—বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে, বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান, শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪, উৎসর্গ—মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে, বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প, পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান, শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে।
ছায়ানট	কবিতা ও গান, আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫, উৎসর্গ—আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্মদ করকমলে।
সাম্যবাদী	কবিতা, পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।

পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান, মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।
ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা, চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ, আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান, আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬, উৎসর্গ—মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ, ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান, শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	পত্রোপন্যাস, শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭, উৎসর্গ—সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা, উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান, আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান, আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮, উৎসর্গ—বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।
বুলবুল	গান, কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮, উৎসর্গ—সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান, কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা, ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯, উৎসর্গ—বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান, ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯, উৎসর্গ—মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে।
চোখের চাতক	গান, পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯, উৎসর্গ—কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়-যুক্তাসু।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস, মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা, আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০, উৎসর্গ—বাবা বুলবুল ! ...
নজরুল-গীতিকা	গান, ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০, উৎসর্গ—আমার গানের বুলবুলিরা ! ....

ঝিলিমিলি	নাটিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান, ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০, গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০, কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস, শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল-স্বরলিপি	স্বরলিপি, ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান, ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১, উৎসর্গ—পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু—বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প, কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য, ১৩৩৮, ১৯৩১, উৎসর্গ—নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম।
সুরসাকী	গান, আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান, আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২, উৎসর্গ—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে।
জুলফিকার	গান, আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা, সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান, আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩, উৎসর্গ—স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—
কাব্য আমপারা	অনুবাদ, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩, উৎসর্গ—বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে।
গীতি-শতদল	গান, বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।

সুরলিপি	স্বরলিপি, ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি, আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান, কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪, উৎসর্গ—পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—।
মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক, শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান, মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা, চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য, ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান, ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান, বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য, মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান, মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ, মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা, ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত, বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ, আবদুল কাদির সম্পাদিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক, ২৮শে আগস্ট ১৯৯১, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড, কলকাতা বইমেলা ২০০১ দ্বিতীয় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১ তৃতীয় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২ চতুর্থ খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩ পঞ্চম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪ ষষ্ঠ খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ব

ভ

ল

শ

স

হ